ফাতাওয়া ও মাসাইল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফাতাওয়া ও মাসাইল

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

লেখকমণ্ডলী
সম্পাদনা
সম্পাদনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ফাতাওয়া ও মাসাইল

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

লেখকমণ্ডলী
সম্পাদনা
সম্পাদনা পরিষদ

ইফাবা গবেষণা : ২৯
ইফাবা প্রকাশনা : ১৮৭৮
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0377-X

প্রকাশকাল
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩; মুহাররম ১৪১৭; মে ১৯৯৬

গ্রন্থস্বত্ব
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদশিল্পী
মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মূল্য ঃ ২৪০.০০ (দুইশত চল্লিশ) টাকা

FATAWA-O-MASAIL (1st & 2nd Vol.) Composed by a group of Researchers and Compiled and Edited by editorial Board and published by Department of Research Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka. May1996

Price : Taka. 240.00 ; US $ 12.00

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

১. হযরত মাওলানা উবায়দুল হক	চেয়ারম্যান
২. হযরত মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস্ সালাম	সদস্য
৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	সদস্য
৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন খান	সদস্য
৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী	সদস্য
৬. হযরত মাওলানা মুফ্‌তী নূরুদ্দীন	সদস্য
৭. হযরত মাওলানা রফীক আহ্‌মদ	সদস্য
৮. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	সদস্য-সচিব

লেখকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
২. মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার
৩. মাওলানা রিযওয়ানুল করীম
৪. মাওলানা নজরুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মদ আলী
৬. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী
৭. মাওলানা আবদুল মোমেন
৮. মাওলানা ফয়সল আহ্‌মদ জালালী
৯. মাওলানা মাহফুযুর রহমান
১০. মাওলানা আবদুল আহাদ
১১. মাওলানা শরাফত আলী
১২. মাওলানা কুতুবুদ্দীন
১৩. মাওলানা মুস্তাক আহমদ
১৪. মাওলানা আবদুল মান্নান
১৫. মাওলানা এ. এন. এম. মুস্তাফীজুর রহমান
১৬. মাওলানা জসীম উদ্দীন খান পাঠান
১৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

ফিকহ্ হচ্ছে ইসলামী আইন–কানূন, বিধি–বিধানের সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের পারিভাষিক নাম। মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ইসলামে সুস্পষ্ট আইন–কানূন, বিধি–বিধান রয়েছে। এই আইনের মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সুন্নাহ্ বা হাদীস। এই দুই মূল উৎসের ভিত্তিতে কালপরিক্রমায় উদ্ভাবিত সমস্যাবলীর যে সমাধান ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে তাও ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হিসাবে স্বীকৃত।

ফিক্হ শাস্ত্রের সর্ববাদী সম্মত প্রধানত উৎস হচ্ছে চারটি। যথা ১. কুরআন, ২. সুন্নাহ্ ৩. ইজমা ও ৪.কিয়াস। মূলত ১. আকাইদ, ২. ইবাদত, ৩. মু'আমালাত অর্থাৎ বৈষয়িক লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, ৪. মু'আশারাত অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, ৫. উকূবাত অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি বিধান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, ৬. আদাব ও আখ্লাক ইত্যাদি বিষয়সমূহ ফিকহ্ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরী প্রথম শতকেই ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে তা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও পূর্ণাংগ রূপ লাভ করে।যাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সারা জীবনব্যাপী সাধনা করে মুসলিম জীবনের সকল দিকের জন্য ইসলামী শরী'আতের সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ আইন–কানূন, বিধি–বিধান পেশ করেন। তাঁদের এই অবদান অনবদ্য ও অবিস্মরণীয়। এবং তাঁদের মাযহাব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও অনুসরণীয় হয়ে আসছে।

কালের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইসলামী ফিকহের উপরে আরবী, ফার্সী এবং উর্দূ ভাষায় প্রণীত ও সংকলিত হয়েছে বহু নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাংগ কিতাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ শাস্ত্রের উপর আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় এ পর্যন্ত পূর্ণাংগ ও নির্ভরযোগ্য কোন কিতাব প্রণীত ও সংকলিত হয় নি। এ অভাব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' শিরোনামে বাংলাভাষায় পূর্ণাংগ ও নির্ভরযোগ্য ফিক্হ গ্রন্থ্ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মোতাবেক দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন ফিকহ্‌বিদ মুহাক্কিক আলিমের উপরে এর পাণ্ডুলিপি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সে সকল পাণ্ডলিপি সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পন করা হয় মুহাক্কিক ও প্রখ্যাত উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা বোর্ডের উপর।

'ফাতাওয়া ও মাসাইল'–এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কিতাবের সবগুলো খণ্ড সংকলিত ও প্রকাশিত হলে ইনশা আল্লাহ্ 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' ও হবে বাংলাভাষার যুগোপযোগী একখানা পূর্ণাংগ ও নির্ভরযোগ্য ফিকহের গ্রন্থ্। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের এটি একটি অবিস্মরনীয় অবদান হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি। আলাহ্ রাব্বুল আলামীন এই মহান খিদমতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

www.pathagar.com

এই কিতাবে ঈমান ও আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিরোধী মতবাদসমূহ দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে খন্ডন করে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সত্যতা ও সঠিকতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাল পরিক্রমায় আধুনিক মতবাদ, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাবে যেসকল জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে তার সময়োপযুগী সমাধানও পেশ করা হয়েছে। কোন কোন নব উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত দেশের প্রখ্যাত আলিমদের নিকট পাঠিয়ে সে সম্পর্কে তাঁদের অভিমত নেওয়া হয়েছে।

আমরা এই কিতাবের বিষয়গুলি পূর্বসূরী ফকীহ্গণের অনুসরণে সুবিন্যস্ত করেছি। যেহেতু বাংলাদেশের প্রায় সব মুসলমানই হানাফী মাযহাবের অনুসারী তাই মাসআলা সমূহের সমাধান হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পেশ করা হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও অন্যান্য ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরী'আতের পরিভাষা বহাল রাখা হয়েছে। তবে পরিচিত পরিভাষার ক্ষেত্রে বাংলা তরজমাও বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে

এই কিতাব সংকলনে আমাদের প্রধান অনুকরণীয় গ্রন্থ ছিল আলমগীরী, শামী, হিদায়া, বাদায়ে, বাহারুর রাইক প্রভৃতি ফিকহের বিশ্ববিখ্যাত কিতাবসমূহ। এছাড়া অন্যান্য যে সকল নির্ভরযোগ্য ফিকহ্ ও মাসাইল গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মাসাইলের শেষে সে সবের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য ও সহজ সরল করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেহেতু এটি এ ধরণের প্রথম কাজ তাই এতে ভুল–ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল পরিদৃষ্ট হলে তা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে আমাদের ফরিয়াদ, তিনি এই গ্রন্থকে কবুল এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন!

সম্পাদনা বোর্ড

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ইসলামের বিধি- বিধান পালনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সফলতা এ অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই নিহিত। ইসলামী পয়গামের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ্। অতঃপর রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ইজমা-কিয়াস তথা ইজতিহাদের ধারা। বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস এ চারটিই হল শরী'আতের মৌল দলীল। ইসলামী ফিকহের যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত ফয়সালা এ দলীল চতুষ্টয়ের আলোকেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

মুসলমান হিসাবে জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসাইল জানা সকলের জন্যই আবশ্যক। তা ছাড়া কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে জীবনযাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু নতুন জিজ্ঞাসাও বর্তমান সমাজে উপস্থিত। সাধারণত ফিকহ্‌বিদ আলিমগণ যুগে যুগে এ ধরনের নতুন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে আসছেন। কিন্তু বাংলাভাষায় এ পর্যায়ে বড় ধরণের কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।

এ প্রেক্ষিতেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও ফকীহ্‌গণের সমন্বয়ে এ প্রকল্প কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানের 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থটি সেই প্রকল্পের ফসল। আশা করি এটি দেশবাসী মুসলিম জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনার সাথে অনেক গুণীজন উলামা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আল্লাহ্ আমাদের এ মেহনতকে কবুল করুন। এটিকে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওয়াসীলা করুন। আমীন!

মোঃ মোরশেদ হোসেন
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ও
অতিরিক্তি সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মানব জীবনে ফাতাওয়া ও মাসাইলের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মুসলমান হিসাবে জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান মুতাবেক সম্পাদন করা আবশ্যক। বস্তুত ইসলামী জীবন যাত্রার সর্বোচ্চ সফলতা এখানেই। জীবনের কাজগুলি শরী'আতের বিধানের আলোকে বিশুদ্ধরূপে সম্পাদন করতে চাইলে শরী'আতের ফাতাওয়া ও মাসাইল জানা থাকা একান্ত জরুরী।

মহানবী (সা.)-এর সময়ে তিনি নিজেই বিভিন্ন বিষয়ের বিধান বর্ণনা করতেন। বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে ফাতাওয়া তথা সমাধান পেশ করতেন। কালক্রমে সাহাবা ও তাবিয়ীনের যুগে শীর্ষ স্থানীয় মনীষীগণের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদিত হত। অতঃপর আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষত ইমাম আযম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (র.), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (র.) ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধানকে সুপরিকল্পিতভাবে সুবিন্যস্ত করেন। তাঁদের এই অনন্য সাধারণ ইজতিহাদ কর্ম মুসলিম উম্মাহর নিকট ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং যে কোন মুসলমান তাঁর জীবনের যে কোন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার শরী'আত সম্মত সদুত্তর পাওয়ার সুযোগ পায়।

শরী'আতের এ বিধি-বিধান মাসাইলের আকারে ফিক্হ গ্রন্থে এবং ফাতাওয়া আকারে ফাতাওয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সে সব গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই আরবী ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে মাসাইল সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও ফাতাওয়া শিরোনামে বড় ও পূর্ণাংগ মানের কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নি। অথচ মুসলমানদের জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে ফাতাওয়া গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। এ প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং দেশ বরেণ্য আলিম ও ফকীহ্গণের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ এ কাজের পদ্ধতি ও রূপরেখা তৈরী করে তার আলোকে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের লক্ষ্য মোতাবেক প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। বাকী খণ্ডগুলো প্রকাশের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

উল্লেখ্য যে প্রকল্পের শুরুর দিকে সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন সারসিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা শরীফ আবদুল কাদের। প্রকল্পের রূপরেখা প্রনয়ণসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সম্পাদনার কাজে সময় দিতে পারেন নি। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করছি এবং মহান আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম জাযা প্রদান করুন এ-দু'আ করছি।

যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী ফিক্হের অনুসারী সেহেতু এ গ্রন্থে হানাফী ফিক্হের অভিমতকেই প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ গ্রন্থের কোন কোন রায়

www.pathagar.com

অন্য ফিকহের অনুসারীদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষ প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ ধরনের মাসাইলের ক্ষেত্রে পাঠকগণের প্রতি নিজ ফিকহের নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে সকল ওলামা ও ফুকাহা মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে শুকরিয়া জানাচ্ছি। তাঁদের এ মহত কাজের স্বীকৃতি হিসাবে লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ-এর নাম পত্রস্থ করা হল। প্রকল্প মেয়াদে গ্রন্থটির প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজ ত্বরান্বিত করতে গিয়ে কোথাও ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অনুগ্রহপূর্বক জানালে তা পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জন ও সংশোধন করা হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত, তিনি যেন আমাদের এ শ্রমকে কবুল করেন এবং এর ওসীলায় আমাদের সকলকে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

১

ইলমে ফিকহ্-এর পরিচিতি ৩-১০
ফিকহ্-এর বিষয়বস্তু ৪
ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ৬

২

ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎস, উৎপত্তি ও বিকাশ ১১-৩৫
ফিকহ্ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ১২
ফিকহ্ সম্পর্কে কুরআন মজীদ ১৩
ফিকহ্ সম্পর্কে হাদীস শরীফ ১৩
ফিকহ্ শাস্ত্রের সংজ্ঞা ১৪
যুগে যুগে ফিকহ্শাস্ত্র ১৪
ফিকহ্ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ১৫
ফিকহ্-এর মূল আলোচ্য বিষয় ১৭
ফিকহ্ শাস্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ ১৭
ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার ইতিহাস ২৫
কিয়াস ও রায় ২৬
ফিকহ্ সংকলনের ধরণ ও প্রকরণ ২৭
ফিকহ্ সংকলন ও সম্পদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাক্লীদ ২৮
তাক্লীদের কারণসমূহ ২৯
ফিকহ্ শাস্ত্রে ব্যবহৃত আহ্কাম ৩৩

৩

রাসমুল মুফ্‌তী এবং মাস্'আলা ও ফাত্ওয়ায় ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ ৩৬-৪৮

৪

বিপদগামী ফিরকাসমূহ ৪৯-৮০
খারিজী ৪৯
খারিজীদের আকীদা ও মতবাদসমূহ ৫১

www.pathagar.com

খারিজী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপদল ৫২
শী'আ ৫৫
শী'আ মতবাদের মূল উৎস ৫৫
চরমপন্থী শী'আ সম্প্রদায় ও তাদের বিভিন্ন উপদল ৫৬
রাফিযী ৬৩
মু'তাযিলা ৬৪
মু'তাযিল সম্প্রদায়ের মূলনীতিসমূহ ৬৫
কাদিয়ানী ৬৬
কাদিয়ানীদের ধ্যানধারনা ও বাতিল আকীদা ৬৭
বাহাই ৭০
বাহাইদের আকীদা ৭২
বাহাই মতবাদের অসারতা ৭৩
ইসমাঈলী ৭৩
ইসমাঈলীদের মতবাদ ৭৫
আগাখানী ৭৬
আবদুল্লাহ্ চাকরালভী ৭৭
যিন্দীক ৭৯

৫

মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশ ৮১-৮৮
হানাফী মাযহাবের বিকাশ ৮৩
মালিকী মাযহাবের বিকাশ ৮৫
শাফিয়ী মাযহাবের বিকাশ ৮৬
হাম্বলী মাযহাবের বিকাশ ৮৭

৬

ইমাম মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরাম ৮৯-১৩০
ঈমাম আবূ হানীফা (র.) ৮৯
শিক্ষা ৯০
ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এর উস্তাদবৃন্দ ৯২
ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এর ছাত্রবৃন্দ ৯৩
রচনাবলী ৯৪
চারিত্রিক গুণাবলী ৯৪
ইন্তিকাল ৯৫
ইলমে ফিকহ্ ও ইমাম আবূ হানীফা (র) ৯৫

www.pathagar.com

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহী ইজতিহাদের মূলনীতি ৯৫
ইমাম মালিক (র.) ৯৬
ইল্‌ম শিক্ষা ৯৭
ইমাম মালিক (র.)-এর উস্তাদবৃন্দ ৯৯
ইলমী পারদর্শীতা ১০০
শাগরিদগণের সংখ্যা ১০১
রচনাবলী ১০১
ইন্তিকাল ১০২
ইমাম মালিক ও ইল্‌ম ফিকহ্ ১০২
ইমাম শাফিঈ (র.) ১০৩
উস্তাদবৃন্দ ১০৪
শাগরিদবৃন্দ ১০৪
শাফিঈ মাযহাবের নীতিমালা ১০৪
ইমাম শাফিঈ ও ইল্‌মে হাদীস ১০৫
ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) ১০৫
ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ১০৮
ইমাম মুহাম্মদ (র.) ১১১
ইমাম যুফার (র.) ১১২
ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) ১১৪
ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ১১৬
ইমাম আবুল হাসান-আশ'আরী (র.) ১১৬
ইমাম আবুল মানসূর মাতুরীদী (র.) ১১৭
ইমাম আবূ বকর আহ্‌মাদ আল-জাস্‌সাস (র.) ১১৮
ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) ১১৯
ফাখরুল ইসলাম ইমাম আবুল হাসান বাযদূবী (র.) ১২০
শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী হানাফী (র.) ১২১
আল্লামা ফাখরুদ্দীন হাসান কাযী খান (র.) ১২২
আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র.) ১২২
সাদরুশ শারী'আহ্ ও তাজুশ শারী'আহ্ (র.) ১২৪
আল্লামা আবূ মুহাম্মদ ফাখরুদ্দীন যায়লায়ী (র.) ১২৫
আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্‌ন হুমাম (র.) ১২৫
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) ১২৬
আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম মিস্‌রী (র.) ১২৭
আল্লামা সাইয়্যিদ আহ্‌মাদ তাহতাবী (র.) ১২৮

www.pathagar.com

হাফিয জামালুদ্দীন যায়লায়ী (র.) ১২৯
ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী (র.) ১২৯

৭

উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুফ্তীগণের
পরিচিতি এবং অবদান ১৩১-১৬২
পাকিস্তান ও ভারতের ফকীহ্গণের পরিচিতি ও অবদান ১৩৩
বাংলাদেশের ফকীহ্ ও মুফ্তীগণের পরিচিতি ও অবদান ১৫১

৮

মুজতাহিদগণের শ্রেণীবিন্যাস ১৬৩-১৭৩
ইজতিহাদের সূচনা ১৬৩
মুজতাহিদ-এর সংজ্ঞা ১৬৫
মুজতাহিদের শ্রেণীবিন্যাস ১৬৫
আল্লামা কাফবী (র.)-এর শ্রেণীবিন্যাস ১৭১
আহ্মাদ ইব্ন হাজার আল মাক্কী (র.)-এর শ্রেণীবিন্যাস ১৭২

৯

হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহের স্তর, শ্রেণীবিন্যাস ও পরিচিতি ১৭৪-১৮৭
মাসাইলে উসূল-মৌলিক মাস'আলা ১৭৪
মাসাইলে নাওয়াদির ১৭৫
ফাতাওয়া বা ওয়াকি'আত ১৭৬
হানাফী মাযহাবের কিতাবের শ্রেণীবিন্যাস ও পরিচিত ১৭৮

১০

ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাখ্খিরূনের মতপার্থক্য ১৮৮-২০৬
মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের পরিচিতি ১৮৮
মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের মতপার্থক্যের কারণ ১৮৯
ইমামগণের মতভেদ উম্মাতের জন্য রহমত ১৯৭
মতভেদের ক্ষেত্র ও প্রকার ১৯৮
ইমামগণের মতভেদ রহমত হওয়ার প্রমাণ ২০১

১১

ফিকহ্ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ ২০৭-২১৪
হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ ২০৭

www.pathagar.com

হানাফী মাযহাবের অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ ২০৮
ফকীহ্গণের মতবিরোধের কারণসমূহ ২০৯

১২

ফাত্ওয়ার সংজ্ঞা ও ক্রমবিকাশ ২১৫-২২৯
নবী করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় ফাত্ওয়া ২১৬
সাহাবায়ে কিরামের যামানায় ফাত্ওয়া ২১৬
তাবিঈগণের যামানার ফাত্ওয়া ২২১
মুফ্তীগণের যোগ্যতা ২২২
মুফ্তীর গুণাগুণ ২২৩
ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ২২৪
ফাত্ওয়া প্রদানের শর্তাবলী ২২৪
ফাত্ওয়া লিখার নিয়মাবলী ২২৬
মুফ্তীর জ্ঞাতব্য বিষয়াদী ২২৬

১৩

তাক্লীদ ও তাক্লীদে শাখ্সী ২৩০-২৪৬
তাক্লীদ ২৩০
তাক্লীদে শাখসী ও তার প্রমাণ ২৩৩
পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাক্লীদের প্রমাণ ২৩৭
তাক্লীদের বিরুদ্ধে পেশকৃত প্রমাণাদির জওয়াব ২৪০
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচিতি ২৪১

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড

ঈমান অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈমান পরিচিতি ২৪৭-২৬৮

ঈমানের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ ২৪৯
ইসলাম পরিচিতি ২৫১
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ২৫২
আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় ২৫৪
ঈমানের বিষয়বস্তু ২৫৭
(ক) আল্লাহ্‌র যাত (সত্তা) ২৫৭
(খ) আল্লাহ্‌র সিফাত (গুণাবলী) ২৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ২৬৯-৩৪০

হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর প্রতি ঈমান ২৭০
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর মর্যাদা ২৭১
তিনি বিশ্বনবী ২৭৬
খত্‌মে নবূওয়াত আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ২৭৮
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাসমূহের আলোকে খত্‌মে নবূওয়াত ২৭৯
আল–কুরআনের আলোকে খত্‌মে নবূওয়াত ২৮১
'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্যা ২৮১
আল–কুরআনের দৃষ্টিতে 'খাতামুন নাবিয়্যীন'এর অর্থ ২৮৩
হাদীসের দৃষ্টিতে 'খাতামুন নাবিয়্যীন'–এর ব্যাখ্যা ২৮৪
সাহাবা, তাবিঈ এবং মুফাস্‌সিরগণের দৃষ্টিতে খাতামুন নাবিয়্যীন–এর ব্যাখ্যা ২৮৫
আরবী অভিধানে 'খাতামুন নাবিয়্যীন'–এর ব্যাখ্যা ২৮৬
হাদীসের আলোকে খত্‌মে নবূওয়াত ২৯২
ইজমা ও কিয়াসের আলোকে খত্‌মে নবূওয়াত ২৯৫
ইমাম ও মুজতাহিদগণের দৃষ্টিতে খত্‌মে নবূওয়াত ২৯৭
মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদারদের তালিকা ২৯৮
যুগে যুগে আকীদায়ে খত্‌মে নবূওয়াতের সংরক্ষণ ২৯৯
কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী আকীদা ঃ একটি পর্যালোচনা ৩০২

www.pathagar.com

কাদিয়ানী প্রচার কৌশল ও সংগঠনিক কাঠামো ৩০৫
মুসলমানদের কর্তব্য ৩০৭
মি'রাজ ৩০৭
আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আকাশমণ্ডলী পরিভ্রমণ ৩০৮
মি'রাজের রহস্য ও উদ্দেশ্য ৩০৯
মি'রাজের স্থান ও কাল ৩১১
মি'রাজের ঘটনা ৩১২
ভ্রমণপথের বিস্ময়কর ঘটনাবলী ৩১৪
বায়তুল মুকাদ্দাস গমণ ৩১৭
আকাশ পরিভ্রমণ ৩১৭
সিদ্‌রাতুল মুনতাহায় গমন ও জান্নাত পরিদর্শন ৩১৯
আল্লাহর দীদার ও কথোপকথন ৩১৯
সন্দেহ নিরসন ৩২২
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন, ঘটনার বর্ণনা ও কাফিরদের প্রতিক্রিয়া ৩২৩
জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজ ৩২৪
শাফা'আত ৩২৭
মু'জিযা ৩৩১
একটি ভ্রান্তির অপনোদন ৩৩৩
মু'জিযার সংখ্যা ৩৩৪
মু'জিযার প্রকারভেদ ৩৩৫
জাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য ৩৩৮
কারামাত ৩৩৯
মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য ৩৩৯
ইস্‌তিদরাজ ৩৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান ৩৪২-৩৪৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ৩৪৯-৩৫৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
তাক্‌দীরের প্রতি ঈমান ৩৫৮-৩৬৯

তাক্‌দীরের অর্থ ৩৫৯

www.pathagar.com

তাক্‌দীরের উপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা ৩৫৯
তাক্‌দীর সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ৩৬০
মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের প্রকৃতি ৩৬১
মানব জীবনে তাক্‌দীরে বিশ্বাসের সুফল ৩৬৪
তাক্‌দীরের সঙ্গে তাদ্‌বীরের কোন সংঘাত নেই ৩৬৬
তাক্‌দীরের লিপিবদ্ধতা ৩৬৬
তাক্‌দীর দ্বারা ওযর পেশ করা যায় না তবে পানাহ্ গ্রহণ করা যায় ৩৬৭
তাক্‌দীর সম্পর্কীয় বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সকলের জন্য নিরাপদ নয় ৩৬৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিয়ামত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান ৩৭০-৩৮৮

কিয়ামত ও আখিরাতের অর্থ ৩৭০
আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখার অপরিহার্যতা ৩৭১
আখিরাত ও পরকাল সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ৩৭২
পরকাল সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণাদি ৩৭৩
আলামতে সুগ্‌রা ৩৭৫
আলামতে কুব্‌রা ৩৭৬
ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রসঙ্গ ৩৭৬
ইমাম মাহ্‌দীর পরিচয় ৩৭৭
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ৩৭৯
দাজ্জালের দৌরাত্ম্য ৩৭৯
হযরত ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ ৩৮০
হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে জীবিত আছেন ৩৮০
অবতরণের পর হযরত ঈসা (আ.)-এর কাজ কর্ম ও ওফাত ৩৮৩
ইয়াজূয ও মাজূযের বহিঃপ্রকাশ ৩৮৪
ভূমিধস ও পৃথিবী ধোয়াচ্ছন্ন হওয়া ৩৮৫
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৩৮৬
দাব্বাতুল আরদ্ ৩৮৬
দক্ষিণের বায়ু ও অগ্নিশিখা ৩৮৭
সিঙ্গার ফুৎকার ও মহাপ্রলয়ের সূচনা ৩৮৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পর ঘটিতব্য বিষয়ের প্রতি ঈমান ৩৮৯-৪৫৭

আলমে বারযাখ ৩৮৯
মৃত্যু ৩৯০

www.pathagar.com

পাপীদের মৃত্যুযন্ত্রণা	৩৯১
মু'মিন বান্দাগণের সহজ মৃত্যু	৩৯২
কবরে সাওয়াল জাওয়াব	৩৯৩
কবরের আযাব ও নিয়ামত	৩৯৫
কবরের আযাব দু'প্রকার	৩৯৬
মৃত্যুর পর রূহের অবস্থান	৪০১
আম্বিয়া কিরাম (আ.)-এর বারযাখী জীবন	৪০২
শহীদগণের বারযাখী জীবন	৪০৩
পুনরুত্থান	৪০৫
হাউযে কাউসার	৪০৭
হাউযে কাউসারের বৈশিষ্ট্য	৪০৮
হাশর	৪০৯
হাশর ময়দানে সূর্য মাথার উপর থাকবে	৪১৩
মহান আল্লাহর সমীপে উপস্থিতি ও জিজ্ঞাসাবাদ	৪১৫
মীযান ও নেকী বদীর ওযন	৪১৫
বিচার	৪১৮
অপরাধ প্রমাণ করার পদ্ধতি	৪২০
আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই হিসাব গ্রহণ করবেন	৪২২
নিসাব-নিকাশে কঠোরতা	৪২৩
মু'মিন বান্দার হিসাব	৪২৩
নূর বন্টন ও পুলসিরাত	৪২৪
পুলসিরাত অতিক্রম	৪২৬
জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য ও বাস্তব অস্তিত্বশীল কাল্পনিক নয়	৪২৭
জান্নাতের বৈশিষ্ট্য ও নিয়ামত সামগ্রী	৪২৯
জান্নাতের প্রশস্ততা	৪২৯
জান্নাতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা পাবে না, অসারও অনর্থক কথাবার্তা শোনা যাবে না	৪৩০
জান্নাতের পরিবেশ	৪৩০
জান্নাতবাসীদের কখনো মৃত্যু হবে না	৪৩১
জান্নাতীগণ যা পেতে ইচ্ছা করবেন তাই পাবেন	৪৩১
জান্নাতের বালাখানা ও প্রাসাদ	৪৩২
জান্নাতের গাছপালা ও পাখ-পাখালী	৪৩৩
জান্নাতের বাজার	৪৩৪
জান্নাতের নহর	৪৩৫
জান্নাতের বিছানা	৪৩৬
জান্নাতবাসীগণের স্ত্রী ও হুর গিলমান	৪৩৬

www.pathagar.com

জান্নাতবাসীগণের খাদেম ৪৩৮
জান্নাতবাসীগণের পোশাক ও আসবাবপত্র ৪৩৯
জান্নাতবাসীগণের খাদ্য ও পানীয় ৪৪০
জান্নাতের নিয়ামত অতুলনীয় ৪৪১
জান্নাতে পেশাব পায়খানার বেগ হবে না ৪৪১
জান্নাতের সর্বোচ্চ নিয়ামত হল আল্লাহ্‌র দীদার ৪৪২
জাহান্নাম ৪৪৪
জাহান্নামের দরজা ও স্তর ৪৪৫
জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে এবং এর প্রত্যেক স্তরের পৃথক পৃথক নাম রয়েছে ৪৪৬
জাহান্নামের আগুনের বৈশিষ্ট্য ৪৪৭
জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আযাব ৪৪৮
খাদ্যের মাধ্যমে আযাব ৪৪৮
জাহান্নামে যা পান করান হবে ৪৫৩
কান্নাকাটি, ফরিয়াদ, আর্তচিৎকার ও মৃত্যু কামনা ৪৫৬
জাহান্নামে কে যাবে এবং কেন যাবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ
ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৪৫৭-৪৬৪
প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য ৪৫৭
কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৪৫৮
ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ৪৫৮
ঈমানের শাখাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা ৪৫৯

নবম অধ্যায়
ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস ৪৬৫-৪৭১
ঈমানের হাকীকত বিশ্লেষণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও অন্যান্য ফিরকা ৪৬৬

দশম অধ্যায়
শিরক ও কুফ্‌র ৪৭২-৪৮৫
কুফরের আভিধানিক ও পরিভাষিক অর্থ ৪৭২
কুফ্‌রের প্রকারভেদ ৪৭২
কাফিরদের শ্রেণীবিভাগ ৪৭৪
মাসাইলে কুফ্‌র ৪৭৪
নামায সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা ৪৭৪
মুরতাদ প্রসঙ্গ ৪৭৬
হাদীসের আলোকে মুরতাদের শাস্তি ৪৭৬

www.pathagar.com

মুরতাদ সম্পর্কীয় কয়েকটি মাস'আলা ৪৭৭
কবীরা গুনাহ ৪৭৮
কবীরা গুনাহসমূহের সংখ্যা ৪৭৯
কবীরা গুনাহসমূহ ৪৮১
শিরক ৪৮৩
শিরকের প্রকারভেদ ৪৮৪

একাদশ অধ্যায়

বিদ্'আত ৪৮৬-৪৯১
বিদ্'আত পরিচিতি ও বিশ্লেষণ ৪৮৬
বিদ্'আতের পরিভাষিক অর্থ ৪৮৬
বিদ্'আত উদ্ভাবনের কারণসমূহ ৪৮৯

দ্বাদশ অধ্যায়

কুসংস্কার ৪৯২-৫০১
মাযার ও ওরশ সংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ ৪৯২
শবে-বরাত এবং আশুরার রুসমসমূহ ৪৯৩
মৃত্যু পরবর্তীকালীন কুসংস্কারসমূহ ৪৯৩
রামাযান মাসে প্রচলিত কুপ্রথাসমূহ ৪৯৪
লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে কুসংস্কারসমূহ ৪৯৪
চুল-দাঁড়ির ব্যাপারে সামাজিক কুপ্রথাসমূহ ৪৯৪
দাবা ও অন্যান্য খেলা ৪৯৫
আতশবাজী ৪৯৫
ঘরে ছবি টানানো ও কুকুর পালা ৪৯৫
আরো কতিপয় রুসুম ৪৯৫
খাত্নার রুসমসমূহ ৪৯৬
বিবাহ শাদীর রুসমসমূহ ৪৯৬
অনৈসলামিক অনুষ্ঠানসমূহ ৪৯৭
বিভিন্ন রকম মেলা ৪৯৮
কুফরী কালাম ৪৯৮
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজ্দা করা ৪৯৯
আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নামে মানত করা ৫০০

www.pathagar.com

ফাতাওয়া ও মাসাইল

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

مقدمة

www.pathagar.com

১

ইল্‌মে ফিকহ্ -এর পরিচিতি

'ফিকহ্' শব্দটি আরবী। তা বাবে 'سَمِعَ 'এবং বাবে 'كَرُمَ' উভয় বাব থেকেই ব্যবহৃত হয়। বাবে 'سَمِعَ' থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে জ্ঞাত হওয়া, জানা, অবহিত হওয়া ইত্যাদি। আর বাবে 'كَرُمَ' থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফকীহ্ হওয়া।

আল্লামা হাস্‌কাফী (র.) 'দুররুল মুখ্‌তার' কিতাবে বলেন,

اَلفقه لغة العلم بالشئ ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر فقها علم وفقه بالضمة فقَاهة صار فقِيها

'ফিকহ্' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া। পরে তা শরঈ বিষয়াদি জানার সাথে খাস হয়ে যায়। এ শব্দটি বাবে 'سمع' থেকে ব্যবহৃত হলে এর মাসদার হবে 'فقه' অর্থ হবে 'জানা'। আর বাবে 'كرم' থেকে ব্যবহৃত হলে এর মাসদার হবে 'فقاهة' অর্থ হবে 'ফকীহ্' হওয়া।

আল্লামা খাইরুদ্দীন রামালী (র.) স্বীয় গ্রন্থ 'মিনহাতুল খালিক আলাল বাহ্‌রির রাইক' কিতাবে উল্লেখ করেন,

يقال فقِه بكسر القاف اذا نهم وبفتحهما اذا سبق غيره إلى الفهم وبضمها إذا صار الفقه سجية له.

'فَقِهَ' সে জ্ঞাত হয়েছে। 'فَقَهَ' অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে সে অন্যের তুলনায় অগ্রগামী হয়েছে। 'فَقُهَ' ফিকহ্ তার স্বভাবজাত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

আল্লামা রশীদ রিযা মিস্‌রী (র.) তাঁর প্রণীত তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ শব্দটি আল-কুরআনের বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উনিশ স্থানে উহা গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম ইল্‌মের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিভাষায় এর একাধিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। 'মিফ্‌তাহুস সা'আদা' গ্রন্থের লেখক ফিক্‌হ এর সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

www.pathagar.com

هو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية ·

যে ইল্‌মে শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এ হিসাবে যে, তা উদ্ভাবন করা হয় বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে। এ ধরনের ইল্‌মকে 'ইলমে ফিকহ্' বলা হয়। এ সংজ্ঞা 'اصول فقه'-এর জন্য ঠিক। কিন্তু ' علم فقه 'এর জন্য ঠিক নয়। সর্বোপরি এ সংজ্ঞা মুজতাহিদ ফকীহ্ এর বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু ' حافظ للفروع ' (শাখা প্রশাখা সম্পর্কিত হুকুমের সংরক্ষক ব্যক্তি) এর ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। কারো কারো মতে,

ألعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ·

শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ্ বলে। উপরোক্ত সংজ্ঞায় বিস্তারিত প্রমাণাদি বলে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস তথা দলীল চতুষ্টয়কে বুঝানো হয়েছে।

শায়খ ইব্‌ন হুমাম (র.) বলেন,

هو التصديق بالأحكام الشرعية القطعية ·

শরী'আতের অকাট্য বিধি-বিধানের যথাযথ অনুধাবন করাকে শরী'আতের পরিভাষায় ফিকহ্ বলা হয়।

আল্লামা ইব্‌ন নুজায়ম (র.) এ মতটিকে সমর্থন করেছেন। 'ইরশাদুল কাসিদীন' গ্রন্থে ফিকহ্-এর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে 'ইল্‌মে ফিকহ্' বলে।

'ইত্‌মামুদ্ দিরায়া' এবং 'নিকায়া' গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, শরী'আতের যে সব বিধি-বিধান ইজ্‌তিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে 'ইলমে ফিকহ্' বলা হয়।

ইমাম আযম আবূ-হানীফা (র.)-এর মতে,

مَعرفَة النفس مَالهَا ومَا عَليهَا·

নাফ্‌স ও আত্মার জন্য যে সব কাজ কল্যাণকর এবং যে সব কাজ কল্যাণকর নয় তা সহ নাফ্‌স সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিকহ্ বলে।

এ সংজ্ঞায় ' اعتقادات ' তথা আকীদা-বিশ্বাস 'وجدانيات' তথা বাতিনী আখ্‌লাক এবং 'عمليات' তথা সালাত, সাওম, বেচা-কেনা ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে তখন আকাইদ সম্পর্কিত

www.pathagar.com

জ্ঞানের নাম হয় 'ইল্‌মে কালাম'। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নাম হয় 'ইল্‌মে তাসাউফ' এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় 'ইল্‌মে ফিকহ্'।

সূফী সাধকদের মতে ইল্‌ম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিকহ্। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন,

الفقيه الزّاهد في الدنيا الرّاغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين

পরকালমুখী ইহকালে বিমুখ, স্বীয় দ্বীনের প্রতি সতর্ক দ্রষ্টা, স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত এবং মুসলমানদের ইয্‌যত ভূলুণ্ঠিতকরণ থেকে বিরত ও সতর্কতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে 'ফকীহ্' বলা হয়। (قواعد الفقه، ص ٤١٦)

ইমাম গাযালী (র.) এর মতে,

معرفة الفروع والوقوف على دقائق عللها

শরী'আতের শাখা প্রশাখাজনিত জ্ঞান লাভ করা এবং সূক্ষ্ম 'علت' সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ্ বলা হয়। (مبادیات فقه، ص ١٠-١٩)

প্রকাশ থাকে যে 'اُصول فقه' এর পরিভাষায় মুজতাহিদ ব্যক্তিকে ফকীহ্ বলা হয়। যে ব্যক্তি মাসাইলের হাফিয কিন্তু মুজতাহিদ নন তাঁকেও রূপক অর্থে ফকীহ্ বলা হয়। আর ফিকহ্ এর পরিভাষায় মাসাইলের হাফিয ব্যক্তিকেও প্রকৃতঅর্থে ফকীহ্ বলা হয়। এমনকি তিনটি বিষয়ের হাফিযকেও ফকীহ্ বলা হয়।

ফিকহ্ এর বিষয়বস্তু

কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগতি এবং স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও নির্ভেজাল ধারনা হাসিল করতে হলে তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া একান্ত আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, ফিকহ্ এর আলোচনার বিষয়বস্তু হল, মুকাল্লাফ তথা বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল। অর্থাৎ বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র নিয়েই যেহেতু এ ইলমের মধ্যে আলোচনা করা হয় এবং তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান, মুবাহ্, জায়িয, নাজায়িয, হালাল, হারাম, মাকরূহ্ তাহরীমী ও মাকরূহ তানযীহী ইত্যাদির থেকে কোনটির অন্তর্ভুক্ত তা নির্দেশ করা হয়। তাই মুকাল্লাফ মানুষের কর্ম ও আমলই হল ইল্‌ম ফিকহ্ -এর বিষয়বস্তু।
(القرة العيون في تذكرة الفنون، ص ٨٠)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোন কাজ করা হয় সেটাই হল ঐ কাজের লক্ষ্য। ইল্‌ম ফিকহ্-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল 'اَلفوز بِسعادة الدارين' দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে

www.pathagar.com

কামিয়াবী ও সফলতা লাভ করা। দুনিয়ার সফলতা হল, হুকূকুল্লাহ্ ও হুকূকুল ইবাদ তথা উভয়বিধ হুকূক সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা এবং এর উপর যথাযথভাবে আমল করা। আর আখিরাতের সফলতা হল জান্নাত লাভ করা এবং আল্লাহ্‌র দীদার ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হওয়া।

ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে 'ফিকহ্' এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন সুন্নাহ্-এর পরই ফিকহ্ এর স্থান। তাই আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.) বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল। এবং হাদীস অনুধাবন ফিকহ্ অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল। তাই ওহী নাযিলের কালেই আল-কুরআনে ফিকহ্ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَلَوْلاَ نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَارَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বহির্গত হয় না যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিকহ্ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবা ঃ ১২২)

এছাড়া আল-কুরআনে আরো উনিশ স্থানে এ ' فقه ' ধাতু হতে বিভিন্ন রূপান্তরের সাথে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলল্লাহ্ (সা.) একাধিক হাদীসে এর গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন,

إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه فى الدِّين ويلهمه رشده .

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে দীনের ফাকাহাত ও জ্ঞান দান করেন এবং তাকে হিদায়েতের অমীয় বাণী দ্বারা আলোক মণ্ডিত করেন।

অন্যএক হাদীসে বর্ণিত আছে,

فَقِيه وَاحِد أشد عَلى الشيطَان مِن اُلف عَابد .

একজন ফকীহ্ শয়তানের উপর হাজার আবিদ অপেক্ষা অধিক কঠোর।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

مَن يرد الله به خيراً يُفقهه فِى الدِّين .

আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান তাকে দীন সম্বন্ধে ফিকহ্ (জ্ঞান) দান করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো ইরশাদ করেন,

لِكل شئ عِمَاد و عِمَاد هذا الدِّين الفِقه .

www.pathagar.com

প্রত্যেক বস্তুরই স্তম্ভ আছে; দীন ইসলামের স্তম্ভ হল ফিকহ্।

অপর এক হাদীসে আছে,

مجلس فقه خير من عباده ستين سنة .

ফিকহ্ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় বসা ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

تفقهوا قبل أن تسودوا .

নেতৃত্ব হাসিল করার পূর্বে তোমরা ফিকহ্ হাসিল কর।

এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর জীবদ্দশায় ফিকহ্ শাস্ত্রের বর্তমান রূপ বিদ্যমান ছিল না। তাছাড়া ইসলামী আহ্কামের প্রকার ভেদ তথা ফরয, ওয়াজিব, এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের কোন তর্ক-বিতর্কও তখন উপস্থিত হত না, বরং তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অনুসরণ করেই চলতেন। কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নবী করীম (সা.) তা সমাধান করে দিতেন বা কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তা নিরসন করে দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীগণের (রা.) জীবনে সুসংহত অবয়বে সতন্ত্রভাবে কোন ফিকহ্ শাস্ত্র প্রণীত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ইন্তিকালের পর ইসলাম যখন প্রভাত আলোর ন্যায় দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন তাহযীব-তামাদ্দুনের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু নিত্য-নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এ সব সমস্যার সমাধান কল্পে কুরআন হাদীসের উপর নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ক. পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ বিদ্যমান নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নামাযে যদি কারো কোন ভুল হয় অথবা কোন আমল ছুটে যায় তবে একথা বলার কোন উপায় নেই যে, তার উক্ত আমলের পর্যায়টি কি, নামায সহীহ্ হয়েছে কি হয় নি, কি ভাবে তার প্রতিকার করতে হবে। এ রকম বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে নেই, অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধান অত্যাবশ্যক।

খ. আল-কুরআনের কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুত বিপরীতমুখী দুই রকমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় উল্লেখ রয়েছে যে,

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন

www.pathagar.com

প্রতীক্ষায় (ইদ্দত) থাকবে।

আবার সূরা তালাকে বিবৃত হয়েছে যে,

وَاُولاَتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ

এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায় যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দতকাল হল চার মাস দশ দিন। চাই গর্ভবতী হোক বা না হোক। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত কাল সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত। ফলে আয়াত-দ্বয় থেকে সুস্পষ্ট ফায়সালা পাওয়া যায় না। অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা একান্ত যরুরী। অনুরূপভাবে এক আয়াতে রয়েছে,

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করবে।

অন্য আয়াতে রয়েছে ,

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ٥

পবিত্র কুরআন যখন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যেন তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।

এ দুই আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই কিরাআত পড়তে হবে। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে ইমামের তিলাওয়াত কালে মুক্তাদী চুপ করে শুনবে, নিজেরা কুরআন তিলাওয়াত করবে না।

গ. কুরআন ও হাদীসের হুকুমে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগতি। যেমন কুরআন মজীদে রয়েছে,

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

পবিত্র কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততটুকু পাঠ করবে।

হাদীসে শরীফে রয়েছে,

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ

সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।

আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় ফাতিহা পড়া যরুরী নয়; যে কোন স্থান থেকে তিলাওয়াত করলেই সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। অথচ হাদীস শরীফ থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, ফাতিহা

www.pathagar.com

পাঠ করতেই হবে। সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না। এ দুই নস্-এর মধ্যে বাহ্যত অমিল দেখা যায়।

ঘ. হাদীসে অমিল দেখা দেওয়া। যেমন- এক হাদীসে আছে,

لَا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

সালাতে যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।

অপর হাদীসে রয়েছে,

من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له

সালাতে যার ইমাম রয়েছে অর্থাৎ যে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করছে, ইমামের কিরা'আতই তার জন্য কিরা'আত অর্থাৎ পৃথকভাবে তাকে আর কিরা'আত পাঠ করতে হয় না।

ঙ. কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে একাধিক অর্থবোধক কোন শব্দ ব্যবহৃত হওয়া। যেমনঃ পবিত্র কুরআনে আছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ

তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তিন হায়িয পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে।

আভিধানিক অর্থে 'কুরূ' শব্দটি ঋতু ও পাক অবস্থা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এখানে এ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসে শরীফ বর্ণিত আছে যে,

مَنْ لَمْ يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله

যে ব্যক্তি জমি বর্গা দেয়া থেকে বিরত না থাকে সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

জমি বর্গা দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কোন্ পদ্ধতি এখানে নিষেধ করা হয়েছে তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই।

চ. স্থান, কাল ও অবস্থান পরিবর্তনের ফলে নতুন সমস্যার উদ্ভব হওয়া।

ছ. আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান না থাকা। কেননা কুরআন সুন্নাহ্ হতে সরাসরি মাসআলা বের করে তদনুসারে আমল করতে হলে আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন হাদীসের শানে নুযূল, শানে উরূদ জানতে হবে। জানতে হবে কোন্টি খাস, কোন্টি আম, কোন্টি মুজমাল, কোন্টি মুফাস্সাল, কোন্টি মুহকাম, কোন্টি মুতাশাবিহ্, কোন্টি নাসিখ এবং কোন্টি মানসূখ ইত্যাকার বিষয়াদি। অন্যথায় মাসআলা উদ্ভাবন করা আদৌ কারো পক্ষে

www.pathagar.com

সম্ভব হবে না। এ কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এমনকি অনেকের জন্য অসম্ভবও বটে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই আয়াত; দুই হাদীস কিম্বা এক আয়াত ও হাদীসের মধ্যে পরিলক্ষিত অসংগতি নিরসন কল্পে সৃষ্ট ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য ইসলামী আইন শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্‌ পর্যালোচনা করে প্রণয়ন করা হয় ইসলামী আইন শাস্ত্রের এক মহা মূল্যবান ভাণ্ডার, যা আজ 'ইলমে ফিকহ্' নামে পরিচিত।

প্রকাশ থাকে যে, ইলমে ফিকহ্‌ কুর'আন সুন্নাহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়। বরং এ হল কুর'আন সুন্নাহ্‌র সারনির্যাস। ইসলামী যিন্দেগী যাপনের জন্য ফিকহ্‌ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ফকীহ্‌গণ এ বিষয়ে একমত যে, দৈনন্দিন জীবনের আমলের জন্য প্রয়োজনীয় 'ফিকহ্‌ শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং ইলমে ফিকহে বুৎপত্তি অর্জন করা হল ফরযে কিফায়া'।

www.pathagar.com

২

ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎস, উৎপত্তি ও বিকাশ

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে 'জীবন বিধান' দান করেছেন। তার-ই নাম ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ, আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া। সরল অর্থে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দেওয়া বিধানকে বিনা দ্বিধায় শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়া।

এ জীবন বিধানের মূলধারা সমূহ পবিত্র কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত রয়েছে। তারই বাস্তব ব্যাখ্যা প্রিয় নবী (সা.)এর পবিত্র জীবনে, কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে সুপ্রকাশিত হয়েছে এবং তাকেই 'সুন্নাহ্' বলা হয়।

বিশ্ব জগতের সবার হিদায়েতের জন্যই 'কুরআন মজীদ' নাযিল হয়েছে। সাদা কালোর বৈষম্য পূর্ব-পশ্চিমের তাহযীব-তামাদ্দুনের ব্যবধান, স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে সর্বাবস্থায়ই কুরআন মজীদ সবার জন্য 'সুপথ প্রদর্শক'।

নবী করীম (সা.)-এর যুগে ইসলাম 'জাযীরাতুল-আরব' বাইরে তেমন বিস্তার লাভ করে নি। সে কালে আরবের সামাজিক জীবনও ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সরল সোজা। প্রয়োজন ছিল সীমিত। সমস্যা সমাধান ছিল সীমাবদ্ধ। তাই সে যুগে স্বতন্ত্রভাবে ফিকহ্ শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেনি।

পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনে ইযামের যুগে ইসলামের আলোক রশ্মি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানগণও বিশ্বের বহু স্থানে ইসলামী দাওয়াত নিয়ে পৌঁছে যান। তখন নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তাঁদের পরিচয় ও সংমিশ্রনের ফলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এমন এক ঐতিহাসিক বিবর্তনকালে, তাবিঈনে ইযামের যুগে একদল কুরআন হাদীস বিশারদ গভীর জ্ঞান ও মনীষার অধিকারী নিবেদিত প্রাণ উলামায়ে দীন এ সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাত এর আলোকে এবং মূলনীতি অবলম্বনে এমন একটি সার্বজনীন আইন শাস্ত্র সম্পাদনায় হাত দেন, যা সকল স্থান কাল ও পাত্রের জন্য প্রযোজ্য এবং যে কোন সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এ মূলনীতি 'أُصول فِقه' (উসূলে ফিকহ্) আর তার আলোকে সম্পাদিত আইন শাস্ত্রই হলো ফিকহ্।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়ায় দিকে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.) ফিকহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি (উসূলে ফিকহ্) নির্ধারণ করেন ও তার আলোকে সর্বপ্রথম ফিকহ্ শাস্ত্র সুবিন্যস্ত

www.pathagar.com

করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর খাস সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) 'উসূলে ফিকহ্' সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য বর্তমানে সে গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে ইমাম শাফিয়ী (র.) রিসালায়ে উসূলে ফিকহ্ নামক যে কিতাব রচনা করেন তা হলো তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত সত্তর খণ্ডে সমাপ্ত কিতাবুল উম্মের ভূমিকা। এ কিতাবখানাই সারা মুসলিম জাহানে এ বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য। সম্মানিত ফকীহ্গণের অনেকেই তাঁর কিতাবখানার পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন করে নিজ নিজ নামে নিখুঁতভাবে 'উসূলে ফিকহ্' এর কিতাব সমূহ সংকলন করেছেন।

ফিকহ্ শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

আল্লামা যামাখ্শারী তাঁর সংকলিত 'হাকীকাতুল ফিকহ্' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ফিকহ্ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ"اَلفِقه حَقِيقَة الشق و الفَتح" ফিকহের মূলকথা হলো, অনুসন্ধান করা ও খুলে দেওয়া। ইমাম গাযালী (র.) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত 'ইহ্ইয়াউল উলূমুদ্দীন' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, ফিকহ্ শব্দের অর্থ হলো শরী'আত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা।

ফিকহ্ শব্দের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ যা বলেছেন, আল্লামা যামাখ্শারী তাঁর 'হাকীকাতুল ফিকহ্' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে তা উল্লেখ করেছেন ঃ

أَلفقيه العَالم الذى يشق الأحكام و يفتش عن حقائقها و يفتح ما استغلق منها.

ফকীহ্ সেই আলিমকে বলা হয় যিনি শরী'আতের আহ্কাম-তার উৎস মূল থেকে বের করেন এবং ঐগুলোর মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন ও তাঁর দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ সমাধান করেন।

হযরত ইমাম হাসান বাসরী (র.) 'ফকীহ্'-এর জন্য কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী থাকার শর্ত উল্লেখ করেছেন। ইমাম গাযালী (র.) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহ্ইয়াউল উলূমুদ্দীন'-এর ১ম খণ্ডে লিখেছেন যে, 'ফকীহ্' এর জন্য নিম্নোক্ত ৭টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যরুরীঃ

১. দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়া।
২. আখিরাতের কাজ সমূহের প্রতি আগ্রহশীল হওয়া।
৩. দীন ইসলামের প্রতি গভীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হওয়া।
৪. ইবাদাত গুযার ও মুত্তাকী হওয়া।
৫. মুসলমানের ইয্যত - সম্মান ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা।
৬. ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে থেকে কাওম ও মিল্লাতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া।
৭. ধন-সম্পদের প্রতি লালসা না থাকা।

www.pathagar.com

ইমাম গাযালী (র.) উপরোক্ত বর্ণনার সাথে আরেকটি বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছেন যে, 'ফকীহ্' কে মানুষের পার্থিব বিষয়ের যৌক্তিকতা ও পাঠ দান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

আল্লামা যামাখ্শারী 'ফকীহ্' এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এও উল্লেখ করেছেন, যে, ফকীহ্ তাঁর যুগের মানুষের 'মাওজুদাহ্-হালাত' অর্থাৎ তাদের চিন্তা-চেতনা, পরিবেশ, পরিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে ওয়াকেফ নয়, সে জাহিল।

বিখ্যাত 'হাদীসবেত্তা' আ'মাশ (র.) ফকীহ্গণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আপনারা চিকিৎসক আর আমরা হলাম ঔষধ বিক্রেতা।

ফিকহ্ সম্পর্কে কুরআন মজীদ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

মু'মিনগণের সকলের এক সাথে অভিযানে বেরিয়ে পড়া সমীচীন নয়; তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বেরিয়ে আসে না দীন ইসলামের অন্তর্নিহিত 'ফিকহ্' বিষয়টা জানার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা ফিরে এসে তাদের নিজ নিজ কাওমকে সতর্ক করতে পারে, যেন তারা হুশিয়ার হতে পারে।

ইমাম গাযালী (র.) বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্-দীন'-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

১. নিজের দোষ-ত্রুটি, অযোগ্যতা ও মূর্খতা সম্বন্ধে সচেতনতা,

২. ঐসব বিষয়ে অবগত থাকা, যা আমল সমূহকে বরবাদ করে দেয়,

৩. আখিরাতের পথের জ্ঞান,

৪. আখিরাতের নি'আমত সমূহের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ,

৫. দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার শক্তি অর্জন,

৬. মনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় সব সময়ের জন্য স্থায়ী হওয়া। এগুণগুলো ফিক্হের গবেষণাকারীর জন্য যরুরী।

ফিকহ্ সম্পর্কে হাদীস শরীফ

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বারাতে মিশ্কাতুল্ মাসাবীহের কিতাবুল ইলমে বর্ণিত হয়েছেঃ

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

আল্লাহ্ তা'আলা যার প্রতি মঙ্গলের ইরাদা করেন তাঁকে দীনের অন্তর্নিহিত 'ফিকহের ইল্ম' দান করেন।

www.pathagar.com

যুগে যুগে ফিকহ্ শাস্ত্র

হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) তাঁর বিশ্ব নন্দিত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' লিখেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুবারক যমানায় 'ফিকহ্' শাস্ত্রে যথারীতি সংকলিত হয় নি। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যে কাজ যেরূপভাবে করতে দেখতেন, তাঁর অনুসরণ করাকেই তাঁরা দীন দুনিয়ার সৌভাগ্য হিসেবে মেনে নিতেন। তাঁদের কাছে এ ধরনের কোন প্রশ্নই ছিল না যে হযরতের কোন কাজ কি মর্যাদার ? কোন্ কাজ তিনি 'আদত' (স্বভাব) হিসেবে করেছেন এবং কোন্ কাজ তিনি ইবাদত হিসেবে করেছেন। এসব কাজ করা যরুরী, না কি তার আবশ্যকতা নেই। যা কিছু তিনি যেভাবে করতেন, তাঁরা তাই করতেন। হযরতের অনুসরণে এ ধরণটি তাঁদের নিকট নিজেদের জানের চেয়েও বেশী প্রিয় ছিল।

যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হতো, যে বিষয়ে হযরতের কোন কাজ বা আদেশ খুঁজে পাওয়া যেতো না তখন যিনি অধিকতর জ্ঞানী, তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে তা সম্পাদন করতেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীগণের নিকট থেকে জেনে নাও।' পবিত্র কুরআনের এ বিধান মোতাবেক জ্ঞানীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কুরআন মজীদ ও হাদীসের সরাসরি বিধানের সাথে তা মিলিয়ে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

সাহাবায়ে কিরামের পরে তাবিঈনে ইযামের যুগ। তাঁরা কুরআনের ইল্ম হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কাজের আদর্শ সরাসরি সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকেই সংগ্রহ করেছেন। প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে তাঁরাও সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় গবেষণা, চিন্তা ও অনুসন্ধানের দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগায়' উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ নাখ্ঈ (র.) প্রমূখ আলিমগণ ফিকহ্ মাসাইলের কতগুলো অধ্যায় সংকলন করেছিলেন। এ কাজের সুবিধার জন্য তাঁরা কতিপয় উসূলের (মৌলিক নীতির) অনুসরণ করেছেন, যা তাঁরা সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

তাবৃঈ তাবিঈনের যুগে এসে হযরত রাসূলে করীম (সা.) সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনে ইযামের পবিত্র জীবন ও আদর্শের আলোকে যাবতীয় সমস্যা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গভীর গবেষণা, বুদ্ধি ও চেতনা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত এ পথেই সাফল্য আসে ও ফিকহ্ শাস্ত্রের সংকলন শুরু হয়।

ফিকহ্ শাস্ত্রের সংজ্ঞা

'ফিকহ্' এমন একটি ইল্ম যার দ্বারা পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামী শরী'আতের হুকুম আহ্কাম ও মাসআলা-মাসাইল অবগত হওয়া যায় এবং যার দ্বারা বিভিন্ন

www.pathagar.com

সমস্যাও প্রশ্নের শরী'আত সম্মত সমাধান ও উত্তর খুঁজে বের করা যায়।

ফিকহ্ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম জাহানের প্রথম দুই খলীফা রাসূলে পাকের শ্রেষ্ঠতম সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলিম উম্মাহ্ ছিল ঐক্যবদ্ধ একটি জাতি। মত পার্থক্য কোথাও থেকে থাকলে তা ছিল নিতান্ত ব্যক্তি পর্যায়ের ও ছোট খাট ব্যাপার। বুনিয়াদী বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী (রা.) এর খিলাফত কালে রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও কোন্দলের সূত্রপাত হয়। ক্রমান্বয়ে তা প্রকট আকার ধারণ করে এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী মুরতাযা (রা.) খিলাফতকালে তা হানাহানী ও গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়।

এ সময়ে বাতিল পন্থী 'খারেজী' দলের উদ্ভব হয়। পরিণতীতে খিলাফতে রাশিদার পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভক্তির সাথে সাথে ধর্মীয় দল উপদলের সৃষ্টি হয়। প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে 'খারেজী' ও 'শী'আ' মতাবলম্বী দু'টি পৃথক উপদল গড়ে উঠে। খারিজী সম্প্রদায় বর্তমান বিশ্বে তাদের সাংগঠনিক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেও শী'আ সম্প্রদায় আজো সারা বিশ্বে কম বেশ ছিটিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

খারেজীরা শুধু কুরআন মজীদ ও প্রধানত দুই খলীফার শাসনামলের প্রমাণিত হাদীস সমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতো। প্রাথমিক অবস্থায় শী'আ মতবাদের আচরণ খারেজীদের প্রায় কাছাকাছি থাকেলও পরবর্তীতে তারাও চরম পন্থী হয়ে যায়। তারা নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করে একটি স্বতন্ত্র উপদলে পরিণত হয়।

উমাইয়া শাসনের মাঝামাঝি সময়ে হক পন্থী উলাময়ে কিরাম দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি ধারায় পরিচিত নাম 'আহলুল-হাদীস'। যাঁরা হাদীসের যাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা যরুরী মনে করেন। কিয়াস এবং তুলনামূলক উপমার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া তাঁরা অপসন্দ করেন। দ্বিতীয় ধারায় তৎকালীন পরিচিত নাম ছিল 'আহলুর রায়'। যাঁরা কুরআন মজীদ ও হাদীসের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতায় ছিলেন বিশ্বাসী।

প্রথম ধারার অনুসারীরা উদ্ভব ঘটেনি এমন বিষয়ে চিন্তা গবেষণা দোষণীয় ও বর্জনীয় মনে করেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারাটি সম্ভাব্য ও সংঘটিতব্য বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদের ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট ও মৌলিক বিধানের কারণ, উপকারণ ও যুক্তিধারা (أسباب و علل) নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রতি আগ্রহী।

হিজায (মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারা) -এর অধিবাসী উলামায়ে কিরামের অধিকাংশই ছিলেন 'আহ্লুল্-হাদীস'। ইরাকের অধিকাংশ উলাময়ে কিরাম ছিলেন 'আহ্লুর রায়'। ইমাম মালিক (র.) [ওফাত ঃ ১৭১ হিজরী] ছিলেন হিজায বাসীদের মধ্যে 'আহ্লুর রায়'

www.pathagar.com

হিসাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর উস্তাদ রাবীআতুর-রায় ছিলেন বিখ্যাত কিয়াসপন্থী। ইরাকী উলামায়ে কিরামের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন ইমাম ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র.) এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (র.) ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ।

হিজরী প্রথম শতকের শেষ ভাগে হাদীস বর্ণনার আধিক্যের কারণে জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের ফিৎনা তুঙ্গে উঠার ফলে ঘোলাটে পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মতাবাদের উদ্ভব ঘটে। এ সময়ে তৎকালীন উমাইয়া খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) -এর হস্তক্ষেপ এবং বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের জন্য তাঁর ফরমান হাদীস সংরক্ষণের কাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় শতকের শুরুতে 'আহলুল-হাদীস' ও 'আহলুর রায়' এর শাখা-প্রশাখা ও ধারা উপধারা বিষয়ে দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে ফিকহ্ শাস্ত্রেও কতগুলো বিতর্কের উদ্ভব হয়। যেমন ঃ

ক. হাদীস ইসলামী ফিকহের জন্য উসূল (উৎসমূল) এবং কুরআন মজীদের পরিপূরক কি না ? যদি হয়, তবে বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার পথ কি হবে ?

খ. পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীস সমূহের মধ্যে প্রাধান্য নির্ণয়ের পন্থা কি ?

গ. কিয়াস, যুক্তিতর্ক এবং ইসতিহ্সান (সূক্ষ্ম কিয়াস)এর মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন বৈধ কি-না ?

ঘ. ইজমা-এর মৌলিকতা আছে কি-না?

ঙ. আম্র ও নাহী (আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা) সূচক শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত বিধানের ধরণ প্রকৃতি কি হবে?

মোটকথা, দ্বিতীয় শতকের প্রথম চতুর্থাংশ ছিল মূলনীতি ও বিধি বিধান উভয় ক্ষেত্রে আলিম ও ফকীহ্গণের মতপার্থক্যের সময়। এর সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাসীন শাসকগণ নিজেদের মর্যী মুতাবিক মীমাংসা প্রদানে কাযী (বিচারক) গণকে বাধ্য করতেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাযীগণের পরস্পর বিরোধী ফয়সালার কারণে মুসলিম জনসাধারণ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হন। সে সময়ে তাঁদের সামনে সঠিক মাসআলা জানার জন্য কোন সুবিন্যাস্ত সংকলন ছিল না। এদিকে তখন ইসলামের বিজয় অভিযান দিকে দিকে পরিচালিত হতে থাকে। নতুন নতুন দেশ ও জনপদ ইসলামী শাসনের আওতাভূক্ত হয়। ইসলামের এই ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন সভ্যতা সাংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। এবং প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এসকল সমস্যার ইসলামী সমাধান সম্বলিত সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ আইন-কানূন তথা ফিক্হ্ ও উসূলে ফিকহ্ প্রণয়নের।

ইমামুল-আয়িম্মা আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত কূফী (র.) সর্বাগ্রে এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বণী উমাইয়া যুগের পতনের পরপরই তিনি তাঁর সঙ্গী সাথী ও শাগরিদগণ সমন্বয়ে একটি মজলিস গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার গুরু-

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনে আত্ম- নিয়োগ করেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র এক বিরাট খিদমত আনজাম দিতে সক্ষম হন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ অনবদ্য অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি কিয়ামত পর্যন্ত সকল গুণী জ্ঞানীজনই প্রসংসা ভাষায় প্রকাশ করতে থাকবে। এ জন্যই তিনি সর্বজন স্বীকৃত ইমামে আ'যম-শ্রেষ্ঠ ইমাম। মিল্লাতে ইব্‌রাহিমী তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে। মানব জীবনের সামগ্রিক দিক তথা আকাইদ, আমাল ও আখ্‌লাক ফিকহের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ফিকহ্‌-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ"معرفت النفس مالها و ما عليها" ফিকহ্‌ হচ্ছে মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞানের নাম। পরবর্তী সময়ে আকাইদের বিষয়সমূহ নিয়ে ইলমে কালাম, আখ্‌লাকের বিষয়সমূহ নিয়ে ইলমে তাসাউফ এবং আমালের বিষয়সমূহ নিয়ে ফিকহ্‌ আলাদা আলাদা শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

ফিকহ্‌ -এর মূল আলোচ্য বিষয়

নিম্নের ৬টি বিষয়ই হচ্ছে ফিকহ্‌ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় ঃ

১. ইবাদত (عبادت) ঃ আল্লাহ্‌ পাক ও তাঁর বান্দার মধ্যে গভীর সংযোগ রক্ষাকারী বিষয় হলো ইবাদত।

২. মু'আমালাত (معاملات) ঃ (সামাজিক জীবনের লেনদেন) যেমন অর্থনৈতিক নিয়ম-কানূন, যা পরস্পরে সাহায্য সহায়তা দান ও যৌথ কাজের জন্য নির্ধারিত। যেমন– বেচাকেনা, লেন-দেন, ধার-কর্য, আমানত ইত্যাদি।

৩. মুনাকিহাত (مناكحات) ঃ (বৈবাহিক বিষয়াদি) মানব বংশ বজায় রাখা সম্বন্ধীয় আইন-কানূন। যেমন ঃ বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, বংশ, আধিপত্য, ওয়াসিয়্যাত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

৪. উকূবাত (عقوبات) ঃ অপরাধ ও শাস্তি। যেমন – হত্যা, চুরি, যিনা, দুর্নাম- অপবাদ এবং হুদূদ, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি বিষয়ক আইন কানূন।

৫. মুখাসামাত (مخاصمات) ঃ বিচার সংক্রান্ত বিষয়।

৬. হুকূমত ও খিলাফত (حكومات و خلافت) ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি, লেনদেন, সন্ধি ও যুদ্ধের নিয়ম-কানূন, রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ মর্যাদার বিস্তারিত বিষয়াদি।

ফিকহ্‌ শাস্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ

ফিকহ্‌ শাস্ত্রের পর্যায়ক্রমিক পূর্ণ আকার ধারণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা পর পর চারটি যুগে ব্যাপৃত রয়েছে ঃ

প্রথম যুগ

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হায়াতে তায়্যিবায় অর্থাৎ নবূওয়াত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরী সন পর্যন্ত। সে সময়ে যাবতীয় ব্যাপার রাসূলে পাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত

www.pathagar.com

পরিস্থিতির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাত্ওয়া-ফারাইয, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। সে সময়ে স্বতন্ত্রভাবে ফিকহ্ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নি।

সে সময়ে ইসলামী ফিক্হের দু'টি উৎস ছিল ঃ ক. কুরআন–হাকীম ও খ. রাসূলে পাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। উদ্ভূত পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মুতাবিক কুরআন হাকীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন সহজ সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কুরআনিক বিধান ও রাসূলে পাকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে কোন দ্বিমতের অবতারণা হতো না। এবং তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা দিত না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কর্মপন্থা ছিল কয়েক ভাগে বিভক্ত ঃ

১. মহান আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মজীদের শিক্ষা দান।

২. কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান।

৩. তায্কিয়ায়ে নফ্স তথা চরিত্র সংশোধন। মূলত তাঁর মুবারক সংশোধনই সাহাবায়ে কিরামের চারিত্র সংশোধনের সর্বোত্তম পন্থা বলে পরিগণিত হয়। এর মাধ্যমে ইসলামের মূল ভিত্তি স্থাপন করে এবং আগত দিনের কঠিন ভবিষ্যত কর্মপন্থার সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) প্রশান্ত চিত্তে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

দ্বিতীয় যুগ

খুলাফয়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের যুগ। বিভিন্ন দেশ জয় ও নানা প্রকার সামাজিকতার সংস্পর্শে আসার কারণে মুসলিম বিশ্বে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এ সমস্যার সমাধানকল্পে আরও দু'টি উপায় অবলম্বিত হয়।

১. সাহাবায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত

এ সময়ে উদ্ভুত যে সমস্যার সমাধান সরাসরি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যেত না তাঁর সমাধানের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কিরাম পরামর্শের ভিত্তিতে ঐক্যমতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ইহাকে'ইজমায়ে সাহাবা'বলা হয়। ইহাই ইজমার মূলভিত্তি। পরবর্তীকালে ইজমা ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃত লাভ করে।

২. বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিগত অভিমত

দ্বিতীয় যুগে উদ্ভাবিত যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরী পাওয়া যেত না এবং যার সমাধানে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবেও কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি।বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম এমন কিছু সমস্যার সমাধানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিমত দিয়েছেন। একে কিয়াসের ভিত্তি বলা হয়। পরবর্তীকে ইহাই ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

www.pathagar.com

তৃতীয় যুগ ঃ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) -এর শাসন কালে একচল্লিশ হিজরী থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত তৃতীয় যুগের বিস্তৃতি। এ সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে শরী'আতের হুকুম-আহ্কাম সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত করার তথা ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন কারণে তীব্রভাবে দেখা দেয়। যথা ঃ

১. এসময়ে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম জীবিত ছিলেন তাঁরা বিশাল ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। অপর দিকে এককভাবে কোন সাহাবীর পক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সকল হাদীস জানা সম্ভব ছিল না। তাই নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মোতাবেক দিতে বাধ্য হলেন। এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চল অবস্থিত তাঁদের রায় ও বিভিন্ন হতে থাকল।

২. রাজনৈতিক কারণে এ সময়ে যে সব চরম পন্থী ও বিপথগামী যথা- শি'আ, খারেজী ইত্যাদি ফিরকার উদ্ভব ঘটে, ঐ সকল ফির্কার লোকেরা নিজ নিজ আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার ফলেও মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

৩. এ সময়ে ইসলাম বিদ্বেষী ও স্বার্থান্বেষী লোকদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য জাল হাদীসও মুসলিম জাহানে জড়িয়ে পড়ে। এসব বানোয়াট হাদীসের কারণে মাসআলা -মাসাইলের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামের হিফাযতের লক্ষ্যে শরী'আতের হুকুম-আহ্কাম সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত করা এবং তাঁর নীতি নির্ধারণ করা তথা ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্ প্রণয়ন ও সংকলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই তৃতীয় যুগে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফাত্ওয়া দানের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত কেন্দ্র সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ ১. মদীনা মুনাওওয়ারা, ২. মক্কা মু'আয্যমা, ৩. কূফা, ৪.বাসরা ৫. শাম (সিরিয়া), ৬. মিসর, ৭. ইয়ামান।

মদীনা মুনাওওয়ারা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ হতে হযরত উসমান গণী (রা.)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত মদীনা তায়্যিবাই ছিল মুসলিম জাহানের ফাত্ওয়া প্রদানের বিশিষ্ট কেন্দ্র। এ সময় খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মু'মিনীনগণ সহ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আয়শা (রা.),যায়িদ ইবন সাবিত (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.), আবদুল্লাহ্ ইবন্ আব্বাস (রা.) এবং আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমূখ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র.) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইলমুল মুওক্বিয়ীন' -এ উল্লেখ করেছেন যে, দীন, ফিকহ্ এবং ইল্ম -এর বিস্তৃতি ঘটেছে ইবন্ মাসউদ, যায়িদ ইব্ন সাবিত, ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং তাঁদের শাগরিদগণের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

মদীনা তাইয়্যেবায় ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তাবিঈগণ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন।

১. সায়ীদ ইব্‌ন মুসায়্যিব মাখযূমী (র.)। তাবিঈনের মধ্যে আলিম ও ফকীহ্ খিলাফতের ২য় বর্ষে জন্ম। (ওফাত ঃ ৯৫ হিজরী)।

২. উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (র.)। আয়িশা (র.)-এর আপন ভাগ্নে এবং তাঁর খাস শাগরিদ। তৃতীয় খলীফা ওসমান (রা.)-এর খিলাফত কালে জন্ম। (ওফাত ঃ ৯৫ হিজরী)।

৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইবন হিশাম মাখযূমী কুরাইশী (র.)। বহু হাদীস বর্ণনাকারী ও শ্রেষ্ঠ ফকীহ্। (ওফাত ঃ ৯৪ হিজরী)।

৪. ইমাম আলী ইব্‌ন হুসাইন যয়নুল আবেদীন (র.)। অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বিধায় 'যয়নুল আবেদীন 'ইবাদতকারীগণের শোভা' উপাধিতে ভূষিত হন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমি আলী ইব্‌ন হুসাইন যয়নুল আবেদীন -এর তুলনায় অধিক জ্ঞানী ফকীহ্ কাউকে দেখি নি। (ওফাত ঃ ৯৪ হিজরী)।

৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উৎবা ইব্‌ন মাসঊদ (র.)। আয়েশা (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৯৮ হিজরী)।

৬. মুসলিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র.)। তিনি ছিলেন আয়িশা (রা.),আবূ হুরায়রা (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১০৬ হিজরী)।

৭. সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (রা.)। তিনি ছিলেন মাইমূনাহ্ (রা.),আয়েশা (রা.),আবূ হুরায়রা (রা.),আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.),যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) প্রমূখ সাহাবায়ে কিরামের শাগরিদ ও উচুঁস্তরের ফকীহ্। (ওফাত ঃ ১০৭ হিজরী)।

৮. কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র.)। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১০৬ হিজরী)।

৯. নাফি' (র.) তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম। মিসরের মু'আল্লিম ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.),আয়েশা (রা.) এবং আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখের শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১১৭ হিজরী)।

১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.)। তিনি ছিলেন মুকাস্‌সিরীন হাদীস অর্থাৎ অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। খুবই উদার ও অমায়িক। সত্য প্রকাশে অকুতোভয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.), আনাস (রা.) এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১২৪ হিজরী)।

১১. ইমাম বাকির মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র.)। আহলে বাইতে রাসূলের অন্যমত ইমাম। জাবির (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) এবং ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১১৪ হিজরী)।

www.pathagar.com

১২. ইমাম জা'ফর সাদিক (র.)। আহ্‌লে বাইতে রাসূলের অন্যতম ইমাম। (ওফাত: ১৪৮ হিজরী)

১৩. আবূ যিনাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাক্‌ওয়ান (র.)। হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় ফকীহ্। হযরত আনাস (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১০৮ হিজরী)।

১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ আনসারী (র.)। সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুত্তাকী। হযরত আনাস (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১৪৪ হিজরী)।

১৫. রবীআ' ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান ফাররুখ (র.)। হাফিযুল হাদীস ও ফকীহ্। আনাস (রা.)-এর শাগরিদ। ইমাম মালিক (র.)-এর উস্তাদ। (ওফাত ঃ ১৩৬ হিজরী)।

মক্কা মু'আয্‌যমা

মক্কা মু'আয্‌যমা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছু দিনের জন্য মু'আয (রা.)-কে সেখানকার মু'আল্লিম ও মুফ্‌তী নিয়োগ করেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাঁর জীবনের শেষভাগ মক্কা মু'আয্‌যমাতে অতিবাহিত করেন। ফলে সেখানকার সবাই তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত হন। সেখানে তখন চার জন বিখ্যাত তাবিঈ মুফ্‌তী ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ

১. মুজাহিদ ইব্‌ন জুবাইর (র.)। তিনি ছিলেন বিখ্যাত তাফসীরবিদ এবং সা'দ (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১০৭ হিজরী)।

২. ইকরামা (র.)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম এবং শাগরিদ। বিখ্যাত তাফসীরবিদ। (ওফাত ঃ ১০৭ হিজরী)।

৩. আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ (র.)। মহা বিদ্বান ও হাফিযুল্ হাদীস। আয়েশা (রা.),আবূ হুরায়রা (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১১৪ হিজরী)।

৪. আবদুল আযীয মুহাম্মদ ইব্‌ন যুন্‌জী (র.)। হাফিযুল্ হাদীস। জাবির (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.),আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) প্রমুখের শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১২৮ হিজরী)।

কূফা (ইরাক)

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারূক (রা.)-এর আদেশে ইরাক এলাকায় পত্তন হয়েছিল নতুন শহর কূফা ও বসরা। সাহাবায়ে কিরামের এক জমা'আত এ নতুন শহর কূফাতে বসবাস করতে শুরু করেন। আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) 'ফকীহুল্-উম্মাত' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে কূফার মু'আল্লিম, মুফ্‌তী ও প্রশাসক নিয়োগ করেন। সেখানে তাঁর দশ বছর অবস্থান কালে স্থানীয় জ্ঞানপিপাসূ সবাই তাঁর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞানপিপাসা নিবারনের মহা সুযোগ লাভ করেন।

চতুর্থ খলীফা আসাদুল্লাহিল্ গালিব আলী (রা.)-এর শাসনামলে (৩৫–৪০ হিজরী সন পর্যন্ত) ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল কূফা। হযরত আলী (রা.) ছিলেন নবী করীম (সা.) -এর

www.pathagar.com

যুগ থেকে ফকীহ্ সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) এ দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের শিক্ষা ধারার মাধ্যমে এখানে ইলমে দীনের চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে ও কূফা অন্যতম দীনী কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে এখানকার অনেক মুজতাহিদ, তাবিঈ খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। নিম্নে তাঁদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আলাকামা ইব্ন কায়স নাখ্ঈ (র.)। তিনি ছিলেন ইরাকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। তিনি হযরত উমর, উসমান এবং আলী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট ও প্রধান শাগরিদ এবং আচার আচারণে তাঁর প্রতিচ্ছবি। জন্ম নবুওয়াত যুগে। ওফাতঃ৬২১ হিজরী সনে।

২. মাসরূক ইব্ন আযদা (র.)। শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুফ্তী। হযরত উমর, আলী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) প্রমুখের শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৬৩ হিজরী)।

৩. উবায়দা ইব্ন 'আমর সালমানী (র.)। সাহাবী যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে রাসূলে পাকের দর্শন লাভে ধন্য হতে পারেন নি। আলী (রা.) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৯২ হিজরী)।

৪. আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ নাখ্ঈ (র.)। আলকামা (র.)-এর ভাতিজা। কূফার বিশিষ্ট আলিম। মু'আয (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) -এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৯৫ হিজরী)।

৫. শুরাইহ্ ইব্ন হারিস কিন্দী (র.)। কূফার কাযী। নবী যুগে জন্ম। হযরত উমর, আলী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) -এর শাগরিদ। দ্বিতীয় খলীফার যুগে কূফায় কাযী পদে নিযুক্ত হন। অব্যাহতভাবে ষাট বছর কাযীর পদ বহাল থেকে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। (ওফাতঃ ৭৮ হিজরী)।

৬. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ নাখ্ঈ (র.)। ইরাকের বিশিষ্ট ফকীহ্। আল্কামাহ্, মাসরূক, আস্ওয়াদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) এর শাগরিদ। ফকীহ্ হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলাইমান (র.) -এর উস্তাদ। (ওফাত ঃ ৯৫ হিজরী)।

৭. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) -এর শাগরিদ। ইরাকের সর্বজন স্বীকৃত ফকীহ্। (ওফাত ঃ ৯৫ হিজরী)।

৮. আমর ইব্ন শুরাহ্বীল (র.)। তাবিঈগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। হযরত আলী, আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আয়েশা ও উমর (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৬৪ হিজরী)।

৯. আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলা (র.)। কাযী ও ফকীহ্। হযরত আলী (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৮৩ হিজরী)

www.pathagar.com

১০. আমির শা'বি (র.)। কূফার ফকীহ্। হযরত আলী (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১০৪ হিজরী)।

১১. হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলাইমান (র.)। ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর উস্তাদ। (ওফাত ঃ ১২০ হিজরী)।

বাসরা (ইরাক)

বসরাতে অবস্থানকারী সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী ও হযরত আনাস (রা.) এবং ফকীহ্ তাবিঈগণের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত পাঁচ জন ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

১. হযরত আবূল আলিয়াহ ইব্ন মিহরান (র.)। তিনি ছিলেন হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) প্রমুখের শাগরিদ। (ওফাতঃ ৯০ হিজরী)।

২. হযরত হাসান ইব্ন আবুল হাসান বাসরী (র.)। তিনি ছিলেন তাবিঈগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম। সূফীকুল শিরোমণি। প্রধান প্রধান সাহাবীগণের শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১১০ হিজরী)।

৩. হযরত আবূ শা'শা জাবির ইব্ন ইয়াযীদ (র.)। তিনি ছিলেন বসরার বিশিষ্ট ফকীহ্। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) -এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৯৩ হিজরী)।

৪. মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.)। ব্যাপক জ্ঞানের ভাণ্ডার। হযরত আনাস (রা.) -এর আযাদকৃত গোলাম ও শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১৩১ হিজরী)।

৫. হযরত কাতাদা ইব্ন দা'আমাহ সূদূমী (র.)। প্রখ্যাত তাফসীরবিদ্। হযরত আনাস (রা.)-এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১১৮ হিজরী)।

শাম (সিরিয়া)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে হযরত মু'আয, উবাদাহ ইব্ন সামিত এবং আবূ দারদা (র.)-কে সিরিয়ায় মু'আল্লিম ও মুফ্‌তী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে সেখানে যে সকল তাবিঈ এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ হলেন ঃ

১. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন গনম (র.)। তিনি ছিলেন হযরত উমর ও মু'আয (রা.) এর শাগরিদ। দ্বিতীয় খলীফা তাঁকে সেখানে মুয়াল্লিম হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। (ওফাত ঃ ৭৮ হিজরী)।

২. হযরত আবূ ইদ্‌রীস খাওলানী (র.)। তিনি ছিলেন হযরত মু'আয (রা.) -এর শাগরিদ এবং সুবক্তা ও সিরিয়ার একজন কাযী। (ওফাত ঃ ৮০ হিজরী)।

৩. হযরত কাবীসাহ ইব্ন যুওয়াইব (র.)। তিনি হযরত আবূ বকর, উমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) -এর বিচার সম্বন্ধীয়

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত সমূহের সংরক্ষক। (ওফাত ঃ ৮১ হিজরী)।

৪. হযরত মাকহুল ইব্‌ন আবূ মুসলিম (র.)। মূলত তিনি ছিলেন কাবূলের বাসিন্দা এবং সিরিয়ার একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্। (ওফাত ঃ ১১৩ হিজরী)।

৫. হযরত রাজা ইব্‌ন হাইওয়া (র.)। তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, জাবির ও মু'আবিয়া (রা.) থেকে হদীস বর্ণনা করেছেন। (ওফাত ঃ ১১২ হিজরী)।

৬. হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)। অষ্টম উমাইয়া খলীফা। অন্যতম খলীফায়ে রাশীদ হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত। ইমাম ও মুজতাহিদ। হযরত আনাস (রা.) -এর শাগরিদ। তিনিই সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। (ওফাত ঃ ১০১ হিজরী)।

মিসর

মিসরে আগত সাহাবীগণের মধ্যে প্রধান ফকীহ্ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস। তাঁর পরে নিম্নোক্ত দু'জন তাবিঈ সেখানে ফকীহ্ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১. হযরত আবুল খাইর মুরশিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)। তিনি ছিলেন হযরত আবূ আইউব, আবূ বাসরাহ্ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আস (রা.) -এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ৯০ হিজরী)।

২. হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র.)। মিসরের শ্রেষ্ঠ আলিম। খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) তাঁকে মিসরে মুফ্তী নিয়োগ করেন। (ওফাত ঃ ১২৮ হিজরী)।

ইয়ামান

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) কিছু দিনের জন্য ইয়ামানে হযরত আলী (র.)-কে প্রশাসক হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন। এর পরে সেখানে আবূ মূসা আশ'আরী (র.) কে আমীর ও মু'আল্লিম রূপে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাবিঈগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ৩ জন সেখানে ফকীহ্ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১. হযরত তাঊস ইব্‌ন কাইসান (র.)। ইয়ামানের বিখ্যাত মুফ্তী। তিনি ছিলেন হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত, আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা.) -এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১০৬ হিজরী)।

২. হযরত ওয়াহব ইব্‌ন মুনাবিবহ্ (র.)। ইয়ামানের বিখ্যাত আলিম ও কাযী। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) -এর শাগরিদ। (ওফাতঃ ১১৪ হিজরী)।

৩. হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র.)। হযরত আনাস (রা.) -এর শাগরিদ। (ওফাত ঃ ১২৯ হিজরী)।

এ যুগের শেষভাগে ফিকহ্ শাস্ত্রের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বের দু'টি কেন্দ্র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠে। তার একটি মদীনায়ে তাইয়্যেবা এবং অপরটি কূফা।

১. হযরত ইমাম মালিক (র.)-এর তত্ত্বাবধানে মদীনায় তায়্যিবাতে কেন্দ্রটি গড়ে উঠে। এ

www.pathagar.com

সময় থেকেই ফিকহ্ এর বিধিবদ্ধ সংকলন ও সম্পাদনার কাজ আরম্ভ হয়।

২. হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় ইরাক অঞ্চলে ফিকহ্ চর্চার কেন্দ্র রূপে কূফা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার ইতিহাস

হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশকে ইসলামী ফিকহ্ এর সংকলন ও সম্পাদনা শুরু হয়। সে যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলামী ফিকহ্কে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম যুগ ঃ ফিকহ্ সংকলন, সম্পাদন ও ইজতিহাদের যুগ

হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রথম যুগের সূচনা এবং তা পরিসমাপ্তি হয় তৃতীয় শতকের শেষাংশে। এ যুগে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সহযোগী সহকর্মী ও শিষ্য শাগরিদগণের সহায়তায় ফিক্হের নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন। তিনি বেঁচে থাকতেই এর সম্পাদনাও পূর্ণাংগ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণ নিয়মিতভাবে ইল্ম ফিকহ্ গ্রন্থাকারে রচনা ও প্রকাশ করেন। এবং মুসলিম উম্মাহ্ ব্যাপকভাবে তা অনুসরণ করতে থাকে। কাযীগণ ঐ ফিকহের অনুসারণে মুকাদ্দমার 'ফয়সালা' দিতে থাকেন। মুসলিম জনতা ইমামগণের তাক্লীদ করতে থাকেন। অবশ্য ইজতিহাদ প্রক্রিয়াও নিজ গতিতে চলমান ছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণের শিষ্যবৃন্দ তাঁদের উস্তাদগণের সম্পাদিত ফিক্হের প্রচার প্রসারে ব্রতী হন। তাঁদের অভিমতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাঁদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোক নতুন নতুন মাস'আলার জওয়াব দিতে থাকেন। উসূলে ফিকহ্ও এ যুগে বিধিবদ্ধ হতে থাকে।

দ্বিতীয় যুগ ঃ পরিপূর্ণতা বিধান ও তাক্লীদ-এর যুগ

এ যুগের আরম্ভ চতুর্থ শতকের শুরুতে এবং পরিসমাপ্তি সপ্তম শতকে। এ যুগে তাক্লীদ ব্যাপকতা লাভ করে। প্রথম যুগের ইমামগণের উদ্ভাবিত নিয়ম-নীতির সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী রচিত হয়। এ সময়ের মানব জীবনে নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্নে দেখা দিলে তাঁর ধর্মীয় সমাধান অনুসন্ধান করা হয়। প্রথম যুগে নির্দ্ধারিত ও স্থিরকৃত মূলনীতিসমূহের আলোকে মাসাইলের ইখ্রাজই (উদ্ভাবনই) ছিল এ যুগের ব্যাপক কাজ।

তৃতীয় যুগ ঃ খালিস তাক্লীদের যুগ

সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগ শুরু হয়েছে। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক সকলকেরই ইমামগণের তাক্লীদ করতে হয়। অবস্থা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম যুগে ইজতিহাদ এবং ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনা

হিজরী দ্বিতীয় শতকের চতুর্থ দশক। বিশাল আয়তন ইসলামী বিশ্বের সরল সহজ তাহ্যীব-তমদ্দুনের মুকাবিলায় পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন নতুন পরিস্থিতি ও সংকট সৃষ্টি হয়েই চলেছে। ইসলামী উম্মাহ্র মাঝেও

ইজাতিহাদ নীতি নির্ধারণ এবং উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় এক অবিন্যস্ত, আগোছালো ভাব। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দূরদৃষ্টি ইসলামী ফিকহ্ বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তিনি ইসলামী ফিকহ্ এর এক বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে এ মহতী কাজে ব্রতী হন। এখান থেকেই শুরু হলো ইসলামী ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া।

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর পূর্ববর্তী যুগে ফিকহ্ কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র ছিল না। মাসআলা বা ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নের জওয়াব দান বা ফাত্ওয়া প্রদানের কোন সঠিক বিধিবদ্ধ নিয়ম নীতি ছিল না। হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (র.) এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে পেলেন এমন অসংখ্য মাসআলা রয়েছে, যে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন হাদীস বা সাহাবীর বাণী পাওয়া যায় না। কাজেই, তিনি কুরআন মজীদ, সুন্নাহ্ ও ইজমার আলোকে ইজতিহাদ ও কিয়াস প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। অবশ্য তাঁর আগে সাহাবী ও তাবিঈগণও কিয়াস এর পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তখন যুগ ছিল সাদাসিধা ধরণের, চাহিদার ব্যাপ্তিও ছিল সীমিত। তাই তখন কিয়াস প্রসারতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। সময়ের বিবর্তনে, সমস্যার ব্যপ্তিতে চাহিদা প্রসারিত হলে কিয়াসের প্রসারতার প্রশ্নও ব্যাপকভাবে দেখা দেয়।

কিয়াস ও রায় (অভিমত)

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিকহ্কে স্বকীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প করে সে জন্য মৌলিক বিধিবিধান বিন্যস্ত করেন। কিয়াস ও রায় (সাদৃশ্য বিধান এবং অভিমত) পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এ কারণেই ঐতিহাসিকগণও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁকে ' إمام أهل الرأى ' (রায় পন্থীগণের ইমাম) নামে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এ খ্যাতির পিছনে ছিল আরোও একটি কারণ বিদ্যমান। তাহলো, সাধারণত হাদীস বিশারদগণ হাদীস গ্রহনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রিওয়ায়াত (বর্ণনা) কে ভিত্তি বানিয়ে ছিলেন। দিরায়াত বা যুক্তির কষ্টিপাথরে ও বুদ্ধিমত্তার নিরীখে যাচাই করা তাঁরা যরূরী মনে করতেন না। এক শ্রেণীর জালিয়াতদের মনগড়া মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস প্রচারের কাজও ছিল অব্যাহত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) দিরায়াতের কারণে (যাচাই বাছাইয়ের নিরীখে) যোগ্য না হওয়ার জন্য অনেক হাদীসই গ্রহণ করেন নি। যেহেতু দিরায়াত ও রায় শব্দদ্বয় একে অপরের সমর্থক। এ কারণে ও কেউ কেউ তাঁকে রায় পন্থী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কেননা তাঁরা শব্দদ্বয়ের মর্মার্থ নিরূপণে সক্ষম হন নি। অবশ্য ইতিপূর্বে আর একজন মহান ইমাম ও এ বিশেষণে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি হলেন হযরত ইমাম মালিক (র.)-এর শায়খ ও উস্তাদ ইমাম রাবী'আহ (র.)। তিনি যেহেতু তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণের মধ্যে

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রায় অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁকে বলা হতো 'রাবী'আতুর রায়' অর্থাৎ রায় পন্থী রাবী'আহ্।

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ইব্ন কুতাইবা (র.) তাঁর 'কিতাবুল মা'আরিফ' এ ২২৫ পৃষ্ঠায় মুহাদ্দিসগণের তালিকার পাশাপাশি সে যুগের আহ্লুর রায় মুহাদ্দিসগণের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। সেখানে আহ্লুল-রায় শিরোনামে বর্ণিত নামগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত ইমাম আবূ লায়লা (র.), ২. ইমাম আবূ হানীফা (র.), ৩. ইমাম রাবী'আতুর রায় (র.), ৪. ইমাম যুফার (র.), ৫. ইমাম আওযায়ী (র.), ৬. ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.), ৭. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.), ৮. ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ও ৯. ইমাম মাহাম্মদ ইব্ন হাসান (র.)।

তাঁদের মধ্যে ইমাম সাওরী (র.) ও ইমাম আওযাঈ (র.) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক খ্যাত। অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন ফিকহ্ শাস্ত্রে সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) এ মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন, 'اَلنَّاسُ فِى الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ' ফিকহ্ বিষয়ে মানব সমাজ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পরিজন তুল্য।

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর যুগের সেরা ফকীহ্। অল্প দিনের ব্যবধানে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁর শিক্ষা কেন্দ্রটি সমসাময়িক বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রদের আগমন ঘটতে থাকে। ইমাম সাহেব (র.) ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্বভাবজাত সহমর্মিতা, সদাচরণ ও আমায়িকতার ব্যাপারেও খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন।

ফিকহ্ সংকলনের ধরন ও প্রকরন

ফিকহ্ সংকলনের চিন্তাধারা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মানসপটে উদিত হয় তাঁর উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (র.) -এর ইন্তিকালের পর। তখন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা ছিল পূর্বে সিন্ধু থেকে উত্তর পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামী রাষ্ট্রের নগর সভ্যতা বিস্তৃত পরিধিতে প্রসারিত হয়েছিল। স্বভাবতই তখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্নও এতে অধিক পরিমাণ সমস্যার উদ্ভব হচ্ছিল যে, একটি সুবিন্যস্ত আইন বিধি ব্যতীত উদ্ভূত সমস্যাবলীর সুষ্ঠ সমাধান কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই সে সময়কার উলামায়ে কিরামের মনে এমন একটি চিন্তা উদিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল যে, ইসলামী বিধি-বিধানের খুটিনাটি ও শাখা প্রশাখা বিষয়গুলিকে গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত করা হোক এবং একে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের রূপ দিয়ে সে বিষয়ে গ্রন্থাদি রচিত, সংকলিত ও সম্পাদিত হোক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন উদ্ভাবনী মনন এবং অসাধারণ আইন প্রণয়ন প্রতিভার স্বভাবজাত অধিকারী। কালাম (দর্শন ও যুক্তি) শাস্ত্রীয় পর্যালোচনা তাঁর এ প্রতিভাকে আরো

www.pathagar.com

ধারালো ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে। তা ছাড়া তাঁর বাণিজ্য বিস্তৃতি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের দূরপ্রান্ত সমূহ থেকে আগত ফাত্ওয়া প্রার্থীদের চিঠিপত্রের কারণেও এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিচার বিভাগের কাযীগণের সিদ্ধান্ত ও আদেশ নিষেধে ভ্রান্তি ও এই প্রয়োজনের তীব্রতাকে আরোও প্রকট করে তোলে। পরিস্থিতির এ তীব্রতার কারণে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ১৩২ হিজরীতে এ মহতী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যা 'ইলমে ফিকহ্' নামে এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

ফিকহ্ সম্পাদন-সংকলনের কাজে কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভের স্থান হবার জন্য কূফাই ছিল সর্বাধিক উপযোগী ও সার্বিক বিচারে সমীচীন। কারণ কূফা তখন ছিল বহুমূলী আরবী ও আজমী সংস্কৃতির সম্মিলনক্ষেত্র। এখানেই উদ্ভূত হচ্ছিল রকম বেরকমের প্রশ্ন ও সমস্যা। আবার এখানেই সম্মিলন ঘটে ছিল ইসলামী উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ মেধা প্রতিভাসমূহের। তুলনামূলক অন্যান্য আরব শহরগুলোতে এ সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। একজন ফিকহ্ সংকলক ও সম্পাদকের জন্য প্রয়োজন ছিল এমনি এক মিলন কেন্দ্রের।

ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাংগতা ও তাক্লীদের যুগ

হিজরী চতুর্থ শতকে শুরু হয়ে এর সমাপ্তি ঘটে সপ্তম শতকে। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় শেষ হয়ে আসে। উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইমামগণের তাক্লীদ (অনুগমন) করতে থাকেন এবং তাঁদের ফিকহী মতাদর্শের ভিত্তিতে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। তাঁদের নির্ণীত মূলনীতির আলোকে নতুন মাসআলা সমূহের ফায়সালা দেন। সে সময় বিশিষ্ট মাযহাবের সপক্ষে উদ্ঘাটিত মাসআলা সমূহের বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সমর্থনে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন প্রকার বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত প্রধান চার ইমাম হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.), হযরত ইমাম শাফিঈ (র.), হযরত ইমাম মালিক (র.) ও হযরত ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (র.)-এর তাক্লীদ করা উপর মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাঁর যুগে চার মাযহাবের অনুগামী সেরা ফকীহ্গণের আবির্ভাব ঘটে।

তাক্লীদ শব্দের অর্থ হলো অনুগমন করা। শরী'আতের পরিভাষায়, কোন ইমাম মুজতাহিদের অভিমতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে দলীলের খোঁজ না করে উক্ত ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ করে চলাকে তাক্লীদ বলা হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, তাবিঈগণের যুগ হতে ফিকহ্ সংকলনের যুগ পর্যন্ত মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয় শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন। মুজতাহিদ ছিলেন সে সব লোক যাঁরা কিতাব ও সুন্নাহ্র নস্ ও ভাষ্য হতে মাসআলা-মাসাইল অর্জন করেছিলেন। মুকাল্লিদ হলেন, যাঁরা কিতাব ও সুন্নাহ্র নস্ ও ভাষ্য হতে মাসআলা-মাসাইল আহরণ করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারেন নি। এ কারণে, কোন মাসআলার সমাধানের প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরা তাঁদের এলাকায় অবস্থানকারী ফাকীহ্গণের কারো নিকট উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় বিধান নিতেন। মুজতাহিদ ও ফকীহ্গণ ক্ষেত্রে বিশেষে তাঁদের ইজতিহাদ ভিত্তিক ফাত্ওয়াও দিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে সাধারণভাবেই মানুষের মাঝে তাক্লীদ ও অনুগমনের ধারা বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ জনসাধারণ ও আলিমগণ সকলেই তাক্লীদ শুরু করনে। এ কারণে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আগের যুগে ফিকহ্ অর্জনে উৎসাহী ব্যক্তিগণ কুরআন ও সুন্নাহ্ অধ্যয়ন করে তা থেকে মাসআলা-মাসাইলের 'إستنباط واستخراج'এর মূলনীতি শিক্ষায় নিমগ্ন হতেন আর পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে এর ব্যতিক্রম ঘটতে থাকে। তখন লোকেরা বিশেষ ইমামগণ কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে উদ্ভাবিত মাসাআলা-মাসাইল ও তাঁর নীতিমালা শিক্ষা করতে থাকেন।

এ অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তাঁকে একজন ফকীহ্ আলিম হিসেবে গণ্য করা হত। তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ইমামের ফিকহ্ ও মাযহাব ভিত্তিক কিতাব সংকলনও করতেন। এসব কিতাব হয়তো পূর্ববর্তী কোন কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হত। কিংবা বিক্ষিপ্ত মাসাইলের সংকলন-সমষ্টি হত। কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত তাঁদের মধ্যে কেউই নিজ ইমামের দেওয়া ফাত্ওয়ার বিপরীতে ফাত্ওয়া প্রদান করা বৈধ মনে করতেন না।

তাক্লীদের কারণ সমূহ

তাক্লীদ (অনুগমন)এর ধারা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভের অনেক কারণের মধ্যে নিম্নের ৩টি উল্লেখযোগ্য।

১. তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও দৃঢ়চেতা বিদ্বান শাগরিদ ও সহযোগী

সাধারণের মধ্যে কোন ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মতবাদ প্রসার লাভের ও প্রভাবশালী হবার শ্রেষ্ঠ ও কার্যকর মাধ্যম হলো, তাঁর কর্তৃক তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা বিশিষ্ট শাগরিদ এবং সহযোগী থাকা। যাঁরা ইমামের নীতি পন্থায় আকৃষ্ট ও প্রভাবিত এবং জনসাধারণের মাঝে তাঁরা বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য এবং মর্যাদা ও প্রতিপত্তির আসনে সমাসীন।

নির্ভরযোগ্য ও বিশিষ্ট শাগরিদগণ তাঁদের বরেণ্য ইমামগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং তাঁদের ফিকহী মতবাদ ও উদ্ভাবনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করতেন। এ বিদ্বান শাগরিদগণ জনসাধারণের কাছে অনুসরণীয় হওয়ার কারণে তাঁরাই ফিকহী মতবাদ অনুসারে আমলে অভ্যস্ত হত এবং এভাবেই মাযহাব প্রচলিত হয়ে যেত।

সংকলন যুগের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ এবং তাঁদের অনুগামী শাগরিদগণের জীবন কাহিনী ও কর্মধারা আলোচনায় পাঠকগণ অবগত হয়েছেন। তাঁদের উন্নত মেধা, ইল্মী যোগ্যতা-বিশ্বস্ততা, প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত প্রদানে প্রতিভা এবং বিশিষ্ট ও সাধারণের মাঝে তাঁদের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অবগতি ও পাঠকগণ লাভ করেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যুগের বিদ্বানগণ তাঁদের ইমামগণের ফিক্হের প্রচার-প্রসারে ব্রতী হন এবং কিতাবাদি রচনা করেন। তাঁদের পরবর্তী স্তরের শাগরিদগণ আরও ব্যাপক প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় তর্ক-বিতর্ক এবং বহস-মুনাযারাহ্ করে ও কিতাবপত্র লিখে নিজেদের ইমামগণের 'মাযহাব' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরিশেষে অবস্থা এমনি পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, অন্য কথা শুনতেও আর কেউ রাযী হয় না।

ঐতিহাসিক ইব্ন খালেদূনের ভাষায় স্পেনে ইব্ন হাযম যাহিরী তাক্লীদের বিরুদ্ধে কথা তুললে চারিদিকে প্রতিবাদের সোচ্চার ধ্বনি উঠে। এমন কি ইব্ন হাযমের কিতাবপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। অনেকক্ষেত্রে তাঁর রচনাবলী বিনষ্ট করে ফেলা হয়।

২. বিচারপতির পদ

সাহাবী ও তাবিঈগণের যুগে সাধারণত কাযী পদে সে সব ব্যক্তিত্বই নিয়োজিত হতেন, যাঁরা ইজতিহাদী প্রভিতায় পূর্ণাংগ উত্তীর্ণ প্রতিভা। সময়ের বিবর্তনে অবস্থায় পরিবর্তন হয়। কাযীদের সে ক্ষুরধার প্রতিভার অভাব দেখা দিতে শুরু করলো। তুলনামূলকভাবে এ পদে অযোগ্য লোক নিয়োগ পেতে থাকলো। পরিণামে সমালোচনা শুরু হলো। তাই কাযীগণ (বিচারকগণ) বাধ্য হয়ে সংকলিত ফিক্হের ভিত্তিতে 'রায়' প্রদান করতে লাগলেন। নিজেদের ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে রায় দান থেকে বিরত থাকলেন। কাযীগণ ও আলিমগণ যেহেতু কোন প্রখ্যাত ইমামের অনুসারী অনুগামী হয়ে চল্ছিলেন, সে জন্যে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ও কোন নির্দিষ্ট ইমামমের মাযহাব অনুসারে 'রায়' দিতে শুরু করলেন। ফলে ঐ বিচারকের আওতাধীন এলাকায় তাঁর অনুসারী ইমামের মাযহাব চালু হয়ে যায়।

৩. মাযহাব সমূহের সংকলন-সম্পাদনা

যে মাযহাবে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য সংকলক ছিলেন, সে মাযহাব খুব প্রচার-প্রসার লাভ করে। যেমন, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহ্ যুগশ্রেষ্ঠ শাগরিদগণ দ্বারা রচিত হয়েছিল। তিনি তাঁদের সহায়তায় নিজস্ব ফিকহ্ সংকলন তৈরী করেন। তাঁর শগরিদগণ মুজতাহিদ ও কাযীগণকে প্রশিক্ষণ দাতা হওয়ার প্রতিভাধারী। ফলে, তাঁর মাযহাব চালু হয়ে গেল এবং তা ব্যাপকতর বিস্তৃতি লাভ করলো।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র.) নিজেই তাঁর ফিকহ্ সংকলন করেন। তাঁর সুযোগ্য বিশ্বস্ত শাগরিদগণ তাঁর মাযহাবের সমর্থনে বহু অবদান রাখেন। ফলে, হযরত ইমাম আযম আবূ হানাফী (র.)-এর পরবর্তী স্থানে তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত ইমাম মালিক (র.) তাঁর মাযহাবের প্রচার-প্রসার করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ শাগরিদগণ তাঁর সংকলিত ফিকহ্ ছড়িয়েছেন। ফলে, শাফিঈ মাযহাবের পরে মালিকী মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে।

হযরত ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) নিজে কোন ফিকহী সংকলন তৈরী না করলেও

www.pathagar.com

তাঁর কর্মবীর শাগরিদগণের মাধ্যমে তাঁর মাযহাবও বিস্তৃতি লাভ করে। অবশ্য এ বিস্তৃতি পূর্বের তিন ইমামের তুলনায় কম।

মোটকথা, চার ইমামের মাযহাব সংকলিত হবার কারণে এবং তাঁদের শাগরিদগণের পরিশ্রমের ফলে এ মাযহবগুলোর তাক্‌লীদ ব্যাপকতা লাভ করে। এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "লাইস (র.) মালিক (র.)-এর তুলনায় অধিক ফকীহ্ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাগরিদগণ তাঁর ইল্‌ম বিনষ্ট করে ফেলে।" অর্থাৎ অনুসরণীয় এমন শাগরিদ ছিল না, যাঁদের দ্বারা মাযহাব প্রসার লাভ হতে পারে।

ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদূনের ভাষ্য

পরিশেষে সারা দুনিয়ায় এ চার মাযহাবের তাক্‌লীদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। অন্যান্য ইমামগণের অনুগামী আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। সর্বসাধারণ চার মাযহারে বিরোধিতার সব দুয়ার বন্ধ করে দিল। কারণ, ইল্‌মী পরিভাষা হয়ে গেল ব্যাপক এবং লোকদের মধ্যেও লোপ পেল ইজতিহাদের মর্যাদায় উপনীত হবার যাগ্যতা। অযোগ্য ও দূর্বল অভিমতের অধিকারী আলিমগণের মুজতাহিদ বনে যাওয়া আশঙ্কা দেখা দিল। এজন্য আলিমগণ নিজেদের অপারগতা ও সামর্থহীনতা স্বীকার করে নিয়ে ইমাম চতুষ্ঠয়ের তাক্‌লীদের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করতে লাগলেন। ফলে প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ইমামের তাক্‌লীদ করতে আরম্ভ করল এবং ইমামগণের মধ্যে কারো তাক্‌লীদ করা অবস্থায় অন্য ইমামের তাক্‌লীদ করাকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কারণ, তাতে শরী'আতের হুকুম আহ্‌কাম পালনের ব্যাপারটি হল খেলো ও উপহাসে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এভাবে তাক্‌লীদ চার ইমামের মাযহাবে সীমিত হয়ে গেল।

হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) -এর মন্তব্য

মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চারটি সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে বিশৃংখলা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কয়েকটি কারণে আমি এ কথা বলতে বাধ্য,

১. মুসলিম উম্মাহ্ এ বিষয়ে ইজমায় (ঐক্যমতে) উপনীত হয়েছে যে, শরী'আতের পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীগণের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত এ চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্ববর্তীগণের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত হতে বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় পরিমার্জিত রয়েছে তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

২. হাদীস শরীফে আছে "বৃহত্তম মুসলিম জামা'আতের অনুসরণ করবে।" যেহেতু পূর্বেকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে কেবলমাত্র মাযহাব চারটিতে সীমিত হয়েছে এবং বিশ্ব মুসলিম এরই অনুসরণ করছে তাই এখন এর ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই।

৩. উত্তম যুগ-এর থেকে যেহেতু সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর হয়েছে ; আমানতদারী ও

www.pathagar.com

বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে, তাই উলামায়ে সূ' (অসৎ আলিমরা) কিংবা এমন লোকের অনুসরণের আশংকা বিদ্যমান, যার মাঝে ইজতিহাদের শর্তাবলী অনুপাতে তা যাচাই করে দেখাও কঠিন কাজ; কাজেই স্বীকৃত প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য। (ইকদুল্-জীদ)।

উসূলুল্-ফিকহ্ (ফিক্হের মূলনীতি)

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফিকহ্-সংকলন ও সম্পাদনার পরিকল্পনার সাথে সাথে তাঁর উৎস ও দলীল প্রমাণ হতে মাসাইল আহরণ-উদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলনীতি ও উসূল নির্ণয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যাতে আহ্কামের স্তর ফরয়, ওয়াজিব, হালাল-হারাম, মুবাহ্-মকরুহ্ প্রভৃতি নিরূপন করা যেতে পারে।

আল্লামা হাযরামী (র.) লিখেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) (মৃত্যু ঃ ১৮৩ হিজরী), ইমাম মুহাম্মদ (র.) (মৃত্যু ঃ ১৮৯ হিজরী) সর্বপ্রথম 'উসূলুল-ফিকহ্' বিষয়ক কিতাব প্রনয়ণ করেন।

এরপর ইমাম শাফিঈ (র.) (মৃত্যু ঃ ২৩৪ হিজরী) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল-উম্ম'-এর ভূমিকায় 'উসূলুল ফিকহ্' বিষয়ে 'রিসালা' নামক একখানা মূল্যবান (পুস্তিকা) মুসলিম উম্মাহ্কে উপহার দিয়েছেন।

পরবর্তীতে এ বিষয়ের উপরে নিম্ন বর্ণিত উলামায়ে কিরাম নিম্নোল্লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন ঃ

১. ইমামুল্ হারামাইন (র.) -এর 'কিতাবুল বুরহান' (ওফাত ঃ ৪৭৮ হিজরী)।

২. ইমাম আবূ হামিদ গাযালী (র.) -এর 'আল্-মুস্তাসফা' (ওফাতঃ ৫০৫ হিজরী)।

৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) -এর 'কিতাবুল-মাহসূল' (ওফাত ঃ ৬০৬ হিজরী)।

৪. শাইখ শরফুদ্দীন আমিদী (র.) -এর 'কিতাবুল-আহ্কাম' (ওফাত ঃ ৬৩১ হিজরী)।

৫. শাইখ সিরাজুদ্দীন আরমাভী (র.) -এর 'কিতাবুত্ তাহ্সীল'।

৬. শাইখ তাজুদ্দীন আরমাভী (র.) -এর 'কিতাবুল্ হাসিল'।

৭. শাইখ শিহাবুদ্দীন কিবরোয়ানী (র.) -এর 'তানকীহাত'। (ওফাত ঃ ৬৮৪ হিজরী)।

৮. কাযী বায়যাবী (র.) -এর 'মিনহাজ' (ওফাত ঃ ৬৮৫ হিজরী)।

৯. আল্লামা ইব্ন হাজিব (র.) -এর 'মুখতাসারুল কাবীর'। (ওফাত ঃ ৬৪৬ হিজরী)।

১০. শাইখ আবূ বকর জাস্সাস (র.) -এর 'কিতাবুল উসূল' (ওফাত ঃ ৩৭০ হিজরী)।

১১. শাইখ আবূ যায়িদ দাবুসী (র.) -এর 'কিতাবুল আসরার' ও 'তাকভীমূল আদিল্লাহ্' (ওফাত ঃ ৪৩১ হিজরী)।

১২. আল্লামা ফাখরুল ইসলাম বযদ্বী (র.)-এর 'কিতাবুল উসূল'।

১৩. শাইখ আবদুল আযীয বুখারী (র.) -এর 'কাশফুল আসরার'।

১৪. শাইখ হাফিযুদ্দীন নাসাফী (র.)-এর 'আল-মানার'।

www.pathagar.com

১৫. মোল্লা জীয়ূন (র.) -এর 'নূরুল আনওয়ার'।

১৬. শাইখ জালালুদ্দীন খাব্বাজী (র.) -এর 'আল-মুগান্নী'।

১৭. ইমাম ইব্‌ন হুমাম (র.) -এর 'তাগ্‌রীব'।

১৮. তাজুশ্‌ শরী'আহ্‌ (র.)-এর 'তাওযীহ্‌'।

১৯. আল্লামা তাফ্‌তাযানী (র.)-এর 'তানভীহ শরহে তাওযীহ'

২০. কাযী মুহিববুল্লাহ বিহারী (র.) -এর 'মুসাল্লামুস্‌ সুবূত'।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মুফ্‌তী শাইখ সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী (র.) লিখেছেন, হযরত নবী করীম (সা.)-এর দীন যেন একটি স্বচ্ছ প্রস্রবণ। সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে ইল্‌মের ঝর্ণাধারা। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সে বারিধারা পৌছে দিয়েছেন দূর দিগন্তে। মাযহাবের ইমামগণ সে প্রবাহমান বারিধারা সঞ্চিত করেছেন সাগর, নদী, দীঘি ও পুকুরে। মুসলিম উম্মাহ্‌ তা দিয়ে তাদের পিপাসা নিবারণ করেছে। সময়ের বিবর্তনে কয়েক শতকে সে পানি চারটি জলাধারে সঞ্চিত হয়ে গিয়েছে, যা আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র দিক দর্শনীয় বাহন ও উপকরণ। (তারীখে ইলমে ফিকহ্‌)।

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে-সানী হযরত শাইখ আহ্‌মাদ ফারুকী সিরহিন্দী (র.) লিখেছেন, দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা বলা যায় যে, হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি সমুদ্র এবং মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম জামা'আত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারী। তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হোন (মাকতুবাত শরীফ, মাকতুবাত নং ৫৫, দ্বিতীয় খণ্ড)।

ফিকহ্‌ শাস্ত্রে ব্যবহৃত আহ্‌কাম

ইসলামী শরী'আতের বিধান মতে মানুষের কাজগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ঃ ১. মাশরূ'-শরী'আত সম্মত, ২. গাইর মাশরূ' -শরী'আত পরিপন্থী। শরী'আত সম্মত কার্যাবলী ৬ ভাগে বিভক্ত। ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নাত, ৪. মুস্তাহাব, ৫. নফল ও ৬. মুবাহ্‌।

ফরয ঃ ফরয অর্থ অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার অলঙ্গণীয় আদেশ। যা দলীলে কাত্‌ঈ (অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত)। আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল মুসলমানের প্রতি তা অপরিহার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। যার অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হবে। এর তরককারীর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। শরী'আতের পরিভাষায় তাকে 'ফাসিক' বলা হয়।

ইসলামী শরী'আতের চারটি রুক্‌ন

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রামাযান মাসে রোযা, বাৎসরিক উদ্বৃত্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের যাকাত দান, সামর্থ হলে ব্যক্তির জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরয।

ফরয দুই প্রকার

১. ফরযে আইন যা প্রত্যেকের উপর ফরয। এ শ্রেণীর ফরয কাজ এককভাবে অথবা সমষ্টিগত-ভাবে আদায় করতে হয়। যেমন - নামায, রোযা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

২. ফরযে কিফায়া যা সমাজের সকলের প্রতি এ কাজ ফরয। তবে সমাজের কিছু লোক তা আদায় করলে সকলে পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি আদায় না করে, তবে সমাজের সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন ঃ জিহাদ, জানাযার নামায ইত্যাদি।

ওয়াজিব

ওয়াজিবও ফরযের ন্যায় অবশ্য পালনীয়। তবে গুরুত্বের দিক থেকে ফরযের পরে ওয়াজিবের স্থান। বিনা কারণে তা পারিত্যাগ করলে ফাসিক হবে এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

শরী'আতের ওয়াজিব বিধানকে গুরুত্বহীন মনে করা সরাসরি গোমরাহী। তবে কোনরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে অথবা সন্দেহ মূলে ওয়াজিবকে ইনকার (আস্বীকার) করলে কাফির হবে না। কেননা, ফরয বিধানের ন্যায় দলীলে কাত্ঈ (অকাট্য) প্রমাণ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় নি। ওয়াজিব সাবিত হয়েছে দলীলে যন্নী (সন্দেহযুক্ত প্রমাণ) দিয়ে। যেমন বিত্‌রের তিন রাক'আত নামায। নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়া ।

সুন্নাত

ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত দীনের যে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে করেছেন, করার নির্দেশ দিয়েছেন বা অনুমোদন করেছেন শরী'আতের পরিভাষায় একে সুন্নাত বলা হয়। এ ছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীন দীনের যে সকল কাজ প্রবর্তন করেছেন সে গুলোকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَلَيكم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ •

তোমাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য আমার সুন্নাত হেদায়েত প্রাপ্ত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা।

সুন্নাত দুই প্রকার ঃ ১. সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা, ২. সুন্নাতে গাইরে-মুওয়াক্কাদা।

সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা

সে সব কাজ যা হযরত নবী করীম (সা.) ইবাদত হিসাবে নিয়মিতভাবে তবে ওযরবশত কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। আমলের দিক থেকে সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি। বিনা কারণে তা বর্জন করা বা বর্জন করার অভ্যাস করে নেওয়া অনুচিত ও গুনাহের কাজ।

সুন্নাতে গাইরে-মুওয়াক্কাদা

সে সকল কাজ যা হযরত নবী করীম (সা.) অভ্যাসগতভাবে নিয়মিত করেছেন এবং বিনা কারণে কখনো তা ছেড়েও দিয়েছেন। এ কাজ যাঁরা করবেন তাঁরা সাওয়াবের অধিকারী হবেন, না করলে শাস্তি হবে না।

www.pathagar.com

মুস্তাহাব

সে সব কাজ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) কখনো কখনো অন্যদেরকে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। মুস্তাহাব কাজ আদায় করলে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে। তবে না করলে কোন গুনাহ হবে না। ফকীহ্গণের পারিভাষায় মুস্তাহাবকে নফল মান্দূব ও তাতাওউও বলা হয়ে থাকে।

মুস্তাহ্সান

যে সব কাজ উলামায় মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শরী'আত বিশেষজ্ঞগণ) পবিত্র কুরআন হাদীস ও সুন্নাতের আলোকে ভাল বলে গ্রহন করেছেন। মুস্তাহ্সান পালনে সাওয়াব আছে, তবে ছেড়ে দিলে কোন গুনাহ নেই।

মুবাহ্

যে কাজ করাতে কোন সাওয়াব নেই। আর না করাতে কোন গুনাহ্ নেই। শরী'আতের পরিভাষায় সে সব কাজকে মুবাহ্ বলা হয়। ইচ্ছা করলে তা করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারে। উল্লেখ্য যে নফল, মুস্তাহাব, মুস্তাহ্সান, মান্দুব, তাতাওউ' সবই ঐচ্ছিক ইবাদত। এসব খেয়াল খুশীমত সুযোগে সময়ে যত ইচ্ছা করা যায়। যত বেশী করবে, ততই অধিক সাওয়াব লাভ করবে।

হালাল

শরী'আতের দৃষ্টিতে যে সকল বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে হালাল বলা হয়। গাইরে-মাশরূ'-শরী'আত পরিপন্থী) কাজগুলো দুই ভাগে বিভক্তঃ ১. মাকরূহ, ২. হারাম।

মাকরূহ্ (অপসন্দনীয় কাজ) দুই প্রকারের ঃ ১. মাকরূহ্ তাহরীমী ও ২. মাকরূহ্ তানযীহী।

মাকরূহ তাহরীমী : যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলীল দারা প্রমাণিত নয়। বিনা ওযরে এ সব কাজ করা গুনাহ্ ও শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

মাকরূহ তানযীহ্ : সে সকল কাজ বর্জন করাতে সাওয়াব লাভ হয়, না করলে গুনাহ্গার হবে না।

হারাম

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, একে হারাম বলা হয়। বিনা ওযরে যে এমন কাজ করে সে ফাসিক। কঠিন আযাব তার জন্য নির্ধারিত। হারামের অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। ফরয এবং হারাম প্রমাণের একই দিক দিয়ে একই পর্যায়ের। ফরয কাজ করা ফরয আর হারাম কাজ বর্জন করা ফরয। অনুরূপ ওয়াজিব এবং মাকরূহ তাহরীমীও প্রমাণের দিক দিয়ে এক পর্যায়ের;তেমনি মুস্তাহাব এবং মাকরূহ তানযীহী একই ধরনের। জায়িয এবং হালাল অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাজায়িয এবং হারামও সমার্থবোধক।[১]

১. কাওয়াইদুল ফিকহ্ঃ মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.) এবং ইসলামী ফিক্হ, ১ম খণ্ড, মাওলানা নজীবুল্লাহ্ নদভী (র)।

www.pathagar.com

৩

রাসমুল মুফ্‌তী এবং মাস্‌আলা ও ফাত্‌ওয়ায় ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ

رَسم المفتى (মুফ্‌তীর পথ নির্দেশিকা)

মুফ্‌তী কিসের ভিত্তিতে ফাত্‌ওয়া দিবেন, যে নীতিমালা মুফ্‌তীকে সে পথ নির্দেশ করে তাকে (رَسم المفتى) বা মুফ্‌তীর পথ নির্দেশিকা বলা হয়। [১]

مُفتى (ফাত্‌ওয়া দানকারী)

যে ফিকহ্‌ তত্ত্ববিদ বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন তাঁকে মুফ্‌তী বলা হয়। মুফ্‌তীর জন্য উসূলে শরী'আত হতে মাসআলা ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়।[২]

আল্লামা শামী (র.) বলেন, মুফ্‌তীই মুজ্‌তাহিদ। মুজতাহিদ নন এমন কোন ব্যক্তি মুজতাহিদের কথা মুখস্থ করলে তিনি মুফ্‌তী হতে পারেন না। এমন ব্যক্তির কাছে যখন কোন প্রশ্ন করা হয় তখন তার উচিৎ তার ঐ কথাটি কোন মুজতাহিদের উক্তি তা উল্লেখ করা। এমন ব্যক্তি মুলত ফাত্‌ওয়া নকলকারী হিসাবে গণ্য হন।[৩]

الإمام الأعظم-الإمام (ইমাম, বড় ইমাম)

হানাফী ফিকহের কিতাবে 'আল-ইমাম' অথবা 'আল-ইমামুল আযম' শব্দের প্রয়োগ হলে তদ্দ্বারা হানাফী মাযহাবের ইমাম হযরত আবূ হানীফা (র.) কে বুঝান হয়ে থাকে।[৪]

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দীনি ও দুনিয়াবী সকল ব্যাপারে যাঁর সঠিক কর্তৃত্ব থাকে তাঁকেও ইমাম বলা হয়। ইমামাতে কুব্‌রা-যাঁরা দীনী আক্বিদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেন উক্ত

১. রাদদুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।
২. মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিকহ, ৪৯৮ পৃষ্ঠা।
৩. রাদদুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।
৪. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইমামকে খলীফা বলে থাকেন। তদ্রূপ নামাযের জামা'আতে যাঁর ইক্‌তিদা করা হয় তাঁকেও ইমাম বলা হয়, এই হলো ইমামতে সুগরা[১]

صَاحِبَيْن-شَيْخَيْن-طَرَفَيْن (সাহিবাইন, শায়খাইন, তারফাইন)

ফিকহের কিতাবে 'সাহিবাইন' (صاحبين) শব্দ দ্বারা একত্রে আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে বুঝান হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে 'শায়খাইন' (شيخين) শব্দ দ্বারা একত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-কে বুঝান হয় এবং তারফাইন (طرفين) শব্দ দ্বারা একত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)–কে বুঝান হয়ে থাকে।[২]

الإِمَام الرَّبانى - الإِمَام الثَّانى - اَلثَّانى

'আস্‌-সানী' 'আল-ইমামুস্‌-সানী' শব্দদ্বয় হানাফী ফিকহের কিতাবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-কে বুঝান হয়ে থাকে।[৩] এভাবে 'আল-ইমামুর রাব্বানী' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে বুঝান হয়ে থাকে।[৪]

عند أئمة الأربعة- ও -عند أئمتنا الثلاثة

(আমাদের তিন ইমামের মতে ও চার ইমামের মতে)

আমাদের হানাফী ফিক্‌হের কিতাবে প্রথমোক্ত কথার ব্যবহার দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম আহ্‌মাদ (র.) ইমামত্রয়কে বুঝানো হয়ে থাকে এবং চার ইমামের মত বলে প্রসিদ্ধ ইমাম চতুষ্টয় যথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.) ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-কে বুঝানো হয়।[৫]

شمس الأئمة (ইমামকূল রবি)

হানাফী মাযহাবের কিতাবে কোন বিশেষণ যুক্ত ছাড়াই যখন 'শামসুল আইম্মা' শব্দের ব্যবহার হয় তখন তা দ্বারা শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী (র.)-কে বুঝান হয়। অন্যদের ক্ষেত্রে যখন এ শব্দের ব্যবহার হয় তখন তা বিশেষ কোন বিশেষণ যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী' 'শামসুল আইম্মা কিরদারী' ইত্যাদি।[৬]

فضلى (ফায্‌লী)

যখন হানাফী মাযহাবের কোন কিতাবে কোন বিশেষণ যুক্ত না করে 'ফায্‌লী' বলা হয় তখন তা দ্বারা আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফযল আল কামারী আল-বুখারী (র.) কে বুঝান হয়।[৭]

---

১. মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিকহ, ১৯০ পৃষ্ঠা। ২. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা। ৩. মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিকহ, ১৯০ পৃষ্ঠা। ৪. মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিকহ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা; মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা। ৫. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা। ৬. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা। ৭. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

مُحِيط (মুহীত)

আমাদের ফিক্হের কিতাবে কোথাও 'মুহীত' কিতাব থেকে সংগৃহীত এমন উল্লেখ থাকলে তা যাখীরা কিতাবের লেখক ইমাম বুরহান উদ্দীন (র.)-এর কিতাব 'মুহীতে বুরহানী'-কে বুঝায়। ইমাম রাযি উদ্দীন সারাখ্সী (র.)-এর 'মুহীত' নামক কিতাব বুঝায় না।[১]

فِى الكِتَاب ও لَفظ الكِتَاب

হানাফী মাযহাবের কিতাব 'লাফযুল-কিতাব' অথবা 'ফিল-কিতাবে' শব্দের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর তা দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'মাবসূত'কে বুঝান হয়।[২]

حَسَن (হাসান)

হানাফী মাযহাবের কোন কিতাবে যদি কোন বিশেষণে বিশেষিত না করে কেবল 'হাসান' থেকে বর্ণিত এমন বলা হয়, তাহলে তা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফার (র.) সাগরিদ ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদকে বুঝায়। যেমন হাদীস, তাফসীরের কিতাবে হাসান হতে বর্ণিত, এমন উক্তি থাকলে তা দ্বারা হযরত হাসান বাসরী (র.)-কে বুঝায়।[৩]

اَلصدر الأوّل (প্রথম যুগ)

ফিক্হের কিতাবে নবী (র.) ও তৎপরবর্তী দুই যুগের ক্ষেত্রে 'সাদরে আওয়ালা' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৪]

مُتَاخِرِين ও مُتقدِمين (মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন)

ফিক্হের কিতাবে মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ব যুগের উলামা) বলতে সাধারণত তাঁদেরকে বুঝান হয়, যাঁরা ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। এদের পরবর্তীগণকে মুতাআখ্খিরীন (পরবর্তী যুগের উলামা) বলে আখ্যায়িত করা হয়। 'জামিউল উলূম' গ্রন্থে 'আল- খিয়ালাতুল লতীকা' হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম হালাওয়ায়ী হতে ইমাম হাফীযুদ্দীন বুখারীর মধ্যবর্তী সময়ে যে সব উলামায়ে কিরাম অতীত হয়েছেন, তাঁদেরকে'মুতাআখ্খিরীন' বলা হয়। আল্লামা যাহাবী (র.) 'মিযানুল ইতিদাল' কিতাবের শুরুতে লিখেছেন যে, উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীনের মাঝে যে সময়সীমা তাঁদেরকে পৃথক করে থাকে তা হল দ্বিতীয় হিজরী শতকের সমাপ্তি ও তৃতীয় হিজরী শতকের সূচনা কাল।[৫]

سَلَف ও خَلَف (সালাফ্ ও খালাফ্)

যাঁর মাযহাবের তাক্লীদ করা হয় অর্থাৎ মতের অনুসরণ করা হয় তাঁকে 'সালাফ' বলে।

---

১. প্রাগুক্ত, ১৬ পৃষ্ঠা। ২. কাশ্ফুল আসরার, ৩য় খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। ৩. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা। ৪. কাশ্ফুল আসরার, ৩য় খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা। ৫. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.) অন্যান্য ইমাম ও তাঁদের সহচরবৃন্দ। তাঁরা আমাদের 'সালাফ', যেমন সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন তাঁদের 'সালাফ'। তাঁদের পরবর্তীগণকে 'খালাফ' বলা হয়। কখনও কখনও 'সালাফ' শব্দটি দ্বারা সাহাবা, তাবিঈন ও তৎপরবর্তী চতুর্থ শতক পর্যন্ত উলামায়ে কিরামকে আখ্যায়িত করা হয়। আর চতুর্থ হিজরীর পরবর্তীদেরকে 'খালাফ' বলা হয়।[১]

আবদুন্ নবী (র.) বলেন, ফিক্হ তত্ত্ববিদগণের মতে ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান (র.) এরপর হতে শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.) পর্যন্ত সময়কালের উলামায়ে কিরাম 'খালাফ' বলে আখ্যায়িত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পর্যন্ত সময়কালের উলামায়ে কেরামকে 'সালাফ' বলা হয়।[২]

مَشَائِخ (মাশাইখ)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাক্ষাৎ পান নি এমন পরবর্তী উলামায়ে কিরামকে 'মাশাইখ' বলা হয়।[৩] হিদায়া কিতাবে উল্লিখিত 'মাশাইখ' শব্দ দ্বারা বুখারা, সমরকন্দের আলিমগণকে বুঝান হয়েছে।[৪]

ظَاهِر الرِّوَايَة ও مَسَائِل الأُصُول (যাহিরুর রাওয়াইয়া ও মাসাইলুল উসূল)

হানাফী মাযহাবের মাসাইল সমূহ তিন স্তরভূক্ত। প্রথম স্তরের মাসাইলকে 'যাহিরুর রিওয়ায়িত' এবং 'মাসাইলুল উসূল' বলা হয়। এ স্তরের মাসাইল সাধারণত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহিবাইন থেকে প্রাপ্ত। অবশ্য উল্লিখিত ইমামত্রয়-এর সাথে ইমাম যুফার ও ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ সহ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যান্য শাগরিদগণকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এই যে, 'আইম্মা সালাসা' অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে প্রাপ্ত মাসাইলের ক্ষেত্রে 'মাসাইলুল উসূল' এবং 'যাহিরুর রিওয়ায়িত' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।[৫]

كُتُب ظَاهِر الرِّوَايَة (কুতুবু যাহিরুর রাওয়াইয়া)

যাহিরুর রিওয়ায়িতের মাসাইল যে সমস্ত কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, এমন কিতাবসমূহকে জাহিরুর রিওয়ায়িতের কিতাব বলা হয়। এ কিতাবসমূহকে উসূলও বলা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক প্রণীত ছয়খানি কিতাব - মাবসূত, যিয়াদাত, জামি' সাগীর, জামি' কাবীর, সিয়ারে সাগীর, সিয়ারে কাবীর হল যাহিরুর রিওয়ায়িতের কিতাব। আল্লামা শামী (র.) বলেন, উল্লিখিত কিতাব সমূহের 'যাহিরুর রিওয়ায়িত' নাম করণের কারণ এই যে, ঐ সকল

---

১. মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিকহ, ১৯০ পৃষ্ঠা। ২. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা। ৩. প্রাগুক্ত, ১৬ পৃষ্ঠা। ৪. মুকাদ্দামাতু উমদাতির হিদায়া, ৩ পৃষ্ঠা। ৫. রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা ; মাজমুয়াতু - কাওয়াইদুল ফিকহ, ৩৮৭ পৃষ্ঠা ও ৫৭ পৃষ্ঠা ; মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

কিতাবের মাসাইল ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় মুতাওয়াতির, মাশহুর সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে।

বাহ্‌রুর রাইক গ্রন্থে যাহিরুর রিওয়ায়িতের কিতাব ছয়টি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ সিয়ারে সাগীরকে যাহির রিওয়ায়িতের কিতাব হিসাবে স্বীকার করেন নাই। এমত অনুসারে জাহির রিওয়ায়িতের কিতাব মোট পাঁচখানা। দুর্‌রুল মুখতার কিতাবের হাশিয়া তরীকুল আনোয়ার-এ উক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। কেউ কেউ সিয়ারদ্বয়কে উহার অন্তর্ভূক্ত করেন নাই। 'তাহ্‌তাবী' কিতাবে এ জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে। অতএব, যাহিরুর রিওয়ায়িতের কিতাব চারখানিতে সীমিত হয়ে যায়। 'ইনায়া' কিতাবে আছে, উসূল বলে 'জামি' সাগীর', 'জামি' কাবীর', 'যিয়াদাত' ও মাবসূতকে বুঝান হয়। এ সমস্ত কিতাবকে যাহিরুর রিওয়ায়িতের কিতাবও বলা হয়।

'মিফ্‌তাহুস সা'আদাত' কিতাবে আছে, ফিকহ্‌ তত্ত্ববিদগণ মাবসূত, যিয়াদাত, 'জামি সাগীর ও জামি' কাবীরকে উসূল এবং মাবসূত, জামি' সাগীর ও সিয়ারে কাবীরকে যাহিরুর রিওয়ায়িত ও মাশহুর রিওয়ায়িত বলেন।[১]

কাফাবী (র.) বলেন, মাসাইলুল উসূল ও যাহিরুর রিওয়ায়িতের মাসাইল মাবসূত কিতাবের মাসাইলকে বলা হয় এবং মাবসূত কিতাবকে 'আসল' বলে উল্লেখ করা হয়।[২]

মুফ্‌তী সাইয়েদ মহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.) বলেন, শহীদ হাকিমের 'কিতাবুল কাফী' ও 'কিতাবুল মুন্‌তাকা' উক্ত শ্রেণীর কিতাব।[৩]

নাওয়াদির (نوادر)

যাহিরুর রিওয়ায়েতের কিতাব ব্যতীত আমাগণে ইমামদের মাসাইল আরও কতিপয় কিতাবে সংগৃহীত হয়েছে। এ শ্রেণীর কিতাবকে নাওয়াদির বলে আখ্যায়িত করা হয়।

১. রাক্‌কিয়াত (رقيات)

এ এমন সব মাসাইল সমৃদ্ধ কিতাব যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত রাক্‌কাহ নামক স্থানে বিচারপতি থাকাকালে লিপিবদ্ধ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সামা'আ ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে এর মাসাইল রিওয়ায়িত করেছেন।

২. কায়সানিয়াত (كيسانيات)

ইমাম মুহাম্মদ (র.) আবূ আমর সুলাইমান ইব্‌ন শুআইব আল-কাইসানীকে যে সব মাসাইল লিখিয়ে দিয়েছিলেন তাকে 'কাইসানিয়াত' বলা হয়। 'মিফ্‌তাহুস সা'আদাত' কিভাবে

১. মুকাদ্দামাতু হিদায়া, ৪ পৃষ্ঠা। ২. মুকাদ্দামাতু উমদাতির হিদায়া, ৯ পৃষ্ঠা ও হাশিয়া তাহতাবী ৯ পৃষ্ঠা। ৩. মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিকহ, ৫৭০ পৃষ্ঠা; মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৬ পৃষ্ঠা; রাদ্দুল মুহতার, ৪৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

উল্লেখ রয়েছে যে, কায়সা নামী জনৈক ব্যক্তির জন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক সংগৃহীত কিতাবকে 'কায়সানিয়াত' বলা হয়।

৩. হারূনিয়াত (هَارُونِيَّات)

তাহতাবী (র.) বলেন, খলীফা হারূনুর রশীদের শাসনামলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে সকল মাসাইল একত্রিত করেছিলেন তা 'হারূনিয়াত' নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এ সকল মাসাইলকে গায়েরে জাহিরে রিওয়ায়েত বা নাওয়াদির এ জন্য বলা হয় যে, তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে পূর্বের কিতাব সমূহের ন্যায় সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ বর্ণনা সহকারে পাওয়া যায় নি।[১]

উল্লেখিত বর্ণনায় যাহির রিওয়ায়িত ও নাওয়াদির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বিষয়টি ভিন্নতর। কারণ অনেক সময় নাওয়াদিরের মাসআলা যাহির রিওয়ায়িতও হতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, মুহীত ও যখীরা কিতাব প্রণেতাদ্বয় বহু স্থানে বলেছেন, এ মাসআলা আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান (র.) বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় রেওয়ায়িত যাহির রেওয়ায়িতের বিপরীত নয়। কারণ ঐ একই মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। অতএব যাহির রিওয়ায়েতের কিতাবে না থাকলেও তা তার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে এ কথা যুক্তিগ্রাহ্য।[২]

أَمَالِى (আমালী)

আমালী 'ইমলা' শব্দের বহুবচন। ইমলা অর্থ লেখা। কোন আলিম আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান নিজে না লিখে যদি ছাত্রদের সম্মুখে বিভিন্ন মজলিসে তা বর্ণনা করেন এবং তারা তা লিখে কিতাব আকারে প্রকাশ করে তবে তাকে 'আমালী' বলা হয়। আল্লামা শামী (র.) বলেন, সালাফের অভ্যাস সাধারণত এ রূপই ছিল।[৩]

جَازَ-يَجُوْزُ (জাযা – ইয়াজূযু)

জায়িয শব্দটি বিভিন্ন রূপান্তর সহকারে ফিকহের কিতাবে ব্যবহার করত শরয়ী দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয় এমন কথাকে বুঝান হয়। অতএব, জায়িয শব্দটি মুবাহ্, মাকরূহ, মুস্তাহাব ও ওয়াজিবকে অন্তর্ভূক্ত করে থাকে।[৪]

'উমদাতুর রিয়ায়াহ' কিতাবের মুকাদ্দামায় (ভূমিকায়) লিখিত আছে, 'ইয়াজূযু' শব্দ ইয়াসিহ্হু শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমাম নববী (র.) লিখিত 'শারহুল মুহায্যাব' গ্রন্থে রয়েছে কখনও কখনও তা ইয়াহিল্লু অর্থাৎ 'হালাল হয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণেই মাকরূহ নামাযের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামকে 'جَازَ ذَالِكَ' এটি জায়িয, 'صَحَّ ذَالِكَ' এটি সহীহ্ এমন কথা ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাঁরা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র বাতিলের বিপরীত সহীহ্ বা সঠিক হওয়া বুঝিয়ে থাকেন। মুবাহ বা মাকরূহ নয় এমন কথা বুঝান

১. মুকাদ্দামাতু হিদায়া, ৪ পৃষ্ঠা ; মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ৯ পৃষ্ঠা। ২. শারহু উকূদি রাসমিল মুফ্‌তী,১১ পৃষ্ঠা। ৩. মুকাদ্দামাতু হিদায়া, ৪ পৃষ্ঠা। ৪. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে না। এ কারণে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার ও টীকা লেখক 'جَازَ' ও 'صح' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'جَازَ مع الكراهة' মাকরূহের সাথে জায়িয। صح مع الكراهة মাকরূহের সাথে সহীহ্। 'মুনিয়াতুল মুসাল্লী' কিতাবের ব্যাখ্যা 'হিলয়াতুল মুহাল্লীর' লেখক বলেন, ফিক্‌হের কিতাবে জায়িয শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং তা দ্বারা শরয়ী দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয় এ কথা বুঝানো হয়। এ কারণে জায়িয শব্দটি মুবাহ্ মুস্তাহাব, মাকরূহ ও ওয়াজিবকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।[১]

قَالَ (ক্বালা)

হিদায়া কিতাবে 'قال' (তিনি বলেন) শব্দের ব্যবহার অধিক দেখা যায়। 'গায়াতুল বয়ান' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হিদায়া প্রণেতা যখন 'قَالَ' শব্দ উল্লেখ করেন তখন তা দ্বারা তিনি বুঝিয়ে থাকেন যে, মাস'আলাটি জামি' সাগীর, কুদূরী অথবা বিদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে। কাযী মাহমুদুল আইনী (র.) বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে হিদায়া কিতাব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামি' সাগীর এবং আবুল হাসান (র.)-এর কুদূরীর ব্যাখ্যা। মিফতাহুস সা'আদাত কিতাবে রয়েছে, 'قال' শব্দটি এমন সব মাসআলার শুরুতে উল্লেখ করা হয় যা কুদূরী, জামি' সাগীর অথবা বিদায়ায় উল্লেখিত হয়েছে। যদি তা বর্ণিত তিনটি কিতাবে উল্লেখ না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে 'قال' শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

يُقَالُ ও قِيلَ

ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন স্থানে 'قيل' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। ব্যাখ্যাকার ও টীকা লেখকগণ সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তা দ্বারা লেখক মাসআলাটির দুর্বলতার কথা বুঝাতে চেয়েছেন। 'উমদাতুর রি'য়ায়াহ' প্রণেতা বলেন, সঠিক কথা এই যে, যদি তাঁর লেখক সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি এহেন শব্দ ব্যবহার করে এর দ্বারা দুর্বল হুকুম বুঝিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে মাসআলাটি সম্পর্কে দুর্বলতার হুকুম দেওয়া যাবে। যেমন মুলতাকাল আবহুরের প্রণেতা এরূপ করে থাকেন বলে জানা যায়। কারণ তিনি স্বীয় কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন, যেখানে তিনি 'قيل' অথবা 'الأصح' শব্দ ব্যবহার করেছেন তা 'الأصح' (অধিকতর সঠিক) শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও তার বিপরীতের তুলনায় দুর্বল। যদি এরূপ স্পষ্ট জানা না যায়, সে ক্ষেত্রে 'قيل' শব্দ ব্যবহারের কারণে তা দৃঢ়তার সাথে বলা যাবে না। এ কারণেই আল্লামা শরনাবুলালী (র.) স্বীয় 'المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية' কিতাবে লিখেছেন ঃ যেখানে আমি قيل শব্দ ব্যবহার করি তা সকল ক্ষেত্রে দুর্বল হবে এমন নয়। এ কথা দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'قيل' অথবা 'يقال'. শব্দদ্বয় এমন নয় যে, তা দুর্বল বুঝানোর জন্যই তৈরী হয়েছে। অতএব এ জাতীয় শব্দ দ্বারা দুর্বল হওয়া না হওয়া লেখকের বর্ণনা রীতির

১. মুকাদ্দামাতু হিদায়া, ৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

উপরে নির্ভর করে।[১]

قَالُوا (ক্বালূ)

নিহায়া কিতাবের শেষ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে 'قَالُوا' শব্দের ব্যবহার সে সমস্ত মাসআলায় হয়ে থাকে যেখানে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। 'কিনায়া' ও 'বিনায়া' কিতাবের 'বাবু মা ইয়ূফসিদুস্ সালাত' অধ্যায়েও অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইবনুল হুমাম 'ফাতহুল ক্বাদীর'-এ রোযার অধ্যায়ে লিখেছেন, হিদায়া গ্রন্থকারের নীতি এই যে, 'قَالُوا'(ক্বালূ) শব্দের ব্যবহার দ্বারা তিনি উলামায়ে দীনের মতভেদ সহ বিষয়টির দুর্বলতার দিকে ইংগিত করেন। আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাযানী কাশ্শাফের حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ তাফসীরের হাশিয়ায় (প্রান্ত টীকায়) উক্ত মত প্রকাশ করেছেন।[২]

عَنْ فُلَانٍ ও عِنْدَ فُلَانٍ

'মিফতাহুস সা'আদাত' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, ফিক্‌হের কিতাবে যদি 'ইনদা ফোলান' (অমুকের মিতে) বলা হয়, তাহলে, তা দ্বারা তাঁর মাযহাব বুঝায় এবং যদি 'আন ফোলান" (অমুকের মতে থেকে) বলা হয় তা হলে তা দ্বারা তার থেকে বর্ণিত এমন বুঝায়। হিদায়াহ কিতাবের ব্যাখ্যাকার আইনী বলেন 'আন' শব্দ ব্যবহার হয় 'যাহির রিওয়ায়িত নয়'এ কথা বুঝাবার জন্য। ইব্‌নুল হুমাম(র.) বলেন, 'ইন্‌দা' শব্দ দ্বারা মাযহাব বুঝায়।[৩]

عِنْدَهُ ও عِنْدَهُمَا (ইনদাহু ও ইনদাহুমা

'ইন্‌দাহু' (তার মতে) শব্দের সর্বনামের মারজা (যে বিশেষ্যের পরিবর্তে সর্বনামটি ব্যবহৃত) ফুকাহায়ে কেরামের বাক্যে যেমন هذا الحكم عِنْدَهُ- هذا مَذْهَبُ এ হুকুম তার মতে -এটা তাঁর মাযহাব) উল্লেখ না থাকলে এর দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে বুঝানো হয়। অনুরূপ 'ইন্দাহুমা' (তাঁদের দু'জনের মতে) দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে বুঝানো হয়। যদি ইমাম ত্রয়ের কোন একজনের নাম উল্লেখের পর 'ইন্দাহুমা' (তাঁদের দু'জনের মতে) শব্দ উল্লেখ করা হয় তা হলে তা দ্বারা অপর দু'জন ইমামকে বুঝায়। যেমন পূর্বে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত বর্ণনা করার পর 'ইন্‌দা হুমা' বললে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে বুঝায়।[৪]

لَابَأْس (লা-বা'সা)

ফিকহ্ তত্ত্ববিদগণের পরিভাষায় 'লাবা'সা' (কোন দোষ নেই) শব্দের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বিষয়টি মুবাহ্' অথবা 'কাজটি পরিত্যাগ করা উত্তম' এ জাতীয় অর্থের জন্য হয়ে থাকে। ফাতহুল ক্বাদীরের 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে অনুরূপ লিখিত আছে। কিন্তু রাদ্দুল মুহতা-

১. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৭ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত ১৫ পৃষ্ঠা ; মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিকহ্, ৫৭৪ পৃষ্ঠা; মুকাদ্দামাতু হিদায়া, ৩ পৃষ্ঠা। ৩. মুকাদ্দামাতু হিদায়া, ৩ পৃষ্ঠা ও মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৭ পৃষ্ঠা। ৪. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

রের 'তাহারাত' (পবিত্রতা) অধ্যায়ে আছে, 'লাবা'সা' শব্দটির অধিকাংশ ব্যবহার যদিও কাজটি ত্যাগ করা উত্তম অর্থে হয়ে থাকে কিন্তু কোন কোন সময়ে তা দ্বারা মুস্তাহাবও বুঝানো হয়।[১]

يَنْبَغِى ও لَا يَنْبَغِى (ইয়ামবাগী ও লা-ইয়ামবাগী)

'ইয়ামবাগী' (উচিৎ) শব্দটি ফুকাহায়ে কিরামের পরিভাষায় মুস্তাহাব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও তাঁরা এর দ্বারা ওয়াজিবও বুঝিয়ে থাকেন। আর 'লা-ইয়ামবাগী' (অনুচিৎ) শব্দ প্রয়োগে তাঁরা খিলাফে আওলা (উত্তম নয়) বুঝিয়ে থাকেন। আবার কখনও কখনও এর দ্বারা হারাম হওয়াও বুঝিয়ে থাকেন। অতএব কোথায় কোন অর্থে তাঁরা এ শব্দ ব্যবহার করেছেন তা বুঝার জন্য বাক্যের ধারা বিশেষভাবে অনুধাবণ করতে হবে। অথবা ফুকাহায়ে কিরামের সুস্পষ্ট বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।[২]

'উমদাতুর রি'য়ায়া'র ভূমিকায় আছে,'ইয়ামবাগী' শব্দটি মুতাআখ্খিরীন উলামার পরিভাষায় অধিকাংশ সময়ে মুস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মুতাকাদ্দিমীনের পরিভাষায় তার ব্যবহার ছিল ব্যাপক। এমন কি তাঁদের পরিভাষায় তা দ্বারা ওয়াজিবও এর অন্তর্ভূক্ত হত।

'রাদ্দুল মুহতার' এবং 'আল- আশবাহ ওয়ান নাযাইর'-এর টীকায় অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।[৩]

وعَلَيه الفَتوى-وَبه يُفتى-وبه نأخذه-وعَلَيه الاعتماد-وعَليه عمل الأمة- وهُو الصحيح-وهُو الأصح-وهُوالاظهر-وهُوالأشبه- وهُو الأوجد-وهُو المختار-وبه جر المعروف-وهُو المتعارف-وبه علمائنا ٠

মাসআলা বর্ণনা শেষে মুফ্তী যদি উপরে বর্ণিত মন্তব্য সংযোগ করেন তাহলে বুঝতে হবে যে, এটাই ফাত্ওয়ার গ্রাহ্য মত। যেমন, মাসাআলা বিশ্লেষণ করে মুফ্তী বললেন, ওয়া আলাইহিল ফাত্ওয়া (এর উপরই ফাত্ওয়া দেওয়া হয়েছে)। 'ওয়া বিহি ইয়ুফ্তা' (এ মতের সাথে ফাত্ওয়া দেওয়া হয়েছে)। 'ওয়া বিহি না'খুযু (এ মতই আমরা গ্রহণ করে থাকি)। 'ওয়া আলাইহিল ই'তিমাদ' (এরই উপর আমাদের আস্থা)। 'ওয়া আলাইহি আমলুল ইয়াওম' (এ মতের উপরে আজকাল আমল রয়েছে)। অবশ্য, আল্লামা শামী (র.) বলেন, আজকাল বলতে কোন নির্দিষ্ট সময় বুঝায় না। 'ওয়া আলাইহি আমলুল উম্মাহ্' (এর উপরই উম্মাতের আমল চলছে)। 'ওয়া হুয়াস্ সাহীহ্' (এটাই সঠিক মত)। 'ওয়া হুয়াল আসাহ্হু' (এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ মত)। 'ওয়া হুয়াল আযহারু' (এটাই অধিকতর প্রকাশ্য) 'ওয়া হুয়াল আসবাহু' বায্যাযিয়া কিতাবে এর অর্থে বলা হয়েছে, রিওয়ায়িতের দিক দিয়ে 'নস্' দ্বারা প্রমাণিত রায়ের

১. প্রাগুক্ত,১৫ পৃষ্ঠা ও মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিক্হ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা। ২. মাজমুয়াতু কাওয়াইদুল ফিক্হ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা।
৩. মুকাদ্দামাতু উমদাতির রিয়ায়াহ, ১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

অধিকারী সামঞ্জস্যপূর্ণ ও জ্ঞানবোধের বিচারে অধিকতর প্রাধান্যের অধিকারী। অতএব এরই উপরে ফাত্ওয়া। 'ওয়া হুয়াল আওজাহ্' (এটাই দলীলের দিক দিয়ে অধিকতর স্পষ্ট) 'ওয়া হুয়াল মুখ্তার' (এটাই গ্রহণীয় মত) 'ওয়া বিহি জারাল উরফু' (এ মতের উপরে সাধারণভাবে ব্যবহার চলেছে)। 'ওয়া হুয়াল মুতা'আরাফু' (এটাই প্রসিদ্ধ)। 'ওয়া বিহি আখাযা উলামাউনা' (এ মত গ্রহণ করেছেন আমাদের মাযহাবের উলামায়ে কিরাম)।[১]

أحوط ও إحتياط (আহ্ওয়াত ও ইহ্তিয়াত)

ফকীহ্গণ দু'টি দলীলের মধ্যে শক্তিশালী দলীলের উপরে আমল করাকে 'ইহ্তিয়াত' বলেন। 'আহ্ওয়াত' শব্দটি যেহেতু তুলনামূলক আধিক্যবোধক, অতএব ফুকাহায়ে কিরাম 'ইহ্তিয়াত' অপেক্ষা অধিকতর পালনীয় বুঝাবার জন্য 'আহ্ওয়াত' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন।[২]

صحيح ও أصح (সাহীহ্ ও আসাহ্হু)

'صحيح' সহীহ্ (বিশুদ্ধ) ও 'اصح' আসাহ্হু (বিশুদ্ধতম) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার ফিকহী পরিভাষায় পার্থক্যের দাবীদার। 'আসাহ্হু' শব্দের ব্যবহার সহীহ্ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ববহ বুঝাবার জন্য হয়ে থাকে। কারণ সহীহ্ কথাটি যঈফের বিপরীত বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে 'আসাহ্হু' শব্দের ব্যবহার যঈফের বিপরীত হওয়ায় সর্বাবস্থায় 'আসাহ্হু' শব্দটি অধিকতর গুরুত্বের অধিকারী বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় একথা বলা সংগত নয়। কিন্তু একই রিওয়ায়িতের শেষে পরস্পর বিরোধীভাবে উল্লেখিত শব্দদ্বয়ের ব্যবহার না হয়ে কেবলমাত্র এককভাবে কোন রিওয়ায়িতের শেষে 'আসাহ্' শব্দের ব্যবহার হলে বুঝতে হয় যে, বিপরীত রিওয়ায়াতটিও সহীহ্। অতএব যে কোনটি অনুসারে মুফ্তী রায় দিতে পারেন।

অবশ্য যদি এমন শব্দ ব্যবহৃত হয় যা রিওয়ায়িতটির সিহ্হাত বা সঠিকতা তারই মধ্যে সীমিত করে, তা হলে সে রিওয়ায়িতই গ্রহণযোগ্য। যেমন রিওয়ায়িতের শেষে সংযুক্ত হল, 'সহীহ্,' 'আ'মালুযূ বিহী' 'বিহি ইউফ্তা' 'আলাইহিল ফাত্ওয়া', এরূপ ক্ষেত্রে মুফ্তী তার বিপরীত ফাত্ওয়া দিবেন না। কিন্তু হিদায়া কিতাবের গ্রন্থকার যদি 'ওয়া হুয়াস সাহীহু' (এটাই সঠিক) বলে মন্তব্য করেন এবং আল্লামা নাসাফির 'কাফী' কিতাবে তার বিপরীত রিওয়ায়িতের শেষে 'ওয়া হুয়াস্ সাহীহু' মন্তব্য সংযুক্ত হয় তা হলে মুফ্তীর নিকটে যেটি অধিকতর শক্তিশালী, যুগোপযোগী এবং বাঞ্ছনীয় মনে হবে সে অনুপাতে রায় দিবেন।[৩]

به يؤخذ-المأخوذ به- أوفق-أولى-أرفق

আল্লামা ইব্ন আবেদীন (শামী) (র.) বলেন, আমি 'রিসালায়ে আদাবুল মুফ্তীতে' দেখেছি, লেখক বলেন যে, যখন কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে আসাহ্,আওলা, আওফাকু, অথবা

১. রাদদুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত ৫২ পৃষ্ঠা। ৩. রাদদুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা ও শারহু উকূদি রাসমিল মুফ্তী, ১১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

অনুরূপ শব্দ কোন রিওয়ায়িতের সাথে সংশ্লিষ্ট দেখবেন, তখন মুফ্তী ঐ রেওয়ায়িতের ভিত্তিতে অথবা তাঁর বিপরীতের ভিত্তিতে ফাত্ওয়া দিতে পারেন। কিন্তু আস সাহীহু-আল-মা'সখাযু বিহী, বিহী-ইউখাযু, আলাইহিল ফাত্ওয়া সংশ্লিষ্ট হলে তার বিপরীতের সাথে ফাতাওয়া দেওয়া বৈধ হবে না।[১]

عَلَى الْمَذْهَبِ- مَذْهَبِ السَّلَفِ (আলাল মাযহাব ও মাযহাবুস্ সালাফ)

ফুকাহায়ে কিরাম কখনও কখনও রায় দানকালে বলে থাকেন, 'আলাল মাযহাব', এ জাতীয় উক্তি দ্বারা তাঁরা যাহির রিওয়ায়েত বুঝিয়ে থাকেন। এবং 'মাযহিবুস সালাফ' দ্বারা মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহায়ে কিরামকে বুঝিয়ে থাকেন।[২]

دَلاَلَةٌ -دَلِيل- مَدلُول (দালালাত, দালীল ও মাদলূল)

উসূলবিদগণের পরিভাষায়, তাকে 'দলীল' বলা হয় যার প্রতি সঠিক নযর করলে কাংখিত বিষয় অর্জন করা যায়। যেমন, যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। এক কথার উপরে দলীল আল্লাহ্র কালাম 'আ'তুয্ যাকাতা' (তোমরা যাকাত দাও)। কারণ এতে সঠিক নযর করলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কাংখিত হুকমটি পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে 'আমর' (আদেশ) সূচক শব্দ বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ করে। অতএব, 'আ'তুয্ যাকাত' শব্দটি এখানে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল এবং কাংখিত হুকুম অর্থাৎ ওয়াজিবকে 'মাদলূল' বলা হবে। আর দলীল ও মাদলূলের মধ্যকার সম্পর্ককে 'দালালত' বলা হবে।[৩]

اُلدليل اُلعقلى- اُلدليل اُلسمعى
(আদ্ দালীলুল আক্লী ও আদ-দালীলুস্ সামঈ)

দলীল দু'প্রকার ১. সামঈ ২. আকলী। দলীলে সামঈ এমন দলীলকে বলা হয় যা কুরআনে কারীম, সুন্নাতে রাসূল, ইজমা ও সালাফ থেকে শুনে জানা যায়। আর আক্লের (জ্ঞানবোধের সাহায্যে) গ্রহণ করে যে দলীল উপস্থাপন করা হয় তাকে দলীলে 'আক্লী' বলে।[৪]

رَاجِح - مَرجُوح (রাজিহ্ ও মারজুহ্)

মুজতাহিদের নিকট দলীলের ভিত্তিতে যে মত অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য তাকে 'রাজিহ্' বলা হয় এবং এর বিপরীত মতকে 'মারজূহ্' বলা হয়।

نص (নস্)

উসূলীদের পরিভাষায় 'নস্' এমন কথাকে বলা হয় যা শব্দগত প্রকাশ্য অর্থ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে থাকে। তার স্পষ্টতা শব্দের কারণে নয় বরং কথাটি যে জন্য বলা হয়েছে

১. রাদদুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা। ২. মাজমুয়াতু কাওয়াইদিল ফিকহ্, ৫৭৩ পৃষ্ঠা। ৩. তাসহিলুল উসূল,১২ পৃষ্ঠা।
৪. মাজমুয়া কাওয়াইদুল ফিকহ্.৪৯৮পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তা উল্লেখ থাকার কারণে হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী,

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং রিবা (সুদ) কে হারাম করেছেন।

এ হলো, উক্ত আয়াতের যাহির (প্রকাশ্য) অর্থ। তবে যেহেতু কাফির সম্প্রদায় ক্রয়-বিক্রয় এবং রিবা (সুদ) কে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করত, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের এই মত খণ্ডন করে, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য এ আয়াত নাযীল করেছেন। এ পার্থক্য বুঝানোই হলো এ আয়াতের 'নস্‌'। কারো কারো মতে নস্‌, এমন কথাকে বলা হয় যে স্বীয় অর্থ বুঝাতে কাত্‌ঈ (নিশ্চিত) হয়। কখনও কখনও 'নস্‌' বলে এমন শব্দকে বুঝানো হয় যার অর্থ জানা আছে। শব্দটি যাহির, মুফাস্‌সার, খাফী, খাস্‌, 'আম, সারীহ্‌, কিনায়া, যে প্রকারের হোক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[১]

إجماع (ইজ্‌মা)

আভিধানিক অর্থে কোন বিষয়ের ঐক্যমত পোষণ করাকে ইজ্‌মা বলে। শরী'আতের পরিভাষায় উম্মাতে মুহাম্মদীর সৎকর্মশীল মুজতাহিদীগণের কোন সময়ে কোন কথা বা কাজে ঐক্যমত পোষণ করাকে ইজ্‌মা বলে।[২]

ইজ্‌মা দু'প্রকার। 'আযীমাত ও রুখ্‌সাত। মুজতাহিদগণের কোন বিষয়ে বা কাজে সকলের ঐক্যমতের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেলে তাকে 'আযীমাত' বলা হয়। মুজতাহিদগণের কেউ কেউ কোন বিষয়ে বা কাজে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার পরে যখন অন্যান্য মুজতাহিদগণ বিষয়টি জানা সত্ত্বেও নিরবতা অবলম্বন করেন। এভাবে এরূপ নিরবতা দ্বারা ঐক্যমত সূচিত হলে তাকে 'ইজমায়ে রুখ্‌সাত' বলে।[৩]

قياس (ক্বিয়াস)

'ক্বিয়াস' শব্দটি আভিধানিক অর্থে তুলনা করা। পারিভাষিক অর্থে, মূল হুকুমের ইল্লাত (কারণ) অন্য কোন বিষয়ে বিদ্যমান থাকলে উক্ত মূল হুকুম এতে জারি করাকে 'ক্বিয়াস' বলে। উল্লেখ্য পরিভাষায় যে বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয় তাকে আসল (মূল) এবং যে বিষয়কে তুলনা করা হয় তাকে 'ফারা' (শাখা) বলা হয়।[৪]

إستحسان (ইস্‌তিহ্‌সান)

আভিধানিক অর্থে ইসতিহ্‌সান বলা হয় কোন কিছুকে ভাল মনে করা। আর উসূলে ফিকহ্‌ এর পরিভাষায় 'ইসতিহ্‌সান' শব্দটি এমন দলীলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা কিয়াসে জলীর মুকাবিলায় আসে। ইসতিহ্‌সান প্রতিষ্ঠিত হয় হাদীস, ইজ্‌মা, যরূরত, (প্রয়োজনীয়তা) অথবা কিয়াসে খাফীর মাধ্যমে। এ সব ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মতে ক্বিয়াসে জলী বাদ দেওয়া

১. নূরুল আনওয়ার, ২২৪ পৃষ্ঠা। ২. তাসহিলুল উসূল, ১৯ পৃষ্ঠা। ৩. নূরুল আনওয়ার ৪. উসূলে বযদুবী, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

পসন্দনীয়, তাই একে 'ইসতিহ্সান' বলা হয়। উসূলের কিতাবে এ কথা সাধারণভাবে প্রচলিত যে, যখন 'ইসতিহ্সান' শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন তা দিয়ে 'কিয়াসে খফী' বুঝায়। যেমন ক্বিয়াস কথাটি বললেই 'ক্বিয়াস জলী' বুঝায়।[১]

إِجْتِهَاد ও مُجْتَهِد (ইসতিহাদ ও মুজতাহিদ)

আভিধানিক অর্থে ইজতিহাদ অর্থ চেষ্টা-সাধনা করা। পরিভাষায় কোন ফকীহ্ আলিমের কোন শরয়ী হুকুম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য শক্তি নিয়োগ করাকে 'ইজতিহাদ' বলে। শরয়ী হুকুম সম্পর্কে প্রাধান্যযুক্ত ধারণা লাভের মানসে সর্বশক্তি পরিচালনাকারীকে 'মুজতাহিদ' বলে।[২]

'তাসহীলুল উসূল' কিতাবে আছে, ইজতিহাদ শব্দটি 'জাহদ' শব্দ থেকে নির্গত। আর 'জাহদ' অর্থ কঠোর পরিশ্রম। অতএব, অত্যন্ত কঠিন কাজে কঠোর পরিশ্রম করাকে 'ইজতিহাদ বলে'। পরিভাষায় শরয়ী দলীল দ্বারা শরয়ী আহ্কাম ইসতিখ্রাজ্-উদ্ঘাটন করার মানসে কঠোর পরিশ্রম করাকে 'ইজতিহাদ' বলে।[৩]

নূরুল আনওয়ার কিতাবের টিকায় আছে, শরয়ী নযরী (এমন শরয়ী হুকুম যা যুক্তি অবতারণার মাধ্যমে জানা যায়) হুকুম ইসতিখরাজ (বের করা) করতে ফকীহের আপন শক্তি এমনভাবে ব্যয় করাকে ইজতিহাদ বলে যা অপেক্ষা অধিক শক্তি ব্যয় করতে নিজের মধ্যে অক্ষমতা অনুভব করেন।[৪]

عُرف (উরফ)

জ্ঞানের দাবীর প্রেক্ষিতে যে বিষয়ের উপর মানুষের অন্তর স্থির হয় এবং সঠিক স্বভাব তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে থাকে তাকে 'উরফ্' বলে। উরফ দু'প্রকার। ১. 'উরফে কাওলী' (عُرف قولي) যে বিষয়ের উপরে কোন শব্দের ব্যবহার মানুষের নিকট সুপরিচিত এমন ব্যবহৃত শব্দকে 'উরফে কাওলী' বলে। ২. উরফে শরয়ী (عُرف شرعي) শরী'আতের ধারক ও বাহকগণ কোন শব্দ হতে যা বুঝে থাকেন এবং তাকে আহ্কামের ভিত্তি স্থির করে থাকেন তাকে উরফে শরয়ী বলা হয়।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত,৩৫২ পৃষ্ঠা। ২. মাজমুয়া কাওয়াইদুল ফিকহ্ ১৬০পৃষ্ঠা। ৩ তাসহিলুল উসূল, ৩১৮ পৃষ্ঠা।
৪. নূরুল আনওয়ার, ২৪৬ পৃষ্ঠা। ৫. شرح عقود رسم المفتي

www.pathagar.com

৪

বিপথগামী ফির্‌কাসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর যমানার পর যারা তাঁর তরীকা, সাহাবায়ে কিরাম ও উম্মাতে মুসলিমার আকীদা বিশ্বাসের বিরোধীতা করে মুসলিম জামা'আত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারাই বিপথগামী হিসেবে গন্য।

নিম্নে এই বিপথগামী ফিরকা সমুহের প্রধান প্রধান কয়েকটি দলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

খারিজী (خَارِجِى)

খারিজীরা ইসলামের সর্বপ্রথম বিপথগামী সম্প্রদায়। আকীদা, আমল ও খিলাফত সম্পর্কে অযৌক্তিক বিতর্ক সৃষ্টি করে তারা নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহ্ থেকে আলাদা করে ফেলে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা প্রধান যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল পুনপুন বিদ্রোহ করে সাময়িকভাবে খিলাফতে রাশিদার শেষ দু'বছর এবং উমাইয়া আমলে মুসলিম রাষ্ট্রের পূর্বাংশে অশান্তি সৃষ্টি করে ; হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে আব্বাসীগণকে যুদ্ধে পরক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।[১] 'আল-মিলাল ওয়ান্ নাহল' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে -

كل من خرج على الإمام الحق الذى إنفقت الجمَاعة عَليه يمسمى خَارجيًا سواء كان الخروج أيام الصحَابة على الائمة الرَّاشدين أو كان بعدهم على التَّابعين بإحسان والأئمة فى كل زمَان .

খারিজী ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের বলা হয় যারা এমন নিয়মতান্ত্রিক ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় ; যার ইমামতের আনুগত্যের প্রতি মুসলিম জনগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাই এ বিদ্রোহ সাহাবায়ে কিরামের যামানার আইম্মায়ে রাশিদীনের বিরুদ্ধে হোক কিম্বা তাবিঈনের সময়কার মুসলিম জনগণ স্বীকৃত ইমামগণের বিরুদ্ধে হোক অথবা পরবর্তী যুগের প্রতিষ্ঠিত ইমামগণের বিরুদ্ধে হোক। সকলেই

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৩৮৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

খারিজীদের অন্তর্ভূক্ত।[১]

খারিজী শব্দটির অর্থ হল দলত্যাগী। মুসলিম জামা'আতকে পরিত্যাগ করায় খারিজীরা উক্ত নামে অভিহিত হয়।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় ৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর মধ্যে সিফ্‌ফীন নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে হযরত মু'আবিয়া (রা.) নিশ্চিত পরাজয় অনুধাবণ করেন। ফলে তাঁর দলের কতক লোক কুরআন শরীফ উর্ধ্বে উত্তোলণ করে হযরত আলী (রা.) -এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেন। হযরত আলী (রা.) ও তাঁর অধিকাংশ সংগী সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন এবং দু'দল থেকে এতে দু'জন সালিশ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু হযরত আলীর (রা.) একদল সমর্থক এ সালিশী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও ফয়সালা চলবে না; এ আওয়াজ তুলে তাঁর দল পরিত্যাগ করে। এ দলত্যাগী খারিজীরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাবকে তাদের দলপতি নির্বাচন্ করে, তার নেতৃত্বে নাহ্‌রাওয়ান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। পরে খারিজীরা বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে হযরত আলী (রা.) -এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকে। হযরত আলী (রা.) এ সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। নাহ্‌রাওয়ানে সংঘটিত যুদ্ধে খারিজীদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব সহ বহু সংখ্যক খারিজী নিহত হয়। এতে খারিজীরা অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত আলী (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.) ও তাঁর উপদেষ্টা মিসরের শাসনকর্তা আমর ইব্ন আস (রা.) -কে ইসলামের শত্রু হিসেবে স্থির করে এ তিনজনকে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। হযরত মু'আবিয়া ও হযরত আমর ইব্ন আস (রা.) কোনক্রমে বেঁচে যান। কিন্তু হযরত আলী (রা.) আততায়ী আবদুর রহমান ইব্ন মুলযিমের হাতে শহীদ হন। হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর খারিজীরা নীরবে বসে থাকেনি। উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে প্রচারণা চালাতে থাকে এবং আব্বাসীয়দের সহিত যোগাযোগ করে উমাইয়াদের পতন ত্বরান্বিত করে। আববাসীয় শাসকগণ যখন মসনদে সমাসীন হন। তখন খারিজীরা তাঁদেরও বিরোধিতা শুরু করে। এবং মেসোপটেমিয়া পূর্ব আরব ও উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগে অশান্তির সৃষ্টি করে। অবশেষে মিশরের ফাতেমী শাসকগণ খারিজীদের শক্তি সমূলে ধ্বংস করে দেন। ফলে রাজনৈতিক প্রচারণা বর্জন করে তারা শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনায় খারিজীদেরকে হারুরিয়াহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা খারিজীরা হযরত আলী (রা.) -এর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছিল হারুরা নামক স্থানে। তাই খারিজীরা 'হারুরিয়া' নামেও অভিহিত।

---

১. الملل النحل, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪

www.pathagar.com

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه وذكر الحرورية فقال قال النبى صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) হারুরিয়াদের সম্পর্কে বর্ণনা প্রসংগে বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।[১]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী (রা.) -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর আনুগত্য থেকে যারা বেরিয়ে পড়ে তাদেরকেই প্রথমত খারিজী নামে অভিহিত করা হয়।

খারিজীদের আকীদা ও মতবাদসমূহ

১. যারা মুসলমান হওয়ার দাবীদার হয়ে অন্য মুসলামনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধরত হতে যারা বের হয়ে না আসে তারা কাফির।

২. খারিজীরা তাদের ধারনায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের মতে খলীফাকে অবশ্যই সমগ্র মুসলিমগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। কোন বিশেষ শেণী গোত্র কিংবা সম্প্রদায়ের মধ্যে খিলাফত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে যে কোন মুসলমান এ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে।

৩. তারা হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কে ইসলামের বৈধ খলীফা বলে মনে করে এবং অন্যান্য খলীফাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে।

৪. কবীরা গুনাহ খারিজীদের নিকট কুফরীর শামিল। কোন মুসলমান নামায, রোযা ও অন্যান্য ফরয কাজসমূহ পালন না করলে কিংবা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে সে কাফির হয়ে যায়।

৫. তাদের মতে যে মুসলমান কবীরা গুনাহ্ করে এবং তাওবা না করে মারা যায় সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

৬. খারিজীদের মতে যারা তাদের আকীদার সংগে একমত নয়, তারা ধর্মদ্রোহী তথা কাফির। এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য।

৭. যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ না করে সে কাফির।

৮. খারিজী সম্প্রদায় আরও বিভিন্ন বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের বিপরীত

---

১. বুখারী শরীফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৬৪৫১।

www.pathagar.com

আকীদা পোষণ করে যেমন তারা 'মোহসিন' (বিবাহিত) যিনাকারীকে রজম করার শাস্তি অস্বীকার করে। চুরির অপরাধে বাহুর গোড়া পর্যন্ত হাত কাটার শাস্তি নির্ধারন করে। মহিলাদের মাসিক হায়িয অবস্থায়ও তার জিনাযায় নামায পড়া ওয়াজিব বলে মনে করে ইত্যাদি। ক্বাযী আবূ বকর ইব্ন আরবী (র.) খারিজীকে আকীদা প্রসংগে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, এ পর্যায়ে তাঁরা দু'দলে বিভক্ত।

প্রথম দল ঃ এ দলের মতে হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) এবং জামাল ও সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ আর তাহ্কীম বা সালিশ প্রশ্নে যাঁরা সম্মতি প্রকাশ করেছেন তাঁরা সকলেই কাফির।

দ্বিতীয় দল ঃ এ দলের মতে কোন মুসলিম যদি কবীরা গুনাহ্ করে তবে সে কাফির তথা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী।

খারিজীদের সম্পর্কে কী হুকুম দেওয়া হবে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবে দু' প্রকারের মত পাওয়া যায়। প্রথমত ঃ খারিজীরা মুরতাদ। দ্বিতীয়ত ঃ খারিজীরা বিদ্রোহী।[১]

খারিজী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপদল

কালক্রমে খারিজীরা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নে এদের কতকগুলো দল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

এক ঃ আল-আযারিকা সম্প্রদায় (الأزارقة)

এ সম্প্রদায় খারিজীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোড়া ও আপোসহীন।

নাফি' ইব্ন আযরাক (نافع بن الأزرق) এ দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাই তার নামানুসারে এদের নাম করণ করা হয়েছে। আযারিকাদের মতে আরা ব্যতীত অন্যান্য মুসলমান কাফির বা বিদ্রোহী। তাদের প্রতি কোনরূপ করুণা প্রদর্শন করা যাবে না। বরং তাদেরকে হত্যা করাই বিধেয়। যারা অন্যায় বা পাপ কাজ করে তাঁরা ইসলামের থেকে বহির্ভূত। খারিজীরা পবিত্র কুরআনের আক্ষরিক অর্থগ্রহণ করে। ইজতিহাদের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না।[২]

আযারিকা সম্প্রদায়ের আকীদা

খারিজী সম্প্রদায়ের সাধারণ আকীদা ছাড়াও আযারিকা সম্প্রদায়ের আরো কিছু আকীদা রয়েছে নিম্নে তা বর্ণনা করা হল ঃ

১. এ সম্প্রদায় তাদের মুখালিফদেরকে কেবলমাত্র ইসলাম থেকে বহির্ভূত বলে মনে করেই ক্ষান্ত হয় নি। বরং তাদেরকে মুশরিক তথা চির জাহান্নামী বলে আকীদা পোষণ করে এবং এদের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য মনে করে।

১. الملل و النحل, ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা। নাইনুল আওতার, ৭ম খণ্ড, ৩৪১-৪২ পৃষ্ঠা। ২. الملل والنحل, ১২১-২২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২. খারিজীদের আবাসভূমি ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানদের দেশকে তারা দারুল হারব বলে মনে করে।

৩. খারিজী ব্যতীত মুসলমানদের সন্তান মুশরিক এবং চির জাহান্নামী।

৪. এরা যিনাকারীর শাস্তি রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা স্বীকার করে না। কেননা তাদের মতে এ হুকুমের উল্লেখ পবিত্র কুরআনে নেই। কুরআন মজীদে যিনাকারীকে চাবুক মারার কথা উল্লেখ রয়েছে। এদের মতে রজমের হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়।

৫. তাদের মতে পুরুষের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর প্রতি কোন প্রকার হদ্ বা শাস্তির বিধান নেই। তবে নিষ্কলংক মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দে কযফ (মিথ্যা অপবাদের শাস্তি) কার্যকর হবে। এ পর্যায়ে আল-কুরআনে কেবলমাত্র মহিলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. তাদের মতে সাগীরা এবং কবীরা গুনাহ আম্বিয়া কিরাম থেকেও প্রকাশ পেতে পারে। তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম দ্বারা কুফরী কাজ সংঘটিত হলে তাঁরা তাওবা করে নেন। এ মতবাদটি তারা পবিত্র কুরআনের নিম্ন আয়াত থেকে গ্রহণ করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ

যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটি সমূহ মার্জনা করেন (৪৮ ঃ ২)।

৭. এদের কাছে তাক্বইয়া নীতি বিশেষ কারণে কোন প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখা বৈধ নয়।

দুই ঃ নাজদিয়া সম্প্রদায় (اَلنَّجدات)

এরা নাজদা ইব্ন আমের হান্ফী (نجده بن عامر الحنفى) এর অনুসারী এ দল কতিপয় মাসআলার ব্যাপারে আযরিকা সম্প্রদায় হতে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। যেমন,

১. তাঁরা তাদের আকীদা বিরোধী অন্যান্য মুসলমানদের সন্তানাদি হত্যা করা বৈধ মনে করে না।

২. যিম্মী এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা বৈধ বলে মনে করে।

৩. তাদের মতে ইমাম নির্দ্ধারনের ব্যাপার কোন জরুরী বিষয় নয় বরং তা অবস্থার প্রেক্ষাপটে জরুরী হয়ে থাকে। যদি মুসলমানগণ কোন ইমাম নির্দ্ধারন, ব্যতিরেকেই ইসলাম প্রচার ও দীনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় তবে ইমাম নির্দ্ধারনের, কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁরা মনে করে না।

এ সম্প্রদায়ের লোক ইয়ামামা নামক স্থানে বসবাস করত। প্রথমে এ জামা'আতের নেতা ছিলো তালূত খারিজী। পরবর্তীতে ৬৬ হিজরীতে নাজিদা -এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

তার সাথীরা ৬৯ হিজরীতে তাকে হত্যা করে।[১]

তিন ঃ সুফ্রিয়া সম্প্রদায় (الفرقة الصفرية)

এরা যিয়াত ইব্ন আসফার (زياد بن الاصفر) এর অনুসারী। এ সম্প্রদায়ের লোক আযারিকা থেকে উদার হলেও অন্যান্য সম্প্রদায় হতে কঠোর। এরা কবীরা গুনাহ কারীকে মুশ্রিক বলে মনে করে না। তাদের মধ্যে কারো কারো ধারনা এই যে কুরআন কারীমে যাদের সম্পর্কে হদ্ বা শাস্তির উল্লেখ রয়েছে; তারা সে নামেই অবহিত হবে। যেমন (سارق) চোর (زانى) ব্যভিচারী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে গুনাহ সমূহের কারণে শরীআতে হদ নির্ধারণ করা হয়নি উক্ত গুনাহকারী কাফির বলে বিবেচিত হবে।

কিছু সংখ্যাক সুফরিয়ার ধারনা এই যে, হাকীম যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে শাস্তির হুকুম না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফির বলা যায় না।

চার ঃ আজ্জারিদা সম্প্রদায়

এ সম্প্রদায়ের লোক আবদুল করীম ইব্ন আজরাদ -এর অনুসারী। যিনি আতীয়াহ্ ইব্ন আসওয়াদ হান্ফীর শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন। ধ্যান-ধারনার ক্ষেত্রে এরা নাজ্দা সম্প্রদায়ের অতি নিকটবর্তী।

পাঁচ ঃ ইবাদিয়া সম্প্রদায়

এরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবাদের অনুসারী। খারিজীদের মধ্যে ইবাদিয়া সম্প্রদাই মধ্যমপন্থী। ধ্যান-ধারনায় এরা অন্যান্য মুসলিমের অতি নিকটবর্তী। ইবাদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মূল্যবান ফিকহ্ গ্রন্থ সম্পাদন করেছিলেন । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলিমও ছিলেন। ইবাদিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা।

১. খারিজী ছাড়া অন্যান্য মুসলমান মু'মিনও নয় এবং মুশ্রিকও নয়। তবে নিয়ামত অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে কাফির বলা যেতে পারে।

২. মুসলমানের খুন প্রবাহিত করা হারাম, তাদের দেশ 'দারুত্ তাওহীদ' হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. তাদের (মুসলমানদের) দেশ জয় করার পর যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধে কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় জিনিস গনীমতের মাল হিসাবে গন্য হবে। তবে সোনা এবং রূপার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয় বরং তা এর মালীকের নিটক ফেরত দিতে হবে।

৪. মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং বিরাসাতের সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে।[২]

---

১. اسلامى مذاهب,১০৩-৪ পৃষ্ঠা। ২. اسلامى مذاهب,১০৫-৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

শী'আ (الشيعة)

'শী'আ' শব্দের অভিধানিক অর্থ হল, সহচর অনুসারী, সাহায্যকারী, শিষ্য ইত্যাদি। প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মশাস্ত্রবিদ -এর মতে হযরত আলী (রা.) ও তাঁর পুত্র-পৌত্রদের অনুসারীগণ শী'আ সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত।

قال ابن المنظور الأفريقي : الشيعة القوم الذين يجتمعون على أمر و كل قوم اجتمعوا على أمر الشيعة وقد غلب هذا الإسم على من يتولى عَلِيًا وأهل بيته .

ইব্‌ন মানযূর আফ্রিকী বলেন, শী'আ এমন একটি সম্প্রদায় যারা কোন এক ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করে। আর এ নামটি প্রধান্য পেয়েছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা হযরত আলী ও আহলে বাইত এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে।[১]

وقد قال المغنية : الشيعة من أحب عَلِيًّا و تا بو أو من أحب و والاه .

আল্লামা মুগানীয়া বলেন শী'আ ঐ ব্যক্তি যে হযরত আলী (রা.)-কে মহব্বত করে এবং তাঁর অনুসরণ করে অথবা যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে এবং মুরব্বি মনে করে।[২]

শী'আ মুসলমানদের রাজনৈতিক দল সমূহের একটি অতি প্রাচীন দল। হযরত উসমান (রা.) -এর খিলাফতের শেষ সময় এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং হযরত আলী (রা.) -এর খিলাফতের প্রাক্কালে তা বিস্তার লাভ করে। হযরত আলী (রা.) -এর আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রতিভা দেখে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাঁর মর্তবা ও ফযীলত সবিস্তার প্রচার করতে থাকে।

উমাইয়া যুগে যখন হযরত আলী (রা.) -এর বংশধরের উপর চরম নির্যাতন চল্‌ছিল তখন আওলাদে রাসূলের প্রতি এ অবমাননা মানব জাতি প্রত্যক্ষ করে। ফলে ক্রমান্বয় শী'আ মতবাদের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে।[৩]

শী'আ মতবাদের মূল উৎস

শী'আ মূলত একটি ইসলামী দল ছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা এবং তাঁর অনুসারীরা হযরত আলী (রা.) -এর উলূহিয়্যাতের দাবীদার হয়ে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে। শী'আরা তাদের মতবাদ প্রচার কল্পে কুরআন ও হাদীস হতে দার্শনিক মতবাদ পেশ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলিমদের দৃষ্টিতে এর উৎস সেই দর্শন ও দীনি মতবাদ যা ইসলাম আবির্ভাবের

১. লিসানুল আরব, ৮ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা। ২. الشيعة فى الميزان, ১৭ পৃষ্ঠা। ৩. اسلامى مذاهب, ৫২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

পূর্বে বিরাজমান ছিল। কতিপয় পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের ধারণা এই যে, শী'আ মতবাদ ইরান ও পারস্যে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা এ কথার দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন, আরবরা ঈমান ও বিশ্বাসে ছিল স্বাধীনচেতা। পক্ষান্তরে পারস্যবাসীরা ছিল খান্দানী রাজত্ব ও হুকুমাতে বিশ্বাসী। তাদের দৃষ্টিতে খলীফা নির্বাচনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। যখন নবী করীম সা.) -এর ইন্তিকাল হয়, তখন তাঁর কোন ঔরসজাত পুত্র সন্তান ছিল না বিধায় পারস্য বাসীদের মতে তাঁর স্থলাভিসিক্ত হওয়ার একমাত্র দাবীদার ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা হযরত আলী (রা.)।

কতিপয় পাশ্চত্যবিদের ধারণা এই যে, শী'আরা পারস্য কৃষ্টি-কালচার ছাড়াও ইয়াহুদী মতবাদ হতে অধিক উপকৃত হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা হযরত আলীর (রা.) পবিত্রতার প্রথম দাবীদার। সে ছিল মূলত ইয়াহুদী।

ইমাম শা'বী শী'আদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, শী'আ সম্প্রদায় এ উম্মাতের ইয়াহুদী।[১]

চরমপন্থী শী'আ সম্প্রদায় এবং তাদের বিভিন্ন দল

চরমপন্থী শী'আ সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক হযরত আলী (রা.)– কে উলূহিয়্যাতের মনযিলে পৌছে দেয়। কেউ কেউ তাঁকে নবীও বলে মনে করে। কেউ কেউ তাকে নবী (সা.) হতেও শ্রেষ্ঠ বলে ধারনা রাখে।

চরমপন্থী শী'আরা বাড়াবাড়ীর প্রক্ষাপটে ইসলামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যায়। পরে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

নিম্নে চরম পন্থী শি'আ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি দলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল।

এক. সাবাইয়া দল

এ সম্প্রদায় আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা -এর অনুসারী। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা ছিল একজন ইয়াহুদী। হীরা প্রদেশের বাসিন্দা। সে হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর মাজলিসে শুরার ঘোর বিরোধী ছিল।

আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা মুসলিম সমাজে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের আকীদা তথা কুমন্ত্রনা বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠে। সে প্রচার করে বেড়াতে থাকে যে, প্রত্যেক নবীর 'ওসী' রয়েছে। তাই হযরত আলী (রা.) হলেন মুহম্মদে (সা.) -এর 'ওসী'। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হলেন 'শ্রেষ্ঠ নবী' আর হযরত আলী (রা.) হলেন 'শ্রেষ্ঠ ওসী'। মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় জীবিত হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ আনবেন। সে বলত, আমি ভেবে হতাশ হই যে মানুষ ঈসা

১. اسلامی مذاهب, ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

(আ.) -এর অবতরণে বিশ্বাসী অথচ মুহাম্মদ (সা.) -এর পুনরায় আগমন স্বীকার করছে না। এভাবে পর্যায়ক্রমে সে হযরত আলীর (রা.) উলূহিয়্যাত -এর দাবী তোলে। হযরত আলী (রা.) যখন এ সম্পর্কে জ্ঞাত হন, তখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) এ ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করেন এবং বলেন যে, এ মুহূর্তে যদি তাকে হত্যা করা হয় তবে আলী (রা.) -এর অনুসারীদের মধ্যে মতানৈক্য তথা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এ দলের কেউ কেউ এ আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আলী (রা.) -এর দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। তারা অন্যান্য ইমামদের ক্ষেত্রেও এরূপ আকীদা পোষণ করে থাকে।

এ দলের কেউ কেউ এ আকীদায় বিশ্বাসী যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কায়ায় হযরত আলীর দেহে অবতরণ করেন। এমন কি তারা হযরত আলী (রা.)-কে উলূহিয়্যাতের মনযিলে পৌছিয়ে দেয়।

দুই ঃ গুরাবিয়া দল (غُرابِية)

এরা শী'আ সম্প্রদায়ের একটি চরম পন্থী দল। সাবাইয়াদের ন্যায় হযরত আলী (রা.) -কে উলূহিয়্যাতের পর্যায়ে সমাসীন করে। এমন কি তারা হযরত আলী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতেও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তাঁরা এ অবস্থার দাবীর সপক্ষে অহেতুক যুক্তি পেশ করে বলে নবী মূলত হযরত আলী ছিলেন। কিন্তু হযরত জিব্রাঈল (আ.) ভুলক্রমে মুহাম্মদের কাছে ওহী নিয়ে অবতরণ করেন।

তাদের মতে হযরত আলী (রা.) নবী করীম (সা.)-এর ন্যায় ছিলেন, বিধায় এ সম্প্রদায়ের লোকদের কে গুরাবিয়া (غرابية) বলা হয়। যেমন-কাক কাকের অনুরূপ হয়ে থাকে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন হাযম (র.) স্বীয় গ্রন্থ, 'كتاب الفصل'এ ভ্রান্ত আকীদা পোষণ কারীদের কে ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে উল্লেখ করে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) -এর নবূওয়্যাত প্রাপ্তির সময় হযরত আলীর বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। এ বয়সে নবূওয়্যাত ও রিসালাতের গুরু দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। আর সাধারণত এ সময় কেউ শরী'আতের মোকাল্লাফও হয় না। তাই তাদের যুক্তি অমূলক তথা ভ্রান্ত।

অন্যদিকে হযরত আলী (রা.) যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন নবী (সা.) -এর অবয়ব তথা শেকেলে সূরাতের সাথে তাঁর কোন মিল ছিল না এবং একে অপরের থেকে শারীরিকগঠনে ভিন্নরূপ ছিলেন বলে কিতাবে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

তিনঃ কাইসানিয়া দল (كيسانية)

কাইসানিয়া 'কাইসান' এর দিকে সম্পর্ক করে এ দলের নামকরণ করা হয়েছে 'কাইসানিয়া'। কেউ কেউ বলেন যে, কাইসান ছিল হযরত আলী (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম। কারো কারো মতে 'কাইসান' ছিল হযরত আলী (রা.)-এর ছেলে মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফিয়্যার নাম।

কাইসানিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা

১. ইমাম হলেন একজন পবিত্র মানুষ। যারা তাঁর অনুসরণ করে তাঁরা তাকে ইল্‌ম ও মর্যাদায় একজন পরিপূর্ণ মানুষ বলে মনে করে। আল্লাহ্‌ তা'আলার ইল্‌মের নিদর্শন হওয়ার প্রেক্ষিতে ইমাম যাবতীয় গুনাহ্‌ থেকে মাসূম বলে তাঁরা আকীদা পোষণ করে।

২. কাইসানিয়া সম্প্রদায় সাবাইয়াদের ন্যায় ইমাম প্রত্যাবর্তনের আকীদা পোষণ করে।

৩. আল্লাহ্‌ পাকের ইল্‌ম পরিবর্তনশীল বলে তারা ধারনা রাখে।

৪. কাইসানিয়ারা 'তানাসুখে আরওয়াহ্‌' রূহ্‌ এক শরীর থেকে বের হয়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করা এ আকীদায় বিশ্বাসী। মুলত এ আকীদা হিন্দু দর্শন থেকে উদ্ভূত।

৫. কাইস্যানিয়াদের মতে প্রত্যেক বস্তুর যাহির ও বাতিন দু'টি দিক রয়েছে। নাযিলকৃত প্রতিটি আয়াতের তাফসীর ও তাবিল হয়ে থাকে।

বস্তুত রিসালাতের সাথে কাইসানিয়াদের আকীদার কোন মিল নেই। তারা আওলাদে আলী (রা.)-এর প্রশংসায় এমনিভাবে ডুবে আছে যেন নবূওয়াতের মর্যাদা থেকেও তাদেরকে উর্ধ্বে উন্নীত করেছে। তাদের কতিপয় আকীদায় দার্শনিক চিন্তাধারার সংমিশ্রণ রয়েছে।[১]

যায়দিয়া সম্প্রদায়

শী'আদের মধ্যে যায়দিয়া সম্প্রদায় আকীদার দিক দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিক নিকটবর্তী। এরা ইমামদেরকে নবূওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন করে না। তাদের মতে ইমামের মর্যাদা সাধারণ লোকের ন্যায় আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) হলেন সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তিত্ব। হযরত আলী (রা.) যাঁদের ইমামত স্বীকার করে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে অস্বীকার করে না। যায়দিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হচ্ছে যায়িদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা.)-এর অনুসারী। তাই এ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে 'যায়দিয়া' বলা হয়। এরা ইমামতের গুরু দায়িত্ব আওলাদে ফাতিমার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস রাখে। তারা অন্য কারে পক্ষে ইমামত বৈধ বলে মনে করে না।

---

১. اسلامی مذاهب, ৫৯-৬৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

যায়দিয়াগণ ইমাম নিয়োগের ব্যাপারে নির্বাচন নীতি স্বীকার করে। তাদের মতে আলীর বংশধরদের মধ্য হতে যে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনের ক্ষমতা মুসলমানদের রয়েছে। তবে বিশেষ কারণে উক্ত বংশের লোক ব্যতীত অন্য লোক ইমাম নির্বাচিত হতে পারেন। এ নীতির আলোকে তাঁরা হযরত আবূ বাকর ও হযরত উমরের পক্ষে ইমামত বৈধ বলে মনে করে।[১]

যায়দিয়াদের আকীদা

১. নবী করীম (সা.) কারো নাম নিয়ে ইমাম নির্ধারণ করে যান নি। বরং তিনি ইমামতের অত্যবশ্যকীয় গুণাবলী বর্ণনা করে গিয়েছেন।

২. এদের মতে একই সময় দু'স্থানে দু'জন ইমাম হতে পারেন। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার ইমাম হবেন।

৩. যায়দিয়াদের মতে কবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে খালেস তাওবা করে। তারা এ আকীদা মুতাযিলাদের থেকে গ্রহণ করেছে। যায়িদ মুতাযিলা সম্প্রাদয়ের প্রতি উদার ছিলেন।

কালক্রমে যায়দিয়া সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য শী'আরা এদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এমন কি যায়দিয়ারা স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে রাফেযী নামে রূপান্তরিত হয়। এ পর্যাযে তারা শায়খাইন (হযরত আবূ বাক্র ও উমর (রা.) -এর ইমামত অস্বীকার করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বুঝা যায় যে, যায়দিয়ারা দু'দলে বিভক্ত ছিল।

১. **মুতাকাদ্দিমীনঃ** যারা রাফেযী বলে গন্য হয় না এবং শায়খাইনের ইমামত অস্বীকার করে না।

২. **মুতায়াখ্খিরীনঃ** যারা ছিল রাফেযী। এরা শায়খাইনের ইমামত স্বীকার করে না। বর্তমানে যায়দিয়া সম্প্রদায় ইয়ামনে বসবাস করে। এরা মুতাকাদ্দিমীন যায়দিয়াদের আকীদার অনুসারী।[২]

ইমামিয়া ইস্না আশারিয়া সম্প্রদায়

এ সম্প্রদায়কে শী'আ ইমামিয়াও বলা হয়। সাধারণত শী'আদের সবদল ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। ইরান, ইরাক, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন ইসলামী দেশে এ সম্প্রদায়ে লোকদের দেখতে পাওয়া যায়। ইমামিয়া সম্প্রদায় দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী বিধায় এ সম্প্রদায়েকে 'ইস্না-আশারিয়া' বলা হয়। নিম্নে তাদের ইমামগণের নাম উল্লেখ করা হল।

১. হযরত আলী (রা.), ২. ইমাম হাসান (রা.), ৩. ইমাম হুসাইন (রা.), ৪. আলী

---

১. اسلامى مذاهب, ৬৬ পৃষ্ঠা।

২. الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৯৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

যয়নুল আবেদীন ইব্‌ন হুসাইন, (রা.), ৫. মুহম্মদ বাকির ইব্‌ন আলী জয়নুল আবেদীন (র.). ৬. জা'ফর আস্‌-সাদিক ইব্‌ন মুহাম্মদ বাকির, (র.) ৭. মূসা আল্‌-কাযিম ইব্‌ন জা'ফর আস্‌-সাদিক (র.),৮. আলী আর-রিযা ইব্‌ন মূসা আল-কাযিম (র.),৯. মুহাম্মদ আল্‌-জাওয়াদ ইব্‌ন আলী আর-রিযা (র.),১০. আলী আল-হাদী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্‌-জাওয়াদ্‌, ১১. আল-হাসানুল আসকারী ইব্‌ন আলী আল-হাদী, ১২. মুহাম্মদ আল- মাহদী ইব্‌ন আল হাসানুল-আসকারী।[১]

শী'আ আকীদা প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ

১. শী'আদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হচ্ছে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাবা (عبد الله بن سباء) সে ছিল ইয়ামানী ইয়াহূদী। বাহ্যিকভাবে সে নিজেকে মুসলমান বলে বলে প্রকাশ করত এবং মুসলমানদের মধ্যে ইয়াহূদী চিন্তাধারা সবিস্তারে প্রসার ঘটাত। সে বলত হযরত মূসা (আ.)-এর 'ওসী' ছিলেন ইউসা ইব্‌ন নূন।অনুরূপভাবে ইসলামী ধর্মমতে মুহম্মদ (সা.) -এর 'ওসী' হলেন আলী (রা.)।

২. মনসুর আহমাদ ইব্‌ন আবূ তালিব আত্‌ তাবরাসী (منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسى) তিনি ৫৮৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইহ্‌তিজাজ' -(كتاب الإحتجاج) ১৩০২ হিজরীতে ইরানে প্রকাশিত হয়।

৩. আল কুলাইনী তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'কিতাবুল কাফী' (الكافى) ১২৭৮ হিজরী সনে ইরানে প্রকাশিত হয়। এ কিতাবখানি শী'আদের নিকট বুখারী শরীফের মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। আর এ কিতাব খানিতে ১৬১৯৯ টি হাদীস রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. আলহাজ্জ মীর্যা হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ তাকী আন-নূরী আত্‌-তাবরাসী। তিনি ১২০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি 'ফাসলুল খিতাব ফী ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব'(فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) কিতাবের লেখক। উক্ত কিতাবে তিনি কুরআনের কারীমের ভিতরে বাড়ানো ও কমানোর অভিযোগ উত্থাপন করেন।

তিনি মন্তব্য করেছেন যে, সুরায়ে আল্‌ ইনসিরাহ্‌-এর ভিতর থেকে একটি আয়াত বাদ দেওয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে ' وجعلنا عليًّا صهرك ' আর আমি আলীকে আপনার জামাতা হিসেবে নির্ধারণ করেছি। এ কিতাবটি ইরানে ১২৮৯ হিজরী সনে ছাপা হয়।

৫. আয়াতুল্লাহ্‌ আল্‌ মামকানী। তিনি 'তানকীহুল মাকাল্‌ ফী আহওয়ালুর রিজাল' (تنقيح المقال فى أحوال الرجال) কিতাবের লেখক। তিনি শী'আদের কাছে যুক্তিপূর্ণ

১. اسلامی مذاهب,৬৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

সাম্যবাদী ইমাম নামে সুপরিচিত। এ কিতাবে তিনি আবূ বকর ও উমর (রা.) কে 'আজ্জিব্‌ত্ উয়াত্ তাগুত' খেতাবে ভূষিত করেছেন।

৬. আবূ জাফর আত্-তূসী 'তাহ্‌যীবুল আহ্‌কাম' কিতাবের লেখক ছিলেন।

৭. আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী। তিনি ইরানী শী'আ আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি বর্তমান শী'আ পন্থীদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি হলেন, 'কাশফুল আস্‌রার ওয়া কিতাবুল হুকুমাতুল ইসলামিয়া' কিতাবের লেখক।[১]

ইমামিয়া ইস্‌না আশারিয়া শি'আদের আকীদা

১. ইমাম নির্ধারিত হবে প্রকাশ্য নস্ দ্বারা। এ ক্ষেত্রে পূর্বের ইমামের উপর পরবর্তী ইমাম নির্দ্ধারন করা ওয়াজিব। কেননা ইমামত অত্যাবশ্যক কাজের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। সুতরাং এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ উম্মাতের উপর ছেড়ে যাওয়া বৈধ নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর উপর তা নির্দ্ধারন করা ওয়াজিব। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কর্তৃক নির্দ্ধারিত ইমাম হলেন, হযরত আলী (রা.)।

২. গদীরে খামের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলীর ইমামত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন।

৩. শী'আদের ধারনা যে, হযরত আলী (রা.) স্বীয় পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইনের ইমামত প্রকাশ্যে বলে গেছেন। ঠিক এমনিভাবে প্রত্যেক ইমাম তাঁর পরবর্তী ইমামকে নির্দ্ধারন করে যান অসীয়াতের মাধ্যমে।

৪. প্রত্যেক ইমামের ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। কিন্তু তিনি হবেন, মাসূম তথা পবিত্র এবং সগীরা ও কবীরা গুনাহ মুক্ত।

৫. প্রত্যেক ইমামকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর তরফ হতে ইলম প্রদান করা হয়েছে। যার দরুন তিনি শরী'আতকে পূর্ণতায় পৌছিয়ে দেন। ইমাম ইলমে লাদুন্নীর মালিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমামের মধ্যে শুধুমাত্র ওহীর পার্থক্য। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমামদের কাছে শরী'আতের ভেদ বাক্য আমানত রেখে গিয়েছেন যেন তারা সময়মত মানুষের কাছে তা পৌছে দিতে পারে।

৬. ইমামের হতে মু'জিযা পাওয়া বৈধ। যদি ইমাম পরবর্তী ইমামের ব্যাপারে কোন প্রমাণ না রেখে যান, তবে মু'জিযার ভিত্তিতে ইমাম নির্দ্ধারন করা ওয়াজিব।

৭. শি'আদের মতে দ্বাদশ ইমাম আল্-মুনতাযির মাহদী হয়ে সত্যিকারভাবে ইসলামের পুনারুদ্ধারকারী হবেন। তিনি সমগ্র বিশ্বজয় করবেন ও কিয়ামতের পূর্ববর্তী সহস্রাব্দের সূচনা করার জন্য আর্বিভূত হবেন।

---

১. الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৯৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৮. তাকিয়া নীতি অবলম্বন করা বৈধ। তাকিয়া নীতির অর্থ হল, কথায় ও কাজে প্রকৃত অবস্থার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করা এবং আপন বিশ্বাস ও মত বিপরীত মত প্রকাশ করা, এভাবে অপরকে প্রতারিত করা। তাকিয়া নীতি শী'আ মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবু জা'ফর (র.) (ইমাম বাকির) বলেন, তাকিয়া নীতি আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম। যে তাকিয়া নীতি অবলম্বন করে না তার ঈমান নেই।

৯ . শী'আ সম্প্রদায়ের মতে নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য মুতা (অস্থায়ী বিবাহ) বৈধ তথা উত্তম অভ্যাস। (ইসলাম এ প্রথাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে)।

১০. শী'আদের ধারনা মতে তাদের কাছে 'মোসহাফে ফাতিমা' রয়েছে। আর মোসহাফে ফাতিমার সাথে কুরআনের কোন মিল নেই।

১১. শী'আগণ খুলফায়ে রাশিদার তিনজন খলীফার নির্বাচনকে অবৈধ বলে মনে করে এবং উমাইয়াও আব্বাসীয় শাসকগণকে তারা খিলাফতের অবৈধ দাবীদার হিসেবে মনে করে।

১২ . শী'আদের মধ্যে চরমপন্থী কেউ কেউ হযরত আলী (রা.) উলূহিয়্যাতের দরজায় পৌছেছে বলে মনে করে। যেমন সাবায়ীয়া ফিরকা (السبئية)। আর কেউ কেউ ধারনা করে যে জিব্রাঈল (আ.) রিসালত প্রদানে আলীর কাছে না এসে ভুলবশত মুহাম্মদের কাছে এসেছে।

১৩. শী'আরা প্রাচীন ফার্সী সনের নববর্ষের দিনে নওরোজ উৎসব পালন করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও মৌলিক পার্থক্য এই যে সুন্নীগণ একমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্কে শরী'আতের উৎস এবং একমাত্র তাঁকেই মাসূম বা নিস্পাপ বলে আকীদা পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে ইস্না আশারী শী'আরা মনে করে শরী'আতের উৎস হলেন হযরত আলী (রা.) ও তাঁর এগারজন ইমাম আর দাবী করে যে তারা সকলে নিস্পাপ ছিলেন। এ দাবী তাদের অমূলক যা ইসলামী শরী'আত বহির্ভূত।

উল্লেখ্য যে, নবী (সা.) এর নিকট থেকে বিশ্বস্ত সত্যবাদী এবং ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবে-তাবিঈনের মধ্যমে যে শরী'আত এসেছে তাই হক এবং সত্য।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবায়ে কিরামের যুগে এবং তাবিঈন তাবে-তাবিঈনের যুগকে 'খায়রুল কুরূন' বা সর্বোত্তম যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনের বহু স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সংগী সাথীদের উচ্চ প্রশংসা প্রকাশ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। বস্তুত আমরা তাঁদের বদৌলতেই সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পেরেছি ।

www.pathagar.com

রাফিযী (رافضى)

فرقة من الشيعة تجيز الطعن فى الصحابة سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيد بن على حين نهاهم عن الطعن فى الشيخين ·

রাফিযী শী'আদের একটি দল বা ফিরকা যারা সাহাবাগণের শানে দোষ-ক্রটি আরোপ করাকে বৈধ মনে করে।

রাফিযী নামকরণ

যখন যায়িদ ইব্‌ন আলী তাদেরকে (ইমামিয়া সম্প্রদায়কে) শায়খাইনের প্রথম দু' খলীফা আবূ বকর ও উমর (রা.) এর বিরুদ্ধে গালমন্দ বলতে নিষেধ করেছিলেন তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁকে ইমামদের মধ্যে গন্য করা থেকে বিরত থাকে। এজন্য তাদেরকে রাফিযী বা পরিত্যাগকারী বলে নামকরণ করা হয়।

যারা আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর ইমামত বা খিলাফত অস্বীকার করে তাদেরকে ইমাম আল-আশ'আরী (র.) রাফিযী আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শী'আদের প্রধান তিনটি দলের অন্যতম দল হিসেবে গুলাত (غلاة) ও যায়দীদের পাশাপাশি রাফিযীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে রাফিযী সম্প্রদায় ইমামিয়াদের অপর একটি নাম।

'তারীখে তাবারী' গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৯৯ পৃষ্ঠায় আবূ মিখ্‌নাকের বর্ণনায় এ ভাবে উল্লেখ আছে যে, কূফায় শী'আদেরকে রাফিযীর বহুবচন বলা হত। কারণ যখন আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর উপর যায়িদ ইব্‌ন আলী (রা.) অভিসম্পাত উচ্চারণ করতে অস্বীকৃতি করলেন, তখন তারা (ইমামিয়ারা) যায়িদ ইব্‌ন আলীকে বর্জন করল। মূলত 'রাফদুশ্ শাইখাইন'(رفض الشيخين) অর্থাৎ আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর ইমামত ও খিলাফাতের অস্বীকৃতিই তাদের দলগত বৈশিষ্ট্য। আল্ মালাভী স্বীয় কিতাব 'আত তানবীহ্ ওয়ার রাদ্দে' অনুরূপভাবে ইমামিয়াদের রাফিযীদেরকেও শী'আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

আবদূল কাহির আল্-বাগদাদীও রাফিযীদের সাথে যায়দিয়া, ইমামিয়া, কায়সানিয়া ও গুলাত একই পর্যায়ভূক্ত গণ্য করেছেন।

শেষোক্ত গ্রন্থাকারের মতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা-এর অনুসারী সাবায়ীরা ছিলেন প্রথম রাফিযী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, রাফিযী শী'আদের প্রতি প্রযোজ্য এটি সাধারণ নাম এবং তা কখনই পৃথকভাবে শী'আদের কোন একটি দলের প্রতি প্রয়োগ করা

www.pathagar.com

হয় নি।[১]

মু'তাযিলা

اَلمعتزلة هم عمرو بن عبيد واصل بن عطاء الغزال واُصحا بها

আমর ইব্ন ওবাইদ ও ওয়াসিল ইব্ন-আতা আল্-গায্যাল এবং তাদের সাথী-সঙ্গীরা মু'তাযিলা নামে অভিহিত।[২]

নামকরণ

একদিন এক ব্যক্তি সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ইমাম হাসান আল্-বাসরী (র.) (৬৪২-৭২৮) সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁকে প্রশ্ন করে যে, যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কবীরা গোনাহ করে তবে সে মুসলিম থাকবে না অমুসলিম হয়ে যাবে? ইমাম এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, সে কাফির। কিন্তু সুবিজ্ঞ ইমামের প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসিল ইব্ন আতা বললেন, সে মুসলিম ও নয় অমুসলিম নয় বরং তাঁর স্থান হল এ দু' অবস্থানের মাঝখান। (اَلمنزلة بَين المَنزِلتَين) ইমাম হাসান বাসরী (রা.) ইব্ন আতার মত প্রত্যাখান কলেন। ফলে ওয়াসিল ইব্ন আতা ইমামের দল পরিত্যাগ করে মসজিদের একপ্রান্তে বসে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করলেন। সংঙ্গীদের মধ্য থেকে একদল তার এমত মেনে নিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহন করল। পরে ইমাম হাসান তার উদ্দেশ্য বললেন -'قد إعتزل عنا وَاصل' অর্থাৎ ওয়াসিল আমাদের দল পরিত্যাগ করেছে। বস্তুত এ থেকেই মুতাযিলা নামে উৎপত্তি হয়।[৩]

এরা নিজেদেরকে 'আসহাবুল আদ্ল ওয়াত্ তাওহীদ' (أصحاب العدل وَالتوحيد) নামে অভিহিত করে। এছাড়া নিজেদেরকে কাদরীয়া এবং আল-আদালিয়া লকবেও ভূষিত করে থাকে।[৪]

ওয়াসিল ইব্ন আতা ও আমার ইব্ন ওবাইদ নামক বসরার এ পণ্ডিতদ্বয় মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া খলীফা হিশাম ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসন (১০৫ - ১৩১ - ৭২৩ - ৭৪৮) মুতাযেলী কর্মতৎপতার যুগ। মুতাযিলীদের ক্রমবিকাশে এ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমরের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আব্বাসীদের পূর্ণ জয় লাভের সংগে সংগে আব্বাসীয়গণ শী'আদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। ফলে শী'আদের একদল বাগদাদে বিশেষ এক মুতাযিলী দল গঠন করে। কিন্তু আমরের নেতৃত্বে বসরায় মুতাযিলীরা বিনা প্রতিবাদে আব্বাসীয় পক্ষ অবলম্বন করে। আমর খলীফা মানসূরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আধ্যাত্মিক গুরুর স্থান লাভ করেন। পক্ষান্তরে পশ্চিমাঞ্চলে মুতাযিলীগণ খারিজীদের সাথে মিলিত হয়ে আব্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে। আব্বাসী আমলের প্রারম্ভে

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ৩৮০-৮১পৃষ্ঠা। ২. شرح العقيدة الطحاوية ,৫৮৮ পৃষ্ঠা। ২. ইসলামী মাযাহিব ঃ গোলাম আহ্মদ,৩৫৫ পৃষ্ঠা। ৩. কাদিয়ানী সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত ফাত্ওয়া, ৩ পৃষ্ঠা ও সংগ্রহ ও গ্রন্থনায় ঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঞা। ৪. প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

মুতাযিলীরা প্রধানত আব্বাসী খলীফাদের প্রতি অনুগত ছিল তবে তাদের একটি দল আব্বাসী খলীফাদের বিরোধী ছিল।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মূলনীতি সমূহ ঃ

মুতাযিলা মতবাদ পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

১. আল-আদ্‌ল (اَلْعدل) , ২. আত্‌-তাওহীদ (اَلتوحيد) , ৩. ইনকাযুল ওয়াঈদ (إنقاذ الوعيد) , ৪. আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন (اَلْمنزلة بَين المنزلتين), ৫. আল-আমরু বিল-মারূফ ওয়ান-নাহী আনিল-মুনকার (الامر بِالمعروف وَ النهى عَن المنكَر)

উপরোক্ত মূলনীতি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

১. আল-আদ্‌ল (اَلْعدل) ঃ আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা। তাঁর সৃষ্টির জন্য যা সবচেয়ে উত্তম তা-ই তাঁর সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি কোন অন্যায়ের ইচ্ছাও করেন না আর আদেশও দেন না। যদি তিনি এ পর্যায়ে করতেন আর এর উপর শাস্তি দিতেন তবে এটা হবে যুলুম। আল্লাহ্‌ তা'আলা ন্যায়বিচারক কারো প্রতি যুল্‌ম করেন না।

২. আত্‌-তাওহীদ (اَلتوحيد) ঃ মুতাযিলাদের মতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব বলতে বুঝায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার বাইরে কোন সিফাত বা গুণ নেই। কুরআন চিরন্তন বা অসৃষ্ট নয় এবং আল্লাহ্‌ মানুষের চাক্ষুষ দর্শনের বহির্ভূত।

৩. ইনকাযুল ওয়াঈদ (إنقا ذ الوعيد) ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা পূণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত এবং পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করার বিধান রেখেছেন। এ ওয়াদা ভংগ করেন না। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

৪. আল-মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন (اَلْمنزلة بَين المنزِلتين) ঃ যে মুসলিম কবীরা গুনাহ করে সে মু'মিন নয় আর কাফিরও নয়। সে ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। মু'মিন শব্দটি সম্মানসূচক বিধায় যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে তাকে মু'মিন বলা যায় না। তার মধ্যে ঈমান থাকার কারণে তাকে কাফির ও বলা যায় না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুতাযিলা সম্প্রদায় ' اَلْمنزلة بَين المنزِلتين ' এর আকীদা পোষণ করে।

৫. আল-আম্‌রু বিল-মারূফ ওয়ান নাহি-আনিল মুনকার (الاَمر بِالمعروف و النهى عَن المنكر) ঃ এ ব্যাপারে মতাযিলী সম্প্রদায়ের আকীদা হল কেবলমাত্র নিজেদের মু'মিন হয়ে সে অনুযায়ী আমল করলেই যথেষ্ট নয়। বরং এ ক্ষেত্রে অন্যকেও আদেশ-নিষেধ করা প্রত্যেকে মু'মিনের দায়ীত্ব। এ উদ্দেশ্যই আমদের দুনিয়ার প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

১. اَلموسوعة الميسرة فى الأديَان والمذاهب المعَاصرة،الندوة العالمية للشباب الإسلامى الرياض ৩০৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুতাযিলীদের আকীদা বিশ্বাসে ইফরাত ও তাফরীত তথা কঠোরতা ও নমনীয়তার সংমিশ্রন রয়েছে। সুতরাং এদের মতবাদ অগ্রহযোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

কাদিয়ানী (أَلْقَادِيَانِيَةُ)

أَلْقَادِيَانِيَةُ حَرَكَةُ نَشَأَتْ سَنَةَ ١٩٠٠ بِتَخْطِيطٍ فِي الإِسْتِعْمَارِ الإِنْجِيلِزِي فِي الْقَارَةِ الْهِنْدِيَةِ بِهَدَفِ إِبْعَادِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ وَعَنْ فَرِيقَةِ الْجِهَادِ بِشَكْلٍ خَاصٍ .

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনায় এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতিকে তাঁদের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ কৌশলে তাঁদেরকে জিহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বিমূখ করার লক্ষ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে কাদিয়ানী আন্দোলনের সূচনা হয়।

এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলো মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (১৮৩৫ খৃঃ -১৯৮০)। মৌঃ নূর উদ্দীন ছিলেন কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা। মুহাম্মদ আলী লাহোরী কাদিয়ানীদের আমীর ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় বিকৃতভাবে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মুহাম্মদ সাদিক ছিলেন কাদিয়ানীদের মুফ্তী এবং মাহমুদ আহ্মদ ইবন গোলাম ছিলেন কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা।

কাদিয়ানী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিয়ান নামক গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর এখানেই তাকে দাফন করা হয়।

তার কবরের উপর 'فوز اغلام أحمد موعود' কথাটি খচিত আছে। এখানে'মাওউদ' শব্দের তাৎপর্য হল তাদের ধারনা মির্জা গোলাম আহ্মদই প্রতিশ্রুত মাহদী যার অপেক্ষা করা হচ্ছে। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবীগুলোর কত কতকাংশ উল্লেখ করা হলো।

১ . তিনি নিজেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে দাবী করেন। এবং তিনি ঈসা (আ.) -এর কবরের পাশে বসে এ সত্য কাশ্ফের মাধ্যমে অবগত হন। হযরত ঈসা (আ.) -এর রূহ্ তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে বিধায় তিনিই প্রতীক্ষিত মাহদী।

২ . মির্জা সাহেব নিজেকে কেবলমাত্র মাহদী বলে দাবী করেই ক্ষান্ত হননি বরং এ দাবীও উত্থাপন করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা তার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

৩ . মির্জা কাদিয়ানী দাবী করেন যে, তার যুগের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত মুজিযা সমূহ তার

www.pathagar.com

নবূওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। যেমন ১৮৯৪ খৃঃ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহন লেগেছিল। তাও তা নবূওয়াতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ।

৪ . মির্জা সাহেব রিসালাতের দাবী করে বলেন যে, তা রিসালাতের দাবী নবী করীম (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া (خَاتَمُ الأَنْبِيَاء) পরিপন্থী নয়। তাঁর মতে 'خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ' -এর অর্থ হলো নবী (সা.)-এর পরে যত নবী আসবেন তাদের নবুওয়াতের উপর নবী করীম (সা.) এর মহর হবে। এবং তারা নবী (সা.) -এর শরী'আতকে সঞ্জীবিত ও সংস্কার করবেন।[১]

মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদীয়ানী জীবনের অধিকাংশ সময় ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা, লেখালেখি, সমালোচনা করার পর নিজের নবী, ইমাম মাহ্দী, মসীহ্ মাওউদ, মুজাদ্দিদ ইত্যাদি হওয়ার দাবী উত্থাপন করে নিরিহ্ জনগণের বায়'আত গ্রহণ করেন। এ সকল দাবী তিনি এক সময় করেন নি বরং সুযোগের চাহিদানুযায়ী সময় মত একের পর এক দাবী করতে থাকে। তিনি জাল নবূওয়াত ও অন্যান্য প্রতারণা দাবী উত্থাপন করতে গিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ফলে তার বিভিন্ন ভাষ্যে আল্লাহ্র তা'আলা, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), সাহাবায়ে কিরাম, উলামায়ে উম্মাত, সাধারণ মুসলমান এবং হারামাইন শরীফাইন ইত্যাদির শানে আপত্তিকর মন্তব্য ও চরম বেয়াদবী প্রকাশ করেন, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে কষ্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু তাই নয় তিনি তার জাল নবূওয়াতের ভিত্তি রচনা করতে গিয়ে শাশ্বত বিধান আল-কুরআন ও আল-হাদীসের তাহরীফ করেছেন এবং ভুল বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ সকল অন্যায় কাজ করার পর তিনি মুসলমানদের দুশমন ইংরেজ শাসকের নিকট আশ্রয় নিতেন। তিনি নিজ জামায়াত বৃটিশের লাগানো চারা বলে উল্লেখ করেছেন। তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রতিটি ইসলামী অনুশাসন ছিল মুসলমানদের থেকে ভিন্ন ধরনের। এ সত্ত্বেও কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে আসল মুসলিম বলে দাবী করছে এবং বিশ্বের কোটি কোটি মুসলামনদেরকে কাফির বলে মন্তব্য করছে। মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারীরা 'আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে এর মাধ্যমে প্রায় এক শতাব্দী যাবত তাদের বাতিল মতবাদ প্রচার করে আসছে।[২]

কাদিয়ানীদের ধ্যান ধারনা ও বাতিল আকীদা

১. মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মাসীহ্।

২. আল্লাহ্ তা'আলা নামায পড়েন, রোযা রাখেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, লেখেন, ভুল করেন ইত্যাদি।

৩. গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর ইলাহ্ ইংরেজ, তাই তিনি ইংরেজী ভাষায় খেতাব ও উপস্থাপনা করেন।

১. ইসলামী মাযাহিব ঃ গোলাম আহমদ ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

২. কাদিয়ানী সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিম সর্ব সম্মত ফাত্ওয়া, ৩ পৃষ্ঠা ও সংগ্রহ ও গ্রন্থনায় ঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঞা।

www.pathagar.com

৪ . নবূওয়াতের দরযা মুহাম্মদ (সা.) -এর আবির্ভাবের দ্বারা বন্ধ হয়নি এবং এর প্রচলন এখনও চলমান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রয়োজনবোধে রাসূল প্রেরণ করে থাকেন। গোলাম আহ্মাদ নবী হতেও শ্রেষ্ঠ।

৫ . হযরত জিব্রাঈল (আ.) গোলাম আহমদের কাছে ওহী নিয়ে আসেন এবং তার প্রতি আগত যাবতীয় ইলহাম কুরআন সমতূল্য।

৬ . প্রতিশ্রুত মাসীহ্ গোলাম আহমদের ব্যক্তিগত কুরাআনই হচ্ছে আসল কুরআন। তার তালীমাতের আলোকে যা কিছু পাওয়া যায় তা হাদীস। আর নবী তারাই যারা গোলাম আহ্মদের নেতৃত্বে পরিচালিত।

৭ . গোলাম আহমদের উপর অবতীর্ণ ওহী কুরআনের মতই প্রবিত্র। এগুলোর সমষ্টির নাম আল-কিতাবুল মুবীন। (كتاب المبين)

৮ . কাদিয়ানীরা পরস্পরে নতুন ধর্মের সাথী এবং তাদের শরী'আত মুস্তাকিল তথা সতন্ত্র আর গোলাম আহমদের সাথীরা সাহাবা তূল্য।

৯ . কাদিয়ান (قاديان) শহরটি, মক্কাও মদীনা শরীফ সমতূল্য বরং তা থেকেও উত্তম। কাদিয়ান শহরের যমীন হারাম এবং এ স্থানই তাদের কিব্লা। এখানেই তারা হজ্জব্রত পালন করে।

১০ . জিহাদের হুকুম বাতিল। ধমের্র জন্য জিহাদ করা হারাম।

১১ . যে মুসলমান কাদিয়ানী আকীদা গ্রহণ না করে সে কাফির। যারা কাদিয়ানী ব্যতীত অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করে কিংবা কাদিয়ানী ছাড়া অন্য কারো কাছে বিয়ে দিবে তারাও কাফির।

১২ . তারা সব আফীম এবং নেশা জাতীয় পদার্থ হালাল মনে করে।[১]

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা উপরোক্ত আকীদাগুলো পোষণ করার কারণে মুসলিম জামা'আত থেকে নিঃসন্দেহে বের হয়ে গিয়েছে। এ সত্ত্বেও তারা নিজদেরকে প্রকৃত মুসলমান বলে মনে করে এবং তারা মুসলমানদের ব্যবহৃত ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। তাদের বায়'আত ফরম ও প্রচার পত্রে ইসলামের নামে প্রকাশ করছে।

তারা যে সব আকীদা পোষণ করে সে প্রেক্ষাপট ইসলামের দৃষ্টিতেও তারা অমুসলিম বলে বিবেচিত। 'الأشباه والنظائر' গ্রন্থের ' كتاب السير والردة ' অধ্যায়ে উল্লেখিত রয়েছে।

---

১. الأشباه والنظائر, ৬৯২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

إذا لم يَعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبيَاء فليس بلمسلم لأنه من الضروريَات ·

যে ব্যক্তি নবী করীম (সা.) -কে শেষ নবী বলে না জানবে যে মুসলমান নয়। যেহেতু এটা দীনের অবশ্যকীয় পালনীয় বিষয়।[১]

ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরীতে এ পর্যায়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

إذا لَم يعرف الرجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبيَاء فليس بمسلم ولو قال أنا رسول أو قال بالفا ريسة من پيغمبر يريد به من پيغامى برم يكفر·

যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.) -কে শেষ নবী বলে স্বীকার না করে সে মুসলমান নয়। যদি কেউ বলে যে, আমি রাসূল অথবা যদি ফার্সি ভাষায় বলে যে, আমি পয়গম্বর , যদিও এর দ্বারা রাসূল বা পয়গাম্বর হওয়ার দাবী করার উদ্দেশ্য নাও হয় তবুও সে ব্যক্তি কাফির।[২]

আল্লামা ইব্ন হাজার মাক্বী শাফি'য়ী (র.) স্বীয় ফাত্ওয়ার কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

مَن اعتقد وحيًا بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع المُسلمين·

যে ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পরে অহী নাযিলের আকীদা পোষণ করে, মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে সে ব্যক্তি কাফির।

এছাড়া আল্লামা মাওসূফ এ পর্যায়ে 'شرح فقه أكبر' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع

আমাদের নবী করীম (সা.) -এর পরে নবূওয়াতের দাবী উত্থাপন করা সকল মুসলমানের ঐক্যমতে কুফরী।[৩]

উপরোক্ত দলীল প্রমাণের প্রেক্ষিতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, গোলাম আহ্মদ কাদীয়ানী কাফির তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফির।

এছাড়া কাদিয়ানী ধর্মীয় আকীদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র ও সংস্থা তাদেরকে ইসলামের বহির্ভূত একটি কাফির ও মুরতাদ সম্প্রদায় বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। 'ও আই সি'-এর অধীন 'বিশ্ব ফিকহ্ একাডেমী' ও 'বিশ্ব মুসলিম লীগ' (رابطة العالم الإسلامى)

---

১. 'الأشباه والنظائر', ৬৯২ পৃষ্ঠা। ২. ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরী, ৮ম খণ্ড, ৮৩২ পৃষ্ঠা।

৩. مفتي محمد شفيع : وصول الإفكار إلى أصول الأكفار , ২৪১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ও বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস (مؤتمر العالم الإسلامى) তাদের অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে।

অধিকন্তু উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন মাওলানা আবূল কালাম আযাদ, আল্লামা ইকবাল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমূখ কাদিয়ানীদের অমুসলিম ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১৯৭৪ সালে বিশ্বের ১৪৪টি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ফিকহ্‌বিদ্‌গণ মক্কা শরীফে বিশ্ব মুসলিম লীগ এর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলিম দেশকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন। বস্তুত কাদিয়ানীরা ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত মুরতাদ তথা কাফির ।

বাহায়ী (البهائية)

البهائية حركة نشأت سنة ١٢٦٠هـ/ ١٨٤٤م تحت رعاية الإستعمار الروسى واليهودية العالمية والإستعمار الإنجليزى بهدف إفساد العقيدة الإسلامية و تفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية .

মুসলমানদের ইসলামী মৌলিক আকীদা বিশ্বাসকে ধ্বংস, তাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে এবং ইসলামের মৌলিক অনুশাসন থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে মোতাবেক ১২৬০ হিজরীতে বৃটিশ, ইয়াহুদী ও রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় বাহায়ী আন্দোলনের আর্বিভাব ঘটে ।

ইরানের মির্জা আলী মুহাম্মদ রেজা আশ্-শীরাজী নিজেকে (১২৩৫ হিঃ - ১২৬৫ হিঃ) 'বাব' বলে উপস্থাপিত করেন। এজন্য তার ধর্মমতের অনুসারীগণকে 'বাবী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। মির্জা হোসাইন আলী (১৮১৮ ইং-১৮৯২ ইং) নিজেকে 'বাহাউল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র জ্যোতি হওয়ার দাবী করে এক স্বতন্ত্র শরীয়াতদাতা হিসাবে তার স্থলাভিসিক্ত হন।

এ আন্দোলনকে 'বাহায়ী আন্দোলন' নাম করণ করেন এবং তার শরীয়াত গ্রন্থের নাম হল 'আল্ আক্‌দাস' (الأقدس) ১৮৯২ খৃস্টাব্দে পঁচাত্তর বছর বয়সে বাহা উল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন।[১]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইরানের মীর্জা আলী মুহাম্মদ ঘোষণা করলেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দিব্য-বার্তা বাহকের আগমন নিকটবর্তী। তিনি নিজেকে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত 'ইমাম মাহদী' বলে উল্লেখ করে বল্‌লেন, আমি 'অবতার'। তিনি নিজেকে 'বাব' বলে উপস্থাপিত করেছিলেন বিধায় তার ধর্মমতের অনুসারীগণকে 'বাবী' বলা হয়।

---

১. الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ، ৬২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আলী মুহাম্মদ তার রচিত পুস্তক 'আল-বয়ান' এ এবং অন্যত্র ঘোষণা করেন যে, আল-বয়ান ছাড়া অন্য কোন কিতাব পাঠ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যারা বাবী ধর্মগ্রহণ করবে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে। এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে। এ ভয়াবহ মতবাদ প্রচার করার কারণে তদানিন্তন সরকার আলী মুহাম্মদকে গ্রেফতার করেন।

বাব যখন বন্দী তখন তাঁর শিষ্যরা খোরাশানের রাজধানী বাদিস্তে এক সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় উম্মে সালমা নাম্নী এর মহিলা ইসলামী শরী'আতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন শরী'আত ও ধর্ম প্রবর্তনের প্রস্তাব পেশ করে। মীর্যা হুসেন আলী নামক এক প্রভাবশালী সদস্যসহ আরও কতিপয় ব্যক্তি এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরিশেষে প্রস্তাবটি জেলখানায় আলী মুহাম্মদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে, তিনিও তাতে সম্মতি প্রদান করেন। বাব পন্থীরা সেই থেকে ইসলামের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করে সম্পূর্ণরূপে এক নব ধর্মের গোড়াপত্তন করেন।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৫০ ইং সালের ৯ জুলাই পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজের সেনানিবাসে আলী মুহাম্মদ বাবকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। এরপর ইয়াহহিয়া নামক এক ব্যক্তি 'সোবহে আজল' খেতাবে গ্রহণ করে বাবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৮৫২ইং সালে একদল বাবী তাদের ধর্মগুরুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন পারস্য রাজ্যের উপর ব্যর্থ হামলা করে। ফলে উম্মে সালমা সহ আরও কতিপয় ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। উলামা সম্প্রদায় এবং সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় পারস্যে অবস্থান করা বাবীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে হুসেন আলী এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই বাবী নেতা ইয়াহ্হিয়া সহ সকল বাবপন্থীকে বাগদাদে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

এরপর হুসেন আলী ১৮৬৩ ইং সালে নিজেই এক স্বতন্ত্র শরী'আতদাতা হওয়ার দাবী করে। সে নিজেকে বাহা উল্লাহ্ নামে অভিহিত করেন। হুসেন আলী ওরফে বাহা উল্লাহ্ তার রচিত শরী'আত গ্রন্থের নামকরণ করেন 'কিতাব-ই আক্দাস'। বাহা উল্লাহর মৃত্যুর পর তদীয় সন্তান আব্বাস আফিন্দী পিতার এ মতাদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং আবদুল বাহা নামে পরিচিত হন। অপর দিকে বাহার নেতৃত্বে স্বীকার না করার ফলে সৃষ্টি হল দু'টি দলের। মৃত্যুর পূর্বেই আবদুল বাহা তার জ্যেষ্ঠ দৌহিদ্র্য শৌকী আফেন্দীকে ধর্মের অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়ে যান। শৌকী আফেন্দী বাহায়ী ধর্ম বিস্তারে ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[১]

বাহা উল্লাহর জীবিত অবস্থায়ই ১৮৭২ ইং সালে বাংলাদেশে বাহাইদের আগমন ঘটে। এ

---

১. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম ঃ মুহামদ আবুল কাসেম ভূঁঞা, ৯-১১পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দেশে প্রথম আগত বাহাই সুলেমান খান ওরফে জামাল এফেন্দী । বাংগালী বাহাই সম্ভবত আলীমুদ্দীন। চট্টগ্রামের এই আলীমুদ্দীন রেংগুনে বাহাই ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ গঠিত হয় ঢাকায় ১৯৫২ সালে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব ক'টি জিলা সদরে স্থানীয় 'আধ্যাত্মিক পরিষদ' আছে বলে তারা দাবী করে।

বাংলাদেশে বাহাইদের প্রধান অফিস হল রাজধানী ঢাকার শান্তিনগরে সার্কিট হাউস রোডে বাহাইদের ভাষায় একে বলা হয়'জাতীয় বাহাই হাজীরাতুল কুদ্স'।

বাহাইদের আকীদা

১ . বাহাইদের বিশ্বাস হল বাব তিনিই যিনি সবকিছু তার কালেমার দ্বারা সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সমুদয় সৃষ্টির প্রবর্তক।

২ . 'حلول و اتحاد' এ বিশ্বাস। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তার ভিতর প্রবেশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন দলের ভিতর তিনি প্রবেশ করবেন।

৩ . তানাসুখে বিশ্বাস ও সমুদয় বস্তু অবিনশ্বর একথার দাবীদার। পরজগতে প্রতিদান ও শাস্তি কেবলমাত্র রূহের উপর নিপতিত হবে বলে তাদের ধারনা।

৪. ১৯ সংখ্যাটি তাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিকট উনিশ দিনে মাস এবং উনিশ মাসে বছর হয় ।

৫. হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলে ছড়ান সর্ম্পকে ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুরূপ মত পোষণ করে।

৬ . কুরআন শরীফে তাদের মাযহাব মোতাবেক তাহরীফ ও তাবলী করা যেতে পারে।

৭. আম্বিয়া কিরামের মুঁজিযা অস্বীকার করে। ফিরিশ্‌তা ও জীন্নের অস্তীত্ব অস্বীকার করে। জন্নাত জাহান্নামকে অস্বীকার করে।

৮ . মহিলাদের জন্য পর্দা হারাম এবং মুতা বিবাহ জায়িয ।

৯ . বাবের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মুহাম্মাদী ধর্মকে বাতিল করা।

১০ . 'বাহ' - এর অবির্ভাব কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত।

১১ . মুহাম্মদ (সা.)-কে 'خاتم النبيين' বলে স্বীকার করে না। ওহীর দরজা সর্বক্ষণ খোলা আছে বলে আকীদা পোষণ করে। তারা এমন কিছু কিতাব প্রণয়ন করেছে যা কুরআনুল কারীমের প্রতিদ্বন্দ্বি। তারা বিভিন্ন ধরনের বাতিল আকিদা পোষণ করে থাকে।

---

১. আল্ বাবিয়া ঃ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইয়ামানী, পৃষ্ঠা -১৩৫।

www.pathagar.com

বাহায়ী মতবাদের অসারতা

বাহায়ী মতবাদ মূলত ইয়ূদী খৃষ্টান, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কতিপয় আদর্শের একটা সমন্বিত রূপ প্রদানের প্রয়াস। একেশ্বরবাদ, বহুশ্বরবাদ, নিরেশ্বরবাদ সব একত্রিত করে সাধারণভাবে একধর্ম এক জাতি আর এক স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাসই বাহায়ী ধর্মের মূল কথা।

এ ধর্মের নবূওয়াত সমাপ্তির কথা বিশ্বাস করে না বরং ধারনা পোষণ করে যে, পবিত্র কুরআনের এ আয়াত ভবিষ্যতে আরও নবী আসবে। মহান রাব্বুল আলামীন এ ভ্রান্ত মতবাদকে এ আয়াত দ্বারা অসার প্রতিপন্ন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ٥

মুহম্মাদ (সা.) তোমাদের কারো পিতা নন বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

সুতরাং এ আয়াতের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) ছিল শেষ নবী এবং তাঁর রিসালাত নবূওয়্যাতের দরজা চিরতরে আল্লাহ্ বন্ধ করে দিয়েছেন বিধায় ইসলামী শরী'আত কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে আর কোন শরী'আত আসবে না। আর মহান রাব্বুল আলামীন ইসলামী শরী'আত দ্বারা দীনের পূর্ণতা প্রদান করেছেন।সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শেষ নবী তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না।[১]

বস্তুত বাহায়ীদের যাবতীয় আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ্ এর বর্হিভূত যা ইসলাম কষ্মিনকালেও সমর্থন করে না। তাই বাহায়ীরা বিপদগামী জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত।

ইসমাঈলী (إسماعيلية)

الإسماعيلية فرقة باطنة انتسبت إلى الامام إسماعيل بن جعفر الصادق ظاهرها التشيع لأهل البيت وحقيقتها هدم عقائد الإسلام تشعبت فرقها وافتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر۔

ইসমাঈলী একটি বাতেনী সম্প্রদায়। এরা ইমাম ইসমাঈল ইব্ন জাফর সাদিকের সাথে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করে। এ দলটি আহ্‌লে বাইতের সহমর্মীতা প্রকাশ করে। মূলত ইসলামের মৌলিক আকীদা সমুহকে ধ্বংসের করাই এদের উদ্দেশ্য এ সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং কালক্রমে এ দল বিস্তার লাভ করে, বর্তমান সময়ে উপনীত হয়েছে।[২]

---

১. إسلامى مذاهب, ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মূলত ইসমাঈলীগণ ইমামিয়া সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। এরা ইসমাঈল ইব্ন জাফর -এর দিকে সম্পর্কযুক্ত। এ সম্প্রদায়ের লোক ইমাম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম জাফর (র.) সাদিক পর্যন্ত ইস্‌না আশারিয়ার সাথে ঐক্যমত। তবে ইমাম জাফর সাদিকের পর ইমাম নির্বাচনের ব্যাপারে দু'দলের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ইস্‌না আশারিয়া তাঁর মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয়পুত্র মূসা পক্ষান্তরে ইসমাঈলী সম্প্রদায় ইমাম জাফর সাদিকের ছেলেইসমাঈলকেইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাদের মতে ইমাম জাফর সাদিকের পরে তাঁর ছেলে ইস্‌মাঈল স্বীয় পিতার মনোনয়ন হিসেবে ইমাম বিবেচিত হন। যদিও ইসমাঈল পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। ইস্‌মাঈলের পর ইমামতের দায়িত্ব মুহাম্মদ মাক্‌তূমের উপর বর্তায়। তিনি তাদের কথিত গুপ্ত ইমামের প্রথম ইমাম ছিলেন। মুহাম্মদ মাক্‌তূমের পর জাফর মোসাদ্দিক -এর ছেলে মুহাম্মদ হাবীব ইমাম নিযুক্ত হন। তাদের মতে তিনিই শেষ গুপ্ত ইমাম ছিলেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় শী'আদের এ দলটিও ইরাকের যমীনে বিস্তৃতি লাভ করে। তারা এখানে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে পারস্য খোরাসান এবং পাক ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ সকল দেশে অবস্থান কালে পারিপার্শ্বিক আকীদায় অনুপ্রাণীত হয়ে বিভিন্ন খেয়ালের লোক তৈয়ার হয় এবং স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থে ধর্মের নামে বিভিন্ন আকীদা পোষণ করে। এ কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ইসমাঈলী নামে পরিচয় লাভ করে। এ সময় কেউ কেউ ইসলামের মৌলিক অনুশাসন ছেড়ে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়।[১]

ইমাম ইসমাঈলের সাথে যুক্ত হওয়ায় এ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ইসমাঈলী বলা হয়। এবং গুপ্ত ইমামের আকীদা পোষণ করার কারণে এদেরকে বাতেনিয়াও বলা হয়। ইসমাঈলী দল বাতেনিয়া নামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

প্রথমত, ইসমাঈলী সম্প্রদায় স্বীয় আকীদাসমূহ লোকদের থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করে এবং তাক্‌ইয়া বা গোপন নীতি অনুসরণ করে।

দ্বিতীয়ত, ইসমাঈলী দল বিশ্বাস করে যে, ইমাম অধিকাংশ সময় গোপন থাকে। তাদের মতে মাগরিবে (মরক্কো) তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত ইমাম গুপ্ত ছিল।

তৃতীয়ত, এদের মতে শরী'আতের দু'টি দিক রয়েছে ; এটি যাহেরী অপরটি বাতেনী। সাধারণ মানুষের কেবলমাত্র যাহেরী ইল্‌ম রয়েছে আর বাতেনী ইলম কেবলমাত্র ইমামের জন্যই নির্ধারিত।[২]

এ ছাড়া এ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ধর্মত্যাগীও বলা হয়। কারণ তাদের মতবাদে প্রচলিত ধর্মমত ত্যাগের উপাদান বিদ্যমান। তাদের মতবাদের অনেকগুলো প্রাচীন এবং অনেকগুলো নবীন। সাতজন ইমামে বিশ্বাসী বলে শী'আদের এ দলকে সাবইয়াও বলা হয়ে থাকে।

---

১. اسلامی مذاهب,৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সুতরাং এ সম্প্রদায়ের লোক ইরাকে বাতেনীয়া, কারামাতিয়া এবং মাযদাকিয়া নামে অভিহিত হয়। আর খোরাসানে এরা তালিমিয়া এবং মোলহিদা নামে আখ্যায়িত হয়।[১]

ইস্‌মাঈলীদের মতবাদ

১ . মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌মাঈলের বংশধর থেকে একজন মনোনীত মাসূম ইমাম থাকা অত্যাবশ্যক।

২ . ইস্‌মাঈলীদের মতে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত ও শব্দের দ্বিবিধ তাৎপর্য রয়েছে - একটি প্রকাশ্য অপরটি গোপনীয়। কেননা প্রতিটি প্রকাশমান বস্তুর নমূনা রয়েছে অদৃশ্য জগতে।

৩ . যামানার ইমাম সম্বন্ধে অবগত না হয়ে যে মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু।

৪ . ইস্‌মাঈলীরা স্বীয় ইমামের প্রতি এমন কতিপয় সিফাত আরোপ করেন, যা আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। কেবলমাত্র ইমামই ইলমে বাতিন সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।

৫ . ইসমাঈলীরা বিপদ ও অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাক্ইয়া ও গোপন নীতি অনুসরণে বিশ্বাসী। জীবনের উপর যেখানে হামলা হওয়ার আশংকা দেখা দেয় সেখানে তারা নিজেদের মতামত গোপন করে শাসকের মতামত বাহ্যত মেনে নেয়।

৬ .তাদের মতে ধর্ম হল মনের ব্যাপার। বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা অনুশীলনের মধ্যে ধর্ম নিহিত নেই। কাজেই উৎকর্ষ সাধন করাই উত্তম।

৭ . তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না, তাদের মতে ইসমাঈল ইব্‌ন জাফর সাদিক শেষ নবী ও ইমাম।

৮ . যমীন কখনও প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য ইমাম থেকে খালি থাকে না ।

৯ . ইসমাঈলী সম্প্রদায় তানাসুখে বিশ্বাসী। ইমাম তাদের মতে সকল নবী পূর্ববর্তী ইমামগণের ওয়ারিস।

১০ . ইসমাঈলীরা আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় সিফাত অস্বীকার করে।

১১ . ইস্‌মাঈলীদের কাছে সাত সংখ্যাটি বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে। তাদের মতে, এ সংখ্যাটির নিগুঢ় একটি অর্থ রয়েছে।[২]

এছাড়া তারা আরও অনেক ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে। যেমন, কুরআন প্রসংগে ইসমাঈলিয়া গাইডে বলা হয়েছে কুরআন সর্বোমোট ৪০ পারা তার মধ্যে ৩০ পারা মানুষের ঘরে, বাকী ১০ পারা ইমামের ঘরে। এ দশ পারা কুরআনই ইমাম সম্পর্কিত। ইসমাইলিয়া

---

১. الملل و النحل, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৯২

২. الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصره, পৃষ্ঠা- ৪৫।

www.pathagar.com

সম্প্রদায় অযূ করে না। তারা বলে, তাদের অন্তর সব সময় অযূ অবস্থায় থাকে। বিয়ে ঠিক হলে তারা খাত্না করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে তারা তাদের জামাতখানায় গিয়ে তিনবার দু'আ করে। তাদের মতে এটা ফরয। রোযাকে তারা ফরয মনে করে না। তাদের মতে সংযম হল চোখ, কান ও জবানের। রোযা খাওয়া দাওয়া বন্ধের মধ্যে নয়। তারা যাকাত দেয় না। তবে তাদের আয়ের সাড়ে বারোভাগ আগাখানকে খাজনা দিতে হয়, এটাই যাকাত।

আগাখানী (اغا خانية)

আগাখান শি'আদের একটি উপদলের ধর্মীয় নেতার উপাধি। এ উপাধি সর্বপ্রথম লাভ করেন আগা হাসান আলী শাহ্। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ হয়ে কাজ করার প্রতিদান স্বরূপ এ উপাধি লাভ করেন। শি'আ সম্প্রদায়ের পঞ্চম ইমাম জাফর সাদিকের জেষ্ঠ্যপুত্রের নাম ছিল ইসমাঈল। পিতার জীবদ্দশায় ইসমাঈলের মৃত্যু হয়। ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণের একটি দল ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মদকে নিজেদের ইমাম বলে ঘোষণা করে। এ ভাবেই ইসমাঈলী নামের একটি ফিরকা সৃষ্টি হয়।

এ ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই ইসলামী খিলাফতের চরম শত্রু বাতেনী সন্ত্রাসবাদী দলের আবির্ভাব ঘটে। এদের একটি দল ইরান ও উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসমাঈলী সম্প্রদায়েরই হাসান আলী শাহ্ নামক একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কাজ করে বিপুল ধন সম্পদের অধিকারী হন। তার জন্ম ইরানে ১৮০০ খৃস্টাব্দে। তিনি ইরানের জনৈক শাহজাদীকে বিয়ে করে কেরমান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশের সাথে অতিরিক্ত মাখামাখির কারণে সেও ইরান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি বৃটিশ সরকারের বৃত্তিভোগী চর ছিলেন। আফগানিস্তান ও সিন্ধু অঞ্চলে বৃটিশ প্রভূত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা হয়। ইনিই আগাখান উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর থেকেই ইসমাঈলী সম্প্রদায় 'আগাখানী সম্প্রদায়' নামে অবিহিত হতে থাকে। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে প্রথম আগাখানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আগা আলী শাহ্ দ্বিতীয় আগাখান নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র স্যার মুহাম্মদ আগা সুলতান শাহ্ তৃতীয় আগা খান নিযুক্ত হন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

স্যার আগা খান ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে তিনি ভারতে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে হতে ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত আগা খান নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯১০ খৃস্টাব্দে তিনি ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আলীগড় মুসলিম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুযোগ করে দেন। আগাখান সব সময় ধর্মপ্রচারে তৎপর ছিলেন। তার প্রচেষ্টায় অসংখ্য

www.pathagar.com

লোক তার ধর্ম গ্রহণ করে। আগাখানের মুরীদগণকে 'ইসমাঈলিয়া' বলা হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় আগা খানের মৃত্যুর পর শাহ্ করীম আল্-হুসাইনী চতুর্থ আগাখান নিযুক্ত হন। বর্তমান আগাখান চতুর্থ আগা খানের পুত্র। আগাখানী সম্প্রদায় বৃটিশের সহায়তায় বড় বড় ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়। এদের নিজস্ব ব্যাংক ব্যবসা রয়েছে। সম্প্রদায়ের লোকদের কল্যাণে এরা খুবই তৎপর। এদের স্বতন্ত্র উপাসনালয় আছে। মুসলমান এমন কি ইস্‌না আশারীয় শী'আদেরকে ও এরা মুসলমান বলে গন্য করে না। এরা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস এবং উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকে। ইসলামী কোন ইবাদত পদ্ধতিই এরা অনুসরণ করে না। তবে নিজেদেরকে মুসলমানদেরই একটি অংশরূপে অভিহিত করে মুসলিম উম্মার চরম সর্বনাশ করে চলছে। আগাখানী সম্প্রদায় বিপথগামী ফির্কার অন্তর্ভুক্ত।[১]

আবদুল্লাহ্ চাকরালভী

চাকরালভী পাঞ্জাবের একটি দল। এরা নিজেদের 'আহ্‌লে কুরআন' বলে দাবী করে। আবদুল্লাহ্ চাকরালভী এ দলের প্রতিষ্ঠাতা বিধায় তার দিকে নিসবত করে তার অনুসারীদেরকে চাকরালভী বলা হয়। এ সম্প্রদায়ের আকীদা সমূহ স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ্ চাকরালভীর লিখিত কিতাব -'برهان الفرقان على صلوة القرآن' এর বরাতে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. কেবলমাত্র কুরআন মাজীদে উল্লেখিত নামায আদায় করাই ফরয। এছাড়া অন্য কোন নামায আদায় করা কুফরী তথা শিরক।

২. কেবলমাত্র কুরআন শরীফ আয়াত সমূহই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ওহী হিসাবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন কিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ হয় নাই।

৩. কুরআন শরীফে যে সকল আহ্‌কামের বর্ণনা রয়েছে এর বাইরে ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.) কোন শরয়ী হুকুম জারী করেছেন এ কথা যে ব্যক্তি বলে, সে 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' এর শানে কি-ই-না বলতে পারে।

৪. আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত অন্য কারো হুকুম মান্য করার অর্থই-ই-হচ্ছে বিশুদ্ধ আমল বরবাদ করা তথা চিরশান্তি প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া। পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ লোক শিরক খফীতে নিমজ্জিত।

৫. রাসূলের (সা.) আনুগত্যের নির্দেশ যেখানে দেওয়া হয়েছে উহা শুধুমাত্র কুরআন মাজীদ। অনুসরণীয় বস্তু দু'টি নয় এবং একটি। কুরআন শরীফ এবং মুহাম্মদ (সা.) নিশ্চয় দু'জিনিস। কিন্তু রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ কুরআন মাজীদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭ ও الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة, ৪৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অন্তর থেকে রাসূল জানি। কিন্তু যে যে আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখনে 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দ দ্বারা কুরআন কারীমই উদ্দেশ্য।

৭. মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কেবল স্বীয় যামানার লোকদের কাছে প্রেরীত হয়েছেন। বর্তমান যামানার কোন লোকদের কাছে তিনি প্রেরিত হন নি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ

অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন কারীম।

৮. إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ এ আয়াতে 'ইত্তিবার' মানে হচ্ছে যে ভাবে আমি কুরআন মাজীদের উপর আমল করি তেমনিভাবে তোমরাও আমল করবে। কোন রাসূল অথবা মু'মিনের অনুসরণ যরূরী নয়।

৯. يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا قُمْتُمْ এ আয়াতের আলোকে অযূতে পা ধোয়া ফরয মাসহ্ বৈধ নয়; চাই খালি হোক কিম্বা মোযা পরিহিত অবস্থায় হোক।

পা মাসহ করার নির্দেশ বা ইংগিত যে সব হাদীসে আছে তা বাতিল এবং একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের অন্তর্ভূক্ত।

১০. কুরআন মাজীদ দ্বারা এ কথা কখনো ও প্রমাণিত নয় যে, লজ্জাস্থান হাত দ্বারা স্পর্শ করলে কিংবা আগুনে পাকানো জিনিস বা উটের গোশ্‌ত ভক্ষণ করলে অযূ ভঙ্গ হয়। যে হাদীসে এ কথার উল্লেখ রয়েছে তা বাতিল।

উপরোক্ত আকীদা ছাড়া তাদের আরও অনেক মতবাদ পাওয়া যায় যা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. আস্‌মানী কিতাব সমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সব কিতাব একই মানের। প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা বলে, যে জিনিসের ভিত্তি আদি থেকে আরম্ভ তা অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে এতে পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। ঠিক তেমনি সকল আসমানী কিতাবই আল্লাহ্ তা'আলার। তাই সব কিতাব একই মানের। لاتبديل لخلق الله

২. নবীগণ সকলেই সমান। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর নবূওয়্যতের সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। দলীল স্বরূপ পেশ করে,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ۝

৩. নামায মাত্র চার ওয়াক্ত। তাহাজ্জুদ, ফজর, যুহর, এবং মাগরিব। এ কথার দলীল হচ্ছে নিম্নে আয়াত দু'টি - رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ

৪. এদের মতে পূর্ব-পশ্চিম দু'দিকই কিব্‌লা।

দলীল হচ্ছে এ আয়াতটি -

www.pathagar.com

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ

৫. নামাযের তাকবীর 'اَللّٰهُ اَكْبَر' নয় বরং 'بسم الله الرحمٰن الرحيم' দলীল স্বরূপ তারা এ আয়াতটি পেশ করে।

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৬. নামাযের আরকান এদের নিকট ১৪টি।

৭. এদের মতে, প্রচলিত আযান নিষিদ্ধ। আসমানী নিদর্শনে নামায আদায়কারী নামাযে উপস্থিত হবে।

৮. অযূতে কেবলমাত্র হাত, মুখ ও পা ধোয়া এবং মাথা মাসহ্ করা যরূরী।যেমন ঃ

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

৯. জানাযার নামাযে হাত বাঁধার বিধান নেই।

১০. রামাযান মাস ৩০ দিনে হয়ে থাকে। দলীল হিসেবে নিম্নের আয়াতটি পেশ করে।

وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, 'আহলে কুরআন' নামধারী চাকরালভী সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে বিপথগামী ফিরকা।[১]

যিন্দীক (زنديق)

যিন্দীক শব্দের বহুবচন হল যানাদিকা। আবূ হাতিম সিজিস্তানী (র.) বলেছেন, যিন্দীক শব্দটি মূলত ফারসী ভাষায় 'زنده كرد' থেকে আরবী করণ করা হয়েছে।

আর এ শব্দটি বৈষয়িক ব্যাপারে তীক্ষ্ন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপকভাবে মুলহিদ এবং দাহ্‌রীকে 'যিন্দীক' বলে হয়ে থাকে। কোন কোন বিশ্লেষণকারী উল্লেখ করেছেন যে, শরয়ী পরিভাষায় যিন্দীক হল,ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে 'ইলাহ্' বলে দাবী করে। আর কেউ বলেছেন, সকল মুশরিক হচ্ছে যিন্দীক।

হাফিয ইব্‌ন হাজার আস্‌কালানী (র.) বলেছেন, সাসানীয়দের শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত ইরানী শব্দ তালিকা হতে 'যিন্দীক' শব্দটি ইরাকে এসেছে। একথা সত্য যে, মাযদিয়ানদের মধ্যে 'যিন্দীক'ছিল এমন ধর্ম বিরোধী দল যারা আবেস্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও রূপক তাৎপর্য উদ্ভাবন করত।[২]

---

১. مولانا محمد شفيع : وصول الافكار إلى أصول الإكفار, পৃষ্ঠা ১৪-১৯।

২. محمد الله علي بن محمد الشوكاني: نيل الاوطار, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪।

www.pathagar.com

'যিন্দীক' শব্দটি মুসলিম ফৌজদারী আইনে প্রয়োগ আছে। এর দ্বারা এমন ধর্ম- বিরোধী ব্যক্তিকে বুঝায়, যার প্রচারণা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। ইব্ন রাওয়ানদী, তাওহীদী এবং মা'আরবী এ তিন ব্যক্তি যিন্দীক নামে পরিচিত। খলীফা মাহ্দীর মতে সরকারী সংস্থায় যিন্দীক হল দ্বিত্ববাদী সংসারত্যাগী। খাশীশের মতানুযায়ী হান্বালীগণ যিন্দীকদের পাঁচটি শ্রেণী স্বীকার করেন।

১. মুআত্তিলা ঃ তারা সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা অস্বীকার করে। তারা পৃথিবীটাকে চারটি মৌলিক পদার্থের অস্থায়ী মিশ্র পদার্থে পরিণত করেছে। ২. মানাবীয়া ৩. মাযদাকীয়াঃ তারা দ্বি-ঈশ্বরবাদী, ৪. আরদাকীয়া ঃ কুফার নিরামিষভোজী ইমামী সংসারত্যাগী, ৫. রূহানিয়াঃ চারটি ভারোন্মাদনাবাদী সম্প্রদায়। তারা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও আইন ও কানূনের শৃংখল মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র সহিত আত্মার প্রেম নিবেদনের মাধ্যমে সম্মিলন কামনা করে।

পশ্চিমাঞ্চলের স্পেন ও মরক্কোর মালিকীগণ সম্বন্ধে কোন কোন গবেষক বলেছেন যে, তারা যিন্দীকের জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রর্বতন করেছেন, বিশেষ করে নবীর (সা.)-এর প্রতি অসম্মান আচরণ ও বিবৃতির ক্ষেত্রে।[১]

বস্তুত যিন্দীক এমন একটি পরিভাষা, যা ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য যারা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শরীক করে অন্য কাউকে ইলাহ্ বলে দাবী করে। এ ছাড়া মুসলিম সমাজে এমন আরও কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যাদের আকীদা ও আমলে শিরক, কুফর ও বিদ্আত পরিলক্ষিত হয়। মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম এ সকল সম্প্রদায়কে শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপথগামী বাতিল ফির্কা বলে অভিহিত করেন।

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

৫

মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর হুকুম-আহ্কাম শিক্ষাদান ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে নবী রাসূলগণের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। সে প্রেক্ষিতে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসাবে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে পবিত্র কুরআন সহ প্রেরণ করেছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে কুরআন অনুযায়ী মানুষকে হিদায়াত করেছেন। এবং সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ইন্তিকালের পর তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবা-ই কিরাম কুরআন ও হাদীসের আলোকে দীনও শরী'আতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা ফকীহ্ ছিলেন, তাঁরা ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ফকীহ্ ছিলেন।

১. যাঁদের ফাত্ওয়া ছিল প্রচুর। যেমন-হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), হযরত আলী মুরতাযা (রা.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ (রা.) প্রমূখ।

২. যাঁদের ফাত্ওয়া প্রথম শ্রেণীর তুলনা কম ছিল। যেমন, হযরত আবূ বকর, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) প্রমূখ।

৩. যাঁদের ফাত্ওয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় আরো কম ছিল। এ সকল ফকীহ্ সাহাবীগণের মধ্যে ও কোন কোন মাস'আলায় ইজতিহাদী ইখ্তিলাফ রয়েছে। তবে তা অতি সামান্য।[১]

সাহাবা ও তাবিঈনের যুগে ইল্মে শরী'আতের ধারকবাহক ফকীহ্ মুফ্তীগণ হিজায, সিরিয়া, মিসর, ইরাক ও অন্যান্য এলাকা সমূহে ছাড়িয়ে পড়েন। মদীনাতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.), সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র.), কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র.) প্রমূখ। মক্কাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.), আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র.), মুজাহিদ (র.), উবাইদ ইব্ন উমাইর (র.) প্রমূখ। বসরাতে আনাস ইব্ন মালিক (রা.), উমর ইব্ন সালামা (র.), আবূ মারইয়াম (র.), হাসান বাসরী (র.), মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) প্রমূখ। সিরিয়ায় হযরত আবূ দারদা (রা.), আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আল-

---

১. আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন, পৃষ্ঠা-১১।

www.pathagar.com

আশআরী (রা.), আবূ ইদ্রীস খাওলানী (র.), শুরাহ্বীল (র.) প্রমূখ। কূফাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.), আলকামা (র.), আসওয়াদ (র.), মাসরূক-হাম্মাদ ইব্ন হারিস (র.), সুফইয়ান সাওরী (র.), আবূ হানীফা প্রমূখ। মিশরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা.) বুকাইর (র.) প্রমূখ। অন্যান্য এলাকায় অপরাপর ফকীহ্ ও মুফ্তীগণ বিদ্যমান ছিলেন।[১]

এ সকল মুফ্তী ও ফকীহ্ গণের উসূল ও নীতিমালার মধ্যে কিছুকিছু পার্থক্য ছিল। উলামা-ই-হিজায সনদ ও মতন সংরক্ষণের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁদের সাহচার্যে যে সকল ফকীহ্ মুফ্তী গড়ে উঠেছেন তাঁরা ও এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ইমাম মালিক (র.) ছিলেন এ সকল ফকীহ্গণের ইল্মের ধারক বাহক।

উলামা-ই-ইরাক হাদীসের অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও রহস্য উদ্ঘাটনের প্রতি অধিক জোর দিতেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানের গড়ে উঠেছিলেন অনেক ফকীহ্ ও মুফ্তী। এ সকল ফকীহ্র ইল্মের উত্তরসূরী ও ধারক-বাহক ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। যিনি তাঁর শাগরিদগণকে নিয়ে ফিক্হ্ ও উসূলে ফিকহ্ সংকলন করেন।

ইমাম মালিক (র.) -এর পর হিজাযের ফকীহ্গণের শিরোমণি ইমাম শাফিঈ (র.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। একদিকে তিনি উলমা-ই-হিজায থেকেও শিক্ষা লাভ করেন। যার ফলে তাঁর উপর হিজাযা ও ইরাক উভয় স্থানের প্রভাব পড়ে। তাই তিনি উভয় স্থানের ফকীহ্গণের ইল্মের সমন্বয় সাধন করে ফিকহ্ সংকলন করেন।

দ্বিতীয় শতাব্দির শুরুতে আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.) শ্রেষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি হিজাযী ইল্মে ধারায় ইল্মে ফিকহ্ সংকলন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের যাহেরি অর্থের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ খাল্লাল তাঁর মাসাইল ও ফাত্ওয়াগুলো 'জামিউল কাবীর' (الجامع الكبير) নামে ২০ খণ্ডে বিরাট গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করেন।

এ ছাড়া ও বিভিন্ন শহর এলাকায় বহু ফকীহ্ মুফ্তী বিদ্যমান ছিলেন। প্রত্যেক শহর ও এলাকার জনসাধারণ স্থানীয় মুফ্তী ও ফকীহ্ ও ফকীহ্গণের অনুসরণের করতে থাকেন। যার ফলে প্রত্যেক এলাকার মুফ্তীর ফাত্ওয়া মাসাইল ঐ এলাকার জন সাধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাযহাবরূপে গৃহীত হয়। আর-এ ভাবেই মাযহাবগুলোর উৎপত্তি ও সূচনা হয়। প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার পূর্বে কিছু কাল যাবৎ নিম্নবর্ণিত মাযহাবগুলো প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। যেমন ইমাম সুফইয়ান সাওরী (র.), ইমাম হাসান বাসরী (র.), ইমাম আওযায়ী (র.) -এর মাযহাব। মুসলিম জনগণ তাঁদের অনুসরণ করত। এ তিনটি মাযহাব হিজরী তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত চালু থাকে। এরপর তাঁদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া ইমাম আবূ সাউর (র.) -এর মাযহাবও তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত চালু থেকে পরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ইমাম দাউদ যাহিরী (র.) -এর মাযহাব ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূন -এর

১. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন, পৃষ্ঠা-১১।

www.pathagar.com

ভাষ্যানুযায়ী হিজরী ৮ম শতাব্দি পর্যন্ত ছিল বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায়। তাছাড়া ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায় (র.) সুফইয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র.) ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) লাইস ইব্‌ন সা'দ (র.) এর মাযহাব ও কিছু দিন পর্যন্ত চালু ছিল। মোটকথা পরবর্তী এক সময়ে এ সব মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বালী এ চারটি মাযহাবই অবশিষ্ট থাকে। মাযহাব অনুসারীগণের সংখ্যা ও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ বা তাক্‌লীদ করাকে অবশ্য করণীয় বলে ফাত্‌ওয়া প্রদান করেন।[১]

হানাফী মাযহাবের বিকাশ

ইসলামে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে এর মধ্যে হানাফী মাযহার সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন সাবিত (র.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় হানাফী মাযহাব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের কাছে এ মাযহাবই সর্বাধিকভাবে সামাদৃত। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মধ্যএশিয়া, তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এ মাযহাব অধিকভাবে প্রসার লাভ করার কারণ হল এ মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন মুজতাহিদকুল শিরোমণি। অনেক মুজতাহিদ নিজে মাযহাব প্রবর্তন না করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অনুসরণ করেছেন। যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.)।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -ই সর্বপ্রথম ফিকহ্ শাস্ত্র প্রণয়ন ও সংকলন করেন। মুজতাহিদ ও প্রখ্যাত উলামা যথা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.), হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (র.), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.), ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ্ (র.), হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র.), ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (র.), আদি ইব্‌ন আমর আল-কাযী (র.), মূহ্ ইব্‌ন আল-মুতী বাল্‌খী (র.), ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ (র.) প্রমূখ চল্লিশ জন ফিকহ্‌বিদ সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বোর্ড গঠন করে ফিক্‌হে হানাফী রচনা ও সংকলন করেন। এ মাযহাবের মাসআলা – মাসাইলকে সহজ-সরলভাবে প্রণয়ন করা হয়। যা মানুষের সাধ্য ও সামর্থের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ মাযহাবের উসূল ও নীতিমালা অত্যাধিক ব্যাপক। মাসাইলের সংখ্যাও প্রচুর। সব বিষয়ের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলার সামাধান এর মধ্যে রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই ১৭০ হিজরীতে খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -কে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফিক্‌হে হানাফী বা হানাফী মাযহাব চালু করেন। ফিক্‌হে হানাফী রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থান পাওয়ার কারণে হানাফী মাযহাব ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।[৩]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) –এর শাগরীদ ছিল অনেক। তাঁরা বিভিন্ন দেশ তথা ইরাক,

১. আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ মাওলানা কাযী আতহার হোসাইন,পৃষ্ঠা ১৯-২১। ২. উমদাতুর রি'আয়াহ্,৭ পৃষ্ঠা।
৩. আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ কাযী মুহাম্মদ আতহার হোসাইন,১৯-২১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

বলখ্, খুরাসান, সমরকন্দ, বুখারা,রায়, সিরাজ, তুনিস, জানজান, ইস্তারাবাদ, বুস্তাম, ফারগানা, দামগান,খাওয়ারিজাম ও ভারত ইত্যাদি স্থান সমূহে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সর্বত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব প্রচার করেন। বিভিন্ন এলাকার উলামায়ে কিরাম মুসলিম জনগণ এ মাযহাব গ্রহণ করেন । তাঁরা তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেন। এবং বিভিন্ন কিতাবাদি রচনা করে এ মাযহাবের প্রসারতা বৃদ্ধি করেন।[১]

বসরায় হানাফী মাযহাব প্রচারে ইমাম যুফার (র.) -এর বুদ্ধিমতা

বসরায় উসামান বাত্তী (র.) ছিলেন প্রখ্যাত ফকীহ্ ও মুফ্তী । ইমাম যুফারের (র.) পূর্বে ইমাম আবূ হানীফার বিশিষ্ট শাগরিদ খালিদ সিম্তী (র.) শিক্ষা-সমাপনের পর বসরায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দারসের মজলিস কায়েম করে ইমাম আবূ হানীফার (র.) মাযহাব প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মজলিসে যখন তিনি উসমান বাত্তীর মতের খিলাফ ইমাম আবূ হানীফার মত বর্ণনা করতেন তখন উসমান বাত্তির শাগরিদরা তাঁকে শুধু গালমন্দই নয় বরং প্রহার করতেও উদ্ধত হত। তাই খালিদ সিম্তী (র.) সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব প্রচার করতেন ব্যর্থ হন।

এরপর ইমাম যুফার (র.) বসরায় গমন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তিনি প্রথমে নিজের মজলিসকায়েমনাকরে উসমান বাত্তীর দরসে বসে পড়েন। উসমান বাত্তী (র.) কোন ব্যাপারে মাসআলা বললে তিনি বলতেন, এ ব্যাপরে আরো একটি সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত রয়েছে। উসমান বাত্তী (র.) তা জানতে চাইলে তিনি তা ইমাম আবূ হানীফার (র.) উসূল ও নীতিমালা ব্যক্ত করেন। শক্তিশালী প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির কারণে উসমান বাত্তী (র.) তা মানতে বাধ্য হতেন। ইমাম যুফার (র.) যখন বুঝতে পারতেন যে, মজলিসে সকল ছাত্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তখন তিনি বলতেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। তা শুনে মজলিসে অংশ গ্রহণকারীরা বলে উঠত, যে-ই বলুক না কেন এটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য অভিমত। এ কৌশল অবলম্বনে ধীরেধীরে মজলিসের সকল ছাত্র ইমাম যুফারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং বাত্তীর দরস বর্জন করে ইমাম যুফারের দরসে ভীড় জমাতে থাকেন। সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাবের প্রসার লাভ করে।[২]

আফ্রিকায় ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফাররূখ (র.) হানাফী মাযহাব প্রচার করেন। যখন ইমাম আসাদ ইব্ন ফুরাত সেখানকার কাযী (বিচারপতি) মনোনীত হন; তখন এ মাযহাবের আরো উন্নতি সাধিত হয়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দি পর্যন্ত আফ্রিকায় হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। এরপর যখন সেখানে মু'আয ইব্ন বাদিস -এর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি সেখানে মালিকী মাযহাব চালু করেন। স্পেনে মুসলিম শাসনের প্রথম যুগ থেকেই হানাফী মাযহাব প্রচলিত ছিল।[৩]

১. উমদাতুর রি'আয়াহ্,৭ পৃষ্ঠা। ২. লামহাতুন নাযার ফী সীরাতিল ইমাম যুফার (র.)।
৩. .আইম্মা আরবা'আহ্; কাযী মুহাম্মদ আতহার হোসাইন, ১৯-২০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

চতুর্থ শতাব্দির প্রসিদ্ধ পর্যটক মুকাদ্দাসী বাশ্শারীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, সেকালে ইয়ামন ও সান্আতে হানাফী মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইরাকের অধিকাংশ ক্বারী ও ফকীহ্ হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। সিরিয়ার প্রত্যেক শহর ও গ্রামে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বিদ্যমান ছিল। অনেক সময় প্রাচ্যের দেশসমূহে তথা খুরাসান, সিজিস্তান, পশ্চিম ও পূর্ব তুর্কিস্তান ইত্যাদি স্থানে হানাফী মাযহাবে প্রাধান্য ছিল। জুরজান ও তাবরিস্তানের কিছু এলাকায় হানাফী মুসলিম বিদ্যমান ছিল। আবিসিনিয়া, তাবরীয ও আহওয়ায এলাকা সমূহে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্যতা ছিল। এ সকল এলাকার উলামা, ফকীহ্ ও ক্বারী হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পারস্যে হানাফী মাযহাবের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

সিন্ধুর শহর ও গ্রামে হানাফী ইমাম ও ফকীহ্তে পরিপূর্ণ ছিল। হিন্দুস্তানের অধিকাংশ বাদশাহ ও মুসলিম জনগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ও আছেন।

মালিকী মাযহাবের বিকাশ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দ্বিতীয় মাযহাব মালিকী মাযহাব। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) এ মাযহাবের প্রবর্তক। মদীনা মুনাওয়ারা থেকেই এ মাযহাবের উৎপত্তি হয়। তারপর হিজাযের বিভিন্ন এলাকা প্রসার লাভ করে ও এরপর বসরা, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন, সিসিলী ও সুদানে এরপরে খুরাসান, কাযবীন, আযহার, ইয়ামান, নিশাপুর, পারস্য, রোম ও সিরিয়ার শহরসমূহে ব্যাপক বিস্তৃত হয়। ইমাম আবদুর রহীম ইব্ন মালিক সর্বপ্রথম মিসরে মালিকী মাযহাব প্রচলন করেন। তারপর আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম -এর ব্যাপক প্রচার করেন। সে সময় ইমাম মালিক (র.) -এর বহু শাগরিদ মিসর বিদ্যমান থাকায় সেখানে মালিকী মাযহাব যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। মু'আয ইব্ন বাদীস তাঁর শাসনামলে বিশেষ পদে তথা আমীরও কাযী ইত্যাদি মালিকী মাযহাবের ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করেন। ফলে পশ্চিম আফ্রিকায় মালিকী মাযহাব প্রাধান্য পায়।

ইমাম তকী উদ্দীন সুবকী 'আল-ইকদুস্-সামীন' কিতাবে লিখেন, এ যুগে অর্থাৎ নবম শতাব্দিতে পশ্চিমাদেশ সমূহের (أهل مغرب) অধিকাংশ মুসলমান মালিকী মাযহাব অনুসারী।

স্পেনে প্রথম ইমাম আওযাঈর (র.)-এর মাযহাব প্রচলিত হয়। সা'সা ইব্ন সালাম ইমাম আওযাঈর মাযহাব সেখানে চালু করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় শাতাব্দির পরপর তা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেকালে মালিকী মাযহাব প্রসার লাভ করে। ইমাম মালিক (র.) -এর বিশিষ্ট শাগরিদ যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান, গাযী ইব্ন কায়স, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কায়স, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া মাসমূদী প্রমূখ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে স্পেনে এসে আওযাঈ মাযহাবের স্থলে মালিকী মাযহাবের প্রচার-প্রসার করেন। স্পেনের খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুর রহমান মালিকী মাযহাব অনুসরণ করার নির্দেশ জারী করেন। খলীফা হিশাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে অত্যধিক ভক্তি করতেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাযী পদে নিয়োগ করতেন। এ ছাড়া

www.pathagar.com

অন্যান্য সরকারী পদের লোক নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর সুপরামর্শ গ্রহন করতেন। এসব কারণে স্পেনে মালিকী মাযহাব প্রসার লাভ করে।

শাফিয়ী মাযহাবের বিকাশ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তৃতীয় ফিকহী মাসলাক হল 'শাফিয়ী মাযহাব'। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিস শাফি'য়ী (র.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। মিসরে এ মাযহাব উৎপত্তি হয়। ইমাম শাফি'য়ী (র.)-এর অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন মিসরীয়। এরপর ইরাকেও এ মাযহাবের বিকাশ ঘটে। তৃতীয় শতাব্দিতে হিজায, বাগদাদ, খুরাসান, তুরান, সিরিয়া, ইয়ামন, মা-ওয়ারাউ ন্নাহার, পারস্য, ভারত, আফ্রিকা ও স্পেন পর্যন্ত তা অনুপ্রবেশ করে। এ সকল জায়গায় কোথাও কোথাও শাফি'য়ী মাযহাব প্রাধান্য লাভ করে। আর কোথাও কোথাও অন্যান্য মাযহাব। মিসরে প্রথমে হানাফী ও মালিকী মাযহাব প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইমাম শাফি'য়ী (র.) যখন সেখানে গমন করেন তখন থেকে সেখানে শাফি'য়ী মাযহাব বিস্তৃতি লাভ করে। ইরাক ও খুরাসান মা-ওয়ারাউন্নাহার এলাকায় দারস ও ফাত্ওয়া প্রদানের হানাফী মাযহাবের সঙ্গে শাফি'য়ী মাযহাবের আলোচনা হত। সিরিয়ায় প্রথম ইমাম আওযায়ীর মাযহাব চালু ছিল। কিন্তু আবূ যুরআহ মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান দামেস্কী যখন দামেশ্‌কের কাযী হন তখন তিনি সেখানে শাফি'য়ী মাযহাব চালু করেন। তারপর অন্যান্য কাযীগণও মাযহাব গ্রহন করেন। আবূ যুরাআহ দামেশ্‌কীর কৌশল ছিল কোন আলিম শাফি'য়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুখ্‌তাসার লিল মুযানী' (المختصر للمزنى) মুখস্থ করলে তাকে এক দিনার পুরস্কার দিতেন। আল্লামা মাক্‌দাসী লিখেন যে, চতুর্থ শাতাব্দিতে সিরিয়ায় শাফি'য়ী মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবই প্রচলন ছিল না।

ইমাম সুবকী (র.) 'তাবাকাতুশ্‌ শাফিইয়্যা' নামক গ্রন্থে লিখেন যে, মাওয়ারাউন্নাহার এলাকায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল মারওয়া (র.),শেখ শাদী (র.)-এর সহযোগিতায় শাফি'য়ী মাযহাব প্রচার করেন। আল্লামা মুকাদ্দাসী (র.) বলেন যে, প্রাচ্যের দেশ তথা কাওর, শাশ, আবলাক, তুস, আবী ওয়ারদ ও কাসা ইত্যাদি স্থানে শাফি'য়ী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। সারখাস, নিশাপুর ও মারু এলাকায়ও শাফি'য়ী মাযহাবের প্রচলন ছিল। ইসফারাইন (إسفرائن) এ আবূ বার'যা ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক নিশাপুরী শাফি'য়ী মাযহাব এবং এ মাযহাবের কিতাবাদি প্রচলন করেন।

বাগাদদে হানাফী মাযহাবের ছিল প্রাধান্য। ইমাম শাফি'য়ী সেখানে গিয়ে স্বীয় মাযহাব প্রচলিত করেন। ইমাম সুবকীর বর্ণনা করেন যে, আরবের তেহামা এলাকায় শাফি'য়ী মাযহাব প্রচলিত ছিল। স্পেনে এককভাবে মালিকী মাযহাব প্রচলিত ছিল। যদি সেখানে কোন হানাফী বা শাফি'য়ী লোক পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে বের করে দেওয়া হতো। আল্লামা ইব্‌ন আসীর (র.) বলেন, আফ্রিকায় ইয়াকূব ইব্‌ন ইউসূফ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন তাঁর শাসন আমলের

www.pathagar.com

শেষভাগে শাফি'য়ী মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে যান এবং শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারীগণকে কাযী পদে নিয়োগ করেন।১

হাম্বলী মাযহাবের বিকাশ

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চতুর্থ ফিক্‌হী মাসলাক হল 'হাম্বলী মাযহাব"। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) এই মাযহাবের প্রবর্তক। বাগদাদ ছিল এ মাযহাবের কেন্দ্র। প্রাথমিক পর্যায়ে এ মাযহাবের প্রচার অন্য তিনটি মাযহাবের তুলনায় কম ছিল। আল্লামা ইব্‌ন খালদূন এর কারণ বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, ফিকহী হাম্বলীতে ইজতিহাদের ব্যবহার ছিল খুব কম। এ মাযহাবের মাসআলা-মাসাইল নিরূপণে যাহেরী আহাদীস ও নসূসের উপরই অধিকতর নির্ভর করা হতো। যে সকল হানাবিলা ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থান করতেন, তাঁরা ছিলেন আহ্‌লে হাদীস ও রেওয়াতের বর্ণনায় অগ্রগামী। আল্লামা ইব্‌ন কারহুন বলেন যে, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলের মাযহাব বাগদাদ অতিক্রম করে সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকায় প্রসারিত হয়। সপ্তম শতাব্দির পর সিরিয়ায় হাম্বলী মাযহাব প্রধান্য লাভ করে। আল্লামা সুয়ূতীর বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, চতুর্থ শতাব্দিতে বাগদাদ ও ইরাকের সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য দেশও হাম্বলী মাযহাব প্রসার লাভ করে। ইমাম আবদুল গণী মুক্‌দাসী (র.) মিসরে সর্বপ্রথম এ মাযহাব প্রচলন করেন। আল্লামা মুকদাসী (র.) বলেন, চতুর্থ শতাব্দিতে বস্‌রা, আকওয়ার দায়লাম, বিহার, সুম, খুজিস্তান ইত্যাদি এলাকায় হাম্বলী মাযহাব বিদ্যমান ছিল। আল্লামা ইব্‌ন আছীর ৩২৩ হিজরীর গণনায় উল্লেখ করে বলেন, সে সময় বাগদাদে হাম্বলী মাযহাবের এত অধিক প্রভাব ছিল যে, মাযহাবের লোকেরা আমীর ওমরাদের বাড়ীতে নবীয শরাব ইত্যাদি পেলে তা ঢেলে দিত। নর্তকী ও গায়িকাদের প্রহার করত। গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলত। শরী'আত বিরোধী কাজের উপর তারা এত কঠোরতা অবলম্বন করেছিল যে, বাগদাদবাসী এতে অস্থির হয়ে পড়ে। ফলে বাগদাদে সরাসরীভাবে এ ঘোষণা করা হয় যে, দুই হাম্বলী যেন একত্রিত হতে না পারে এবং হাম্বলী মাযহাবের কোন আলোচনা যেন করা না হয়। এর পূর্বে 'খালকে কুরআনের ফিত্‌না'এবং আব্বাসী খলীফা ও মু'তাযিলাদের বিরোধিতা হাম্বলী মাযহাব বিকাশে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে। বর্তমানে এ মাযহাবের প্রাধান্য নায্‌দ এলাকা ব্যতীত অন্য কোথায়ও আছে বলে জানা যায় না। বর্তমান যুগে মাযহাবের চতুষ্ঠয়ের অনুসারী মিসরের প্রসিদ্ধ দার্শনিক আল্লামা আহমাদ তাইমুর 'নুযরাতুন তারিখিয়্যাতিন ফি'ল মাযাহিবি'ল আরবা'আহ ওয়া ইন্‌তিশারুহা' (نظرة تاريخية في المذاهب الأربعة وانتشارها) গ্রন্থে লিখেন-বর্তমানে এপৃথিবীতে মাযহাবের চুতুষ্টয়ের অনুসারী কোথায় কত সংখ্যক আছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে প্রশ্চাত্য, তুনিস, আল জাযাইর এবং আফ্রিকার কিছু কিছু এলাকায় মালিকী মাযহাবের প্রাধান্য রয়েছে। এসকল এলাকায় তুর্কী বংশের সংগে সম্পৃক্ত কিছু সংখ্যক হানাফীও বিদ্যমান আছে। মিসরে শাফি'য়ী ও মালিকী মাযহাব অবলম্বী লোকদের

১. আইম্মা-ই- আরবাহ্‌ ঃ কাযী আতহার হুসাইন, ২৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

সংখ্যা প্রচুর। সাদ ও সুদানে মালিকী মাযহাব পন্থীদের সংখ্যা অনেক। তবে হানাফীর সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। অবশ্য কিছু সংখ্যক হানাবেলাও সেখানে বিদ্যমান রয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সিরিয়ার অর্ধেক হানাফী, এক চতুর্থাংশ শাফি'য়ী এবং এক চতুর্থাংশ হাম্বলী। ফিলিস্তিনে শাফি'য়ীমাযহাবের প্রাধান্য বিদ্যমান। হানাফী এবং মালিকীও রয়েছে। ইরাকে হানাফী মাযহাব অধিক প্রচলিত। তবে শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীও আছে। তুরস্ক, আলবেনীয়া, বালকান এলাকায় হানাফী মাযহাবের আধিক্য বিদ্যমান। কুরদিস্তান ও আরমেনিয়ায় শাফি'য়ী মাযহাবের প্রভাব অধিক। পারস্যে শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী বেশী। সেখানে কিছু সংখ্যক হানাফীও রয়েছে। পশ্চিম তুর্কীস্তান তথা বুখারা, তাসখন্দ, উজবেকিস্তান, তুর্কমানিয়া, কাযাগায়রাহ, কাযাকিস্তান ও আযারবায়জান ইত্যাদি স্থানের অধিবাসী হানাফী মাযহাবের অনুসারী। পূর্ব তুর্কিস্তানের অধিবাসী হানাফী কিন্তু কিছু সংখ্যক শাফিয়ীও রয়েছে। কাওকায শহরে হানাফীদের প্রভাব অধিক। তবে সেখানে শাফি'য়ীমাযহাবের অনুসারীও কিছু রয়েছে। সিন্ধুতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। হিন্দুস্তানের পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় আরব বংশীয় লোক বসবাস করত। তারা শাফি'য়ীমাযহাবের অনুসারী ছিল। কাওকান, মালাবর ও মনদরাজের অধীবাসী শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী। হিন্দুস্তানের অন্যান্য এলাকাও পাকিস্তান বাংলাদেশে হানাফী মাযহাব প্রচলিত। মালদ্বীপ এর এক লক্ষ মুসলমান অধিবাসী সকলেই শাফি'য়ী মাযাহাবের অনুসারী। শ্রীলংকা, জাবা, সুমাত্রা, পূর্ব ভারতের দ্বীপসমূহ এবং ফিলিপাইন এলাকার দ্বীপসমূহে শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারীই অধিক। থাইল্যান্ডের অধিকাংশ মুসলমানই শাফি'য়ী কিছু হানাফীও রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ মুসলমান শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী।

আমেরিকার ব্রাজিল এলাকায় পঞ্চাশ হাজার হানাফী মুসলমান বাস করে। আমেরিকার প্রায় দেড় লক্ষ * মুসলমান বসবাস করছে। তার মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী রয়েছে। হিজাযে শাফি'য়ীও হানাফী মাযাহাবের প্রাধান্য, তবে গ্রাম এলাকায় আহনাফের সংঙ্গে মালিকীও বিদ্যমান রয়েছে। নাজ্‌দের অধিবাসীরা সকলেই হাম্বলী।আদ্‌ন, ইয়ামন ও হাজারামাউত এলাকাবাসী শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী। আদ্‌ন শহরে আহ্‌নাফও রয়েছে। ওমানে শাফি'য়ী ও হাম্বলী মাযাহাবের অনুসারী রয়েছে। কাতার ও বাহরাইনে মালিকী মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সেখানে হানাবেলাও বিদ্যমান রয়েছে। ইহ্‌সা এলাকায় হাম্বলী ও মালিকী মাযহাবের প্রধান্য। কুয়েতে মালিকী মাযহাবের প্রভাব খুব বেশী।

---

* এ সংখ্যা বহুদিন পূর্বের, বর্তমানে আমেরিকায় মুসলমান সংখ্যা পনের লক্ষাধিক।

www.pathagar.com

৬

ইমাম, মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরাম

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)

বংশ পরিচয় :

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) হলেন প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফা। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ - আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত ইব্ন নু'মান মারযুবান। কারো মতে তাঁর দাদার নাম ছিল যূতী। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন একজন তাবিঈ। তিনি ইমাম আবূ হানীফা নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক। পৃথিবীতে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, ৬৩ হিজরী, কেউ বলেন ৭০ হিজরী, আবার কেউ বলেছেন ৮০ হিজরী সন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের শাসনামালে ৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে প্রখ্যাত গবেষক লেখক আল্লামা যাহিদ আল-কাওসারী বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যে ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্ম সন হিসাবে ৭০ হিজরী সালকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) -এর পিতামহ যূতী কাবুলের অধিবাসী একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কূফায় আগমন করেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) -এর পৌত্র ইসমাঈল বলেন, আমরা বংশীয়ভাবে পারস্যের অধিবাসী ছিলাম। আমার পিতামহ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) -এর পিতা সাবিত হযরত আলী (রা.) -এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁর নিকট নিজের ও তাঁর বংশধরদের কল্যাণের জন্য দু'আ করার আবেদন জানান। হযরত আলী (র.) তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য দু'আ করেন। সম্ভবত এ দু'আর বরকতেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) এত বড় জ্ঞানের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ ইমাম হতে

---

১. আস্‌সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত্ তাশরীঈল ইসলামী : ড. মুস্তাফা হুসনী আস্ সুবাঈ, ৪০১পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

পেরে ছিলেন। তিনি কূফায় তায়মুল্লাহ ইব্ন সা'য়ালাবাহ গোত্রের মিত্র ছিলেন বলে তাঁকে তায়মুল্লাহ্ও বলা হয়।[১]

শিক্ষা

সেকালে ইসলামী শহরগুলোর মধ্যে কূফা নগরী ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বড় বড় উলামা, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার সমাবেশের ফলে কূফা নগরী সে কালের ইলমের মারকায ও কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নাহু, সরফ, হাদীস, ফিকহ্, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞান চর্চার মারকায হিসেবে কূফা ছিল সারা পৃথিবীর নিকট সুপরিচিত।[২]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি সর্বপ্রথম ইল্‌মে কালাম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এই বিষয়ে এত গভীরতা ও পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লোকেরা তাঁর দিকে ইশারা করে বলত তিনি হলেন, ইল্‌মে কালামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। সে কালের যিন্দীক, নাস্তিক ও বাতিল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মুনাযারা করে তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নিজের বক্তব্য যে, শুধুমাত্র মুনাযারা ও বাহাসের উদ্দেশ্যে আমাকে বিশ বার বসরায় গমন করতে হয়েছে।[৩]

কোন কোন সময় পূর্ণ এ বছর আবার কোন কোন সময় প্রায় এ বছরকাল বসরায় অবস্থান করে খারিজী, হাসবিয়া ইত্যাদি বাতিল ফিরকার মুকাবিলায় আমাকে বাহাস করতে হয়েছে। সে সময় ইল্‌মে কালামই ছিল আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। একেই দীন ও শরী'আতের সবচেয়ে মৌলিক জ্ঞান বলে আমি ধারণা করতাম। এবং এ দ্বারাই দীনের বিরাট খিদমত হয় এ-ই ছিল আমার বিশ্বাস। এরপর আমি ভেবে চিন্তে দেখলাম যে, হযরত সাহবায়ে কিরাম ও তাবিঈন আমাদের তুলনায় দীন ও শরী'আতের ব্যাপারে অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। তথাপি তারা তর্ক-বিতর্ক ও বাহাস-মুবাসায় লিপ্ত হননি। বরং দীনের বাপারে তর্ক-বিতককে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তাঁরা তো শরী'আতের ফিকহী মাসআলা, মাসাইল ও আহ্‌কামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং এ জন্য ইল্‌মী হাল্‌কা ও মজলিস কায়েম করেছিলেন। এ সময় আমাকে এক মহিলা একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে আমি এর উত্তর না দিতে পেরে বড় লজ্জিত হলাম। তখন আমি ইল্‌মে কালাম বাদ দিয়ে ফিকহ্ ও হাদীস শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করলাম।[৪]

তারপর তিনি সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ইমাম হাম্মাদ (র.) -এর ইল্‌মী হাল্‌কায় শরীক হয়ে ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে ফিকহ্ অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম হাম্মাদ (র.) -এর দারসের এ মজলিস হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত

---

১. আখবারুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া আসহাবিহী ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন আলী আস- সীমিরী, ৩ পৃষ্ঠা ; আইম্মা আরবা'আহ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৩৪ পৃষ্ঠা। ২. আখবারে আবূ হানীফা ওয়া আসহাবিহী ঃ সীমিরী, আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন। ৩. আস্‌সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ঈল ইসলামী ঃ ড. মুস্তাফা হুসনী আস্ সুবাঈ, ৪০১পৃষ্ঠা। ৪. আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৪০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ছিল। কেননা হাম্মাদ (র.) ইব্রাহীম নাখ্‌ঈ,হযরত আল্‌কামা (র.) থেকে এবং হযরত আলকামা (র.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করেছেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ইমাম হাম্মাদ (র.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত (১২০ হিঃ) মোট আঠার বছরকাল অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিয়মিতভাবে তাঁর নিকট থেকে ইল্‌মে হাদীস ইল্‌মে ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করেন। যার ফলে ইমাম হাম্মাদের (র.) মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্রগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং কূফায় অবস্থিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। পরবর্তী সময়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 'মাদ্‌রাসাতুর রায়' নামে খ্যাতি অর্জন করে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) সমগ্র ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ হিসাবে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন এবং সারা বিশ্বে তাঁর ইল্‌ম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ২২ বছর বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র ইল্‌মে কালাম শিক্ষায় রত ছিলেন তা-ই নয় বরং সাথে সাথে ইল্‌মে হাদীসও শিক্ষা করেছেন। তবে ঐ সময়ে তিনি ইল্‌মে হাদীস শিক্ষার তুলনায় ইল্‌মে কালামকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ২২ বছর বয়সের পর থেকে তিনি কেবলমাত্র ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে ফিকহ্ শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাম্মাদের (র.) সাহচর্যে থাকাকালীন দরসের অবশিষ্ট সময়ে তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণের খিদমতে হাযির হয়ে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ফিকহ্ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইমাম হাম্মদ (র.) যেমন ছিলেন তাঁর বড় উস্তাদ। তেমনি হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে আমির শা'বী ছিলেন তাঁর বড় উস্তাদ। একবার ইমাম সাহেব হাদীসের উস্তাদ আ'মাশের দরবারে উপস্থিত হলে উস্তাদ তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেন। উস্তাদ আ'মাশ বললেন, তুমি কোন্ দলীলের ভিত্তিতে এ উত্তর দিয়েছ ? তখন ইমাম সাহেব বললেন, আপনার কাছ থেকে যে হাদীস শিক্ষা করছি তার ভিত্তিতে উত্তর দিয়েছি। ইমাম আ'মাশ তখন বললেন, হে ফকীহ্ সম্প্রদায় ! তোমরা হলে ডাক্তার আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) বলতেন, ঐ ব্যক্তিরই হাদীস বর্ণনা করবার অধিকার রয়েছে যিনি হাদীস শ্রবণ করে তা মুখস্থ রাখতে পারেন। ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন বলেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) মুখস্থ ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেন না।[২]

সেকালের ইল্‌মী মারকায-বসরা, মক্কা মুয়ায্‌যমা ও মদীনা মুনাওয়ারার শ্রেষ্ঠ উলামা-ই-কিরাম ও ইমামগণের সথে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) -এর সাক্ষাত ঘটে। আব্বাসী খলীফা মানসূর যখন বাগদাদ নগরী স্থাপন করেন। তখন বাগদাদের উলামা ও মাশাইখের সংগে তাঁর সাক্ষাত লাভ এবং এ সকল উলামা ও মাশাইখের সংগে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বিভিন্নভাবে ইল্‌মী আলোচনা ও পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব আলোচনার মাধ্যমে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) যেমনিভাবে তাঁদের থেকে ইলমী ফায়দা লাভ করেন অনুরূপভাবে তাঁরাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন। ফলে

১. আস্‌সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ঈল ইসলামী ঃ ড. মুস্তাফা হুসনী আস্ সুবাঈ, ৪০১পৃষ্ঠা।

২. আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৪২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) -এর সুখ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ে যে তাঁর ইল্‌মী হালকা বিশাল সমাবেশরূপে পরিণত হয়। যার এক দিকে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক ও হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ অপরদিকে ছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান, যুফার, হাসান ইব্‌ন যিয়াদের মত ফকীহ্‌গণ।[১]

ইমাম সাহেবের উস্তাদবৃন্দ

ইমাম আ'যম হানীফা (র.) অসংখ্য উস্তাদ থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করেছিলেন। আবূ হাফ্‌স কাবীরের নির্দেশে ইমাম সাহেবের উস্তাদগণের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল তার মধ্যে চার হাজার উস্তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। 'উকদুল জুমান' গ্রন্থে তাঁর দুই শ' আশি জন উস্তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে আবূ হানীফা (র.) -এর কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ উস্তাদের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলাইমান (র.), ২. আমির ইব্‌ন শূরাহ্‌বীল হিমাইরী কূফী (র.), ৩. আল কামা ইব্‌ন মারসাদ কূফী (র.), ৪. হাকাম ইব্‌ন কুতায়বা কূফী (র.), ৫. আসিম ইব্‌ন আবুন-নাজওয়াদ কূফী (র.), ৬. সালমান ইব্‌ন কুহায়েল কূফী (র.), ৭. আলী ইব্‌ন আকমার কূফী (র.), ৮. যিয়াত ইব্‌ন আলফাহ্ কূফী (র.), ৯. হায়সাম ইব্‌ন হাবীব (র.), ১০. আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ মক্কী (র.), ১১. সাঈদ ইব্‌ন মাসরুক সাওরী (র.), ১২. আবূ জা'ফর আল-বাকের মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র.), ১৩. আদী ইব্‌ন সাবিত আন্‌সারী, ১৪. আতিয়্যা ইব্‌ন সাঈদ আওফী (র.), ১৫. আবূ সুফইয়ান সাদী (র.), ১৬. আবূ উমায়্যা আবদুল কারীম (র.), ১৭. আবূ মুযারিফ বাসরী (র.), ১৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আন্‌সারী (র.), ১৯. ইহ্‌শাম ইব্‌ন উরওয়ার মাদানী (র.), ২০. নাফি ইব্‌ন মাওলা ইব্‌ন উমার মাদানী (র.), ২১. আমর ইব্‌ন দীনার মাক্কী (র.), ২২. আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন হরমুয আল-আ'নাজ মাদানী (র.), ২৩.কাতাদাহ্ ইব্‌ন দাআমাহ বাসরী (র.) ২৪. আবূ ইসহাক সাবী'ঈ কূফী (র.), ২৫ .মুহারিব ইব্‌ন দিসার কূফী (র.) ২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র.) ২৭. সিমাক ইব্‌ন হারব কূফী (র.) ২৮. কায়স ইব্‌ন মুসলিম কূফী (র.) ২৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সুহায়েব কূফী, ৩০. আবদুল আযীয ইব্‌ন কাফী মাক্কী, ৩১. আবূ যুবায়ের মুহাম্মদ মুসলিম মাক্কী, ৩২. মানসুর ইব্‌ন মু'তাসির কূফী, ৩৩. সুলাইমান ইব্‌ন মেহরান (র.) এবং অনেক বিখ্যাত তাবি'ঈ।[৩]

অধ্যাপনা

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর প্রধানতম উস্তাদ হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মানের মৃত্যুর পর সর্ব-সম্মতিক্রমে ইমাম আবূ হানীফাকে তাঁর স্থলাভিষিক্তি করা হয়। ইমাম সাহেব প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীয় উস্তাদের স্থালাভিষিক্ত হয়ে হাল্‌কা কায়েম করতে ইতস্তত করছিলেন। এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কবর খনন করছেন। এতে ইমাম সাহেব খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি বসরা গমন করে এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র.) -এর নিকট স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, "স্বপ্নদ্রষ্টা

১. প্রাগুক্ত ২. তাহযীবুত তাহযীব, ১০ খণ্ড, ৩৩৯-৭৮পৃষ্ঠা। ; তাযাকরিআতুলহুফ্‌ফায, ১ম খণ্ড, ১৫৯ ৭৮পৃষ্ঠা ; আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৬৭ পৃষ্ঠা। ৩. আখবারু ইমাম আবূ হানীফা ওয়া আসহাবিহী ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন ইব্‌ন আলী আস- সীমিরী, ৩ পৃষ্ঠা ; আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৮৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর হাদীসের ভাণ্ডার বিকশিত করবেন"। এরপর থেকে ইমাম সাহেব প্রসন্ন মনে ফিকহ্ ও ফাত্ওয়ার দরস দিতে শুরু করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ইমাম সাহেবের দরস ও তাদরীসের সুখ্যাতি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আলিমগণ তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ওয়াকী ইব্ন জাররাহ্ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কি করে ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, যেখানে তাঁর হালকায় সর্ব বিষয়ের যোগ্য ও পারদর্শী ব্যাক্তিবর্গ বিদ্যমান আছেন। যেমন, ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার (র.) সহ বহুসংখ্যক আলিম ইমাম সাহেবের দরসে শরীক হতেন। এর মধ্যে দশজন এমন যাঁরা কখনও অনুপস্থিত থাকতেন না। তাঁদের মধ্যে চারজন এমন ছিলেন যাঁদের ফিকহ্ কণ্ঠস্থ ছিল। যেমন- যুফার, আবূ ইউসুফ, আসাদ ইব্ন আমর, আলী ইব্ন মুসহির (র.) প্রমুখ।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)- এর হাজার হাজার ছাত্র ছিল। তৎকালে অন্য কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহ্ -এর এত সংখ্যক ছাত্র ছিল না। মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারাহ, দামেশ্ক, বাসরা, কূফা, ওয়াসিত, মুসিল, জাযীরা, রিক্কাহ্, রামল্লাহ্, মিসর, ইয়ামন, বাহরাইন, বাগদাদ, আওয়ায, কিরমান, ইস্পাহান, ইস্তারাবাদ, হালওয়ান,হামদান, দামগান, তাব্রাস্তান, জুরজান, সারখ্সী, নিসা, মারু, বুখারা, সামরকন্দ, তিরমিয, বলখ্, কুহেস্তান, খাওয়ারিযাম, সিজিস্তান, মাদায়েন, হিমস্ ইত্যাদি এলাকার হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইমাম সাহেবের দরসে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা লাভ করেছেন। 'উকদুল জুমান' গ্রন্থের লিখক উক্ত কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর আটশ' শাগরিদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু সংখ্যক ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও কাযী ছিলেন। ইমাম সাহেবের কিছু প্রসিদ্ধ ছাত্রের মধ্যে কাযী আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান শায়বানী, যুফার ইব্ন হুযায়ল আম্বরী, হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা, হাসান ইব্ন যিয়াদ, আবূ ইসমাত নূহ্ ইব্ন মারয়াম, কাযী আসাদ ইব্ন আমর, আবূ মুতী' হাকাম ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলখী, মুগীরা ইব্ন মিকসাম, যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়দা মিসআর ইব্ন কুদাম, সুফইয়ান সাওরী, মালিক মিগওয়াল, ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক, দাউদ তাঈ, হাসান ইব্ন সালেহ্, আবূ বক্র ইব্ন আইয়্যাশ, ঈসা ইব্ন ইউনুস, আলী ইব্ন মুসহির, হাফস ইব্ন গিয়াস, আবূ আসিম নাবীল, জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক, ওয়াকী' ইব্ন জাররাহ্, আবূ ইসাহাক ফাযারী, ইয়াযীদ ইব্নু হারুন, মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম, আবদুর রায্য়াক ইব্ন হাম্মাদ সান'আনী, আবদুর রহমান মুকরী, হায়শাম ইব্ন বশীর, আলী ইব্ন আসিম, জাফর ইব্ন আওন, ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান, হাম্যাহ ইব্ন হাবীব আয-যায়্যাত,

১. আখবারু ইমাম আবূ হানীফা ওয়া আসহাবিহি ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন আলী আস- সীমিরী, ৩ পৃষ্ঠা ; আইম্মা আরবা'আহ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৮৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইয়াযীদ ইব্ন রাফী, যুবায়, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামান, খারিজা ইব্ন মুসআব, মুসআব ইব্ন কুদাম, রাবীয়া ইব্ন আবদুর রহমান রাঈ মাদানী (র.) প্রমুখ।[১]

রচনাবলী

ফিকহী মাসাইলের সংকলন ও রচনার প্রচলন নিয়মিতভাবে দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুরু হয়। এ সময়ে বিজ্ঞ বিজ্ঞ উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন স্থানে কিতাবাদি লিখা আরম্ভ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও কূফাতে ইল্‌মে ফিকহ্ সংকলন করেন। তাঁর ছাত্রদের এক জামা'আত নিয়ে 'আল-মাজমাউল ফিকহী' (الجمع الفقهي) প্রতিষ্ঠা করেন।

এতে তিনি হাদীস ও ফিকহ্ লিপিবদ্ধ করাতেন। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যগণ এই সকল লিপিবদ্ধ মাসাইল তাঁদের ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করেন। এ সংকলিত মাসাইলগুলোকে ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া ইমাম সাহেবের স্বরচিত কিতাবও রয়েছে, যেমন -

১. ফিকহি'ল আকবর, (فقه الأكبر)

২. কিতাবু'ল রিসালাতুন ইলাল-বুস্তী, (كتاب الرسالة إلى البستى)

৩. কিতাবু'ল আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম, (كتاب العالم والمتعلم)

৪. কিতাবুর রাদ্দে আলা'ল জাহমিয়া (كتاب الرد على الجهمية)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাউদ ওয়াসিতী মন্তব্য করেন যে, কেউ যদি অন্ধত্ব ও মূর্খতার লাঞ্ছনা হতে বেরিয়ে ফিকহের স্বাদ গ্রহণ করতে চায় সে যেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে।[২]

চারিত্রিক গুণাবলী

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর চারিত্রিক গুণাবলীতে ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) খলীফা হারুনুর রশীদের সামনে ইমাম সাহেব সম্পর্কে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতেন। অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকতেন। তাঁর নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তা জানা থাকলে তিনি তার উত্তর দিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু। জাগতিক শান-শওকত ও জাকজমক তিনি মোটেও পসন্দ করতেন না। অন্যের অপবাদ দেওয়া হতে সর্বদা বিরত থাকতেন এবং পরোপকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য, সংযম, মায়ের খিদমত ও উস্তাদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি বহু গুণাবলীর তিনি অধিকারী ছিলেন।

---

১. আস্‌সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ঈল ইসলামী : ড. মুস্তাফা হুসনী আস্ সুবাঈ। ৪০১পৃষ্ঠা।
২. আইম্মা আরবাআহ্ : কাযী আতহার হোসাইন, ৪০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইন্তিকাল

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তৎকালীন শাসকগণ কর্তৃক অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হন। উমাইয়া খিলাফতের সময় ইব্ন হুবায়রা তাঁকে কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -কে দৈনিক দশটি বেত্রাঘাত করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি কাযীর পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন নাই। এরপর আব্বাসী খিলাফত আমলে পুনরায় কাযীর পদ গ্রহণের জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়। এবারও তিনি তা অস্বীকার করেন। যার কারণে খলীফা আবূ জা'ফর মানসূরের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়। কথিত আছে যে, কারাগারে তাঁকে বিষ পান করানো হয়েছিল। তিনি ১৫০ হিজরী সনে কারাগারেই ইন্তিকাল করেন। বাগদাদের খেযরান নামক কবর স্থানের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে ইমাম আ'যমের স্মরণে তাঁর মাযারস্থ অঞ্চলটি আ'যামিয়্যা নামে পরিচিত লাভ করে।[১]

ইল্‌মে ফিকহ্ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যদিও ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে হাদীস, ইল্‌মে ফিকহ্ ইত্যাদি সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। তবে ইল্‌মে ফিকহ্‌কে অধিক উপকারী মনে করে তিনি এর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) ছিলেন ফিকহ্ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের (রা.) ইল্‌মের বিশেষ উত্তরাধিকারী হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলাইমানের সাহচর্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদের (রা.) ফিক্‌হ হাসিল করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সূত্রে হযরত আলী, হযরত ইব্ন উমর, হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত ফিকহী জ্ঞান লাভ করেন।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর ফিকহী ইজতিহাদের মূলনীতি

إنى أخذت بكتاب الله وإذا وجدته فمالم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار الصحاح عنه التى فشت فى ايدى الناس عن الثقات فاذالم أجد فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لاأخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتقى الأمر إلى إبراهيم والشعبى وابن سرين وسعيد بن المسيب وعد رجلاً قد اجتهدوا فلى أن أجتهد كما اجتهدوا.

---

১. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৯২ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমি ফিকহী বিষয়ে প্রথমত কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন) থেকে হুকুম গ্রহণ করি। যদি কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে সে সম্পর্কে হুকুম না পাই তবে সুন্নাত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস হতে হুকুম গ্রহণ করি। আর যদি কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে হুকুম না পাই তবে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁর কথা গ্রহণযোগ্য মনে করি তাঁর কথা গ্রহণ করি। তাঁদের অভিমত বর্তমান থাকতে তা পরিত্যাগ করে অন্য কারো অভিমত গ্রহণ করি না। যখন সাহাবাদেরও কোন অভিমত না পাওয়া যায় এবং মাসআলার সিদ্ধান্ত ইব্রাহীম নাখঈ, শা'বী, ইব্ন সীরীন, হাসান, আতা, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব প্রমুখ ফকীহ্গণের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল হয় তখন আমিও ইজতিহাদ করি যেমন তাঁরা ইজতিহাদ করেন।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর ইজতিহাদের পদ্ধতি এই ছিল, যে সব বিষয়ে কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ ও সাহাবাগণের কোন অভিমত পাওয়া যেত না সে সব বিষয়ে তিনি কিয়াস দ্বারা সমাধান করতেন। খতীবে বাগদাদী 'তারীখে বাগদাদে' আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করেন যে, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর হাদীস পাওয়া গেলে তা আমাদের শিরোধার্য। আর সাহাবাগণের বিভিন্ন মত পাওয়া গেলে তার মধ্যে কোন একটি মত নির্বাচন করে নিই। তাঁদের মত বর্জন করে অন্যভাবে সমাধান করি না। আর যদি তাবিঈনের অভিমত হয় সে ক্ষেত্রে আমরাও তাদের মত ইজতিহাদ করি।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গীতে সকল বিষয়ের সমাধান কল্পে প্রখ্যাত চল্লিশজন ফকীহ্ নিয়ে ইল্মে ফিকহের একটি মজলিস কায়েম করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), মুহাম্মদ (র.), যুফার (র.) ইমাম দাঊদ তায়ী (র.), ইমাম আসাদ ইব্ন উমর (র.), ইমাম ইউসুফ ইব্ন খালিদ সিমতী (র.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়দা প্রমুখ ফকীহ্গণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মজলিসে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ করা হত। তাঁদের মধ্য থেকে একজনও যদি কোন ভিন্ন মত পোষণ করতেন তবে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের আলোচনা করা হতো এরপর একমতে পৌছতে পারলে লিপিবদ্ধ করা হত।[৩]

ইমাম মালিক (র.)

প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে অন্যতম। তাঁর নাম মালিক, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্, উপাধি ইমামু-দারিল হিজরাত। তাঁর পিতার নাম আনাস, পিতামহ মালিক। তাঁর বংশানুক্রমিক ধারা এরূপ ইমামু দারিল হিজরত হযরত আবূ আবদুল্লাহ্ মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক। হযরত আবদুল্লাহ্ মালিক ইব্ন-আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ আমির নাফি' ইব্ন আমর ইব্ন হারিস

---

১. আখবারু ইমাম আবূ হানীফা ওয়া আসহাবিহি, পৃষ্ঠা ১০।
২. আস্সুন্নাতু ও মাকানাতু হা ফিত্ তাশরী'ইল ইসলামী ঃ ডঃ মুস্তফা হুস্নী আস্ সুবাঈ ৪৪৭পৃষ্ঠা।
৩. আইম্মা আরবাআহ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ২২২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন জুসাইল আসবাহী হিময়ারী (র.) তাঁর বংশানুক্রমিক এ ধারা ইয়ামানের প্রসিদ্ধ গোত্র হিময়ার ইব্‌ন সাবার সঙ্গে মিলিত হয়। তাঁর মাতার নাম আলিয়াহ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইয়ামনের শাহী খান্দান হিময়ারের শাখা গোত্র আসবাহের অধিবাসী ছিলেন। সে হিসেবে ইমাম মালিককেও আসবাহী হিময়ারী বলা হয়। তাঁর পিতামহ আবূ আমির ইয়ামন ত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে বসবাস করতে থাকেন। এ বংশে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং রসূল (সা.) -এর একজন সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। বদর যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ মালিক একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও তাবিঈ। প্রবীণ সাহাবীদের সূত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর চার পুত্র আনাস, উওয়াইস, আবূ সুহাইল ও রাবী। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীয় যুগের প্রখ্যাত আলিম মুহাদ্দিস হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম সাহেবের পিতা আনাস তাঁদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন। ইমাম মালিক (র.) ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ জন্ম সন ৯০ অথবা ৯৫ হিজরী উল্লেখ করেছেন। 'তাবাকাতুল ফুকাহা' গ্রন্থে ৯৪ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। হাফিয যাবাহী (র.) প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি অস্বাভাবিকভাবে দুই বছর কারো মতে তিন বছর মাতৃগর্ভে ছিলেন।[১]

ইমাম মালিক (র.) গৌর বর্ণের ছিলেন। শারীরিক গঠন পরিমার্জিত লম্বা ও মোটা ছিল, নাকটা কিছুটা লম্বা ও সরু ছিল। মাথার কেশ ছিল খুব কম। লম্বা ও ঘন দাড়ির অধিকারী ছিলেন। গোফের দুই পার্শ্বে লম্বা রাখতেন। অধিকাংশ সময় তিনি শুভ্র পোষাকই পরিধান করতেন। অধিক আতর ব্যবহার করা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।[২]

ইল্‌ম শিক্ষা

ইমাম মালিক (র.) জন্মের প্রাক্কালে মদীনা মুনাওয়ারায় ইল্‌মের চর্চা ছিল ব্যাপক। ইমাম মালিক সাহেবের পরিবার ছিল এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায়। পরিবারে ইল্‌মী পরিবেশ থাকার ফলে ইমাম মালিক বাল্যকালেই ইল্‌ম অর্জনের জন্য আগ্রহী ও উৎসাহী হন। তিনি নিজেই বলেন, আমি আমার মাতাকে বললাম, আমি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য সফর করব। এতে আনন্দিত হয়ে তিনি বললেন, এসো, তোমাকে ইল্‌মের পোষাক পরিয়ে দিই। তাকে জামা, পায়জামা, টুপি ও পাগড়ী পরিধান করিয়ে বললেন, ইমাম রাবীয়আর খিদমতে যাও। ইল্‌ম শিক্ষার পূর্বে আদব শিক্ষা কর। এ সময় তিনি ইমাম নাফি' হতেও ইল্‌ম হাসিল করেন। তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে বাড়ীর চাকরের সংগে ইমাম নাফি'-এর নিকটে যেতাম। তিনি উপর থেকে নেমে সিঁড়িতেই বসে পড়তেন এবং আমাকে হাদীস শুনাতেন। আমি জিজ্ঞাসা করতাম ইব্‌ন উমর (র.) অমুক অমুক মাসআলায় কি বলেছেন? তিনি তা বর্ণনা করতেন। তাঁর কাছে দ্বিপ্রহরের রোদে যেতাম। রাস্তায় কোথাও সামান্য ছায়াও পাওয়া যেত না। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রহমান ইব্‌ন হরমুযের খিদমতে সকালে যেতাম এবং রাত্রে প্রত্যাবর্তন করতাম।

১. আইম্মা আরবাআহ্ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৯৮-১০০ পৃষ্ঠা।

২. আইম্মা আরবাআহ্ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

একদা আমার পিতা আমাকে এবং আমার ভাইকে যিনি ইব্‌ন শিহাব যুহরীর সমবয়সী ছিলেন এক মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমার ভাই এর সঠিক উত্তর প্রদান করেন এবং আমি উত্তরে ভুল করলাম। তখন আব্বা বললেন, কবুতর তোমাকে ইল্‌ম হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর এ উক্তি আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগল। এরপর আমি আবদুর রহ্‌মান হরমুযের দরসে রীতিমত যেতে লাগলাম। একাধারে সাত বছর পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে ইল্‌ম হাসিল করলাম। এ সময়ের মধ্যে অন্য কারো দরসে উপস্থিত হইনি। দরসে যাওয়ার সময় খেজুর নিয়ে যেতাম। ছেলেদের সেগুলো প্রদান করে বলতাম, যদি শায়খ (উস্তাদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে বলে দিও যে তিনি ব্যস্ত আছেন। একবার আমি তাঁর বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হলাম। ইব্‌ন হরমুয বাদীর মাধ্যমে সংবাদ নিয়ে বললেন, তাঁকে আসতে দাও। সে তো ইমাম। ইব্‌ন হরমুযের দরস মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হত। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর জামাতা ও তাঁর ইল্‌মের ধারক-বাহক এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও আলিম ছিলেন।

ইমাম মালিক (র.)-এর বাল্যকালের উস্তাদগণের মধ্যে সাফওয়ান ইব্‌ন সুলাইমান ছিলেন অন্যতম। একদিন তিনি তাঁর শাগরিদ মালিক (র.)-কে এসে স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞাসা করেন। শাগরিদ আরয করল; আপনি তো বড় বুযুর্গ ও আলিম। এরপরেও আমার কাছে তা'বীর জিজ্ঞাসা করেন। উস্তাদ বললেন, ভাতিজা এতে কোন অসুবিধা নেই। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি আয়না দেখছি। ইমাম মালিক তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনি আখিরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সামান সংগ্রহ করছেন। তাঁর এ তা'বীর শুনে উস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন।

أنت اليوم مُويلك ولئن بقيت تكونن مَالكاً إتق اللّٰه يَامَالك إن كنت مَالكا وإلاَّ فانت هَالك ·

আজই তো তুমি (মুওয়ায়লিক) ক্ষুদে মালিক। যদি বেঁচে থাক তবে তুমি অবশ্যই সত্যিকার মালিক হবে। যদি তুমি প্রকৃত মালিক হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

তখন থেকে মানুষ তাঁকে আদর করে মুওয়ায়লিক নামে ডাকত। তিনি তাঁকে আবূ আবদুল্লাহ্ উপনাম প্রদান করেছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ছিলেন।

ইমাম মালিক (র.)-এর উস্তাদগণের মধ্যে ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.) ছিলেন অন্যতম। তাঁর নিকট হতে ইল্‌মে হাদীস লাভ করেছেন। তিনি 'ওয়াকিবানির রায়ল' নামক স্থানে হাদীস বয়ান করতেন। শিক্ষার্থীরা সেখানে ভীড় জমাত। তিনি বলতেন, ইব্‌ন উমর (রা.) এরূপ বলেছেন, মজলিস শেষে শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসা করতেন, ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে আপনি কার মাধ্যমে হাদীস পেয়েছেন। তিনি বলতেন, ইব্‌ন উমরের পুত্র সালেমের মাধ্যমে। একবার আমি তাঁর

১. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ২১২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দরজায় উপস্থিত হলে চাকরের মাধ্যমে আমার আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। প্রবেশ করার পর তিনি আমাকে খানা খেতে আহবান করেন। আমি বললাম, খাওয়ার প্রয়োজন নেই, হাদীস বয়ান করুন। তৎক্ষণাৎ তিনি সতেরটি হাদীস বর্ণনা করে বললেন, এতে তোমার কি লাভ হবে ?-আমি হাদীস বলেই যাব তুমি তা মুখস্থ করবে না। ইমাম মালিক (র.) বললেন, আপনার অনুমতি হলে এখনই শুনিয়ে দিচ্ছি, এই বলে তিনি সতেরটি হাদীস শুনিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তাঁর লিখিত চল্লিশটি হাদীস বয়ান করে বললেন, যদি এই হাদীসগুলো মুখস্থ করে শুনাতে পার তবে তুমি হাফিয হয়ে যাবে। আমি বললাম, এ চল্লিশটি হাদীস এখনই মুখস্থ শুনাতে পারব। এরপর তিনি সবগুলো হাদীস মুখস্থ শুনালেন। ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.) তাঁর এই অসাধারণ মেধা দেখে তাঁকে বললেন -

قم فأنت من أودعية العلم أوقال إنك لنعم المستودع للعلم .

যাও, তুমি ইল্‌মের ভাণ্ডার, অথবা বলেছেন, তুমি ইল্‌মের উত্তম ভাণ্ডার। ইমাম সাহেব বলতেন, মদীনা একজন মুহাদ্দিস পেয়েছে যিনি ফকীহ্‌ও বটে। আর তিনি হলেন ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.)।

ইমাম মালিকের পড়া-শোনার যামানা অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্যে কেটেছে। বাহ্যিক জিনিসপত্র তাঁর তেমন কিছুই ছিল না। ঘরের ছাদ ভেঙ্গে বিক্রি করে তিনি কিতাব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করেছেন। অবশ্য পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সচ্ছলতা দান করেছিলেন।[১]

ইমাম মালিকের উস্তাদবৃন্দ

ইমাম মালিক (র.) ঐ সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ হতে ইল্‌ম হাসিল করতেন, যাঁরা সত্যবাদিতা ও তাক্‌ওয়া, তাহারাত, মেধাশক্তি ও ফিকহ্ শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন অনেক। আল্লামা নববী (র.) 'তাহযীবুল আসমায়' লিখেন, ইমাম মালিকের নয়শ' উস্তাদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনশ' তাবিঈন ও ছয়শ' তাবি-তাবিঈন ছিলেন। আল্লামা যুরকানী (র.) বলেন, ইমাম মালিক নয়শ' রও অধিক উস্তাদ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি যে সকল উস্তাদ থেকে মুওয়াত্তায় হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাই পঁচানব্বই জন। ইমাম মালিক (র.)-এর সব উস্তাদই ছিলেন মদীনার অধিবাসী। একদা বাদশা হারুনুর রশীদ ইমাম মালিককে বললেন, আপনার কিতাবে হযরত আলী ও ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণনা খুব কম পেলাম। তিনি বললেন, তাঁরা আমার শহরে ছিলেন না। আর আমিও তাঁদের শাগরিদের সাথে বেশী সাক্ষাৎ করতে পারিনি। ইমাম মালিক (র.) -এর প্রসিদ্ধ উস্তাদগণের মধ্যে হতে কিছু সংখ্যক উস্তাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. রাবীয়াতুর রায় (র.), ২. নাফি' ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত গোলাম (র.), ৩. মুহাম্মদ

১. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.). ৪. যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র.). ৫. আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.), ৬. নাঈম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.). ৭. হুমায়েদ আত্ তাবীল (র.). ৮. সাঈদ মাকবারী (র.). ৯. আবূ হাযিম সালামাহ ইব্‌ন দীনার (র.), ১০. শরীফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.). ১১. সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান (র.), ১২. সাফওয়ান ইব্‌ন সুলাইম (র.), ১৩. আবুয্ যিনাদ (র.). ১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র.). ১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র.). ১৬. আবূ তাওয়ালা (র.). ১৭. আবদ রাব্বিহ ইব্‌ন সাঈদ(র.). ১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ উমর (র.). ১৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র.), ২০. আইয়্যুব সাখ্‌তিয়ানী (র.). ২১. সাওর ইব্‌ন যায়িদ (র.), ২২. ইব্রাহীম ইব্‌ন আবূ আবালাহ মুকদাসী (র.), ২৩. হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র.). ২৪.আয়শা বিনতে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (র.). ২৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাজির (র.). ২৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুযায়ফা (র.), ২৭. আবূয যুবাইর মাক্কী (র.) ,২৮. ইব্রাহীম ইব্‌ন উক্‌বা (র.), ২৯. মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (র.). ৩০. ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ হাকীম (র.). ৩১. হামীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.), ৩২. হামীদ ইব্‌ন কায়স মাক্কী (র.), ৩৩. দাউদ ইব্‌ন হুসাইন (র.). ৩৪. যিয়াদ ইব্‌ন সা'দ (র.). ৩৫. যায়িদ ইব্‌ন রাবাহ্ (র.), ৩৬. সালিম ইব্‌ন আবূন নয্‌র (র.) . ৩৭. সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (র.). ৩৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র.) . ৩৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল হাশিমী (র.), ৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.). ৪১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) প্রমূখ।[১]

ইল্‌মী পারদর্শীতা

খল্‌ফ ইব্‌ন উমর (র.) বলেন. একদা আমি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট বসেছিলাম। এ সময় মদীনার ক্বারী ইব্‌ন কাসীর তাঁর নিকট একটি পত্র দিলেন। তিনি পত্রটি পড়ে তা জায়নামাযের নীচে রেখে দিলেন। এরপর তিনি যখন দাঁড়ালেন আমিও তখন তাঁর সংগে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বসতে বললেন। এবং পত্রটি পড়তে দিলেন। পড়ে দেখলাম। এতে এক স্বপ্নের বৃত্তান্ত লেখা আছে: কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর চর্তুপাশে একত্রিত হয়ে তাঁর কাছে কি যেন চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে বললেন. ঐ মিম্বরের নীচে রক্ষিত আছে। মালিককে তা বন্টন করার জন্য বলে দিয়েছি। তোমরা মালিকের নিকট যাও। লোকেরা আলোচনা করতে করতে প্রত্যাবর্তন করল যে মালিক কি তা বন্টন করছে ? একজন বললেন. তাঁকে যখন হুকুম দেওয়া হয়েছে তখন তিনি অবশ্যই তা পালন করবেন। ইমাম মালিক (র.) এই স্বপ্ন শুনে এমনভাবে কাঁদলেন যে. আমি তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায়ই রেখে এলাম। এ থেকে মালিকের ইল্‌মী মর্যাদা যে, কত উর্ধ্বে তা অনুমান করা যায়।[২]

অধ্যাপনা

ইমাম মালিক (র.) -এর শিক্ষা মজলিস খুব শান-শওকতের ছিল। তিনি খুব সুন্দর পরিপার্টি পোষাক পরিধান করে. আতর. সুরমা ব্যবহার করে এবং খুব জাঁকজমকপূর্ণ আসনে

১. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৯৮-১০৮ পৃষ্ঠা। ২. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ১১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

বসে শিক্ষা দান করতেন। হাদীস ও কুরআন পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যেই তিনি এইরূপ করতেন। তিনি আজীবন মদীনায় মুনাওয়ারায় ছিলেন। অন্য কোন শহরে যান নি। মসজিদে নববীতে বসেই তিনি শিক্ষা দান করতেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর নিকট হতে হাদীস ও ফিকহের শিক্ষা লাভ করতো। বিশেষ করে মিশর ও আফ্রিকাবাসীগণ ও তাঁর নিকট হতে ফিকহ্ শিক্ষা করার জন্য আগমন করত এবং শিক্ষা লাভের পর নিজ নিজ দেশে গিয়ে তা প্রচার করত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাগরিদগণের সংখ্যা

ইমাম মালিকের শাগরিদের সংখ্যা অগণিত। ইমাম যাহাবী (র.) লিখেন, তাঁর নিকট হতে এত সংখ্যক মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন যাঁদের সংখ্যা গণনা করা প্রায় অসম্ভব। কাযী আয়ায (র.) ইমাম মালিকের শাগরিদের সংখ্যা তেরশ' বলে বর্ণনা করেছেন। হাফিয দারু-কুতনী শাগরিদদের সংখ্যা এক হাজার বলেছেন। তাঁর কোন কোন উস্তাদও তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম যুহরী, আবূল আসওয়াদ, আয়্যুব সাখ্তিয়ানী, রাবীয়াতুর রায়, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী, মুহাম্মদ ইব্ন যিব (র.) প্রমুখ।

ইমাম মালিক (র.)-এর প্রথিতযশা শাগরিদগণ হতে কিছু সংখ্যক নাম নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবূ ইউসুফ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক, লায়স ইব্ন সা'দ, শুবা সুফইয়ান মাওরী, ইব্ন জুরাইজ, ইবন উয়ায়না, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইব্ন মাহদী, আবূ আসিম আন্ নাবীল, আবদুর রহমান আওযায়ী (র.) প্রমুখ।[১]

রচনাবলী

ইমাম মালিকের যুগে হাদীস ও ফিকহের সংকলন আরম্ভ হয়েছিল। ১৪০ হিজরী হতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ফিকহ্ বিষয়ে কিতাবাদি রচনা শুরু করা হয়। উলামায়ে উম্মাত তখন থেকে ফিকহ্ ও হাদীসের অসংখ্য গ্রন্থাদি রচনা করতে থাকেন। ইমাম মালিক (র.) তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. আল মুওয়াত্ত (الموطا)

২. রিসালাতুহু ইলা ইব্ন ওহাব ফি'ল কাদ্‌র (رسالته إلى ابن وهب فى القدر)

৩. কিতাবুন নুজূম ওয়া হিসাবু মাদারি'য্ যামান ওয়া মানাযিলি'ল কামার

(كتاب النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر)

৪. রিসালাতুল মালিক ফি'ল আকাযিয়্যাহ (رسالة مالك فى الأقضية)

১. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৯৮-১০৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৫. রিসালাতুহু ইলা আবী গাসসান মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাররাফা ফিল ফাত্‌ওয়া

رِ سا لته إلى أبى غسان محمد بن مطرف فى الفتوى)

৬. রিসালাতুহু ইলা হারুনুর রশীদ আল-মাশহুরাতু ফি'ল আদাবে ওয়া'ল মাওয়ায়েয

(رِسالته إلى هَارون الرشيد المشهورة فى الأدب والمَواعظ)

৭. আত্‌-তাফসীর লি-গারীবি'ল কুরআন (اَلتفسير لِغريب القُرآن)

৮. কিতাবু'স সিয়ার (كِتَاب السِّيَر)

৯. রিসালাতুহু ইলা'ল লায়স ফী ইজমাঈল মাদীনাহ (رِسالته إلى الليث فى إجماع المدنية)

ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

ইমাম মালিক (র.) ১৭৯ হিজরী সনে রবিউল আউয়াল মাসের ১১ অথবা ১৪ তারিখ শনিবার ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, ৮৪কেউ কেউ ৮৬ কেউ ৮৭ আবার কেউবা বলেছেন, ৯০ বছর।

ইমাম মালিক (র.) -কে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তিনি মুহাম্মদ ও ইয়াহ্‌ইয়া নামক দুই পুত্র রেখে যান। তাঁরা মুহাদ্দিস ছিলেন।[১]

ইমাম মালিক ও ইল্‌ম ফিকহ্‌

ইমাম মালিক (র.) সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর কাল হাদীস ও ফিকহের অধ্যাপনা ও ফাত্‌ওয়া দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে ফিকহের কোন কিতাব রচনা করেননি। তবে ইমাম মালিক (র.) মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের যে সকল উত্তর প্রদান করেছেন, তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর শাগরিদগণ 'মোদাওয়ানা' নাম দিয়ে এর একটি সংকলন বের করেন। পরবর্তীতে এই সংকলনই ফিকহে মালিকী নামে খ্যাতি লাভ করে।

ইমাম মালিক (র.) ফাত্‌ওয়া দানের সময় প্রথমে কুরআনের উপর এরপর বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। তিনি হাদীসের সনদের ব্যাপারে হিজাযের মুহাদ্দিসগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। মদীনাবাসীদের আমল ও তাঁদের প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। মদীনাবাসীদের আমলে বিপরীত হওয়ার কারণে অনেক হাদীস তিনি গ্রহণ করেন নি।

ইমাম মালিকের মতে 'تعامل أهل مدينه' অর্থাৎ মাদীনাবাসীদের আমল, প্রথা ও অভ্যাস ফিকহ্‌ শাস্ত্রের বিশেষ নির্ভরযোগ্য উৎস। তাঁর মতে মদীনাবাসীদের আমল ও তাঁদের সর্বসম্মত মতামতের পরে হচ্ছে কিয়াসের স্থান। হানাফী মাযহাবের মত তাঁর মাযহাবে কিয়াসের তত

১. আইম্মা আরবাআহ্‌ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ৯৮-১০৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আধিক্য নেই। তবে হানাফী মাযহাবে (إستحسان) এর মত মালিকী মাযহাবেও (إستصلاح) অথবা (مصالح مرسلة) এর উপর আমল করা হয়। (إستصلاح) এর অর্থ মুসলিহাত বা সামঞ্জস্য বিধান।

জন কল্যাণের উদ্দ্যেশে কোন নিয়ম কানূনকে সামঞ্জস্য পূর্ণ করে গ্রহণ করার নাম ইস্তিসলাহ্ (إستصلاح)।মোট কথা, মালিকী মাযহাবের মতে মাসআলার সমাধান দেয়ার জন্য ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎস হল ঃ

১. কুরআন, ২. হাদীসে রাসূল (সা.), ৩. আসারে আহলে মদীনা, ৪. তা'আমূলে আহলে মদীনা, ৫. কিয়াস (قياس) ও ৬. ইসতিস্লাহ্ (إستصلاح)

ইমাম শাফি'য়ী (র.)

ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম শাফি'য়ী (র.) প্রসিদ্ধ চারজন ইমামের অন্যতম। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্, পিতার নাম ইদ্রিস, পিতামহ আব্বাস, মাতার নাম ফাতিমা, পূর্ণ নাম ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্ন উসমান ইব্ন শাফি' ইব্ন সায়েব ইব্ন উবায়দ কুরাইশী (র.)। তাঁর বংশ পরম্পরা সর্বশেষে আবদে মানাফের সংগে মিলে নবী করীম (সা.) বংশের অন্তর্ভূক্ত হয়। তিনি ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাজা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। দু'বছরকালে মাতার সংগে মক্কা মুকার্‌রমায় চলে আসেন। সেখানেই প্রতিপালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। প্রথমে কুরআন শরীফ শিখেন। তারপর দশ বছর পর্যন্ত হুজায়ল গোত্রের মধ্যে অবস্থান করেন এবং ইল্‌মে লুগাত ও কবিতা শিখেন। এ জন্যই ইমাম শাফি'য়ী (র.) হুজায়ল গোত্রের কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী রূপে সমাদৃত। কথিত আছে যে, আরবী সাহিত্য ও ভাষায় ইমাম আসমায়ী স্বয়ং হুজায়ল গোত্রের কবিতা ইমাম শাফি'য়ী (র.) হতে শুদ্ধ করে নিতেন। তারপর ইমাম শাফি'য়ী মক্কার মুফ্তী মুসলিম ইব্ন খালিদ যুনজীর নিকট ফিকহ্ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় সফর করেন এবং ইমাম মালিক (র.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট তিনি প্রত্যক্ষভাবে পুরো 'মুয়াত্তা' কিতাব অধ্যয়ন করেন। এই কিতাব অধ্যয়নকালে ইমাম মালিক (র.) ইমাম শাফি'য়ীর অসাধারণ প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, অসামান্য বিনয় লক্ষ্য করে তাঁকে অধিকতর স্নেহ ও সম্মান করতেন।

এরপর ইমাম শাফি'য়ী (র.) ইয়ামনের একটি প্রদেশে চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরীরত অবস্থায় কোন হিংসুক খলীফা হারুনুর রশীদ এর নিকট তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেন। তাঁকে বাগদাদে ডেকে আনা হয়। এ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে আহলে বাইতের প্রাধান্য প্রদানের ও শিয়া মতবাদ অবলম্বনের অভিযোগ আনা হয়। এ ঘটনা ১৮৪ হিজরীর। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আনিত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া এবং ইমাম মুহম্মদ (র.) -এর সুপারিশের কারণে খলীফা সম্মানের সাথে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন। এ ঘটনার পর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সংগে ইমাম শাফি'য়ী (র.)-এর সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠে এবং তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ছাত্রদের লিখিত পান্ডুলিপিগুলোও সংগ্রহ করেন। বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন,

خرجت من بغداد قد حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير

"ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসানের ইল্‌ম হতে উটের বোঝা পরিমাণ ইল্‌ম নিয়ে আমি বাগদাদ হতে প্রত্যাবর্তন করছি"। সেখান থেকে তিনি মক্কা মুকার্‌রমায় ফিরে আসেন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। এ সময়ে মাঝে মাঝে তিনি হিজায ও ইরাকে ইল্‌মী সফরে গমনাগমন করতেন। ১৯৯ হিজরীতে তিনি মিস্‌রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি তাঁর ফিকহী মতামত প্রচার করেন এবং সে অনুযায়ী মাসআলা-মাসাইল সংকলন করেন। ২০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

উস্তাদবৃন্দ

ইমাম শাফিয়ী (র.) মক্কা, মদীনা, বাগদাদ ইত্যাদি এলাকার বহু ফকীহ্, মুহাদ্দিস হতে ইল্‌মে ফিকহ্ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহন করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুসলিম ইব্‌ন খালিদ যুনজী, মালিক ইব্‌ন আনাস, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী শাফিয়ী (তাঁর চাচা) সুফইয়ান ইব্‌ন উআইনাহ্, ইব্রাহীম ইব্‌ন সা'দ, সাঈদ ইব্‌ন সালিম, ইসমাঈল ইব্‌ন উলাইয়্যাহ, ইসমাঈল ইব্‌ন জাফর (র.) প্রমুখ।[২]

শাগরিদ্‌গণ

ইমাম শাফি'য়ী (র.) এর ইল্‌মী জ্ঞান-ভান্ডার হতে অসংখ্য শাগরিদ ইল্‌মে ফিক্‌হ ও ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ জাফরানী বাগদাদী, ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল শায়বানী বাগদাদী, আবূ সাওর ইব্রাহীম হুসাইন ইব্‌ন আলী কারাবিসী, ইসমাঈল মজুনী, রাবী ইব্‌ন সুলাইমান, হারমালাহ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া মিসরী, ইউনুস আবদুল আলা ইউসূফ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ (র.) প্রমূখ।[৩]

ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর মাযাহাবের নীতিমালা

অন্যান্য ইমামগণের ন্যায় ইমাম শাফি'য়ী (র.)-এর মাযহাবের উসূল ছিল কুরআন, সুন্নাহ্, ইজ্‌মা ও কিয়াস। ইমাম শাফি'য়ী (র.) ব্যাপকভাবে খবরে ওয়াহিদ উপর আমল করতেন বিধায়, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাবের তুলনায় তাঁর মাযহাবের

---

১. আস্‌সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ঈল ইসলামী ঃ ড. মুস্তাফা হুসনী আস্ সুবাঈ, ৪০১পৃষ্ঠা। ২. আইম্মা আরবা'আহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ১৪১-১৮১ পৃষ্ঠা। ৩. প্রাগুক্ত, ১৭১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দলীলের ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। অপরদিকে মুরসাল হাদীসের উপর আমল পরিত্যাগ করার কারণে তাঁর মাযহাব অন্যান্যদের তুলনায় ছিল সংকীর্ণ। অবশ্যই তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র.)-এর মত প্রসিদ্ধ তাবিঈনের মুরসাল হাদীস গ্রহন করতেন। ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর মাযহাবের নীতিমালার মধ্যে আর একটি নীতি ছিল 'ইসতিসহাব' (إستصحاب) (পূর্বে থেকে প্রচলিত রীতি-নীতি) প্রমাণ ও খন্ডন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ইস্‌তিসহাব হানাফীদের নিকটও গ্রহণযোগ্য। তবে তা শুধু খন্ডনের ক্ষেত্রে প্রমাণের ক্ষেত্রে নয়।[১]

ইমাম শাফি'য়ী (র.) ও ইলমে হাদীস

ইমাম শাফি'য়ী (র.) হাদীস শাস্ত্রেও ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী। তিনি হাদীস রিওয়াতের (বর্ণনা) নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তিনি 'আল-উম্' ও 'আর-রিসালা' গ্রন্থে সুন্নাহ্ সম্পর্কে যে উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেছেন। পরবর্তী কালের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাঁরই অনুসরণ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর এ উক্তি দ্বারাই তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعى' মুহাদ্দিসগণকে হাদীস সম্পর্কে কিছু বলতে হলে তাঁদের ইমাম শাফি'য়ীর ভাষাই কথা বলতে হবে।[২]

উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত মাসনাদে শাফি'য়ী, সুনানে তাঁর আরও দু'টি গ্রন্থ রয়েছে।[৩]

ইমাম আহ্‌মাদ্ ইব্‌ন হাম্বল (র.)

ইমাম আহ্‌মাদ্ ইব্‌ন্ হাম্বল (র.) প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন। তাঁর নাম আহ্‌মাদ, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্, পিতার নাম মুহাম্মদ, পিতামহ হাম্বল ইব্‌ন্ হিলাল। বংশ তালিকা আবূ আবদুল্লাহ্ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন আয়াদ ইব্‌ন ইদ্রীস (র.)।

ইমাম আহ্‌মাদ হাম্বল (র.) ১১৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহন করেন। এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। তাঁর বয়স যখন তিন বছর তখন তাঁর পিতা ইন্‌তিকাল করেন। এরপর তাঁর মাতা সাদিয়া বিন্‌তি মায়মুনা এর হাতে তিনি প্রতিপালিত হন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মকতবের শিক্ষা সমাপণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইল্‌মে হাদীস অধায়নে মনোনিবেশ করেন। এ ছাড়া বাগদাদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফহীহ্‌গণ থেকে শিক্ষা লাভ করার পর কূফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া, জর্জিয়া ইত্যাদি স্থানের বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌গণ থেকে হাদীস ফিকহ্ -এর জ্ঞান হাসিল করেন। এরপর তিনি হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস হিসাবে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন। বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শাফি'য়ী (র.) নিকট থেকে তিনি ইল্‌মে

১. আস্‌সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ঈল ইসলামী ঃ ড. মুস্তাফা হুসনী আস্ সুবাঈ, ৪৪০পৃষ্ঠা। ২. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ২২২ পৃষ্ঠা। ৩. আস্‌সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ঈল ইসলামী, ৪৪২পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ফিকহ্ লাভ করেছেন এবং শাফি'য়ী (র.) ও ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) থেকে ইল্মে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.)-এর শাগরিদ ছিলেন। হযরত আহমাদ ইব্ন্ হাম্বলের ইল্মী সুখ্যাতি যখন সর্বত্র পরিব্যপ্ত। এ সময় একদা তাঁকে দোয়াত কলম নিয়ে কোন ইল্মী দরসে শরীখ হওয়ার জন্য যেতে দেখে জনৈক ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, জাতির একজন সুপ্রসিদ্ধ ইমাম হওয়া সত্ত্বেও ইল্ম শিক্ষার জন্য যাচ্ছেন। তিনি বললেন,"مع المحبرة إلى المقبرة"দোয়াতের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত ইল্ম্ শিক্ষার ধারা জারী থাকবে।[১]

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন্ হাম্বল (র.) যে সকল প্রথিতযশা মনীষীগণ হতে ইল্ম্ হাসিল করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ, ইসমাইল ইব্ন্ উলাইয়া, হুশায়ম ইব্ন বাশীর, হাম্মাদ ইব্ন্ খালিদ খাইয়্যাত, মানসূর ইব্ন সালামাহ্ খুজা'য়ী, মুজাফফর ইব্ন্ মুদরিক, উসমান ইব্ন্ উমর ইব্ন ফারিস, আবূ নযর হাশিম ইব্ন্ কাসিম, আবূ সাঈদ মাওলা বনী হাশিম (র.) মুহাম্মদ ইব্ন্ ইয়াযীদ ওয়াসিত, মুহাম্মদ ইব্ন্ আবূ আদী, মুহাম্মাদ ইব্ন্ জা'ফর গুন্দর, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন্ সা'ঈদ আল-কাত্তান, আবূ দাউদ তায়ালিসী, ওয়াকী ইব্ন্ জাররাহ্, আবূ উসমান, সুফইয়ান ইব্ন্ উআয়না, মুহাম্মদ ইব্ন্ ইদ্রীস শাফি'য়ী (র.) প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) চল্লিশ বছর বয়সে হাদীস ও ইফ্তার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে পূর্ণ উদ্যমের সংগে হাদীস ও ফিকহের দরস দিতে শুরু করেন। তাঁর দরসে হাজার হাজার লোক অংশ গ্রহণ করতেন। তন্মধ্যে আলিম ও সাধারণ উভয় ধরণের লোক শরীক হতেন। আলিমগণ হাদীসের ও ফিকহের শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং সাধারণ লোকেরা আদব ও আখ্লাকের তালীম নিত। তিনি ছাত্রদের সম্মান ও আরামের প্রতি সর্বদা লক্ষ রাখতেন। তাঁর দরস ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ। তবে কোন কোন সময় তিনি ছাত্রদের সংগে হাল্কা রশিকতাও করতেন। তিনি মুখস্থ হাদীস বলতেন না। বরং অতি সতর্কতার জন্য কিতাব দেখে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত লিখতে ছাত্রদেরকে নিষেধ করতেন।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বলের অনেক উস্তাদ ও তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন, যেমন -আবদুর রায্যাক সান্আনী, ওয়াকী' ইব্ন জাররাহ্,, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী, ইমাম শাফি'য়ী (র.) প্রমূখ।

তাঁর হাজার হাজার শাগরিদ হতে নিম্নে প্রখ্যাত কিছু শাগরিদের নাম প্রদত্ত হল ঃ

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বলের দুই পুত্র সালিহ্ ও আবদুল্লাহ্, হাম্বল ইব্ন ইসহাক, হাসান ইব্ন সাব্বাহ্, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সাগানী, আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ দুরী, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ মুনাদী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ নিশাপুরী, আবূ যুরআহ্ রাযী, আবূ হাতিম রাযী, আবূ যুরআহ দামেশ্কী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ বাগাবী, আবূ

১.আইম্মা আরবাআহ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দাউদ সিজিস্তানি, আবূল কাসিম বাগাবী (র.) প্রমূখ।[১]

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) তাক্ওয়া পরহেয্গারী ও হকের উপর অটল অবিচল এবং দুনিয়ার প্রতি ছিলেন নিরাসক্ত। 'খালকে কুরআনের' বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মু'তাযিলাদের মুকাবিলা করেন। তিনি খলীফা মা'মুনের খিলাফত কাল থেকে মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়, দৈহিকভাবেও তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। তিনি এসব যুলুম ও নির্যাতন অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে বরদাশত করে যান। খালকে কুরআনের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনের ক্ষেত্রে ইমাম আহ্মাদের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা মুসলমানদেরকে যুগ যুগ ধরে সত্যের উপর অটলও অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা যোগাবে। এ ধরণের পরীক্ষায় দৃঢ়, অটল ও অবিচল থাকার কারণে মুসলমানদের নিকট তাঁর মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে উম্মতে মুসলিমার নিকট সর্বসম্মত তিনি সে যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইমাম শাফি'য়ী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি বাগদাদে আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.)-এর চেয়ে অধিক মুত্তাকী, দুনিয়ার নিরাসক্ত এবং যোগ্যতর আলিম দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি। তিনি ২৪১ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) পাঁচটি মূলনীতির ভিত্তিতে ফাত্ওয়া প্রদান করতেন।

১. নসূসে কাতইয়্যা অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ্ হাদীস।

২. সাহাবাগণের ফাত্ওয়া অর্থাৎ যখন তিনি সাহাবাগণের ঐক্যমতের কোন ফাত্ওয়া পেয়ে যেতেন তখন অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

৩. যদি সাহাবাগণের মতামত বিভিন্ন হতো। তবে তিনি যে মতটি কুরআন ও সুন্নাহ্র বেশী নিকটবর্তী মনে করতেন তাই গ্রহণ করতেন। আর যদি কোন মতটি কুরআন ও সুন্নাহ্র বেশী নিকটবর্তী নির্ণয় করতে না পারতেন তবে সবগুলো মতই উল্লেখ করতেন, কোনটাকেই প্রাধান্য দিতেন না।

৪. উপরোক্ত তিনটি মূলনীতির কোন একটিতে যদি সমাধান খুঁজে না পেতেন, তবে সেক্ষেত্রে মুরসাল হাদীস এমনকি হাসান ও যঈফ হাদীসকে গ্রহণ করতেন এবং তা কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন।

৫. যদি কোন মাসআলায় নস্ , কাওল সাহাবী, মুরসাল এমনকি হাসান ও যঈফ হাদীস না পেতেন তখন কিয়াসের দ্বারা সমাধান দিতেন।

হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে 'মুসনাদে আহ্মাদ' ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) -এর অমর অবদান। উক্ত 'মুসনাদে' তিনি তাঁর সংগৃহীত ও মুখস্থ সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই ও নির্বাচন করে চল্লিশ হাজার হাদীস বাছাই ও নির্বাচন করে সংকলন করেন। এই 'মুসনাদে' সংকলন ও বিন্যাসে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ

১.আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ২১২ পৃষ্ঠা ও হুসনুত্ তাকাযী ঃ যাহিদ কাওসারী, ৭ পৃষ্ঠা ।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট একজন সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীস এক জায়গায় একত্রিত করেছিলেন। চাই সে হাদীসের বিষয়বস্তু যতই ভিন্ন হোক না কেন। যেমন তিনি হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত সমস্ত হাদীস একই অধ্যায় একত্র করেছেন। যদি সে সব হাদীসের বিষয়াবলী বিভিন্ন ছিল। অর্থাৎ নামায, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের সমস্ত একই অধ্যায় একত্র করেছেন।

ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) -এর শাগরিদগণকে তাঁর নিজস্ব অভিমত সমূহ লিখতে নিষেধ করতেন। এমন কি কেউ তা লিখলে তিনি অত্যন্ত রাগ করতেন। যার ফলে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর শাগরিদগণ তাঁর আকওয়াল একত্রিত করেন। তাই ফিকহ্ হাম্বলী নামে পরিচিত।[১]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ছিলেন একজন ফকীহ্ ও মুজতাহিদ। তিনি হানাফী মাযহাবের প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম। তার নাম ইয়াকূব, উপনাম আবূ ইউসুফ, পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর পূর্ণ নাম, ইমাম আবূ ইউসূফ ইয়াকূব ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-কাযী। তিনি ১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কারো মতে ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা যাহিদ কাওসারী (র.) বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে শেষোক্ত মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষের মধ্যে সা'দ ইব্‌ন্ হাব্‌তা খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে ডেকে নিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলতেন, তাঁর সে হাত বুলানোর বরকত এখনো আমাদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রথমে ইব্‌ন আবূ লায়লা (র.) -এর নিকট থেকে ইল্‌মে ফিক্‌হ ও ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর ইল্‌মী হালকায় নিয়মিতভাবে বসতে শুরু করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বিধায় তাঁর পারিবারিক জীবন পরিচালনার জন্য পরিশ্রমও করতে হত। তিনি নিজেই বলেন, আমি ইল্‌মে ফিকহ্ ও ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা পিপাসু ছিলাম। একদা আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দরসে বসেছিলাম। এমন সময় আমার পিতা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে বৎস! ইমাম আবূ হানীফার নিকট কখনো যাবে না। কেননা, ইমাম আবূ হানীফার রুটি তৈরী থাকে আর তুমি তো রোজগারের মুখাপেক্ষী। একদিন ইমাম আবূ হানীফা (র.) আমাকে উপস্থিত না পেয়ে অন্য ছাত্রদের নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিছুদিন পর যখন আমি দরসে উপস্থিত হলাম তখন আবূ হানীফা (র.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিলে কেন? আমি বললাম, পিতার নির্দেশ পালন ও জীবিকা অর্জনের জন্য। শাগরিদগণ চলে গেলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) আমার হাতে একটি দীনারের থলে দেন এবং বলেন, এটা ব্যয় করতে থাকবে। শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। আর এখন থেকে নিয়মিত

১. আইম্মা আরবাআহ্ ঃ কাযী আতহার হোসাইন, ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দরসে উপস্থিত থাকবে। আমিও দরসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতে শুরু করলাম। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে আরেকটি একশ' দিনারের থলে প্রদান করেন। পরবর্তিতে কিছুদিন পরপরই দিনারের একটি করে থলে আমাকে দিতে থাকেন। অথচ আমি তাকে অথবা অন্য কাউকে এই দিনারের শেষ হওয়ার কথা কখনো বলিনি। তিনি যেন নিজেই এগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার সংবাদ নিতেন। সে সময় ইমাম আবূ হানীফা (র.) শাগরিদদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফের ন্যায় একনিষ্ঠ ও নিয়মিত শিক্ষার্থী আর কেউ ছিল না।[১]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ছিলেন প্রথম শ্রেণীর একজন মুজতাহিদ। তিনি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রবর্তনের যোগ্যতা রাখতেন। মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী (র.) বলেন,

فالحق أنهما مجتهدان مستقلان نالاَ رتبة الإجتهَاد المطلق إلا أنهما لحسن لعظمهما لأُستاذ هما وفرط اجلالهما لإما مهما أجد أصله وسلكا نحوه وتو جه إلى نقل مذهبه وتائيده وإ نتصاره والإنتساب إليه ·

প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) হলেন মুজতাহিদে মুস্তাকিল অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা উস্তাদের মর্যাদা ও আদব সম্মানের লক্ষ্যে তাঁর উসূল ও নীতির অনুসরণ করেছেন এবং তাঁদের উস্তাদের মাযহাব প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। এবং নিজেদেরকে উস্তাদের মাযহাবের অনুসারী হিসেবেই প্রকাশ করেছেন।[২]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বহু সংখ্যক উস্তাদের নিকট থেকে ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইব্‌ন আবূ লায়লা, আবান ইব্‌ন আবূ আইয়াশ, আহওয়াস ইব্‌ন হাকীম, আবূ ইসহাক শায়বানী, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ ইসহাক, ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়্যাহ, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, ইসমাঈল ইব্‌ন উলায়্যা, ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম, আইয়্যুব ইব্‌ন উত্‌বা, বায়ান ইব্‌ন বাশার, আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাবিত আবূ হামযাহ সুমালী (র.) প্রমূখ প্রখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩]

তাঁর নিকট থেকে ইল্‌মে হাদীস ইল্‌মে ফিকহ্ শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁদের মধ্যে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন জাররাহ্ আল-মাদানী আল-কাযী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সালামাহ্ তায়ালিসী, ইব্রাহীম ইব্‌ন ইউসুফ বল্‌খী, আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ ইসরাঈল, আসাদ ইব্‌ন কুরাত, ইসহাক ইব্‌ন আবূ ইসরাঈল, ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ ইবন আবূ হানীফা,

১. হুসনুত তাকাযী ঃ যাহিদ কাওসারী, ৮-৯ পৃষ্ঠা : আখবারু আবূ হানীফা, ৯২ পৃষ্ঠা।
২. ইমদাতুর রিআয়া, ৮-৯ পৃষ্ঠা। ৩. হুসনুত তাকাযী ঃ যাহিদ কাওসারী, ১৭ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

ইসমাঈল ইব্‌ন ফযল, আশরাফ ইব্‌ন সাঈদ, তাঁর ভাগীনা আবূ বকর জাফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া হাসান ইব্‌ন যিয়াদ, হাসান ইব্‌ন আবূ মালিক (র.) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) খলীফা হারুনুর রশীদ-এর খিলাফতকালে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, সচেতনতা ও আন্তরিকতার কারণে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়েন। ফলে খলীফা ইসলামী নীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা অর্থনৈতিক কর্মপন্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারেও তাঁর মতামত গ্রহণ করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পুত্র পিতার জীবদ্দশায়ই বিচারপতি পদে নিয়োগ লাভ করেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বহু কিতাব রচনা ও সংকলন করেছেন। নিম্নে তাঁর কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো -

১. কিতাবু ইখতিলাফি ইব্‌ন আবী লায়লা ওয়া আবী হানীফ

(كتاب إختلاف ابن أبى ليلى وأبى حنيفة)

২. কিতাবুর রাদ্দে আ'লা সিয়ারিল আওযায়ী (كتاب الرد وعلى سير الأوزاعى)

৩. কিতাবুল খারাজ (كِتَاب الخراج)

৪. কিতাবুস সালাত (كِتَاب الصلوٰة)

৫. কিতাবুস যাকাত (كِتَاب الزكوٰة)

৬. কিতাবুস সিয়াম (كِتَاب الصيام)

৭. কিতাবুল ফারাইয (كِتَاب الفرائض)

৮. কিতাবুল বুয়ূ' (كِتَاب البيوع)

৯. কিতাবুল হুদূদ (كِتَاب الحدود)

১০. কিতাবুল ওয়াকালাহ (كِتَاب الوكالة)

১১. কিতাবুল ওসায়া (كِتَاب الوصايا)

১২. কিতাবুস সায়দে ওয়ায্ যাবায়েহ্ (كِتَاب الصيد الذبائح)

১৩. কিতাবুল ইস্তিবরা (كِتَاب الإستبرا)

১৪. কিতাবুল গাযাব (كِتَاب الغضب)

১৫. কিতাবুল জাওয়ামে' (كِتَاب الجوامع) ইত্যাদি।[২]

১. হুসনুত তাকাযী : আল্লামা যাহিদ কাওসারী, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা ; আখবারু আবূ হানীফা, ৯২ পৃষ্ঠা।
২. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ১৮২ হিজরী, মতান্তরে ১৮১ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।[১]

ইমাম মুহাম্মদ (র.)

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবদুল্লাহ্। পিতার নাম হাসান, দাদার নাম ফারকাদ আশ-শায়বানী (র.)। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ জাযীরাতুল আরবে বসবাস করতেন। কিন্তু তাঁর পিতা হাসান পরিবার পরিজনসহ দেশ ত্যাগ করে তিনি দামেস্ক শহরের অদূরে হারিস্তা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এরপর তাঁরা উমাইয়া খিলাফতের শেষের দিকে ইরাকে চলে আসেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ১৩১/১৩২ হিজরী সনে ইরাকের ওয়াসিত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে কূফায় চলে আসেন এবং এখানেই তিনি লালিত-পালিত হন।[২]

ইমাম মুহাম্মদ (র.) চৌদ্দ বছর বয়সে ইল্ম হাসিলের উদ্দেশ্যে ইমাম আবূ হানীফার (র.) খিদমতে উপস্থিত হন। চার বছরকাল তিনি ইমাম আবূ হানীফার (র.) সাহচর্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া তিনি ইমাম ইউসুফ (র.) এর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কূফা, মক্কা, বাসরা, ওয়াসিত, সিরিয়া, খুরাসান, ইয়ামামা ইত্যাদি স্থানের অসংখ্য উলামা, বহু সংখ্যক ফকীহ ও মুহাদ্দিস থেকে ইল্ম হাসিল করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম যুফার (র.) সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইব্ন মিগওয়াল, হাসান ইব্ন উমারা, ইমাম মালিক, ইব্রাহীম, যাহ্হাক ইব্ন উসমান, সুফিয়ান ইব্ন উআয়নাহ, তালহা ইব্ন আমর, জাম'আহ ইব্ন সালিহ্ আবুল আওয়াম, ইমাম আওযায়ী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) প্রমূখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইল্মে ফিকহ্সহ হাদীস তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ের উপরও অতিশয় পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার পিতা আমার জন্য ত্রিশ হাজার দিরহাম রেখে যান। আমি এর অর্ধেক পনের হাজার দিরহাম আরবী ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষায় এবং অবশিষ্ট পনের হাজার দিরহাম হাদীস ও ফিকহ্ এর জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করি।[৩]

অধ্যাপনা

ইমাম মুহাম্মদ বিশ বছর বয়সে দরস ও তাদরীসের (অধ্যাপনা) কাজ শুরু করেন। হাজার হাজার ছাত্র তাঁর দরস থেকে ইল্ম হাসিল করতেন। তিনি কুফাতে যখন 'মুয়াত্তা' কিতাবের দারস দিতেন, তখন অধিক সংখ্যক উপস্থিতির কারণে তাঁর বাড়ী লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত এবং রাস্তাঘাট প্রায় বন্ধ হয়ে যেত। একদিন ইমাম শাফি'য়ী (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বাড়ীতে একঘরে রাত্রি যাপন করেন। তিনি সারারাত নামায

১. হুসনুত্ তাকাযী ঃ আল্লামা যাহিদ কাউসারী (র.), ৭৩ পৃষ্ঠা। ২. আনওয়ারুল বারী (মুকাদ্দিমা),১ম খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা ; মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ঃ অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ পৃষ্ঠা। ৩. আনওয়ারুল বারী,১ম খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আদায় করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) শায়িত থাকেন। তিনি বিছানা থেকে উঠে বিনা অযূতেই ফজরের নামায আদায় করেন। ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি রাতে নিদ্রা যাইনি। এ রাতে আমি এক হাজার মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছি। আপনি নিজের জন্য কাজ করেছেন। আর আমি উম্মাতের জন্য কাজ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর তাফসীর, ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করে যাঁরা সৌভাগ্যবান হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা অগণিত।

তাঁদের মধ্যে থেকে প্রখ্যাত কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল -

আবূ হাফ্স কবীর, আবূ সুলাইমান মুসা ইব্ন সুলাইমান জাওয়ানী, আবূ উবাইদ কাসিম ইব্ন সালাম, আলী ইব্ন মা'বাদ, মুসা ইব্ন নাসীর, মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ,মুআল্লাহ্ ইব্ন মানসূর, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল রাবী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ইব্ন রুস্তম, হিশাম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, ঈসা ইব্ন আবান,-শাদ্দাদ ইব্ন হাকীম (র.) প্রমূখ।[১]

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর রচনা ও সংকলনের সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। তিনি কিতাবের স্তূপের মাঝখানে বসে কিতাব প্রণয়ন করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকখানা গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. মাবসূত (اَلْمَبْسُوط) যা কিতাবূ'ল আসল নামেও পরিচিত। ২. আল-জামিউল কাবীর (اَلْجَامِع الكَبِير) ৩. আল-জামিউস্ সাগীর (اَلْجَامِع الصَّغِير) ৪. আস-সিয়ারুল কাবীর (اَلسِّيَر الكَبِير) ৫. আস-সিয়ারুস্ সাগীর (اَلسِّيَر الصَّغِير) ৬. আল-মুহীত (اَلْمُحِيط) ৭. আয্-যিয়াদাত (اَلزِّيَادَات) ৮. আন-নাওয়াদির (اَلنَّوَادِر) ৯. আল-হারুনিয়াত (اَلْهَارُونِيَات) ১০. রুকিয়্যাত (اَلرُّقِيَات) ১১. মুওয়াত্তা (اَلْمُوَطَّا) , ইত্যাদি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ৫৮ বছর বয়সে ১৮৯ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।[২]

ইমাম যুফার (র.)

ইমাম যুফার (র.) হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ। তাঁর নাম যুফার, উপনাম আবূল হুযাইল, পিতার নাম হুযাইল। তাঁর পুর্ণ নাম আবূল হুযাইল যুফার আল-আম্বারী আল-বাসরী ইব্ন হুযাইল ইব্ন যুফার (র.)। তাঁর পিতা ইসফাহানে বিচারপতি পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি ১১০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম যুফার (র.) প্রথমে হাদীস শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন এবং এতে অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর তিনি ইমাম আযম আবূ

১. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম পৃ. ও আনয়ারুল বারী, ১৯৩ পৃষ্ঠা, ১ম খণ্ড।
২. আখবারু আবী হানীফা, ১২০ পৃষ্ঠা ।

www.pathagar.com

হানীফা (র.) -এর নিকট ইলমে ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ইলমে ফিকহ্ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা উত্থাপিত হলে তিনি এর সমাধান দিতে অপারগ হন। তারপর ইমাম আবূ ইমাম হানীফা (র.) এর সমাধান জিজ্ঞাসা করলে তিনি সঠিকভাবে এর উত্তর প্রদান করেন। তখন ইমাম যুফার (র.) তাঁকে বললেন, কোন দলীলের ভিত্তিতে আপনি এ সমাধান দিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, ওমুক হাদীস ও কিয়াসের ভিত্তিতে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাসআলার ধরণ পাল্টিয়ে ইমাম যুফারের নিকট এর উত্তর জানতে চাইলেন। উত্তরে যুফার (র.) বললেন, আমি এ ব্যাপারে প্রথমটির তুলনায় অধিক অপারাগ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল প্রমাণসহ এর উত্তর বলে দিলেন। ইমাম যুফার (র.) বলেন, পরবর্তীতে আমার হাদীসের হালকার সকলকে এসকল প্রশ্নের জওয়াব দিতে বললে তাঁরা সকলেই এ সব প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তখন আমি ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর খিদমতে হাযির হই। ইমাম যুফার (র.) বিশ বছর কাল ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট ইলমে ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করেন এবং হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ হিসাবে পরিগণিত হন। উল্লেখ্য যে ইমাম যুফার (র.) হানাফী মাযহাবের সংকলনকারী বিশিষ্ট দশজন ইমামের একজন।[১]

আল্লামা যাহিদ কাওসারী (র.), 'লামহাতুন নাযার ফী সীরাতে ইমাম যুফার' গ্রন্থে ইমাম যুফার (র.)-কে মুজতাহিদে মুতলাক অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম যুফার (র.) ইজতিহাদের কোন কোন মূলনীতির ব্যাপারে কোন কোন মাসআলা ইমাম আবূ হানীফার (র.) সাথে মতানৈক্য করেছেন। সতেরটি মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত অনুসারে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আল্লামা যাহিদ কাওসারী (র.) 'হুসনুত তাকাযী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আল্লামা মারজানা বলেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার (র.) ইল্‌মে ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'য়ী (র.) এর সমপর্যায়ের মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম যুফার (র.) নিজে স্বতন্ত্র মাযহাব প্রবর্তন না করে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সম্মানার্থে নিজকে তাঁর উস্তাদের মাযহাবের অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসাবে প্রকাশ করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম যুফার (র.) -এর বিবাহের খুত্‌বা পাঠ করার পর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, যুফার ইবন হুযাইল মুসনাদের ইমামগণের ইমাম। ইল্‌ম ও শরাফতের ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের একটি উত্তম নমূনা।[২]

ইমাম যুফার (র.) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম কৌশলের সাথে বসরায় হানাফী মাযহাব প্রচার করেন। তিনি বসরা গমনের পর প্রথমে নিজে কোন হালকা বা ইল্‌মী মজলিস কায়েম করেন নি। বরং বসরায় প্রখ্যাত আলিম উসমান বাত্তীর দরসে যোগদান করেন। উসমান বাত্তী (র.) কোন মাসআলা পেশ করলে ইমাম যুফার (র.) বলতেন, এ ব্যাপারে আরো একটি সুন্দর ও

১.লামহাতুন নাযার ঃ যাহিদ কাওসারী (র.); আনওয়ারুল বারী, ১২১-১২২পৃষ্ঠা।
২. আখবারু আবী হানীফা, ১০৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

যৌক্তিক অভিমত রয়েছে। উসমান বাত্তী তা জানতে চাইলে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) উসূল ও নীতিমালা আলোকে তা পেশ করতেন। নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ও শক্তিশালী যুক্তির কারণে উসমান বাত্তী(র.) তা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। ইমাম যুফার (র.) বলতেন, এটা যখন বুঝতে পারতেন যে, দরসের সকল ছাত্রগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি বলতেন, এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)এর অভিমত। এ সময়ে দরসে অংশগ্রহণকারী সকলেই সমস্বরে বলে উঠতেন যে-ই বলুক না কেন এটা খুবই যুক্তিযুক্ত অভিমত। এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করার দরুণ হালকার সকল ছাত্রগণ ইমাম যুফারের (র.) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং উসমান বাত্তীর দরস বর্জন করে ইমাম যুফারের (র.) দরসে ভীড় জমাতে থাকেন। এভাবে ইমাম যুফার (র.) বসরায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব প্রচার করতেন।[১]

ইমাম যুফার (র.) যে সকল উস্তাদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.), সুলাইমার ইব্‌ন মেহরান, আ'মাশ, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তায়মী, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, আইউব সাখ্তিয়ানী, যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়িদা ইব্‌ন আবূ আরুবা (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম যুফার (র.) থেকে যাঁরা ইল্‌ম শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, শাকীক ইব্‌ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান, ওয়াকী' ইব্‌ন জাররাহ্, সুফইয়ান ইব্‌ন 'উআইনা, আবূ আলী উবায়দুল্লাহ্, ইব্‌ন আবদুল মাযীদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী কাযী, হিলাল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, হাকাম ইব্‌ন আইউব, শাদ্দাদ ইব্‌ন হাকীম, নুমান ইব্‌ন আবদুস্ সালাম, মালিক ইব্‌ন ফুদাইক, হাসান ইব্‌ন যিয়াদ লু'লুয়ী (র.) প্রমুখ অধিকতর উল্লেখযোগ্য।

ইমাম যুফার (র.) ১৫৮ হিজরী সনের শাবান মাসে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র.)

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র.) হানীফা মাযহাবের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। তাঁর নাম আহ্মাদ, উপনাম আবূ জাফর। পিতার নাম মুহাম্মদ। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ- আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন সুলাইম ইব্‌ন জাওয়াব আল-ইয্‌দী। হাজারী মিসরী হানাফী (র.)। মিসরের অন্তর্গত তাহা নাম এলাকায় অথবা এর পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাস করতেন বলে তাঁকে তাহাবী বলা হয়।

তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে একাধিক অভিমত রয়েছে, যেমন ২২৭, ২৩৭ হিজরী ২৩৮, ২৩৯, ২২৯ হিজরী। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হাফিয ইব্‌ন কাযীসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ শেষোক্ত মতটিকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন।[২]

---

১. আখবারু আবী হানীফা, ১০৩ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত ; আনওয়ারুল বারী, ৬৪ পৃষ্ঠা। ও হায়াতে ইমাম তাহাবী : সাঈদ আহ্মদ পালনপুরী, পৃষ্ঠা ৯৭

www.pathagar.com

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র.) ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথমে মিসরে গমন করেন এবং স্বীয় মামা ইমাম মাযানীর যিনি ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। তার নিকট শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এ সময় তিনি শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এরপর যখন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ ইমরান হানাফী (র.) মিসরের বিচারপতির দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তখন ইমাম তাহাবী (র.) তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর নিকট ইল্‌মে ফিক্‌হ্ শিক্ষা লাভ করেন। সে সময় তিনি শাফি'য়ী মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন। তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, ইমাম তাহাবী (র.)-এর মামা ও তাঁর উস্তাদ মাযানী (র.) সর্বদাই হানাফী মাযহাবের কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন। তা দেখে ইমাম তাহাবী (র.) সর্বদাই হানাফী মাযহাবের কিতাবাদি অধ্যয়ন শুরু করেন। হানাফী মাযহাবের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। আল্লামা আবদুল হাই লাখ্‌নভী (র.)'তা'লীকাতুস্ সুন্নাহ্' (تعليقات السنة) কিতাবে উল্লেখ করেন যে, ইমাম তাহাবী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর সমপর্যায়ের মুজতাহিদ ছিলেন।

ইমাম তাহাবী (র.) যে সকল প্রথিত যশা মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌গণের নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছেন তাঁদের মধ্যে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দাউদ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনকায, ইব্রাহীম ইব্‌ন মারযূক আহ্‌মাদ ইব্‌ন কাসিম, আহ্‌মদ ইব্‌ন দাউদ, আহ্‌মদ ইব্‌ন সাহল, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আসরাম মাদানী, আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ বাশ্‌শার, আহ্‌মাদ ইব্‌ন খালিদ, ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মাযানী, হাকীম ইব্‌ন ইউসুফ, আবূ যুর'আহ দামেশ্‌কী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ্ তাহাবী (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম তাহাবী (র.) -এর নিকট থেকে আবূ উসমান আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম, আহ্‌মাদ ইব্‌ন ওয়ারিস, আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্‌ন কাসিম, সুলাইমান ইব্‌ন আহ্‌মাদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর গুনদূরী, হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ মিস্‌রী (র.) প্রমূখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌গণ শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি বহুসংখ্যক কিতাব রচনা সংকলন করেছেন।

নিম্নে তার কয়েকটি প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল -

১. মা'আনিল আসার (مَعَانى الآثار)
২. মুশ্‌কিলু'ল আসার (مُشكل الآثار)
৩. ইখতিলাফু'ল উলামা (إختلاف العُلماء)
৪. কিতাবুল আহ্‌কামি'ল কুরআন (كِتاب أحكام القُران)
৫. কিতাবু'শ শুরুতু'ল কাবীর (كِتاب شُروط الكبير)
৬. মুখতাসারু'ল ইমাম আত্-তাহাবী (مُختصر الإمَام الطحَاوى)

www.pathagar.com

৭. নাকযু কিতাবু'ল মুদাল্লিসীন (نقض كتاب المدلسين)
৮. আর্ রাদ্দু আলা আবী উবায়িদ (الرد على أبى عبيد)
৯. আত-তারিখু'ল কাবীর (التاريخ الكبير)
১০. আকীদাতু'ত তাহাবী (عقيدة الطحاوى)
১১. সুনানুশ্ শাফি'য়ী (سنن الشافعى)
১২. শারহু'ল মুগনী (شرح المغنى) ইত্যাদি।[১]

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র.) হিজরী ৩২১ সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)

ইমাম আবূল হাসান কারখী (র.) একজন হানাফী মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ্, উপনাম আবূল হাসান, পিতার নাম হুসাইন কারখী নামে তিনি সমাধিক পরিচিত। তিনি ২৬০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম কারখী (র.) শায়খ ইসমাঈল ইবন কাযী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাযরামী (র.) প্রমূখ উস্তাদগণ থেকে হাদীস ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন। আবূ হাফ্স শাহীন, আবূ বকর রাযী আল-জাস্সাস, আল্লামা শাশী, আল্লামা তানুসী, আল্লামা দামগানী, ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) প্রমূখ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণ তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।[২]

ইমাম কাখরী (র.) অত্যন্ত পরহিযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ে রোযা রাখতেন।

তিনি ইরাকের হানাফী উলামাগণের শিরোমণি ছিলেন। তিনি বড় বড় আলিমগণের উস্তাদ ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশা-শায়বানী(র.) প্রণীত 'জামি' স্যগীর' ও 'জামি' কাবীর' কিতাবদ্বয়ের ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মুজতাহিদ ফিল মাসাইল ফকীহ্গণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

ইমাম আবূল হাসান আশ'আরী (র.)

ইমাম আবূল হাসান আশ'আরী (র.) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকাইদ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তাঁর নাম আলী, উপনাম আবূল হাসান, পিতার নামা ইসমাঈল। তিনি হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (র.) -এর নাম নবম অধস্তন। সে হিসেবেই আশ'আরী বলা হয়। তিনি হিজরী ২৬০ সনে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বসরায় মু'তাযিলা প্রধান আবূ আলী আল-জুবায়ীর শাগরিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরে মু'তাযিলা মতবাদ পরিত্যাগ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে শামিল হন। যদি মু'তাযিল মতবাদ পরিত্যাগ না করতেন তবে সম্ভবত তিনিই আবূ আলী জুবায়ীর স্থলাভিষিক্ত হতেন। হিজরী ৩০০ সনে তিনি মুতাযিলা

১. আনওয়ারুল বারী, ৭০-৭৪ (২য় খন্ড) ২. তারীখে ফিকহী ইসলামী, ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

মতবাদ পরিত্যাগ করেন এবং বসরার জামে মসজিদের মিম্বরে এ কথার ঘোষণা দেন। শেষ জীবনে তিনি বাগদাদেই বসবাস করেন এবং ৩২৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

উল্লেখ রয়েছে যে, রামাযানুল মুবারক মাসে তিনি তিনবার স্বপ্নে দেখেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে খাটি সুন্নাতের অনুসরণ করার নির্দেশ দান করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে এ স্বপ্ন অবশ্যই সত্য। এ প্রেক্ষিতে তিনি মুতাযিলা মতবাদ ত্যাগ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে শামিল হন। তিনি আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) মাযহাব গ্রহণ করেন।

কাযী আবূল মা'আলী ইব্ন মালিক -এর মতে ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিনশ। তাঁর এই রচনা সম্ভারকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায় -

১. যে গুলো মু'তাযিলা থাকাকালে রচিত গ্রন্থ যা পরে তিনি নিজেই খন্ডন করে দিয়েছেন।

২. এ সকল যেগুলো তিনি দার্শনিক, প্রকৃতিবাদী, দাহরিয়া, ব্রাহ্মণ, ইয়াহুদী, খৃস্টান অগ্নিপূজক ইত্যাদি ফিরকা সমূহের মতবাদ খন্ডন করার জন্য রচনা করেছিলেন।

৩. ঐ সকল গ্রন্থ যে গুলোর মাধ্যমে তিনি খারেজী, জাহমী, শী'আ, মু'তাযিলা প্রমুখ ফিরকা ভ্রান্তিসমূহের মতবাদ খন্ডন করেছিলেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে - ১. মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, ২. আল-ইব্না, ৩. আল-লুমাত, ৪. রিসালাতুল ঈমান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আবূল মানসূর মাতুরীদী (র.)

ইমাম আবূল মানসূর মাতুরীদী (র.) একজন খ্যাতনামা আকাইদ শাস্ত্রবিদ ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন। আকাইদ ও দর্শন শাস্ত্রে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখপাত্র ছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূল মানসূর। পিতার নাম মুহাম্মদ; দাদার নাম মাহমূদ। তিনি ইমাম মাতুরীদী নামে সমধিক খ্যাত। ইমাম মাতুরীদী (র.) আকাইদ দর্শন শাস্ত্রে অতি মূল্যবান উচ্চ পর্যায়ের বহু গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে থেকে বিশেষ বিশেষ কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল -

১. কিতাবুত্ তাওহীদ (كتاب التوحيد)
২. কিতাবু'ল মাকালাত (كتاب المقالات)
৩. কিতাবু আওহামিল মু'তাযিলা (كتاب اوهام المعتزلة)
৪. রাদ্দুল উসূলিল খামসা আবী মুহাম্মদ বাহি (رد الأصول الخمسة أبى محمد باهلى)
৫. রাদ্দু'ল কারামিতা (رد القرمطة)
৬. মা'আখাযুশ শারায়ে (مأخذ الشرائع)
৭. কিতাবুল জিদাল (كتاب الجدال)
৮. তা'বীলাতু'ল কুরআন (تاويلات القرآن)

www.pathagar.com

উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁর একটি বাগান ছিল। মেহমান আগমন করলে এ বাগান হতে অমৌসুমেও তিনি ফল খাওয়াতেন। এতে মানুষ আশ্চর্যবোধ হলে তিনি বলতেন, আমি আমার ডান হাত দ্বারা কোনদিন কোন গোনাহ করিনি। যার ফলে আমার ডান হাতের মাধ্যমে আমি কোন বস্তু লাভের ইচ্ছা করলে লাভ করতে সক্ষম হই।[১]

একদা জনগণ সে সময়কার বাদশাহর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তাঁর নিকট বাদশার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তৎক্ষণাৎ তিনি গাছ দিয়ে ধনূক এবং ডাল দিয়ে তীর বানিয়ে অত্যাচারী বাদশাহর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। পরে জানা গেল যে বাদশাহ ঐ দিনই মারা যান। ইমাম মাতুরীদী (র.) হিজরী ৩৩৩ সনে ইন্তিকাল করেন।[২]

ইমাম আবূ বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস (র.)

ইমাম আবূ বকর আহমাদ জাস্সাস (র.) ছিলেন প্রখ্যাত মুফাস্সির, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তাঁর নাম, আহ্মাদ উপনাম আবূ বকর, পিতার নাম আলী। তিনি রাযী ও জাস্সাস উভয় নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর যুগে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। হিজরী ৩০৫ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবূ বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস (র.) ইমাম আবূ দাঊদ, ইব্ন আবূ শায়বা, আবদুর রায্যাক, তায়ালিসী প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণিত হাদীসের হাফিয ছিলেন। যে কোন সময় যে কোন হাদীস অনায়াসে বর্ণনা করতে পারতেন।

তিনি হাফিয আবদুল বাকী ইব্ন কানি' ইমাম কার্খী, আবূ হাতিম, উসমান দারেমী প্রমূখ বড় বড় ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ হতে ইল্ম শিক্ষা করেন। দূর দূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে জ্ঞান পিপাসুরা ইল্ম শিক্ষার জন্য তাঁর দরবারে আগমন করতো। আবূ আলী এবং আহ্মদ হাকিমও ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম আল-জাস্সাস বহুসংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন। যার মধ্যে থেকে কয়েকটি নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-ফুসূল ফিল-উসূল (الفصول فى الأصول)
২. শুরুহ্ মুখতাসারুত তাহাবী (شروح مختصر الطحاوى)
৩. শরহু মুখতারুল কার্খী (شرح مختصر الكرخى)
৪. শারহে জামে' কাবীর (شرح جامع كبير)
৫. আহ্কামুল কুরআন (أحكام القرآن)

এ তাফসীর গ্রন্থটি তাঁর ইল্মী পরিপক্কতার অনন্য নির্দর্শন। তৎকালীন শাসকদের পক্ষ থেকে বিচারপতি পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা। ২. আল্ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দরস তাদরীস ও তা'লীমের কাজকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১]

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (র.)

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (র.) হানাফী মাযহাবের একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নাম আহ্মাদ, উপনাম আবূল হাসান, পিতার নাম মুহাম্মদ, পিতামহের নাম আহ্মাদ, ইব্ন মুহাম্মদ আহ্মাদ ইব্ন জা'ফর কুদূরী হানাফী (র.)। তিনি ইমাম কুদূরী নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে যে কুদূরী তাঁর গ্রামের নাম। সেদিকে ইঙ্গিত করেই তাঁকে বলা হয় কুদূরী। অথবা তিনি বা তার বংশের কেউ ডেক ডেকচীর ব্যবসা করতেন। সে হিসাবেও তাঁকে কুদূরী বলা হয়।

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (র.) প্রখ্যাত ও মুহাদ্দিস রুকনু'ল ইসলাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাহদী জুরজানীর নিকট ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন সুওয়াদ এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ হাওশানীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত খাতীবে বাগদাদী (র.) প্রধান বিচারপতি আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ দামগানী (র.) কাযী মুফায্যাল ইব্ন মাস্উদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট থেকে ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন।

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (র.) ৩৬২ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মলাভ করেন এবং ৪২৮ হিজরী সনে রজব মাসের রবিবার ৬৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (র.) চতুর্থ তবকার একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। খাতীবে বাগদাদী (র.) বলেন, আমি তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তিনি হাদীস কম বর্ণনা করতেন। আল্লামা সাম'আনী (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী অসাধারণ মেধার কারণে সে যুগে ইল্মে ফিকহে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্য ও বক্তব্য ছিল রসালো। তিনি খুব বেশী পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বহুসংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. তাজরীদ ৭ খণ্ড (এ কিতাব তিনি হানাফী ও শাফি'য়ী মাযহাবের ইখ্তিলাফের উপর অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন)। ২. মাসাইলুল খিলাফত (مسائل الخلافة)
৩. তাকরীব (تقريب) ৪. শরহে মুখ্তাসারুল কারখী (شرح مختصر الكرخى)
৫. শরহে আদাবুল কাযী (شرح أدب القاضى) ৬. মুখতাসারুল কুদূরী (مختصر القدورى)

এই কিতাবখানি প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশটি নির্ভরযোগ্য

১. তারীখে ফিকহী ইসলামী, ৪৪৮ পৃষ্ঠা ; আনয়ারুল বারী, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

কিতাব হতে বার হাজার অতি জরুরী মাসাইল এ কিতাব সন্নিবেশিত হয়েছে। রচনাকাল থেকে পর্যন্ত মুসলমান বিশ্বের সর্বত্র এর পাঠ দান অব্যাহত রয়েছে। অসংখ্য মানুষ এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।[১]

ফখরুল ইসলাম ইমাম আবুল হাসান বযদূবী (র.)

ফাখরুল ইসলাম ইমাম আবুল হাসান বযদূবী (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম হুসাইন উপাধি ফাখরুল ইসলাম।

ফাখরুল ইসলাম ইমাম আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবদুল কারীম ইব্ন মূসা বযদূবী হানাফী (র.)। উসূলী ও ফুরু'য়ী মাসআলা-মাসাইলে তিনি ছিলেন সে কালের ইমাম ও ইসলামাকূল শিরোমণি। মাযহাবী মাসআলা-মাসাইল মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ।

ইমাম বযদূবী (র.) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন –

১. মাবসূত (مبسوط) ১১ খণ্ড,২. শারহে জামি' কাবীর (شرح جَامع كبير),৩. শারহে জামি'সাগীর (شرح جا مع صغير),৪. উসূলে বাযদূবী (أصول بزدوى) এ গ্রন্থ ফিকহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। ৫. তাফসীরে কুরআন মাজীদ ১২০ খণ্ড,৬. গিনাউল ফিকহ্ (غناء الفقه),৭. কিতাবুল আমালী (كتاب الأمالى) ইত্যাদি।

তিনি দীর্ঘদিন সামারকন্দে দারস-তাদরীসের কাজ ও বিচারপতির দায়ীত্ব পালন করে-ছেন।[২]

ইমাম আবুল হাসান বাযদূবী (র.) -এর মেধাশক্তি ছিল অসাধারণ। এ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

একদা জনৈক আলিম আল্লামা বাযদূবীর নিকট ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর স্মৃতিশক্তি ও মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এক মাসেই কুরআন মাযীদের হিফ্য সম্পন্ন করেছেন এবং প্রত্যেক দিনই তিনি একবার তা খতম করতেন। ইমাম আবুল হাসান বলেন, এ তো অত্যন্ত সহজ কাজ। প্রত্যেক আলিমের জন্যই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা উচিত। তোমরা আমার নিকট তোমাদের সরকারী হিসাব পত্রের রেজিস্টার নিয়ে আস এবং দুই বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব আমাকে পাঠ করে শুনাও। লোকেরা তা-ই করল। এরপর রেজিস্টারগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে শীলমোহর করে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে সংরক্ষণ করা হল। ইমাম বাযদূবী (র.) এরপর হজ্জে চলে যান এবং ছয় মাস পর প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর একদা তিনি এক জনসভায় ঐ সকল রেজিস্টার তলব করে জনৈক শাফি'য়ী আলিমের হাতে সেগুলো সোপর্দ করেন। এরপর তিনি

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা। ২. আনওয়ারুল বারী, পৃষ্ঠা ১০৪। ৩. তারীখে ফিকহী ইসলামী, ৪৫০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

রেজিষ্টারের পূর্ণ হিসাবপত্র মুখস্থ শুনিয়ে দেন। দেখা গেল যে, তাতে বিন্দুমাত্রও ভুল হয়নি। উপস্থিত সকলে তাঁর এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল।[১]

আল্লামা ইমাম বযদূবী (র.) ৪৮২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

শামসুল আইম্মা সারাখ্সী হানাফী (র.)

নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ বকর, উপাধি শামসুল আইম্মা, পিতার নাম আহ্মাদ, দাদার নাম সাহল। তিনি শামসুল আইম্মা সারাখ্সী নামে সকলের কাছে পরিচিত। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। ফেকহী উসূল ও নীতিমালা ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি শামসুল আইম্মা হালওয়াইর নিকট বাগদাদে হাদীস, ফিকহ্, তাফসীর অন্যান্য ইল্ম শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম সারাখ্সীর নিকট থেকে ইল্ম হাসিল করে যাঁরা মুহাদ্দিস, ফকীহ্, মুফ্তী, মুফাস্সির অন্যান্য জ্ঞানে পারদর্শী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বুরহানুল আইম্মা আবদুল আযীয ইব্ন উমর ইব্ন মাযাহ্, রুকনুদ্দীন, মাসউদ ইব্ন হাসান (র.) প্রমূখ মনীষী সুপ্রসিদ্ধ।

সত্য কথা বলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। সে যুগের বাদশাহ 'খাকান'- এর বিরুদ্ধেও সত্য কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। যে কারণে বাদশাহ্ তাঁকে এক অন্ধকূপের মধ্যে বন্দী করে রাখেন।

সেখানে থেকেই তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব মাবসূত (مبسوط) লিপিবদ্ধ করান। অথচ সেখানে সাহায্য নেওয়ার মত কোন কিতাবাদি ছিল না। তাঁর শিষ্যগণ কূপের উপরে আশে পাশে বসে তাঁর শ্রুতিলিপি লিখনের কাজ চালিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি তাঁর ফিকহ্ হাদীসের দারস ও তাদ্রীসের কাজ কূপের ভিতর থেকে জারী রাখেন। এই বন্দী জীবনেই তিনি উসূলে ফিকহ্রে একটি কিতাব সিয়ারে কাবীরের শরাহ্ লিখানোর কাজ সমাপ্ত করেন। মুক্তি লাভের পর শেষ বয়সে তিনি ফারগানায় অবস্থান করে মাবসূতের অসম্পূর্ণ অংশ সমাপ্ত করেন।

এ ছাড়াও তিনি মুখ্তাসারুত্ তাহাবী (مختصر الطحاوى) ও ইমাম মুহাম্মদের কিতাব সমূহের শরাহ্ লিখেন।

একদা কেউ তাকে বলল, ইমাম শাফি'য়ী (র.) তো তিনশ' জুয্ মুখস্থ করেছেন। তখন তিনি তাঁর মুখস্থকৃত মাসাইল হিসাব করে দেখলেন যে, তাঁর বার হাজার জুয্ মুখস্থ রয়েছে। ইমাম সারাখ্সী (র.) ইল্মী দক্ষতায় ছিলেন যেমন পারদর্শী তেমনি আমলেও বুযুর্গ ব্যক্তিছিলেন। তাঁর থেকে বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে।[২]

তিনি ৫৯০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১. তারীখে ফিকহী ইসলামী, ৪৫০ পৃষ্ঠা। ২. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আল্লামা ফাখ্‌রুদ্দীন হাসান কাযীখান (র.)

আল্লামা ফখ্‌রুদ্দীন হাসান কাযীখান (র.) ছিলেন একজন খ্যাতনামা মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিস। তাঁর উপনাম আবুল মাফাখির, পিতার নাম মানসূর, দাদার নাম মাহমূদ, কাযীখান নামে তিনি প্রসিদ্ধ। পূর্ণনাম আবুল মাফাখির ফাখরুদ্দীন শায়খ হাসান ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন মাহমুদ ফারগানানী কাযীখান (র.)। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট মুখপাত্র ছিলেন। উসূলী ও ফুরুয়ী মাসাইল এবং কুরআন ও হাদীসের সূক্ষ্মসূক্ষ্ম অর্থ ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে তিনি ছিলেন অসাধারণ ও পারদর্শী প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

ইব্‌ন কামাল পাশা তাঁকে তাবকাতে ফুকাহার তৃতীয় স্তর 'মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল' -এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি বহুসংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন।

তাঁর রচনার মধ্যে ফাতওয়ায়ে কাযীখান (قاضی خان) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চার খন্ডে সংকলিত এই ফাতওয়া গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে। হাফিয কাসিম ইব্‌ন কাতলুবুগা তাসহীহুল কুদূরী (تصحيح القدوری) নামক কিতাবে লিখেন যে, কাযী খান যে মাসআলার তাসহীহ্ (সংশোধন) করেন তা সকলের উর্ধ্বে স্থান পায়। তা ছাড়াও তিনি 'কিতাবু আমালী' (كتاب أمالى) , 'কিতাবু মাহাযের' (كتاب محاضر), 'শারহে যিয়াদাত' (شرح زيا دات), 'শারহে জামি' সাগীর' (شرح جامع صغير), ২য় খন্ডে; 'শরহে আদাবুল কাযী' (شرح أدب القاضی) প্রভৃতি কিতাব রচনা করেছেন।[১]

তিনি ৫৯২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র.)

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ এবং হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা। নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি বুরহানুদ্দীন, পিতার নাম আবূ বকর। বংশ পরিচয় নিম্নরূপ - আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল জলীল ইব্‌ন আবদুল খলীল (র.)। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) -এর বংশধর। তিনি ৫১১ হিজরী সনে ৮ই রজব সোমবার বাদ আসর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুরগীনান নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাই তাঁকে মুরগীনানী বলা হয়ে থাকে। কারো মতে তিনি মুরগীনানের নিকটবর্তী রুশদান নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সে প্রেক্ষিতে তাঁকে মুরগীনানীও বলা হয়।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির। এ ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাক্‌ওয়া পরহেযগারীর দিক দিয়েও তিনি ছিলেন সে যুগের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আল্লামা কামাল ইব্‌ন পাশা (র.) তাঁকে

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তাবকাতে ফুকাহার 'আসহাবুত্ তারজীহ্' (পঞ্চম তবাকা) এর মধ্যে গণ্য করেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে 'মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব' বলেছেন।

তাঁর প্রণীত হিদায়া কিতাবের মাসআলা সমূহে দলীল হিসাবে ব্যাপকভাবে হাদীস উদ্ধৃত করার দ্বারা তিনি যে একজন উঁচুস্তরের মুহাদ্দিসও ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিদায়া কিতাবের ভাষা, সাহিত্য তাঁর আরবী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ও অসাধারণ পান্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। একজন শি'আ আলিম উক্ত কিতাবের ভাষা সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে বলেছিলেন ইসলামী কিতাবসমূহের মধ্যে বুখারীর পরেই হিদায়ার স্থান। কথিত আছে যে, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, 'জালালাইন শরীফের মত তাফসীর আমাকে লিখতে বললে তা লিখতে পারব কিন্তু হিদায়ার মত কিতাবের অংশ বিশেষ লিখাও আমার পক্ষে অসম্ভব।[১]

আল্লামা মুরগীনানী (র.) বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইল্ম হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলঃ

মুফ্তিউস্ সাকালাইন নাজমুদ্দীন আবূ হাফস উমার (র.), আবুল লাইস আহ্মাদ ইব্ন উমর (র.), আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.), জিয়া উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন (র.), মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন মাসউদ (র.), উসমান ইব্ন ইব্রাহীম (র.), শায়খুল ইসলাম বাহা উদ্দীন (র.), মিনহাজুশ্ শরীয়াহ্ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন (র.) প্রমুখ।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র.) -এর নিকট থেকে যাঁরা ইল্ম হাসিল করার সুযোগ লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দীন নিজামুদ্দীন (র.), শায়খুল ইসলাম ইমামুদ্দীন (র.), কাযীউল কুযাত মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র.), শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুস্ সাত্তার কুরদী (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র.) বহুসংখ্যক কিতাব প্রণয়ন করেনে। এর মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকখানা কিতাবের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. হিদায়া ঃ আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র.) প্রথমে কুদূরী ও জামি সাগীর গ্রন্থদ্বয়ের মতন (মূল বক্তব্য) অবলম্বনে 'বিদায়াতুল মুবতাদী' নামক একখানা কিতাব রচনা করেন। এরপর তিনি উক্ত বিদায়াতুল মুবতাদী কিতাবখানির উপর 'কিফায়াতুল মুনতাহী' নামে বিস্তারিতভাবে একখানা ব্যাখা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত ব্যাখা গ্রন্থখানা আশি খণ্ডে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে তিনি 'কিফায়াতুল মুনতাহি' নামক কিতাবখানা মূল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে চার খণ্ড সম্বলিত এক অপর খানা কিতাব রচনা করে। যে কিতাবখানা পৃথিবীর সর্বত্র 'হিদায়া' নামে প্রসিদ্ধ (হিদায়ার ভূমিকা)।[২]

---

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

২. এ'লাউস সুনান, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১. মুনতাকা (منتقى) ২. তাজনীস (تجنيس)

৩. মাযীদ (مزيد) ৪. মানাসিকুল হাজ্জ (مناسك الحج)

৫. নাশ্‌রুল মাযহাব (نشر المذهب) ৬. মুখতারাতুন নাওয়াযিল (مختارات النوازل)

৭. কিতাবুল ফারাইয (كتاب الفرائض) ইত্যাদি।

আল্লামা বুরহানুউদ্দীন ৫৯৩ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইন্তিকালের সময় তিন পুত্র রেখে যান, যাঁরা তৎকালিন যুগে খ্যাতনামা আলিম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[১]

সাদরুশ্ শারী'আহ্ ও তাজুশ্ শারী'আহ্ (র.)

ইসলামী ফিকহ্-এর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ শারহে বেকায়ার লেখকের উপাধি হল 'সাদরুশ্ শারী'আহ্'। তাঁর প্রপিতামহ আহ্‌মাদ -এর উপাধি ছিল 'সাদরুশ্ শারী'আহ্'। তাই তাঁকে সাদরুশ শারী'আহ্ আসগার বলা হয়। তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ্, পিতার নাম মাসউদ এবং পিতামহের নাম মাহমুদ, তাঁর উপাধি ছিল 'তাজুশ শারী'আহ্'। তাঁর বংশক্রম সাহাবী হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) -এর সাথে মিলিত হয়।

সাদরুশ্ শরীআহ্ হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ কালাম, ইল্‌মে মুনাযারা, নাহ্‌, লুগাত, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সাদরুশ্ শারী'আহ্ এর পিতামহ তাজুশ্ শারী'আহ্ একজন প্রখ্যাত আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি তার পৌত্র উবায়দুল্লাহ্ সাদরুশ্ শারী'আহ্‌র জন্য লফযী মাসাইল হিদায়া লেখার পর বিকায়া নামক গ্রন্থখানা রচনা করেন। পিতামহের মাসাইল সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে সাদরুশ্ শারী'আহ্ তা মুখস্থ করে ফেলতেন। তাজুশ্ শারী'আহ্ যে ফিক্‌হ শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন এই গ্রন্থখানাও এর প্রমাণ বহন করে।

সাদরুশ্ শারী'আহ্ তাঁর পিতামহ তাজুশ্ শরীআহ্ এবং অন্যান্য উলামাগণের নিকট থেকে ইল্‌মে তাফসীর, ফিকহ্ ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। হাফিয আবু তাহির মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আলী তাহিরী ও ইব্‌ন মুহাম্মদ বুখারী (র.) তাঁর শাগরিদদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর দাদার লিখিত 'বিকায়া' কিতাবের বিস্তারিত শরাহ্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ শরহে বিকায়া গ্রন্থখানা উলামা মাসায়েখের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মাদ্রাসায় এ কিতাবখানা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে 'কিফায়া' নামক কিতাবখানা সংক্ষিপ্ত করে অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেন যা 'নিকায়া' গ্রন্থ নামে পরিচিতি লাভ করে। এ ছাড়া তিনি উসূলে ফিকহ্ বিষয়ের উপর 'তানকীহ্' (تنقيح) কতাব রচনা করেন এবং 'তাওযীহ্' (توضيح) নামে নিজেই এর রচনা করেন।

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তা ছাড়া 'আল-মুকাদ্দামাতুল আরবা'আহ্' (المقدمات الأربعة) 'তা'দীলুল উলূম ফী উলূমিল আকলিয়া' (تعديل العلوم فى علوم العقلية) 'আল-বিশাহ্' (الوشاح) 'কিতাবুল শুরু' (كتاب الشرط) 'কিতাবু'ল মুহাযিরা' (كتاب المحاضرة) ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনালীর অন্তর্ভূক্ত। তিনি ৬৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৪৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু সন ৭৪৫ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ ফাখরুদ্দীন যায়লা'য়ী (র.)

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ ফাখরুদ্দীন যায়লা'য়ী (র.) একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নাম উসমান, উপনাম আবূ মুহাম্মদ, পিতার নাম আলী, দাদার নাম মেহজান, উপাধি ফাখরুদ্দীন। পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ ফাখরুদ্দীন উসমান ইব্ন আলী মেহজান যায়লা'য়ী, হানাফী (র.)। তিনি ফাখরুদ্দীন যায়লা'য়ী নামে প্রসিদ্ধ। যায়লা' হাবশার এক শহরের নাম। তিনি সেখানকার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে যায়লা'য়ী বলা হয়। সেখানে আর বহু যোগ্যযোগ্য উলামার আবির্ভাব ঘটেছিল।

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ ফাখরুদ্দীন যায়ল'য়ী (র.) হিজরী সনে কায়রো আগমন করেন এবং সেখানে শিক্ষা- দীক্ষা, রচনা সংকলন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকেন। সে যুগের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরাম তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইল্মী ফায়দা হাসিল করেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'কানযুদ দাকাইক' (كنز الدقائق) ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তাবয়ীনুল হাকাইক' (تبيين الحقائق) প্রসিদ্ধ। যা ছয়টি খণ্ডে তিনি সমাপ্ত করেন। এ ছাড়াও তিনি 'জামি' সাগীর'-এর ভাষ্য লিখেছেন।

আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্ন হুমাম (র.)

আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্ন হুমাম (র.) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আব্দুল হামীদ (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। আল্লামা ইব্ন নুজাইম 'বাহরুর রাইক' গ্রন্থে তাঁকে 'আসহাবে তারজীহ্' স্তরের ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেন। তবে অন্যান্য আলিমগণ তাঁকে ইজ্তিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন ফকীহ্ বলে বর্ণনা করেছেন। শেষোক্ত অভিমতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, কালাম,উসূল, নাহ্, মানতিক, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্ন হুমাম (র.) আবূ যুরআহ ইরাকী ও শামসুদ্দীন শামী (র.) এর নিকট ইল্মে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর সমকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ বুরহান মন্তব্য করেন যে, আমি ফিকহী মাসাইলের দালাইল প্রমাণাদি অন্বেষণ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শহরে ইব্ন হুমামের চেয়ে বড় আলিম দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আধ্যাত্মিক দিক থেকেও তিনি ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ সম্পাদন করেন। তাঁর বহুসংখ্যক

www.pathagar.com

রচনাবলী রয়েছে। নিম্নে তাঁর কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল -

১.'ফাতহুল কাদীর'(فتح القدير) হিদায়ার ভাষ্য গ্রন্থের মধ্যে এটা সর্বোত্তম।

২.'আত্-তাহ্রীর'(التحرير) এ কিতাব খানা উসূলে ফিকহ্র নির্ভরযোগ্য কিতাব।

৩.'মুসায়েরাহ্'(مسائرة) ৪.'যাদুল ফিক্হ'(زاد الفقه) ফিকহ্ বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদি।

তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদগণ তাহরীর কিতাবের অতি চমৎকার একখানা শরাহ্ লিখেছেন। তিনি ৮৬১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। তাঁর পূর্ণ নাম শায়খুল ইসলাম বদরুদ্দীন আইনী মাহমুদ ইব্ন আহ্মদ (র.)। তিনি কায়রোর অধিবাসী ছিলেন। ৭৬২ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি স্বীয় যুগের হাদীস, ফিকহ্, তাফসীর, ইতিহাস, উসূল, ইল্ম মা'কূল ও মা'কূলের ইমাম ছিলেন।

তিনি ইল্ম শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে সফর করেন। প্রখ্যাত উলামা মিসর থেকে ইল্ম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি 'মু'জামু শুয়ুখ' গ্রন্থে তাঁর উস্তাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তাঁদের মধ্য থেকে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

হাফিয জয়নুদ্দীন ইরাকী, হাফিয কুতুব উদ্দীন হালবী, হাফিয শরফুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আশরাফ (র.) প্রমুখ।

তিনি কায়রোর 'জামিয়া মুওয়ায়্যিদিয়ায়' (جامعة مؤيدية) প্রায় চল্লিশ বছর হাদীস শরীফের অধ্যাপনার কাজ সম্পাদন করেন। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য মাদ্রাসায়ও দারস-তাদরীসের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন বাদশাহ্ নিজে একজন আলিম ছিলেন। তিনি ইল্মী আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি সিহাহ্ সিত্তার কিতাবের দারসের জন্য নির্ধারিত বিশেষে বিশেষ কুরসির ন্যায় 'শরহে মা'আনিউল আসার' কিতাবের জন্য ও একটি স্বতন্ত্র কুরসী নির্ধারণ করেন এবং এ কুরসীর জন্য আল্লামা আয়নীকে নির্বাচন করেন। তিনি বুখারী অন্যান্য কিতাবের ন্যায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'শরহে মা'আনিউল আসার' কিতাবের দারস প্রদান করেন।

তাঁর নিকট হতে বহু সংখ্যক শাগ্রিদ ইল্মী ফায়দা হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

কামার উদ্দীন ইব্ন হুমাম হাবাসী, হাফিয কাসিম কাতলুবুগা হানাফী, হাফিয আযাযী শাফি'য়ী, হাফিয ইব্ন খুযায়মা শাফি'য়ী, কাযিউল কুযাত ইজ্জুদ্দীন আহ্মদ ইব্ন ইব্রাহীম হাম্বলী, শায়খ কামাল উদ্দীন মালিকী।

www.pathagar.com

হাফিয ইব্ন হাযার আস্‌কালানী ও আল্লামা আইনী (র.) -এর সমকালীন প্রতিযোগী আলিম ছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, ইব্ন হাজার আস্‌কালানী (র.) তাঁর থেকে ইল্‌মী ফায়দা হাসিল করেছেন এবং 'আল্‌-মাজমাউল মু'য়াসসিস' (المجمع المؤسس) গ্রন্থে আল্লামা আইনীকে আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র.) শায়খ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) এর বহু সংখ্যক রচনাও রয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. উমদাতুল কারী (عمدة القارى) ৩০ খণ্ড, (বুখারী শরীফের বে-নযীর ভাষ্য গ্রন্থ)।
২. নুখাবুল আফকার শারহু মা'আনিউল আসার তাহাবী (نخب الافكار شرح معانى الآثار طحاوى)
৩. মাবানিউল আখবার ফী শারহি মা'আনিউল আসার (مبانى الأخبار فى شرح معانى الآثار)
৪. মাবানিউল আখুবার ফী রিজালি মা'আনিউল আসার (مبانى الأخبار فى رجال معانى الآثار)
৫. শারহু সুনানি আবী দাঊদ (شرح سنن أبى داؤد)
৬. তাকমীলু'ল আত্‌রাফ, (تكميل الطراف)
৭. বিনায়া, (শারহ্‌, হিদায়া) ১০ খণ্ড (بناية شرح هداية)
৮. আদ্‌ দুরারুয্‌ যাহিরা, (الدرر الزاهرة)
৯. গুরারুল আফকার, (غرر الأفكار)
১০. রাম্‌যুল হাকাইক শারহু কানযুদ্‌ দাকাইক (رمز الحقائق شرح كنز الدقائق) ইত্যাদি।[১]

আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম মিস্‌রী (র.)

আল্লামা ইব্ন নুজাইম (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্‌। তাঁর নাম যাইনুদ্দীন, পিতার নাম ইব্রাহীম, পিতামহ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কারো নাম ছিল নুজাইম, সে দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁকে ইব্ন নুজাইম বলা হয়। ৯২৩ হিজরীতে তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়রো ও অন্যান্য এলাকার বিশিষ্ট আলিমগণের নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ আমীনুদ্দীন ইব্ন আবদুল আলী হানাফী, আবুল সুলামী, শায়খুল ইসলাম আহ্‌মাদ ইব্ন ইউনুস, শায়খ নুরুদ্দীন দায়লামী, শায়খ শাকীর মাগরিবী (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা ইব্ন নুজাইম (র.) একজন প্রখ্যাত মুফ্‌তী ও সুযোগ্য উস্তাদ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বহু সংখ্যক আলিম ইল্‌ম হাসিল করেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর ভাই সিরাজ উদ্দীন, (নাহরুল ফাইক গ্রন্থের লেখক), আল্লামা তামারতাশী (المنح - গ্রন্থের লেখক), শায়খ মুহাম্মদ আলী সাব্‌ত ইব্ন আবূ শরীফ মুকাদাসী, আবুল হাফফার মুকাদ্দাসী (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ১৪৭-১৫০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইল্মী যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সাথে সাথে তিনি সুমধুর চারিত্রিক অধিকারী ছিলেন। আল্লামা আবদুল ওয়াহাব শা'রানী বলেন, দশটি বছর আমি তাঁর সংগে ছিলাম, কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁকে কোন দোষণীয় কাজ করতে দেখিনি। তিনি আরও বলেন, ৯৫৩ হিজরীতে আমি তাঁর সংগে হজ্বের সফরে গিয়েছিলাম। সেখানেও তাঁকে তাঁর সংগী সাথীদের সাথে অমায়িক ও বিনয় ব্যবহার করতে দেখেছি। অথচ সফরে মানুষের অভ্যন্তরীণ সকল ত্রুটি দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়।[১]

তিনি ৯৭০ হিজরীর ৮ই রজব ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা ইব্ন নুজাইম (র.) বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহুসংখ্যক কিতাবাদী রচনা করেছেন। এর মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. বাহ্রুর রাইক, (بحر الرائق) কানযুদ্ দাকাইক কিতাবের ভাষ্য গ্রন্থ।

২. আল- আস্বাহ ওয়াল-নাযাইর, (الأشباه والنظائر)

৩. শারহুল মানার (شرح المنار)

৪. লুব্বুল উসূল মুখতাসারু তাহরীরিল উসূল লি-ইব্ন হুমাম (لب الأصول مختصر تحرير الأصول لابن همام)

৫. আল-ফাওয়াইদুয যাইনিয়্যা ফী ফিকহিল হানাফিয়া (الفوائد الزينية فى فقه الحنفية)

৬. হাশি'আয়ে হিদায়া (حاشيه هداية)

৭. হাশি'আ জামিউল ফুসূলাইন (حاشية جامع الفصولين) ইত্যাদি।

আল্লামা সাইয়িদ আহ্মাদ তাহ্তাবী (র.)

আল্লামা সাইয়িদে আহ্মাদ তাহ্তাবী (র.) ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। তিনি তাহ্তাবী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন সুযোগ্য মুফ্তী ছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি মিসরে ফাত্ওয়া প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি 'দুর্রে মুখ্তার' (در مختار) কিতাবের নির্ভরযোগ্য হাশি'য়া (পাদটিকা) লিখেছেন যা হাশি'য়ায়ে তাহ্তাবী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর ফাযাইল ও মানাকিব অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করতেন। তাঁর বরাতে আল্লামা শামী (র.) -'রাদ্দুল মুহ্তার' (رد المحتار) কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

তিনি এ ছাড়াও তাঁর ছোট বড় অনেক রিসালা ও কিতাবাদি রয়েছে। তিনি ১১৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

---

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ২০৫-২০৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

হাফিয জামালুদ্দীন যায়লা'য়ী (র.)

হাফিয জামালুদ্দীন যাযলায়ী (র.) একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খ্যাতনামা ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ উপনাম আবূ মুহাম্মদ, উপাধি জামাল উদ্দীন। পিতার নাম ইউসুফ, দাদার নাম মুহাম্মদ ইব্ন আইউব ইব্ন মূসা। তিনি জামাল উদ্দীন যায়লায়ী নামে অধিক পরিচিত।

যায়লা (زيلع) হাবশার অন্তর্ভূক্ত একটি শহরের নাম। তিনি সে শহরের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে যায়লায়ী বলা হয়। ইল্‌মে ফিকহ্ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে তিনি সমকালীন উলামায়ে কিরামের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। হাদীস সংকলনের কাজে তিনি বেশীর ভাগ সময় নিয়োজিত থাকতেন।

তিনি অনেক উস্তাদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে প্রখ্যাত কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল্লামা ফাখরুদ্দীন যায়লায়ী,

২. কাযী আলা উদ্দীন (র.) ও

৩. হানাজীব হাররানী (র.) প্রমূখ।

তিনি 'হিদায়া' কিতাবের হাদীস সমুহ তাখরীজ করেছেন। তার নাম হল, 'নাসবুর্ রায়া'। এ ছাড়া তিনি কাশ্‌শাফ কিতাবের হাদীস সমূহ তাখরীজ করেন। আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) 'ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যা' গ্রন্থে লেখেন যে, হিদায়ার সকল ভাষ্যকারই যায়লায়ীর তাখরীজ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।[১]

তিনি ৭৬৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী (র.)

আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ফকীহ্ ও মুফাস্‌সির। তাঁর নাম আবদুল্লাহ্, উপনাম আবুল বারাকাত, উপাধি হাফিয উদ্দীন, পিতার নাম আহ্মাদ, দাদার নাম মাহমূদ। নাস্‌ফ (نسف)'মা ওয়ারাউন নাহার'-এর অন্তর্ভূক্ত একটি শহরের নাম। সে হিসাবেই তাকে 'নাসাফী ' বলা হয়ে থাকে। তিনি সে যুগের বিখ্যাত আলিম শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুস্ সাত্তার কুরদী, নাজমুল উলামা আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী বদরুদ্দীন খাহারজাদা (র.) প্রমূখ মনীষীর নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেন। আল্লামা সাগনাকী (سغناقى) তাঁর শাগরিদদের মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য।

ইব্ন কামাল পাশা (র.) ইমাম আবুল বারাকাত (র) - কে তাবাকাতে ফুকাহার ষষ্ঠ স্তরের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ ফিল্ মাযহাব এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আল্লামা আবুল বারকাত নাসাফী (র.) বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. ওয়াফী (وَافى)

২. কাফী (كَافى)

৩. আল-মিনা (المناء)

৪. কালফুল আসরার (كَشف الأسرار)

৫. আল- মুসতাস্ফা (اَلمستصفى)

৬. আল-মানার ফী উসূলিদ্দীন (اَلمنار فى اُصول الدِّين)

৭. আল- উমাদা (العمدة) ইত্যাদি।[১]

তিনি ৭১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১. আনওয়ারুল বারী, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৭

উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুফ্তীগণের পরিচিতি এবং অবদান

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য স্বাভাবিকভাবে যে পন্থা গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন তা হল এই ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

এ আয়াতের মর্মে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকে মুসলিম সম্প্রদায় ও গোত্রের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি কুরআন ও সুন্না্হ্র জ্ঞানে বুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লাভ করা অপরিহার্য করেছেন।

অতএব বুঝা গেল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক লোকের জন্য দীনী ইল্মে পারদর্শিতা লাভ করা ফরযে-কিফায়া। তাঁরা কুরআন সুন্নাহ্র জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করে তা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে পৌছিয়ে দিবেন। তাঁদের প্রতি এ দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত।

সাহাবীগণের পর আরব ও আযমে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটলে তখন থেকেই ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে মদীনা, কূফা, ও বসরা ও সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ইল্মী মাকতাব ও মারকায গড়ে ওঠে। কূফায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর শাগরিদগণকে নিয়ে যে মাকতাব-গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন সেটাই কালক্রমে হানাফী মাযহাবের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। তাঁর প্রধান চারজন শাগরিদ যথাক্রমে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার ও ইমাম হাসান (র.) হচ্ছেন হানাফী মাযহাবের চার স্তম্ভ। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে কিতাব ও ফাত্ওয়ার আকারে হানাফী মাযহাব সম্প্রসারিত হয়। কুরআন ও হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সকল ইমামগণের মতামত অনুসারে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম সরল সহজ ভাষায় বিধান আকারে 'ফিকহ্ শাস্ত্র' বিন্যস্ত করে সাধারণ মানুষের কাছে পেশ করেন। এভাবেই ফাতাওয়া-ফারাইয লেখা ও প্রকাশের একটি চিরন্তন ধারা শুরু হয়ে যায় এবং সব মাযহাবেই এ ধারা চালু হয়। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য ফিকহের গ্রন্থসমূহই এর প্রমাণ।

www.pathagar.com

এ উপমহাদেশে ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রবেশ কখন হয় তার নির্দিষ্ট কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমের সিন্ধু বিজয়কালে এ উপমহাদেশে কিছুসংখ্যক ফকীহ্র আগমন ঘটে। কেননা তিনি এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন মুসলমান। ইসলামী জীবন ধারা অনুসরণের জন্য ফিকহের প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে। মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমের পর প্রায় তিন শতাব্দি পর্যন্ত এই উপমহাদেশের মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালিত হয়নি। তবে মুলতান, সিন্ধু, লাহোর ইত্যাদি ঐতিহাসিক শহরগুলোতে সেকালের কিছুকিছু আলিমের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। সাধারণভাবে একথা অনুমান করা যায় যে অধিকাংশ উলামায় কিরাম হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেননা শাফি'য়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের তেমন কোন প্রভাব এ উপমহাদেশে নেই। লাহোরের বিখ্যাত ওলী ও সূফী দাতাগঞ্জ বখ্শ (র.) -এর 'কাশফুল মাহ্যূব' গ্রন্থটি যদিও তাসাউফের বুনিয়াদী প্রাচীন গ্রন্থ বলে খ্যাত তবুও এ কিতাব অধ্যায়নে বুঝা যায় যে, তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এরপর বিখ্যাত আলিম ও বিশ্ব বিখ্যাত সূফী সাধকরূপে যে মহান ব্যক্তির নাম ইতিহাসে স্মরণ করা হয় তিনি হলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র.) (জন্ম ঃ ৫৩৭, মৃত্যু ঃ ৬৩৩ হিজরী)। তাঁর সম্পর্কে মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.) লিখেছেন যে, তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১]

এ প্রসঙ্গে আর ও উল্লেখ্য যে ইরাক, ইরান, সমরকন্দ, বুখারা ও আফগানিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আলিমগণের আগমনের সাথে সাথেই এদেশে ফিকহ্ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। তাঁরা এদেশে এসে স্থানে স্থানে খানকাহ্ করে ছাত্রদেরকে ফিকহের শিক্ষা দিতেন। আগের যুগে উপমহাদেশে সাধারণত ফার্সী ভাষাই ফিকহের কিতাব ও ইসলামী বই পুস্তক রচিত হতো। কেননা তখন ভারতের সুধীজনের ভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সী। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী জ্ঞান ও ফিকহ্ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটে। সে যুগে শি'আ মাযহাব ও মতবাদ এ দেশে কিছু কিছু প্রচারিত থাকলেও সাধারণের মধ্যে এর কোন প্রভাব ছিল না।

খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্তী (র.) লাহোর ও মুলতান হয়ে দিল্লী আগমন করেন এবং আজমীর এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ স্থানটিকেই তিনি ভারতে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। এখান থেকেই তিনি দীনের দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেন। এবং নব দিক্ষিত মুসলমানগণকে তালীম ও তালকীন দিয়ে ঈমান ও আমলে পরিপক্ক করে তোলেন। তাঁরই বাতেনী আহবানে ভারতের গজনীর বাদশাহ্ শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী (র.) -এর অভিযান সাফল্য মণ্ডিত হয়। পর্যায়ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন হয়। মুসলিম শাসকদের সহায়তায় কিছু সংখ্যক আলিম জায়গীর লাভ করেন। তাঁরা স্থানে স্থানে খানকাহ্ গড়ে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রেও হতে থাকে প্রচলন ও সম্প্রসারণ। সেই যুগেই উলামায়ে কেরাম হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফাত্ওয়ায়ে তাতার খানিয়াহ, ফাত্ওয়ায়ে

১. তারীখে ইলমে ফিকহ্ (উর্দূ): মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.)।

www.pathagar.com

হিন্দ (আলমগীরী) -এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর। যাঁরা ফিকহ্‌ের মাসাআলা উদ্ভাবন গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ফাত্‌ওয়া দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁরাই ফকীহ্‌ নামে পরিচিত।

এ উপমহাদেশের আলিম ফকীহ্‌গণের সবিস্তার পরিচয় দেওয়া এবং তাঁদের অবদান তুলে ধরা খুবই কঠিন কাজ। কেননা অনেক ফকীহ্‌রই জীবনী সংরক্ষিত নয়। যে সকল ফকীহ্‌ জীবনভর অধ্যাপনা ও শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের সংখ্যাই সমাধিক। আর কিছুসংখ্যক ফকীহ্‌ গ্রন্থ প্রণয়ন ও ফাত্‌ওয়া রচনার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। আবার কতকে হাদীসের শরাহ প্রণয়ন, কুরআনের তাফসীর প্রণয়নের কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁরাও কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মাযহাবের মতামতগুলো তুলে ধরেছেন। এদিক দিয়ে ফিকহ্‌ শাস্ত্রে তাঁদের অবদান কোন অংশে কম নয়। বক্ষমান আলোচনায় সর্বপ্রথম বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের মুফ্‌তী ও ফকীহ্‌গণের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এরপর বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ মুফ্‌তী ও ফকীহ্‌গণের আলোচনা করা হবে।

পাকিস্তান ও ভারতের ফকীহ্‌গণের পরিচিতি ও অবদান

এ উপমহাদেশে বর্তমান পাকিস্তান ও ভারত থেকে ফিকহ্‌ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ হয়। সেখান উলামায় কেরাম কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ্‌ শাস্ত্রে সে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন মুসলিম সমাজ তা দিয়ে চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে। নিম্নে তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ফকীহ্‌ ও মুফ্‌তীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. শায়খ নিযামুদ্দীন (র.)

চিশ্‌তীয়া নিযামীয়া -এরীকার অন্যতম শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়া (র.) -এর সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত সুলতান মাশায়েখ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন বুখারী বাদায়ূনী দেহলবী (র.) (মৃত্যু ঃ ৭২৫ হিজরী)। তিনি একদিকে সূফী সাধক অপরদিকে ছিলেন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌।

২. শায়খ ইয়াহ্‌ইয়া মুনিরী (র.)

ফেরদাউসিয়া সিলসিলার অন্যতম আলিম শায়খ আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মুনিরী বিহারী (র.) -এর মুরীদ শায়খুল ইসলাম শরফুদ্দীন (র.) (জন্ম ঃ ৬৬১ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৭৭২ হিজরী)। এ মহান বুযর্গ একদিকে ছিলেন সূফী সাধক এবং অপর দিকে ছিলেন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌।

৩. শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলবী (র.)

তৎকালীন যুগে এ মহান সাধকও একজন খ্যাতনামা ফকীহ্‌ ছিলেন (মৃত্যু ঃ ৭৮০ হিজরী)।

৪. আলম ইব্‌ন আ'লায়া আন্দারপতি (র.)

সমসাময়িককালে তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌ ছিলেন। ভারতের প্রাথমিক মুসলিম শাসনামলের আমীর তাতার খানের নির্দেশে এবং তাঁর সহায়তায় তিনি "ফাত্‌ওয়ায়ে তাতার-খানিয়া" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উপমহাদেশে এ কিতাবখানাই হল সর্বপ্রথম ফিকহ্‌ গ্রন্থ। (মৃত্যু ঃ ৭৮৬ হিজরী)।

www.pathagar.com

৫. শায়খ আবুল ফাতাহ রোকন ইব্ন হুস্সাম নাগারী (র.)

'ফাতাওয়ায়ে হাম্মাদীয়া' গ্রন্থখানা হল তাঁর অমর অবদান।

৬. শায়খ ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ মুলতানী (র.)

তিনি একজন খ্যাতনামা বুযূর্গ ও ফকীহ্ ছিলেন। ৭৯৫ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৭ . মাওলানা ইফ্তিখার উদ্দীন গিলানী দেহলবী (র.)

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি বিখ্যাত আলিম নাসিরুদ্দীন সিরাজ দেহলবীর ওস্তাদ ছিলেন।

৮. মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপূরী (র.)

এ মহান বুযর্গ একজন উচ্চমানের আরবী ভাষাবিদ ও ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন মাওলানা আবদুল্লাহ্ তাবীনী। তিনি বিখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থের একখানি শরাহ্ গ্রন্থ লিখেছেন। যার নাম হল 'শারহে হিদায়া'। এছাড়া তিনি হানাফী মাযহাবের উসূলে ফিকহ্ গ্রন্থ 'উসূলে বাযদূবী এবং ইলমে ফিকহের 'কুল্লিয়া' নামক গ্রন্থের শরাহ্ লিখে মুসলিম উম্মাতের জন্য অমর অবদান রেখে গেছেন। (মৃত্যু ঃ ৯২৩ হিজরী)।[১]

৯. সিরাজুদ্দীন উমর ইব্ন ইসহাক হিন্দী (র.)

তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ছিলেন। তিনি হেদায়ার একখানা মুল্যবান শরাহ্ প্রণয়ন করেছেন -এর নাম হল 'আত্ তাউশীহ্' তবে তিনি শরাহ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। মৃত্যু ঃ ৭৭৩ হিজরী)।[২]

১০. শেরশাহ সুরীর উস্তাদ শায়খ বুদ্দাহ বিহারী (র.)

তিনি সেকালে সকলের নিকট 'শায়খুল ইসলাম' নামে সবিশেষ পরিচিতি ছিলেন।[৩]

১১. বারকলী মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন পীর আলী (র.)

তিনি 'তরীকায় মুহাম্মদীয়া' নামে একখানা অমূল্য গ্রন্থ মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছেন। (মৃত্যু ঃ ৯৮২ হিজরী)।[৪]

১২. মাওলানা হামীদ ইব্ন মুহাম্মদ কুনুবী (র.)

এ মহান বুযুর্গ একজন খ্যাতনামা মুফ্তী ছিলেন। 'ফাতাওয়ায়ে হামিদীয়া' গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান (মৃত্যু ঃ ৯৮৫ হিজরী)।[৫]

১৩. কাযী আবুল ফাতাহ্ বিলগিরামী (র.)

এ মহান ব্যক্তি একজন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ছিলেন এবং বিল গিয়াশের কাযী ছিলেন (মৃত্যু ঃ ১০০১ হিজরী)।

---

১. এক হতে সাত ক্রমিক পর্যন্ত তারীখে ইলমে ফিকহ্, ১২০-১২১ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীতঃ মুফ্তী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.)। ২. আহওয়ালুল মুসান্নিফীন, ১৯৮ পৃষ্ঠা। ৩. তারীখে ইলমে ফিকহ্ ঃ মুফ্তী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.)। ৪. প্রাগুক্ত ৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

১৪. খাজায়ে খাজেগান হযরত বাকী বিল্লাহ্ (র.)

এ মহান বুযুর্গ মুজাদ্দিদে আলফ্সানী (র.) -এর পীর ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যেমন যুগশ্রেষ্ঠ ওলী বানিয়ে ছিলেন তেমনি তিনি মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ (মৃত্যু ঃ ১০১২ হিজরী)।[১]

১৫. মুজাদ্দিদে আলফ্-সানী (র.)

তিনি ঐতিহাসিক এক মহাপুরুষ। বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাবের পাতিয়ালার মহারাজার উমরগড় নিয়ামতের অধীন সারহিন্দ গ্রামে ৯৭১ হিজরী, ১৪ই সাওয়াল জুমু'আ রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম বারাকাত বদরুদ্দীন শায়খ আহ্মাদ। পিতার নাম শায়খ আবদুল আহাদ। ১০৩৪ হিজরী সনের ২৮শে সফর শুক্রবার সুবহে সাদিকের সময় তাঁর ইনতিকাল হয়। তিনি সম্রাট আকবরের অনৈসলামিক কাজ কারবার এবং তাঁর প্রবর্তিত নতুন ধর্ম দীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে দেশময় এক গণআন্দোলন গড়ে তুলেন এবং গোয়ালিয়ার দূর্গে দীর্ঘদিন বন্দী অবস্থায় কাটান। তিনি যে হানাফী মাযহাবের একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত পত্রসমূহে। তাঁর ইন্তিকালের পর ৫৪০ খানা পত্র তিন খণ্ডে 'মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী' নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। এছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহও তিনি রচনা করেন।

১. মা'আরিফে লাদুনিয়া (معَارف لدنية)
২. রিসালাতু মাবদা ও মা'আদ (رِسالة مبداء و معاد)
৩. মুকাশিফাতে গায়বিয়া (مُكاشفة غائبية)
৪. রিসালাতু রাদ্দে রাওয়াফিয (رسالة رد روافض)
৫. রিসালায়ে হালাতে খাজেগানে নকশাবন্দ (رسالة حالت خواجكان نقشبندى)
৬. রিসালাতু আদাবুল মুরীদীন (رسالة أدب المر يدين)

১৬. মুহাম্মদ সাঈদ ইব্ন মুজাদ্দিদে আলফ-সানী (র.)।

তিনি মুজাদ্দিদে আলফ্-সানী (র.) -এর পুত্র এবং একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। হাশীয়ায় মিশ্কাত তাঁর অমর অবদান (মৃত্যু ঃ ১০৭০ হিজরী)।[২]

১৭. শায়খুল হিন্দ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)।

ইব্ন সাইফুদ্দিন বুখারী দেহলবী (র.)। মহান বুযুর্গ ভারতের ইলমে দীনের জগতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশেষ। ১০৫২ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। কোন কোন বর্ণনায় তাঁর মৃত্যু ১০৫৮ হিজরী সন বলেও উল্লেখ রয়েছে। ভারতে উসূলে হাদীসের গ্রন্থ সর্বপ্রথম তাঁর হাতেই রচিত হয় যা 'মুকাদ্দামায়ে মিশকাত' রূপে মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থের সাথে সংযোজিত। এ ছাড়া তিনি আরবী ভাষায় 'লুমআতুত তানকীহ্' এবং ফার্সী ভাষায় 'আশয়াতুল লুমাআত' শরহে মিশকাত

---

১. তারীখে ইলমে ফিকহ্ ঃ মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.)। ২. আহওয়ালুল মুসান্নিফীন, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

নামে দুইখানা কিতাব প্রণয়ন করে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি একদিকে মুহাদ্দিস ও অপরদিকে ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর উজ্জ্বল স্বাক্ষর উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়। এ ছাড়া তিনি 'সফরাস সা'আদাত' নামক আরও এক খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৮. শায়খ হাসান বল্খী (র.)

শায়খ হাসান বল্খী (র.) একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ ছিলেন। ৮৮৬ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৯. ইউসুফ ইব্ন জুনায়েদ তুকানী (র.)

তিনি ছিলেন হাসান বল্খীর ভাই যাখিরাতুল উকরা ও হশীয়ায় শারহে বিকায়া -এ দু খানা গ্রন্থ তাঁরই অবদান। ৯০৫ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০. বাদশাহ্ আলমগীর (র.)

তিনি মোঘল সম্রাজের সর্বোৎকৃষ্ট দীনদার পরহেযগার আলিম, বাদশাহ ছিলেন। তিনি সাতশ' মুহাদ্দিস আলিম সমন্বয়ে একটি বোর্ড ফাত্ওয়া গঠন করে তাঁদের দিয়ে শরয়ী বিধানের একটি সংকলন প্রণয়ন করান, যা 'আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া' অথবা ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরী নামে খ্যাত। তিনি তাঁর শাসনামলে সমস্ত রাজকীয় কাজে এ গ্রন্থখানিকে অনুসরণ করে চলতেন এবং সর্বক্ষেত্রে -এর অনুসরণের নির্দেশ দেন (মৃত্যু ঃ ১১১৮ হিজরী)।

২১. মোল্লা নিযাম উদ্দীন বুরহানপুরী (র.)

বাদশাহ্ আলমগীর সাতশ' আলিমের সমন্বয় যে ফাত্ওয়া বোর্ড কায়েম করেছিলেন, সেই বোর্ডের প্রধান ছিলেন এই মহান ফকীহ্ (মৃত্যু ঃ ১১০৩ হিজরী)।

২২. আল্লামা মোল্লা জিউন (র.)

মোল্লা জিউন (র.) -এর পূর্ব পুরুষ মক্কা শরীফ থেকে এ উপমহাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। যাহিরী-বাতেনী কামালাতের প্রতীক এ মহান বুযর্গ লাখনৌর আমেথি গ্রামে ১৪৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেণ। তাঁর পূর্ব আসল নাম হচ্ছে হাফিয শায়খ আহ্মাদ ইব্ন আবু মাসঊদ ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ আল-হানাফী (র.)। তবে তিনি 'মোল্লা জিউন' নামেই সুপিরিচিত। হিন্দী ভাষায় 'জিউন' শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবন্ত। তিনি বাল্যকালেই কুরআন মজীদ হিফয করার পর ফতেহ্পুর অঞ্চলের কোরা গ্রামের মোল্লা লুতফুল্লাহ্ কারী থেকে ইলমে দীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করে সনদ লাভ করেন। এরপর দেশব্যাপি তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে বাদশাহ্ আলমগীর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেন। বাদশাহ্ আলমগীরের পুত্র শাহ আলম তাঁর নিকট ইল্ম শিক্ষা করেন এবং উস্তাদকে আন্তরিকভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। মোল্লা জিউন (র.) আটান্ন বছর বয়সে হজ্জের সফরে যান। মদীনা শরীফ অবস্থানকালে সেখানকার আলিমগণের অনুরোধে তিনি উসূলে ফিকহ্ বিষয়ের 'আল-মানার'

www.pathagar.com

নামক কিতাবখানির একখানা পূর্ণাংগ শরাহ্ লিখেন। যার নাম 'নূরুল আনওয়ার'। এ কিতাব খানির রচনায় তাঁর সময় লেগেছিল দু'মাস সাত দিন। এ কিতাবখানা স্বাক্ষ্য বহন করে যে তিনি একজন উচ্চস্তরের হানাফী ফকীহ্ ছিলেন। দীনী শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ কিতাবখানি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ মহান বুযুর্গের আর একটি অমর অবদান হচ্ছে "তাফসীরাতুল আহ্‌মদীয়া ফী বয়ানে আয়াতিশ শারীয়াহ্" যা এদেশে 'তাফসীরে আহমাদী' নামে খ্যাত। এ তাফসীরখানা তিনি তাঁর ষোল বছর বয়সের সময় প্রণয়ন করেন। মোল্লা জিউন (র.) ১০৮৩ বছর বয়সে হিজরী ১১৩০ সনে দিল্লীতে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর স্বীয় জন্মভূমি আমেথি গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়।

২৩. মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ্ বিহারী (র.)

ভারতের ইসলামী জ্ঞানাকাশে মুহিব্বুল্লাহ্ বিহারী (র.) হলেন মুশতারী সমতুল্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিহারের মুহিব আলীপূর পরগনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা কুতুব উদ্দীন শামস আবাদরী দরসগাহ থেকে ইসলামী উলূমের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। বাদশাহ্ আলমগীরের আমলে তিনি লাখ্‌নৌর হায়দারাবাদের কাযী নিযুক্ত হন। পরে তিনি শাহ আলমের সাথে কাবুল গমন করেন। কাবুল থেকে এসে তিনি ফাযিল খান উপাধি লাভ করে মামালিক থেকে মাহরুসায়ার প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য যে অমর অবদান রেখেছেন ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হানাফী ফিকহের উসূল শাস্ত্রের উপর তাঁর প্রণীত 'মুসাল্লামুস্ সুবূত' (مُسَلَّم الثبوت) কিতাবখানি বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গন্থটি টীকা বর্ণনায় তিনি আর একখানা গ্রন্থ লিখেছেন যার নাম হল 'মিনহাজ হাওয়াশিয়ে মুসাল্লামে সুবূত' (منهاج حواشى مسلّم الثبوت) এছাড়া মানতিক বিষয়ে 'সুল্লামুল উলূম' (سلّم العلوم) রচনা করেছেন। এছাড়া হিকমত বিষয়ে 'জুয লাইয়াতা জায্‌যা' (جزء لايتجزى) রিসালায়ে জাওহারে ফরদ ও আল-ফিত্‌রাতুল ইলাহিয়া গ্রন্থগুলিও তাঁর রচিত। হিজরী ১১১৯ সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

২৪. মোল্লা ইসামুদ্দীন (র.)

মোল্লা ইসামুদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উরবশাহও একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ ছিলেন। শরহে বিকায়ারটিকায় (حواشى شرح وقاية) তাঁর একটি ফিকহী অবদান। তিনি ৯০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

২৫. সায়াদী চলপী সায়াদুল্লাহ্ (র.)

সায়াদী চলপী সায়াদুল্লাহ্ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আমীর খান(র.)। তিনি হিজরী ৯৫০ সনে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি সমসাময়িক যুগের বিখ্যাত মুফ্‌তী ছিলেন। 'ইনায়াহ্'(عناية) নামক কিতাব খানির টিকা তাঁর একট উজ্জ্বল খেদমত।

www.pathagar.com

২৬. মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালূবী (র.)।

তিনি হিজরী ১১১ সনে ইন্তিকাল করেন। দরসে নিযামীয়ার তিনিই হচ্ছেন প্রতিষ্ঠাতা। 'শারহে মুসাল্লামুস্ সুবূত' (شرح مسلّم الثبوت) গ্রন্থ তাঁর অমর অবদান।[১]

২৭. মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ কারীমুদ্দীন উসমানী কণৌজী (র.)।

তিনি মুসাল্লামুস্ সুবূতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "কাশফুল মুবহাম মিম্মা ফীল-মুসাল্লাম আস- সুবূত" (كشف المبهم مما فى المسلّم الثبوت) তাঁর অবদান।

২৮. মাওলানা বরকতুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আহমাদুল্লাহ্ ইব্‌ন নিয়ামতুল্লাহ্ লাখ্‌নৌবী (র.)

মুসাল্লামুস সুবূ-এর ব্যাখ্যায় 'আত-তালীকুল মানউত আলা মুসাল্লামিস সুবূত' (التعليق المنعوت على مسلّم الثبوت) তাঁরই রচিত গ্রন্থ। 'আহ্‌সানুল হাওয়াশী আলা উসূলিশ্ শাশী' নামে আরও এক অবদান বিদ্যমান।[২]

২৯. মাওলানা বাহরুল উলূম আবদুল আলী ইব্‌ন নিযামুদ্দীন ইব্‌ন কুতুবুদ্দীন (র.)

তিনি মুসাল্লামুস সুবূত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় 'فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت' নামে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করে উম্মাতকে উপহার দিয়েছেন।

৩০. মাওলানা কায়েষ হাসান ইব্‌ন মাওলানা ফখরুল হাসান সাহারানপুরী (র.)

তিনি 'মাফাতিহুল বুয়ূত ফীল হাল্লে মুসাল্লামুস্ সুবূত' (مفاتح البيوت فى حل مُسلّم الثبوت) নামে একখানা গ্রন্থ লিখে হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখেছেন।

৩১. মোল্লা হাসান ইব্‌ন কাশী গোলাম মুস্তাফা (র.)

তিনি 'শরহে মুসাল্লামুস্ সুবূত' নামে একখানা অমর গ্রন্থ রেখে গেছেন।

৩২. মোল্লা মুহাম্মদ মুবীন ইব্‌ন মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ্ লাখনৌবী (র.)

তিনি 'শারহে মুসাল্লামুস সুবুত' নামে একখানা বাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন।

৩৩. মোল্লা ওয়ালি উল্লাহ ইব্‌ন হাবীবুল্লাহ্ ইব্‌ন মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ ফিরিঙ্গী মহল্লী (র.)

'নাফায়িসুল মালাকূত শারহে মুসাল্লামুস্ সুবূত' নামে একখানা গ্রন্থ লিখে অমর হয়ে আছেন।

৩৪. মাওলানা আবদুল হাই খতীব জামি' রেঙ্গুন (র.)

তিনি উর্দূ ভাষায় মুসাল্লামুস্ সুবূত -এর একখানা শরহে গ্রন্থ লিখেছেন যার নাম হল "আস্‌সুবুলুস সালাম ফী - তাওযীহিল মুসাল্লাম" (السبل السلام فى توضيح المسلّم)

৩৫. শায়খ নূরুদ্দীন ইব্‌ন শায়খ মুহাম্মদ আহ্‌মাদী (র.)।

তিনি হিজরী ১১৫৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি যে একজন উচ্চমানের ফকীহ্ ছিলেন।

১. তারিখে ইলমে ফিক্‌হ্ ও ফাত্‌ওয়া ছিদ্দীকীয়া ছারছীনা, ২৫৫ পৃষ্ঠা। ২. আহ্‌ওয়ালুল মুসান্নিফীন, ২১৬-২১৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তা তাঁর প্রণীত হাশীয়ায়ে শরহে ও বিকায়া-হাশীয়ায়ে তালবীহ্ থেকে পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৬. আবূল খায়ের মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন ইব্ন শাহ খয়রাত আলী ইব্ন সাইয়্যিদ আহ্মাদ করাবী (বিহারী) (র.)।

তিনি উপমহাদেশের সমসাময়িককালের একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। "তালীক বি শারহে বিকায়া" (تعليق بشرح وِقاية) গ্রন্থ তাঁর প্রসিদ্ধ অবদান। তিনি ১২৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৩৭. মাওলানা আবদুল হাই লাখ্নৌবী (র.)

ইব্ন আবদুল হালীম আমীনুল্লাহ্ আনসারী ফিরিঙ্গী মহল্লী (র.)। তিনি এ উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুফ্তী ছিলেন। তাঁর রচিত 'উমদাতুর রিয়ায়াহ আলা শারহে বিকায়া' (عمدة الرعاية على شرح وِقاية) গন্থখানি তাঁর ফকীহ্ হওয়ার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। এ ছাড়া তিনি মাজমুআয়ে ফাতাওয়া ও ফাওয়ায়িদে বাহিয়্যা গ্রন্থদ্বয় সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ১৩০৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৮. মাওলানা ওয়াহীদুয্যামান ইব্ন মাসীহুয্ যামান লাখনৌবী ফারুকী (র.)

তাঁর কৃত 'নূরুল হিদায়া আলা শরহে বিকায়া' গ্রন্থ দ্বারা তিনি ফকীহ্ হওয়ার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। হিজরী ১৩০৭ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৯. মাওলানা মঈনুদ্দীন ইমরানী দেহলবী (র.)

তিনি একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষক আলীম ও ফকীহ্ ছিলেন। 'হাশিয়াতু হুস্সামী' (حاشية حُسامى) তাঁর অমর অবদান।

৭৪৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৪০. আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক ইব্ন মুহাম্মদ আমীর ইব্ন খাজা শামসুদ্দীন দেহলবী (র.)

আন্-নামী শারহে হুস্সামী (النامى شرح حُسامى) নামক গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।[১]

তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাক্কিক ফকীহ্ ছিলেন।

৪১. মাওলানা ফায়যুল হাসান ইব্ন মাওলানা ফাখরুল হাসান গাংগুহী (র.)

তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর রচিত 'আত্-তালীকুল হামী আলাল হুস্সামী' (التعليق الحامى على الحُسامى) গ্রন্থখানি উসূলে ফিকহের একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি 'উমদাতুল হাওয়াশী' নামে উস্লুশ্ শাশীর টিকা গ্রন্থ লিখেছেন।[১]

---

১. আহওয়ালুল মুসান্নিফীন, ২১৬-২১৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৪২. আবুল ফাযায়েল সা'আদুদ্দীন মাহ্মূদ দেহলবী (র.)

তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে রেখে গেছেন। যার নাম হল "ইফাযাতুল আনওয়ার ফী ইযায়াতে উসূলিল মানার" (إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار)। এ কিতাবখানি ফিকহের নীতি শাস্ত্রীয় 'আল-মানার' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ৭৭১ হিজরী সনে তাঁর ইন্‌তিকাল হয়।[২]

৪৩. শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ শাহ্ নওশাবাদী (র.)

এ মহান ব্যক্তি ফিকহের নীতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'আল-মানার' -এর ব্যাখ্যা লিখে অমর রয়েছেন। তাঁর সে গ্রন্থটির নাম হল 'যুবদাতুর আফকার ফী-শারহিল মানার' (زبدة الأفكار في شرح المنار) মৃত্যু ঃ ৯৮৭ হিজরী।

৪৪. শায়খ ইয়াকুব ইবন হাসান সারফী কাশ্মিরী (র.)

তিনি ১০০৩ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি 'তালবীহ্ আলাত্ তাওযীহ্' গ্রন্থের হাশীয়া লিখে ফিকহ্ শাস্ত্রে অমর হয়ে আছেন।

৪৫. হাফিয আমানুল্লাহ্ ইব্‌ন নূরুল্লাহ্ বানারশী (র.)

তিনিও তালবীহ্ গ্রন্থের হাশীয়া লিখে ফকীহ্ হওয়ার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি হিজরী ১১৩০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৬. শাহ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)

এ উপমহাদেশের ইসলামী ইতিহাসে শাহ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় পূর্ণ কামালত দান করে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে আবির্ভূত করে ছিলেন। উপমহাদেশের মুসলমানগণ রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক দিক দিয়ে অধঃপতনের চরম সীমায় যখন উপনীত, তখনই উপমহাদেশের আকাশে তাঁর উদয় হল। তিনি ছিলেন একধারে মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকীহ্, সূফী ও মুজাদ্দিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থমালা অধ্যয়নে প্রকাশ পায় যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবূওআতের প্রস্রবণ থেকে বিশেষ ইহ্‌সান দান করে ছিলেন। এ উপমহাদেশে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্‌লবীর পর তাঁর হাতেই হাদীস শাস্ত্রের দরস ও ইশায়াতের ধারাটি সমৃদ্ধশালী হয়। সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় তিনিই কুরআন মজীদের -এরজমা করেন। তিনি স্বীয় 'তাফহীমাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুজাদ্দিয়াতের মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর কর্মময় জীবনের ইতিহাস দ্বারা এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তিনি হিজরী ১১১৪ সনের ৪ঠা শাওয়াল বুধবার মুজাফ্‌ফর জিলার ফুলাত গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি শৈশবকালে পিতা শায়খ আবদুর রহীম(র.) প্রতিষ্ঠান দিল্লীর রাহীমিয়া মাদ্রাসায়

---

১. আহ্ওয়ালুল মুসান্নিফীন, ২১২ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত, ২১৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতা তাঁকে যোগ্য করে গড়ে তোলেন ও নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি রাহীমিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ৪৩ খানা গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মাতকে উপহার দেন। -এর মধ্যে ঃ

১. হুজ্জাতুল্লা হিল বালিগা, ২. আল-বালাগুল মুবীন, ৩. আল-কাওলুল জামীল, ৪. আল-খাইরুল কাসীর, ৫. ফুয়ূযুল হারামাইন, ৬. ইযালাতুল খাফা আল-খিলাফাতিল খুলাফা, ৭. আল- ফাওযুল কাবীর সবিশেষে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমলের দিক দিয়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন। এ উপমহাদেশের বিখ্যাত অনেক আলিম তাঁরই মাদ্রাসার ফসল।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কাযী ছানা উল্লাহ্ পানিপথী, শাহ্ নূরুল্লাহ্ বুড্ডানবী, শায়খ রাফী উদ্দীন ইব্ন রাফী উদ্দীন মুরাদবাদী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আফগান, ইরান-তুরানে তাঁর অনেক ছাত্র ছিলেন। এই মহা মনীষী মুসলিম উম্মাহ্কে শোকের সাগরে ভাসিয়ে হিজরী ১১৭৬ সনের ২৯ শে মুহাররম আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁর পিতার কবরের পাশে তাঁর নূরানী দেহ মুবারক দাফন করা হয়। এই মহান বুযর্গ যে দার্শনিক, ফকীহ্, মুফ্তী ছিলেন তাঁর প্রণীত 'মুসাওওয়া শারহে মুয়াত্তা' (আরবী), মুসাফ্ফা (ফার্সী), ইকদুল জীদ ফী-আকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্লীদ, আল-ইনসাফ ফী- বায়ানে আসবাবিল ইখ্তিলাফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণিত হয়।[১]

৪৭. শাহ্ আহলুল্লাহ্ দেহলবী (র.)

এ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ দেহলবী (র.) -এর ভাই। তিনি সমসাময়িক কালের একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত ফিকহের কিতাব 'কানযুদ্ দাকাইক' গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করে অমর অবদান রেখে গেছেন।[২]

৪৮. শাহ্ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)

ইনি শাহ আবদুল আযীয (র.) -এর পরবর্তী যুগের লোক। তিনি হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। বিখ্যাত 'সিফা' কিতাব প্রণেতা মুফ্তী ইনায়েত আহ্মাদ তাঁরই শাগরিদ ছিলেন।

৪৯. মুফ্তী ইনায়েত আহ্মাদ ইব্ন মুন্শী মুহাম্মদ বখ্শ (র.

তিনি হিজরী ১২২ সনে কুয়ারবী জিলার বারবানকী পরগণার দিওয়াহ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। দিল্লী, আলীগড়, কানপূর ইত্যাদি স্থানে দারস্ ও ফাত্ওয়া প্রদান কাজে তিনি নিয়োজিত থাকেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্দী হয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দেশান্তরিত হন। মাওলানা মুনসিফ ফিদা হুসাইন ও কাযী আবদুল জলীল তাঁরই প্রসিদ্ধ শাগরিদ। কানপুরের

১. আহ্ওয়ালুল মুসান্নিফীন, ২১৬ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত ৩১২-১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মোট উনিশ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে 'ইলমুল ফারাইয', 'আদ্-দুররুল ফারীদ ফী মাসাইলিস সিয়াম, কিয়াম ওয়াল ঈদ' (الدر الفريد في مسائل الصيام والقيام والإجتهاد) 'হিদায়াতুল আযাহী' (هديات الأضاحي) ও 'মাহাসিনুল আমল' (محاسن العمل) ফকীহ্ হওয়ার অমর স্বাক্ষর রেখেছেন। হিজরী ১২৭৯ সনে হজ্জের সফরে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় জিদ্দার নিকটে জাহাজ ডুবে যাওয়ায় ইন্তিকাল করেন।[১]

৫০. মাওলানা মুহাম্মদ আহসান ইব্ন লুতফে আলী (র.)

হিজরী ১২৪১ সনে তাঁর জন্ম হয় এবং ১৩১২ হিজরীর রামাযান মাসের শেষ সাপ্তাহে তিনি ইন্তিকাল করেন। বেরেলা শহরটি ছিল তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ের কর্মস্থল। তিনি শায়খ আবদুল গণী (র.) -এর হাতে বাইয়াত হন। পরে তিনি তাঁর খলীফা নিযুক্ত হন। যাহেরী ইল্মের সব শাখায় তাঁর গভীর পান্ডিত্য ও বুৎপত্তি ছিল। বেরেলীর 'মিসবাহুত্ তাহযীব' নামক মাদ্রাসাটি তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি একটি প্রেস কায়েম করেন। সেখান থেকে 'আহ্সানুল আখ্বার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁর মালিকানা ও সম্পাদনায় প্রকাশ করা হয়। তিনি জীবনে পঁচিশখানা ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে ১. কানযুদ্ দাকাইকের উর্দূ তরজমা গ্রন্থ 'আহ্সানুল মাসাইল' ২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী রচিত 'আল-ইনসাফ ফী-বয়ানে সাবাবিল ইখতিলাফ' -এর উর্দূ অনুবাদ গ্রন্থ 'কাশ্শাফ' ৩. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রচিত 'ইক্দুল জীদ ফী-আহ্মকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্লীদ' -এর উর্দূ অনুবাদ গ্রন্থ 'সিলকে মারওয়ারীদ'। ইহ্ইয়ায়ে উলূমিদ্দীন -এর উর্দূ অনুবাদ গ্রন্থ 'মাযাকুর আরেফীন' তাঁর অমর অবদান। তিনি একদিকে ছিলেন মুহাদ্দিস ও সূফী অপর দিকে ছিলেন একজন ফকীহ্।

৫১. কাযী সানা উল্লাহ্ পানিপথী (র.)

কাযী সানা উল্লাহ্ পানিপথী (র.) হিজরী ১১৪৩ সনে জন্মগ্রহন করেন। শায়খ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (র.) ও আবদুল আযীয দেহলবী (র.) -এর ছাত্র ছিলেন। আর তিনি মুরীদ ও খলীফা ছিলেন মির্জা মাযহার জানজানান (র.) -এর। তিনি ইলমে যাহির ও ইলমে বাতিনের গভীর বুৎপত্তি কামালাতের অধিকারী ছিলেন। দশ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীরে মাযহারী তাঁরই অবদান। এছাড়া ফিকহ্ শাস্ত্রের তিনি 'মাবসূত' নামে সবিস্তার একখানা কিতাব রচনা করেছেন যাতে মাস'আলার উৎস দলীল এবং চারি ইমামের অভিমতের উল্লেখ রয়েছে।

সর্বসাধারণের সুবিধার্থে তিনি 'মা লা বুদ্দা মিনহু' নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করেছেন যা বাস্তবিকই মানুষের জন্য একান্ত দরকারী। এই মহান বুযর্গ মুফাস্সির, ফকীহ্ ও সূফী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি দৈনিক একশ' রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন বলে কথিত আছে।

হিজরী ১২২৫ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

---

১. আহ্ওয়ালুল মুসান্নিফীন, ৩১২-৩১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৫২. বাহ্রুল উলূম (র.)

তিনি 'বাসাইরে আরকান' নামে একখানা ফিক্হের কিতাব লিখে অমর হয়ে আছেন। হিজরী ১২২৬ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৫৩. মোল্লা মাজদুদ্দীন মাদানী (র.)

তিনি সমসাময়িক যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ছিলেন মোল্লা নিযাম উদ্দীন ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) -এর ছাত্র। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে।[১]

৫৪. শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী (র.)

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) -এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন শাহ আবদুল আযীয (র.)। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও কালাম শাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ও যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। মাদ্রাসার সিনিয়ার পদটি অলংকৃত করে তিনি বহু যোগ্য আলিম সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রণীত অনেক ইসলামী গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন যুগের সেরা মুফ্তী। 'ফাত্ওয়া আযীযীয়া' তাঁর মুফ্তী হওয়ার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

তাফসীরে আযীযী, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, তুহফায়ে ইস্না আশারীয়া প্রভৃতি তাঁর রচিত বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ। হিজরী ১২৩৯ সনের এই মহান আলিমের ইন্তিকাল হয়।

৫৫. মাওলানা কারামত আলী জৌনপূরী (র.)

এই জ্ঞান তাপস মহান বুযর্গ শায়খ সাইয়্যিদ আহমাদ বেরলবী (র.) -এর খলিফা ছিলেন এবং বাংলার হাদী ছিলেন। ইল্ম ও আমলে ছিলেন একটি নূরানী প্রদীপ। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও তাসাউফ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন পূর্ণ কালামাত ও বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী। তিনি তাঁর জীবন দাওয়াত তাবলীগ ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে অতিবাহিত করেন। তাঁর প্রণীত অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। উর্দূ ভাষায় সর্বপ্রথম তিনিই মিশকাতুল মাসাবীহ্র অনুবাদ করেন। তাঁর প্রনীত গ্রন্থ সমুহের মধ্যে 'মিফ্তাহুল জান্নাত', তাযকিয়াতুন নেসওয়ান, কিতাবে ইস্তিকামাত, যাখিরা কারামত, যাদুত্-তাক্ওয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সেকালে 'মিফ্তাহুল জান্নাত' কিতাবখানা ঘরে ঘরে পঠিত হত। এ গ্রন্থে অনেক ফিকহের কিতাব থেকে মাসয়ালা চয়ন করে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সেকালে একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাক্কিক আলিম ও ওলী আল্লাহ্ রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হিজরী ১২৯০ সনে রংপুর তাঁর ইন্তিকাল হয়। রংপুর জজকোর্টের দক্ষিণ পাশে মসজিদের সম্মুখে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৫৬. মুফ্তী সায়াদুল্লাহ্ (র.)

'ফাতাওয়ায়ে সায়াদীয়া' প্রণয়ন করে ফকীহ্ হওয়া এক অমর অবদান রেখেছেন। হিজরী ১২৯৪ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১. তারীখে ইল্মে ফিকহ্, ১২৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৫৭. মুফ্তী আসাদুল্লাহ্ (র.)

মুফ্তী আসাদুল্লাহ্ ফতেহ্পুরের মুফ্তী এবং জৌনপূরের 'সদ্রুস্ সুদূর' ছিলেন। হিজরী ১৩০০ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫৮. মাওলানা ইরশাদ হোসাইন রামপূরী (র.)

তিনি একজন বিশিষ্ট আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। 'ইনতিসারুল হক' এবং 'ফাতাওয়ায় ইরশাদিয়া' গ্রন্থদ্বয় তাঁকে ফকীহ্রূপে স্মরণীয় করে রেখেছেন। হিজরী ১৩১১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

৫৯. মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাংগুহী (র.)

এ উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত পীর এবং মুহাজিরে মাক্কী (র.) -এর প্রধান খলীফা। উপমহাদেশের বহু সংখ্যক আলিম ছিলেন তাঁর মুরীদ ও খলীফা। হিজরী ১২৪৪ সাহ্রানপূরের গাংগুহ নামক গ্রামে তাঁর দাদার বাড়ীতে জন্মগ্রহন করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও তাসাউফ শাস্ত্রে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বুৎপত্তি। তাঁর প্রণীত 'ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া' গ্রন্থখানা একখানা বিশিষ্ট ফাত্ওয়ার কিতাব। ১৯০৫ সনে ১১ই আগস্ট শুক্রবার তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

৬০. মুফ্তী আবদুল্লাহ্ টুনকী বিহারী (র.

তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার 'সদরুল মুদাররিসীন' ছিলেন। ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। ফকীহ্ পদটি তাঁর কর্মময় জীবনের স্বাক্ষর।[২]

৬১. মুফ্তী লুৎফুল্লাহ্ আলীগড়ী (র.)

ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ বুৎপত্তি ছিল। ১৩৩৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৬২. মুফ্তী আযীযুর রহমান (র.)

তিনি এ উপমহাদেশের অন্যতম দীনী দরসগাহ দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী ও ফকীহ্। তিনি আজীবন ফাত্ওয়া প্রদানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সাত খন্ডে প্রকাশিত 'ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ' মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর অমর অবদান। ১৩৪৮ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৬৩. মাওলানা ওয়াকীল আহ্মাদ সিকান্দারপূরী (র.)

একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। 'শারহে আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থখানা হানাফী ফিকহ্ জগতে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান সাম্বলী (র.)

তিনি হিদায়া গ্রন্থের হাশীয়া (পদটিকা) লিখে অমর হয়ে আছেন।

---

১. তাযাকিরাতুর রাশিদিয়া ঃ আশেক ইলাহী। ২. তারীখে ইলমে ফিক্হ, ১২৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৬৫. শায়খ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (র.)

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুদাররিস ছিলেন। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও তাসাউফ শাস্ত্রে অগাধ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহন করে বহু সংখ্যক আলিম ফিকহ্ ও হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ছিলেন। কুরআন মজীদের উর্দূ তরজমা তাঁর অমর অবদান।

৬৬. মাওলানা মুফ্তী আহ্মদ রেযা খান বেরলবী (র.)

তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট অলী ও খ্যাতনামা মুফ্তী। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ আশেকে-রাসূল। 'ফাত্ওয়ায়ে রেযায়ীয়া' ও অন্যান্য গ্রন্থবলী তাঁর অমর অবদান। হিজরী ১৩৪০ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৬৭. মাওলানা মুশ্তাক আহ্মাদ কান্পুরী (র.)

তিনি একজন অসাধারণ ফকীহ্ ছিলেন। হাশীয়ায়ে হেদায়া ফিকহ্ শাস্ত্র তাঁর এক বিশেষ অবদান। হিজরী ১৩৫৯ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৬৮. মাওলানা ইযায আলী ইব্ন মুহাম্মদ মেযাজ আলী মুরাদাবাদী (র.)

তিনি ছিলেন ফিকহ্ শাস্ত্রের একজন মহাপন্ডিত। প্রথম দিকে তিনি হায়দারাবাদের দারুল উলূম এবং পরে দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি নয় খানা গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান জগতে অমর হয়ে আছেন। হাশীয়ায়ে নূরুল ইযাহ্ (আরবী), হাশীয়ায়ে নুরুর ইযাহ্ (ফার্সী), হাশীয়ায়ে নেকায়া এবং হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকাইক ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। হিজরী ১৩৭৪ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৬৯. মুফ্তী কিফায়েতুল্লাহ্ ইব্ন শায়খ ইনায়েতুল্লাহ্ (র.)

তিনি ভারতের মধ্য প্রদেশের অর্ন্তগত শাহজাহানপূরের বায়াঈ মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা শেষে প্রথমে তিনি শাহজাহানপূর এবং দিল্লী আমীনিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস পদে নিয়োজিত হন। তিনি 'দিল্লীর মুফ্তীয়ে আযম' রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর ফাত্ওয়া ইরান, আফগান, তুরস্ক, মিশর, আরব ও আফ্রিকার উলামা কিরামের নিকট সমর্থন লাভ করে। তাঁর রচিত চার খন্ডে সমাপ্ত 'তালীমুল ইসলাম' কিতাব খানি এ উপমহাদেশে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এ ছাড়া ও বত্তখুর রিয়াহীন ও আল-বুরহান গ্রন্থদ্বয়ও তাঁর অমর অবদান। এ মহান বুযর্গ ১৯৫২ইং সনে ইন্তিকাল করেন। শাহ কুতুবুদ্দিন বখ্তিয়ার কাকী (র.) -এর মাজারের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়।

৭০. হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)

এ মহান বুযর্গ হিজরী ১২৮০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দীনী ইল্মের প্রতিটি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে সনদ হাসিল করেন। মাওলানা ইয়াকূব নানুতুবী ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) তাঁর উস্তাদ ছিলেন। তিনি মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র.) -এর নিকট তাফসীর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কাযানুয়ের মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি অধ্যাপনা, ওয়ায, নসীহত ও কিতাব প্রণয়নের কাজে অতিবাহিত করেন। তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ পেয়েছে। 'হায়াতে আশরাফ' গ্রন্থে তাঁর প্রণীত অনূদিত ও বক্তৃতামালাসহ মোট ৬২৩ খানা কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বেহেশ্‌তী জিওর ও ইমদাদুল ফাতাওয়া কিতাবদ্বয় ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, তাসাউফসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ও গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি 'হাকীমুল উম্মাত' খিতাবে ভূষিত হন। এ মহান বুযর্গ হিজরী ১৩৬২ সনে ৮৩ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। এ উপমহাদেশে মশহুর উলামায় কিরামের মধ্যে তাঁর অনেক খলীফা রয়েছেন।[১]

৭১. মুফ্‌তী আমজাদ আলী (র.)

তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ ছিলেন। দারুল উলূম আজমীরের প্রধান মুহ্‌তামিম হিসাবে তিনি আজীবন দীনী ইলমের খেদমত করে গিয়েছেন। উর্দূ ভাষায় ১৭ খণ্ডে তাঁর রচিত 'বাহারে শরী'আত' গ্রন্থখানি ফিকহ্ শাস্ত্রে একটি অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার। এই কিতাবের সহায়তায় উলামায় কিরাম ফাত্‌ওয়া দিয়ে থাকেন।

৭২. মাওলানা যহীর আহ্‌মাদ শাহ্‌ওয়ানী (র.)

তিনি প্রসিদ্ধ ফিকহ্ গ্রন্থ 'কানযুদ্ দাকাইক' -এর একখানা উর্দূ অনুবাদ লিখে অমর হয়ে আছেন। অনুবাদ গ্রন্থখানির নাম হল 'যাহিরুল হাকাইক'।

হিজরী ১৩১৬ সনে তাঁর ইন্‌তিকাল হয়।

৭৩. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফা গাংগুহী (র.)

তিনি 'কানযুদ্ দাকাইক' গ্রন্থের 'মাদানুল হাকাইক' নামে একখানা উর্দূ শরাহ লিখেন। এ ছাড়া আসবাহুন নূরী শারহে কুদূরী এবং এবং ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর উর্দূ তরজমা করে ফিকহ্ শাস্ত্রে এক চমৎকার অবদান রেখেছেন। 'খায়রুল মুহাস্‌সিলীন বি-আহওয়ানিল মুসান্নিফীন' গ্রন্থখানা তাঁর এক অমর অবদান।

৭৪. মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান খান (র.)

'তুহ্‌ফাতুল আযম ফী-ফিকহিল ইমামিল আ'যম' নামে 'কানযুদ্ দাকাইক' গ্রন্থের একখানা উর্দূ শরাহ লিখে ফিকহ্ শাস্ত্রে অমূল্য অবদান রেখেছেন।

১২৫২ হিজরীর পর তাঁর ওফাত হয়।

৭৫. শায়খ হামীদ উদ্দিন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হিন্দী (র.)

হিদায়া গ্রন্থের একখানা আংশিক শরাহ্ রচনা করেছেন।

৭৬. মাওলানা আমীর আলী (র.)

তিনি হিদায়া গ্রন্থের শরাহ 'আইনুল হেদায়া' নামে একখানা কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

১. ইরশাদুত্ তালিবীন।

www.pathagar.com

৭৭. শায়খ যামানুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ (র.)

'ইদ্দাতু আসহাবিল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ফী তাজরীদে মাসাইলিল হিদায়া' (عدة أصحاب الوادية والنهاية فى التجريد مسائل الهداية) নামে গ্রন্থখানা রচনা করে ফিকহ্ শাস্ত্রে এক অবদান রেখেছেন।[১]

৭৮. আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.)

তিনি এ উপমহাদেশের এক মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ্, হিসাবে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দরসের মজলিসে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতামালা শাগরিদগণ কর্তৃক সংকলিত হয়ে 'ফায়যুল বারী শরহে বুখারী' নামে ৪ খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। -এর মধ্যে দলীল প্রমাণসহ বহু ফিকহী মাসাআলা বিদ্যমান রয়েছে।

৭৯. মাওলানা ইদ্রী কান্দলবী (র.)

তিনি 'তা'লিকুস সাবীহ্ শরহে মিশকাতিল মাসাবীহ্', নামে একখানা আরবী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এতে দলীল প্রমাণসহ হানাফী মাযহাবের যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া তিনি হায়াতে সাহাবা, সীরাতে মুস্তাফা এবং ইলমে কালাম নামেও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

৮০. মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী দেহলবী (র.)

তিনি এ উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি সমসাময়িক কালে ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ করতেন। তিনি 'আকাইদে ইসলাম' (উর্দূ) নামে একখানা গ্রন্থ হিজরী ১২৯২ সনে প্রণয়ন করেছেন।

৮১. মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (র.)।

তিনি ছিলেন তাবলীগ জামায়াতের একজন বিশিষ্ট মুরুব্বী। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ফিকহ্ শাস্ত্রেও যে তাঁর মূল্যবান অবদান বিদ্যমান রয়েছে। 'আওজাযুল মাসনিক ইলা মুয়াত্তা মালিক' গ্রন্থ দ্বারা তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থখানি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনি চার মাযহাবের ইমামগণের অভিমত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৮২. শায়খ সালামুল্লাহ্ হামাদী (র.)

তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ছিলেন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) -এর বংশধর। 'আল-মুহাল্লা' নামে মুয়াত্তা ইমাম মালিকের একখানা শরাহ্ গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে অমর হয়ে আছেন।

হিজরী ১২২৯ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

---

১. আহ্ওয়ালুল মাসান্নিসীন থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

৮৩. মাওলানা কারী তাইয়্যেব দেওবন্দী (র.)

তিনি এ উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান দার্শনিক, আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ্ ও মুফ্তী ছিলেন। ইসলামী জ্ঞানের সর্বশাখায় ছিল তাঁর গভীর বুৎপত্তি। জাতি তাঁকে 'হাকীমুল ইসলাম' নামে স্মরণ করে। উর্দূ ভাষায় তাঁর প্রণীত বহু গ্রন্থ রয়েছে। যার কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ 'খুত্বাতে তাইয়্যেবিয়া' নামে দু'খন্ডে সংকলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম -এ তাঁর অনেক ফাত্ওয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে। শারহ্ আকীদাতুত্ তাহাবিয়া,খাতিমুন নাবীয়্যীন, আফতাবে নবূওয়াত, ইসলাম আওর সাইন্স ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি মুসলমান জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

৮৪. ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী (র.)

তিনি এ উপমহাদেশের একজন সুপন্ডিত ও শিক্ষাবিদ। দীর্ঘদিন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিয়াত বিভাগের প্রধান ছিলেন। ফিকহ্শাস্ত্রে তাঁর অবদান চিরস্থায়ী। ফিকহ্ হানাফী ভিত্তিতে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তাঁরই উদ্ভাবিত। শিরকাত ও মুদারিবাত ব্যবস্থা তাঁরই উদ্ভাবিত। শিরকাত ও মুদারিবতকে শারঈ উসূল, গারেয় সুদী ব্যাংকারী, বীমা ইসলামী নোকতায়ে নযর মে, ইসলামী নয্রিয়ায়ে মিলকিয়াত ইত্যাদি গ্রন্থ লিখে তিনি আধুনিক যুগে একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ প্রমাণ রেখেছেন। এছাড়া তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) রচিত 'কিতাবুল খিরাজ' গ্রন্থের 'আল-খিরাজ' নামে একখানা উর্দূ অনুবাদ প্রণয়ণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। বাদশাহ্ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি ছাড়িয়ে পড়ে।

৮৫. মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী (র.)।

তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের ফিকহ্ ও তাসাউফ শাস্ত্রে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৫৬৫ বাংলা সনে পশ্চিম বঙ্গে হুগলী জিলার ফুরফুরা শরীফে তিনি জন্মগ্রহন করেন। তিনি হুগলী মুহ্সিনিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পাশ করার পর মাওলানা সাইয়্যিদ আহমদ বিরল্বী (র.) -এর খলীফা হাফিয জামাল উদ্দিনের নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর মদীনা মুনাওয়ারায় রওযা মুবারকের খাদেম আদ্-দালায়েলে আমীন রেদওয়ানের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চল্লিশ খানা হাদীস গ্রন্থের সনদ লাভ করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার একজন হাদীস ও সংস্কারক ছিলেন। বহু সংখ্যক খ্যাতনামা আলিম ও শিক্ষাবিদ তাঁর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করে দেশময় বিভিন্নভাবে ইসলামের খেদমত করেছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফিকহ্, ফাত্ওয়া শাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। তিনি নিজে 'আদিল্লাতুল মুহাম্মদিয়া' (আরবী) কাওলুল হক (উর্দূ) এবং তালীমুল ইসলাম (বাংলা) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ১৩৩৯ সনে ইন্তিকাল করেন।[১]

৮৬. মাওলানা আবু বকর ফুরফুরাবী (র.)

এ মহান বুযর্গ ফুরফুরার শায়খ আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) -এর দ্বিতীয় পুত্র ও খলীফা।

১. আহ্ওয়ালুল মাসান্নিসীন থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

তিনি জ্ঞানে গুণে এবং ইলমে যাহির ও ইলমে বাতিনে কামালতের অধিকারী। তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে সবিশেষে পারদর্শী। তিনি আজীবন ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৮৭. মাওলানা রুহূল আমীন বশীরহাটী (র.)

তিনি পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণার বশীরহাট নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও ফাত্ওয়া শাস্ত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ পারদর্শী ও বুৎপত্তিশালী আলিম। ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক (র.) -এর হাতে বায়'আত হয়ে তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন। তিনি জীবনে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধনে অবদান রেখেছেন। সাপ্তাহিক হানাফী ও মাসিক জামায়াত পত্রিকা দু'টি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁরই সম্পদনায় প্রকাশিত হয়। ইসলামী যুক্তি তর্ক প্রদর্শনে বক্তৃতা ও আলোচনায় তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন একজন তেজস্বী সুসাহিত্যিক। তিনি ছোট বড় মোট ১৩৫ খানা পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর মধ্যে তাফসীরে আমীনীয়া, ফাতাওয়ায়ে আমীনীয়া, তরীকত দর্পন বা তাসাউফ তত্ত্ব নামক গ্রন্থ সমূহ সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী ১৯৪৫ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৮৮. নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী (র.)

এ উপমহাদেশের ইসলামী জগতে তিনি ছিলেন এক খ্যতিমান ব্যাক্তিত্ব। তিনি বুখারী শরীফের শরাহ্ 'উয়ূনূল বারী' এবং মসুলিম শরীফের শরাহ 'সিরাজুল ওহ্হায' সহ আরও বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। (মৃত্যু ঃ হিজরী ১৩০৭)

৮৯. মাওলানা খলীল আহমাদ সাহরানপুরী (র.)

তিনি 'বাযলুল মাজহুদ' নামে আবূ দাঊদ শরীফের বিখ্যাত শরাহ এবং ফিকহ্ ফাত্ওয়া বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৯০. মুফ্তী নিযাম উদ্দীন (র.)

তিনি হচ্ছেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী। তাঁর রচিত 'ফাতাওয়ায়ে নিযামীয়া' আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসায় সমাধানে একখানা অমূল্য গ্রন্থ।

৯১. মাওলানা মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (র.)

তাঁর প্রণীত ফাতাওয়ায়ে মাহমুদীয়া ফিকহ্ শাস্ত্রে এক অমূল্য অবদান।

৯২. মাওলানা আবদুশ্ শাকূর ফারুক লাখ্নৌবী (র.)

তিনি 'ইলমুল ফিকহ্' নামক গ্রন্থ রচনা করে ফিকহ্ শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

৯৩. মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী' (র.)

এ মহান আলিম দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে সেখানেই মুদার্‌রিস ও মুফ্তীর পদে

www.pathagar.com

নিয়োজিত হন। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগকালে পাকিস্তানে হিজরত করে করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। করাচীতে তিনি একটি বিরাট দারুল উলূম কায়েম করেন। যা বর্তমানে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অন্যতম দীনী প্রতিষ্ঠান রূপে খ্যাতি লাভ করেছে। এ কাজের পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ ও ফাত্ওয়া দানের কাজেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর রচিত 'মা'আরিফুল কুরআন' তাফসীর গ্রন্থখানা তাঁর এক অবিস্মরণীয় অবদান। 'জাওয়াহিরুল ফিকহ্' 'মাসাইলে আহ্লে হাদীস' এবং 'ইস্লাম কা নিযামে আরাযী' ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান।

৯৪. মাখদূম মুহাম্মদ আরিফ (র.)

তিনি 'উশ্‌র ও খিরাজ' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যা ফিক্‌হ শাস্ত্রে ফার্সী ভাষায় একটি সংযোজন।

৯৫. মালিকুল উলামা কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলাতবাদী (র.)।

তিনি একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি স্থায়ী ফাত্ওয়াগুলো সংকলন করে 'ফাতাওয়ায়ে ইব্‌রাহীম শাহী' নামে একখানা গ্রন্থ রেখে গেছেন। হিজরী ৮৫৫সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৯৬. মুফ্তী আহ্মাদ ইয়ার খান (র.)

একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুফ্তী ছিলেন। 'জাআল হক' গ্রন্থখানি তাঁর একটি বিশেষ অবদান। এছাড়া 'ফাতাওয়ায়ে নাঈমিয়া' নামক গ্রন্থখানা তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

৯৭. শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন ইব্‌ন নসরুল্লাহ্ ইবন ইমামুদ্দিন গুজরাটী (র.)

তিনি হিজরী ৯৯৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি সমসাময়িক কালের একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুফ্তী ছিলেন। 'হাশীয়ায়ে বিকায়া' 'তালবীহ্ শারহে তাওজীহ্' লিখে তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখেছেন।

৯৮. মাওলানা আবদুর রাউফ দানাপুরী (র.)

একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন। 'আসাহুস্ সিয়ার' গ্রন্থটি তাঁর এক অমর অবদান।

৯৯. মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী (র.)

উপমহাদেশ বিখ্যাত একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহেলবী (র.) প্রণীত 'আল-ইনসাফ ফী-সাবৃবিল ইখ্‌তিলাফ' গ্রন্থটির উর্দূ অনুবাদ করে তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখেছেন। এছাড়া হাকীকতে তাওহীদ, ইসলামী রিসালাত, শাহরিয়াত কে হুকূক এবং তাফসীরে তাদাব্‌বুরে কুরআন প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলিম উম্মাহ্র জন্য তাঁর বিরাট অবদান।

www.pathagar.com

১০০. মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী (র.)

ইনি হলেন একজন সর্বজন পরিচিত খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। জাতির জন্য মা'আরিফুস্ সুনান গ্রন্থখানা তাঁর বিরাট অবদান।

১০১. মাওলানা শাব্বির আহ্মাদ উসমানী (র.)

তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান ব্যাক্তিত্ব। হাদীস, তাফ্সীর, ফিকহ, কালাম ও তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ বুৎপত্তি। সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যা 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থখানা তাঁর এক অমর অবদান।

১০২. মাওলানা জাফর আহ্মাদ উসমানী (র.)

তিনি ছিলেন একজন বুৎপত্তিশালী ও গবেষক আলিম। 'ইলাউস্ সুনান' গ্রন্থটি তাঁর এক অমর অবদান। গ্রন্থখানি বাইশ খণ্ডে সমাপ্ত। এতে ফিকহ্কে একটি নব দিকদর্শনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১০৩. মাওলানা সাইয়্যিদ সুলাইমান নদবী (র.)

তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও ইতিহাস শাস্ত্রের বিশেষ পন্ডিত্যের অধিকারী। সীরাতুন্নবী (সা.) এবং 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থদ্বয় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও লেখনীর তেজস্বীতার প্রমাণ বহণ করে।

বাংলাদেশের ফকীহ্ ও মুফ্তীগণের পরিচিতি ও অবদান

১. শায়খ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.)

এ মহান বুযর্গ রাশিয়ার বুখারা থেকে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলকানের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করে দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন। সে যুগে ভারতে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কোন আলিম ছিল না। ইল্মে মা'রিফাতেও তিনি ছিলেন কালের অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া পত্যক্ষ করে সুলতান ভীত হয়ে তাঁকে ভারতের পূর্ব প্রান্ত বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দেন। তিনি নারায়গঞ্জের সোনারগাঁয় এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

সোনারগাঁয়ে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিকহ্ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক ধারা চালু করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর রচিত একশ' আশি পংক্তিযুক্ত 'মসনবী বনামে হক' কিতাবখানা ফিক্হ্ শাস্ত্রে তাঁর মূল্যবান অবদান। তাঁর প্রচেষ্টার অনেক অমুসলমান মুসলমান হয় এবং বহু মুসলমান সঠিক অর্থে ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।

হিজরী ৭০০ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং সোনারগাঁয়েই তাঁকে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

২. মাওলানা হাজী শরীয়াতুল্লাহ্ (র.)

তিনি হিজরী ১১৮৬ সনে শরীয়তপুর জিলার শিবচর থানার শামাইল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় তিনি চাচার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। এরপর তিনি ফুরফুরায় চলে যান এবং সেখানে জনৈক আলিমের নিকট কুরআন ও হাদীসের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তথাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি আঠার বছর বয়সে মক্কা শরীফ যান এবং সেখানে শায়েখ তাহির সম্বলার নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং মা'রিফাত ও তরীকতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখান থেকে মা'রিফাতে কামালীয়াত লাভ করে শায়খের নির্দেশে জন্মভূমি বাংলায় ফিরে আসেন। দেশে এসে তিনি মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে চরম অবক্ষয় ও দুর্দিন লক্ষ্য করে সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের মূলকথা ছিল মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যেসব হুকুম-আহ্কাম (ফারাইয) নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা। এজন্যই তাঁর এ সংস্কার আন্দোলনের নাম হয় 'ফারাইযী আন্দোলন'। মুসলমানের জীবনকে শরী'আতের বিধান তথা ফিক্হী ধারানুযায়ী গঠন করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে তিনি দেশময় সফর করে মুসলমানদেরকে সচেতন করে তুলেন। তাঁর আন্দোলনের ধারাটি যে ফিকহ্ শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রবাহমান ছিল তা নাম দ্বারাই বুঝা যায়। এ মহান বুযর্গ হিজরী ১২৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন। বর্তমান বাহাদুরপূরে তাঁর মাজার অবস্থিত।

৩. মাওলানা নিছার উদ্দীন আহ্মদ (র.)

মাওলানা মুফ্তী নিছার উদ্দীন আহ্মদ (র.) পিরোজপুর জিলার স্বরূপকাঠি থানাধীন ছারছিনা গ্রামে বাংলা ১২৯৭ সনে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম সূফী সদর উদ্দিন আহমদ। পিতা হজ্জ পালন করতে গিয়ে মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন। এবং সেখানেই দাফন করা হয়। বাল্যকালে পিতৃহারা হয়ে পূণ্যবতী মাতার আন্তরিক আগ্রহ ও প্রেরণায় মাদারীপুরের অর্ন্তগত মাগদী নামক গ্রামে অবস্থিত মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেন। অতঃপর পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত হুগলী মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পাশ করেন। হুগলী মাদ্রাসায় লেখাপড়া কালেই ভারত বিখ্যাত পীর ফুরফুরার হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক (র.) -এর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত হন। চিশ্তিয়া, কাদেরিয়া, নক্শাবন্দিয়া, ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকায় পূর্ণতা লাভ করেন এবং এই দেশের মানুষের হিদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করেন ছারছীনার দারুস্ সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা। বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীনী প্রতিষ্ঠান। আলিম হিসাবে তিনি ছিলেন একজন বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। বৃটিশ আমলে তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকার কিতাব সংগ্রহ করে একটি ব্যক্তিগত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। 'তরীকুল ইসলাম' (কয়েক খন্ডে) এবং 'ফাত্ওয়ায়ে সিদ্দীকিয়া' ও 'মাযহাব ও তাক্লীদ' গ্রন্থসহ বিভিন্ন দীনী কিতাব প্রনয়ণ করেন। তিনি ছারছীনার বিজ্ঞ

www.pathagar.com

উলামায়ে কেরাম সমন্বয় একটি 'দারুল ইফ্তা' কায়েম করে সমাজে ফাত্ওয়া-ফারাইয প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ইংরেজী ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৪. মাওলানা হাফিয আবদুল আউয়াল জৌনপূরী (র.)

১২৮৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহন করেন। তিনি মাওলানা কেরামত আলী জৌনপূরী (র.) -এর পুত্র। তিনি বিভিন্ন উস্তাদের নিকট ইল্মে দীন শিক্ষা করে শেষে মক্কা শরীফের ছৌলতিয়া মাদ্রাসা হতে হাদীস ও ফিকহে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি পূর্ব বাংলা ও আসামে কুরআন হাদীসের ইল্ম প্রচার করেন। তিনি ছোট বড় ১২১ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ঃ

১. আল-আযহার ফী-তাসামুহি শারহিল মুখ্তাসার (الأزهر فى تسامح شرح المختصر)

২. আন-নাওয়াদিরুল মুনীফাহ্ ফী-মানাকিবিল ইমামি আবী হানীফা,

(النوادر المنيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة)

৩. হিদায়াতুন্ নিস্ওয়ান, (هداية النسوان) ৪. ইয্হার-এ-হক (إظهار حق)

৫. আল-মাকাসিবুল মুনীফাহ্ ফী-মানকিবিল ইমামি আবী হানীফা,

(المقاثب المنيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة)

৬. আল-ফাতাওয়াল ইয়ামানিয়্যাহ্ ফিল-আহ্কামিস্ সামানিয়্যাহ,

(الفتاوى اليامانية فى الأحكام الثمانية)

৭. জাওয়ামিউল কালিম (جوامع الكلم) ৮. মুফীদুল মুফ্তী (مفيد المفتى)

৯. কিতাবুল হুনাফা ফী-যিক্রি যুয়ফি ওয়ায্-যু'আফা (كتاب الحنفاء فى ذكر الضعف والضعفاء)

এই মনীষী তাঁর জীবন ভর সমাজসেবা, ধর্মপ্রচার, জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান সেবায় নিজকে নিয়োজিত রাখেন। হিজরী ১৯৩৯এ তিনি কলকাতার মানিক তলায় ইন্তিকাল করেন।

৫.মাওলানা জমির উদ্দিন চাটগামী (র.)

মাওলানা জমির উদ্দিন (র.) চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন ওয়াবীল গ্রামে ১২৯৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মীর নুয়াদ্দীন। তিনি প্রথমে বার্মায় দীনী ইল্ম শিক্ষা লাভ করেন। -এরপর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীস, ফিকহ্ ও তাফসীর শাস্ত্রের উচ্চ-এর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁরপর মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গুহী (র.) -এর নিকট তিন বছর কাল ইল্মে বাতিন শিক্ষা করে তাঁর খিলাফত লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রথমত ফটিকছড়ি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক হন। তিনি সেখানে নিয়মিতভাবে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ্ শাস্ত্রের শিক্ষকতা করতেন। তিনি

www.pathagar.com

একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। হাফিয ফায়িয আহ্মদ ইসলামাবাদী 'তাযকিরায়ে জমীর' নামে তাঁর সতন্ত্র জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন। ১৯৩৯ইং সনে এ মহান ব্যক্তির ইন্তিকাল হয় এবং হাট হাজারী মাদ্রাসার সন্নিকটে দাফন করা হয়।

৬. মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ্ (র.)

হযরত মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ্ (র.) একজন বিখ্যাত মুফ্তী ছিলেন। হাদীস ফিকহ্সহ বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের পূর্ণ অনুসারী। হিজরী ১৩১১ সনে হাটহাজারী থানাধীন মেঘল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হেদায়েত উল্লাহ্। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হাটহাজারী মাদ্রাসায়ই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি উক্ত মাদ্রাসায় প্রথমত মুদার্‌রিস হিসেবে যোগদান করেন। তারপর প্রধান মুফ্তীর দায়ীত্বও পালন করেন। তিনি শিক্ষা দান ও ফাত্ওয়া প্রদানের পাশাপাশি লেখনীর মাধ্যমেও ইসলাম প্রচারে কর্মমূখর ছিলেন। তিনি উনিশ খানা কিতাব লিখেছেন। তম্মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাব সমুহ ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান।

১. ارشاد الأمة إلى التفريق بين البدعة والسنة

২. الفيصلة الجلية فى حكم سجدة التحية

৩. الحق الصريح ৪. رافع الإشكالات

তিনি ১১৭০/৭২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে নিজ গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

৭. মুফ্তী দীন মুহাম্মদ খান (র.)

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নূর উল্লাহ্ খান। তিনি চক বাজার জামে মসজিদের তৎকালীন ইমাম মাওলানা ইব্‌রাহীম পেশোয়ারী সাহেবের নিকট প্রথম থেকে 'সিহাহ্ সিত্তা' পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর দেওবন্দ গিয়ে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। এরপর দিল্লীর আমিলিয়া মাদ্রাসায় তিনি মুফ্তী কিফায়েতুল্লাহ্ (র.) -এর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন এবং ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়েও কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ঢাকায় সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি সে মাদ্রাসায় তিন বছরকাল অধ্যাপনা করেন। তিনি ফাত্ওয়া-ফারাইয প্রদানে ছিলেন সুবিজ্ঞ জনসাধারণের কাছে তিনি মুফ্তী সাহেব নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ফিকহ্ শাস্ত্রের খেদমতের কারণে তিনি মানুষের কাছে অমর হয়ে আছেন।

তিনি ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

৮. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) ফরিদপুর জিলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার গোপেরভাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া এঙ্গলো পার্সিয়ান বিভাগ থেকে এস. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেন্সী কলেজে লেখাপড়া করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পরবর্তী ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) –এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বায়'আত হন। এরপর সাহরানপুরে অবস্থিত মাযহারুল উলূম মাদ্রাসায় ফাযিল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্রাসা থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তাঁর প্রচেষ্টায় পর্যায়ক্রমে ঢাকায় বড় কাট্‌রা আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসা ও লালবাগ জামেয়ায়ে কুরআনিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আমরণ লালবাগ জামেয়ায়ে কুরআনিয়ার প্রধান শাইখ (মুহ্‌তামিম) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকার ফরিদাবাদ কাওমী মাদ্রাসা এবং নিজগ্রাম গওহার ডাঙ্গার কাওমী মাদ্রাসাটিও তাঁরই অবদান। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগাধ ব্যুপত্তি অর্জন করেছিলেন। ইসলামী লেখনীর দিক দিয়েও তাঁর অবদান সুমজ্জ্বল। তিনিই প্রথম ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থ রচনা করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অন্যাদেরকেও গ্রন্থ রচনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

তিনি তাফসীরে বয়ানুল কুরআন এবং বেহেশ্‌তী জিওর সহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাবের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া মৌলিক ভাবেও অনেক ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বেহেশ্‌তী জিওর, তিজারতের ফযীলত, ফাযাইলে মোআমালাত গ্রন্থ তিনটি ফিকহ্ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদানরূপে গন্য করা হয়। ইলমে তাসাউফ ও তরীকতের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনেক। এ দেশে তাঁর বহু মুরীদ ও ভক্ত রয়েছে। 'খাদিমুল ইসলাম' জামায়াত'টির প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। এ মহান বুযর্গ ১৯৬৮ সনে ইন্তিকাল করেন। নিজবাড়ী গওহার ডাঙ্গায় তাঁকে দাফন করা হয়।

৯. মুফ্‌তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান মুজাদ্দেদী বরকতী (র.)

হযরত মাওলানা মুফ্‌তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী (র.) ভারতের মুঙ্গের জিলার পাচন গ্রামের মাতুল বাড়ীতে ১৩২৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাঁর নাম হাকীম সাইয়িদ আবদুল মান্নান। তিনি পিতার সাথেই কলিকাতায় লালিত পালিত হন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি কুরআন মজীদ নাজরানা খতম করেন। বিভিন্ন উস্তাদের কাছে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা -ই- আলীয়া থেকে ফাযিল ও কামিলে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি পিতার নিকট ইলমে তিব্বতও শিক্ষা গ্রহণ করেন। না-খোদা মসজিদ সংলগ্ন কাওমী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক এবং

না-খোদা মসজিদের ইমামও মুফ্তী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মময় জীবন শুরু হয়। পরবর্তীকালে তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দীনী প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মাদ্রাসা -ই- আলীয়া মুহাদ্দিস ও মুফ্তী পদে যোগদান করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি ঢাকা আসেন ও স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করতে থাকেন। মাদ্রাসার চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। আমরণ তিনি এ পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ের বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ও উর্দূ ভাষায় প্রনয়ণ করেছেন। বিশেষ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি কয়েকখানা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রনয়ণ করে মুসলিম জাতির কাছে অমর হয়ে আছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের নিম্নবর্ণিত কিতাবগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, ২. আদাবুল মুফ্তী, ৩. হাদিয়াতুল মুসাল্লীন, ৪. তারীখে ইল্‌মে ফিক্‌হ, ৫. ফিকহুস্ সুনান ওয়াল আসার, ৬. লুবব্ উসূলিল ফিক্‌হ্ ,৭. আত্ তাম্বীহ লিল ফিক্‌হ, ৮. মা লা বুদ্দা লিল ফিক্‌হ, ৯. তুহফাতুল বরকতী, ১০. আল-ইফসাহ, ১১. ইযহারে হক, ১২.তরীকায়ে হজ্জ, ১৩. মশ্‌কে ফারাইয।

এ মহান বুযর্গ বিশ হাজার ফাত্ওয়ার একটি সংকলন রেখে গেছেন। যার নাম হচ্ছে 'ফাত্ওয়ায়ে বরকতীয়া' তবে এ পর্যন্ত তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কুতুবখানায় বিভিন্ন বিষয়ের বহু মূল্যবান গ্রন্থ রেখে গিয়েছেন। এটাই তাঁর জ্ঞান সাধনার বিরাট স্বাক্ষর বহন করে। তিনি এক কন্যা ও এক স্ত্রী রেখে হিজরী ১৩৯৪ সনের ১০ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন। ঢাকার কুলুটোলায় তাঁকে দাফন করা হয়।

১০. মুফ্তী আবদুল মুঈয (র.)

তিনি নোয়াখালি জেলার বটতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল আযীয বদু (র.) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর মুরীদ ছিলেন। নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। তিনি প্রথমত ঢাকার আশ্রাফুল উলূম বড় কাটারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তাঁরপর মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.) -এর ইন্তিকালের পর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব -এর দায়িত্ব পালন করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত এই খেদমতেই নিয়োজিত ছিলেন। তিনি একজন সুশিক্ষিত আলিম এবং ফকীহরূপে সর্বজন বিদিত ও শ্রদ্ধেয় বুযর্গ ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সনে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন এবং নিজ গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

১১. মাওলানা আবদুর রহমান (র.)

তিনি শরীয়তপুর জেলার নরিয়া থানার অন্তর্গত গুলমাইজ গ্রামে ১৮৮৮ সনে এক সম্ভ্রান্ত

www.pathagar.com

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ফাযেল উদ্দিন। প্রাথমিক শিক্ষা দেশে শেষ করে সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে হাদীসে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ মাদ্রাসায় কিছু দিন অধ্যাপনা করেন। অতঃপর দেশে ফিরে বরিশালের ছারছিনায় প্রথম স্থাপিত মক্তবে কিছু দিন খেদমত করেন। তাঁরপর দীর্ঘ আটাশ বছর ভোলা ইসলামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর ফরিদপুরে কাজির চর মাদ্রাসায় এবং বরিশালের হদুয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি ছারছিনার মাওলানা নিছার উদ্দিন (র.) -এর তৃতীয় জামাতা ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব সাদাসিধেভাবে চলতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনটি জাগতিকভাবে নির্লোভ অবস্থায় অতিবাহিত হয়। তিনি সুন্নাতের পূর্ণ পাবন্দ ছিলেন। হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে ও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। ফাত্ওয়া ফারাইয প্রদান করা ছিল তাঁর এক বিশেষ কাজ। ঈমান শিক্ষা ও তালাকের মাসাইল নামে দু'খানা কিতাব লিখে ফিকহ্ শাস্ত্রে তিনি অমর অবদান রেখেছেন। তাঁর শেষ জীবনটি ছারছিনায় অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৬৮ সনে ইন্তিকাল করেন এবং পুরাতন মাদ্রাসায় পূর্ব পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।

১২. মুফ্তী আবদুল ওয়াহিদ (র.)

তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার ধীৎপুর গ্রামে ১৩২২ বাংলা সনে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মমরুজ আলী। তিনি সাহরানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসা থেকে হাদীস ও ফিকহ্ -এর উচ্চ-এর সনদ লাভ করেন। ময়মনসিংহ জিলার বালিয়া আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসায় তিনি মুফ্তী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৪০১ বাংলা সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩. মাওলানা মুফ্তী আবদুল হক (র.)

মুফ্তী আবদুল হক (র.) চট্টগ্রাম জেলার মাদারশাহ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা ইসমাঈল। তিনি দেওবন্দ দারুল উলূম থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চ -এর সনদ লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত নেত্রকোণা মিফতাহুল উলূম মাদ্রাসায় হাদীসের উস্তাদ ও মুফ্তী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৪. মুফ্তী মুহাম্মদ আলী (র.)

তিনি কুমিল্লা জেলার নাগাইশ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতাঁর নাম মুন্শী করম আলী। তিনি দেশে ইল্মে দীনের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে দেওবন্দ গিয়ে সেখান থেকে হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ-এর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও ফাত্ওয়া দানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর হয়বতনগর মাদ্রাসা ও বালিয়া আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসায় হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের শিক্ষকতা করেন। কিশোরগঞ্জের জামেয়া ইমদাদিয়াতেও তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজ করেছেন। শেষ জীবনে তিনি বালিয়া আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস ও মুফ্তী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৫. মুফ্তী ওসমান গণী (র.)

মুফ্তী ওসমান গণী (র.) ১৯৩৪ ইং সনে ময়মনসিংহ জিলার ফুলপুর থানাধীন আলজান

www.pathagar.com

বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম আবুল হোসেন মুন্সী। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি জামেয়া আরাবিয়া আশ্রাফুল উলূম বালিয়ার মুফ্তীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৪০৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.)

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শর্ষীণা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪২ সনে কলিকাতা মাদ্রাসা -ই- আলীয়া থেকে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর ইসলামের গবেষণা ধর্মী জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী পত্র পত্রিকার প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা -ই-আলীয়া কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ্ সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশী অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ইসলামের অর্থনীতি, মহাসত্যের সন্ধানে, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পরিবার-পারিবারিক জীবন, আল, কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ, আল কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত, ইসলামী শরী'আতের উৎস, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

মৌলিক গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি তিনি বিশ্বের খ্যাতনামা আলিম ও ইসলামী মনীষীদের রচনাবলীর অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে আল্লামা ইউসুফ আল্-কারযাভী কৃত ইসলামের যাকাত বিধান (২খণ্ড) ও ইসলামের হালাল হারামের বিধান এবং মুহাম্মদ কুতুবের বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত এবং ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহ্কামুল কুরআন' উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আবদুর রহীম (র.) ও আই সির ফিকহ্ একাডেমীর সদস্য ছিলেন। এই মনীষী ১৯৮৭ সনের ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে যান। আজিমপুর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৭. মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান (র.)

মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন (র.) পিরোজপুর ভাণ্ডারিয়া থানাধীন পশরিবুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ রমযান আলী খান। কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া থেকে তিনি ইল্মে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় কাউখালী থানাধীন কেউদিয়া নিউ স্কীম মাদ্রাসার হেড মাওলানা হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি ছারছীনা দারুস্ সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহন করেন। ফিকহ্ শাস্ত্রে তিনি আরবী ভাষায়

www.pathagar.com

'জাওহারুল ফিকহ্ নামে একখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তিনি বেহেশ্তের যামিন, হজ্জও যিয়ারত, ইসলামে দাঁড়ি ও লেবাস সহ আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত আলিম ও প্রফেসর তাঁর ছাত্র। ১৯৭১ সনে এ মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

১৮. মুফতী মুবারক উল্লাহ্ (র.)

মুফ্তী মুবারক উল্লাহ্ (র.) নোয়াখালী জিলার অধিবাসী। নোয়াখালী ইসলামিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাকতা করেন। পরে পটুয়াখালী মোকামিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি মোকামিয়া দরবারের মুফ্তী হিসাবে ফাত্ওয়া-ফারাইয প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

১৯. মুফ্তী আবদুল মজীদ (র.)

মুফ্তী মাওলানা আবদুল মজীদ (র.) বরিশাল জিলার মুলাদী থানাধীন বালিয়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এমদাদ আলী ভূঁইয়া। তিনি নোয়াখালীর ইসলামীয়া আলীয়া মাদ্রাসা থেকে বৃটিশ যুগে ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর ছারছীনার মাওলানা নিছার উদ্দীন (র.) -এর হাতে বায়'আত হন এবং তাঁর খিলাফত লাভ করেন। আজীবন তিনি ছারছীনার দরবারে মুফ্তী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সনে ইন্তিকাল করেন এবং নিজ বাড়ীর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২০. মুফ্তী আলী আকবর (র.)

মাওলানা মুফ্তী আলী আকবর (র.) মাগুরা জিলার সদর থানাধীন শিমুলিয়া গ্রামে ১৯৩৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আবূ হানীফ মণ্ডল। তিনি চট্টগ্রামের দারুল উলূম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে সনদ লাভ করেন। তিনি যশোর জিলার দাড়াটানা জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। ইল্ম ফিকহের চর্চা এবং ফাত্ওয়া ফারাইয করা ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। সুদীর্ঘ ২৯ বছর পযর্ন্ত তিনি ফাত্ওয়া প্রদান করে যশোরের এলাকায় একজন সুদক্ষ আলিম ও মুফ্তী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৯ইং সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

২১. মাওলানা তাজুদ্দীন (র.)

মাওলানা তাজুদ্দীন (র.) পটুয়াখলী জিলার পুকুরজনা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করার পর ভারতে দেওবন্দ মাদ্রাসা গিয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরেন। এরপর পাঙ্গাশিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজে ও মুফ্তী পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে একটি আলিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ দিন

www.pathagar.com

পর্যন্ত মাসআলা-মাসাইল চর্চা ও ফাত্ওয়া প্রদানের খেদমত আঞ্জাম দেন।

১৯৭০ সনের প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কবলে পড়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

২২. মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ উরফে আসাদুল্লাহ (র.)

মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ (র.) হবিগঞ্জ জিলার অন্তর্গত তরফ পরগনার ঐতিহাসিক রায়ধর গ্রামে আনুমানিক ১২৮২/৮৩ বাংলা সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহমাদুল্লাহ্। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর চুনারুঘাট ফান্দ্রাইল মাদ্রাসায় ওলীয়ে কামিল শাহ মাওলানা মুহাম্মদ সায়্যিদ উরফে কনুমিয়া সাহেবের খিদমতে কয়েক বছর দীনী ইল্ম শিক্ষা লাভ করেন। তাঁরপর কুমিল্লা জিলার হরিতলার মাওলানা হাসান আলী সাহেবের খিদমতে ফিক্হ হাদীস ও তাফসীরসহ্ অন্যান্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এরপর সূফী শাহ্ কনুমিয়া সাহেবের খিদমতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা হাসিল করেন। কিছুদিন পর হজ্জে গমন করেন। পবিত্র হজ্জ আদায় করে আল্লামা আবদুল হক মুহাজিরে মাক্কী (র.) -এর খিদমতে ছয় মাস অবস্থান করে আধ্যাত্মিক কামালিয়াত হাসিল করেন এবং তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে দীনী শিক্ষা সমাজ সংস্কার ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে শায়েস্তাগঞ্জ জংশনের নিকটে কতুবের চক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর নিজ গ্রামে আরও একটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেন। যা বর্তমানে জামেয়া সাদিয়া বায়ধর নামে পরিচিত। তাঁর ফিকহ্ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত কুতুবখানাতে ফিকহ্ ও আকাইদের বহু মুল্যবান কিতাবের সম্ভার ছিল। ফাত্ওয়া প্রদান ও সংস্কার আন্দোলন ছিল তাঁর প্রধান কাজ। উলামায়ে কিরামের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আলিম।

আকাইদ ও ফিক্হ শাস্ত্রে 'শরীয়ত নামা' ও 'মারিফাত নামা' তাঁর রচিত কিতাব দু'টি অমূল্য অবদান। এ ছাড়াও তিনি 'কাওয়াইদে সাদী' ফারসী ভাষায় পাঠ উপযোগী একখানা কিতাব রচনা করেন।

তিনি ১৩৫২ বাংলা সনে ইন্তিকাল করেন। নিজ বাড়ীতে মাদ্রাসার পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।

২৩. মুফ্তী মুহাম্মদ ইব্রাহীম (র.)

মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম (র.) চট্টগ্রাম জিলায় আনোয়ারা থানার অন্তর্গত ভিংরুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্শী হামিদ আলী। চট্টগ্রামের জিরী মাদ্রাসা হতে দাওরা হাদীস পাশ করে পুনরায় দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীসে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কর্মজীবনে প্রথমত সাতকানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা এবং পরে চুন্তী সিনিয়ার মাদ্রাসায় হেড মাওলানা পদে কাজ করেন। অতঃপর ১৯৫১ সনে পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও মুফ্তী পদে যোগদান করেন। তাঁর প্রদত্ত ৩৭০০ ফাত্ওয়ার বিরাট পাণ্ডুলিপিও সংশ্লিষ্ট দফ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে।

www.pathagar.com

২৪. মুফ্তী আবদুল করীম (র.)

হযরত মাওলানা মুফ্তী আবদুল করীম (র.) কুমিল্লা জিলার রুপসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আফতাবুদ্দীন। তিনি ভারতের রামপূর মাদ্রাসা হতে ফিকহ্সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তথাকার মাতলাউল উলূম মাদ্রাসা হতে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রায় ৩৫ বছর যাবত ছারছীনা দারুস্ সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসায় হাদীস শাস্ত্রের (মুহাদ্দিস পদে) শিক্ষকতা করেন। আর ছারছীনার দারুল ইফ্তার প্রধান মুফ্তী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রদত্ত ফাত্ওয়া সমূহের কিয়দাংশ 'ফাত্ওয়ায় দারুস্ সুন্নাত' নামে পাণ্ডুলিপি আকারে ছারছীনায় সংরক্ষিত রয়েছে।

তিনি ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি সকলের কাছে রুপসাই হুযূর নামে সুপরিচিত ছিলেন।

২৫. মাওলানা মুফ্তী বেলায়েত হোসাইন (র.)

মাওলানা মুফ্তী বেলায়েত হোসাইন (র.) নোয়াখালী জিলার সুধারাম থানাধীন অশ্বদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আহ্মদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফাযিল পাশ করেন। তারপর দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসার একজন মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফ্তী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে হাদীস চর্চা ও ফাত্ওয়া প্রদান করে ইসলামের খিদমত করেছেন।

২৬. মুফ্তী নূরুল হক (র.)

মাওলানা মুফ্তী নূরুল হক (র.) চট্টগ্রাম জিলার চন্দনাইশ থানাধীন দোহাজারী জামীরজুরী গ্রামে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জিরী মাদ্রাসা হতে দাওরা পাশ করার পর দারুল উলূম দেওবন্দ হতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে এসে তিনি জিরী ইসলামিয়া মাদ্রাসার মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন, তিনি পরবর্তীতে উক্ত মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফ্তী পদটি অলংকৃত করেন। মাসআলা চর্চা ও ফাত্ওয়া প্রদানে তিনি একজন বিজ্ঞ মুফ্তী ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

২৭. মুফ্তী মুহাম্মদ আযীযুল হক (র.)

তিনি ১৩২২ হিজরী সনে চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন চরকানাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা নূর আহমদ। তিনি জিরী মাদ্‌রাসা হতে দাওরা পাশ করে ভারতের সাহারানপুর মাযাহিরে উলূম মাদ্রাসা হতে উচ্চ-এর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৩৪৫হিজরী সনে জিরী মাদ্রাসার শিক্ষক হন। ১৩৫৭ হিজরী সনে পটিয়ায় কাসিমূল উলূম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একদিকে মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। অপর দিকে তাসাউফ ও তরীকতের শাইখ ছিলেন। তিনি উর্দূ ভাষায় কয়েকখানা কিতাবও লিখেছেন। বিশেষ করে এর মধ্যে'আল-ইতিদাল'ও'খাইরুয্ যাদ' উল্লেখযোগ্য।১৯৬১ ইং সনে তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

২৮. মাওলানা আবদুল ওয়াদূদ (র.)

মাওলানা আবদুল ওয়াদূদ চট্টগ্রাম জিলার সন্দ্বীপ থানাধীন চর রহীম গ্রামে ১৩০৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আফছার উদ্দীন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ৪৪ বছর যাবৎ জিরী ইসলামিয়া মাদ্রাসা শিক্ষকতা করে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখেছেন। তার প্রদত্ত ফাত্ওয়া সমূহ 'ফাত্ওয়ায়ে ওয়াদূদীয়া' নামে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

৮

মুজতাহিদগণের শ্রেণী বিন্যাস

ইজতিহাদের সূচনা

আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর পূর্ণাঙ্গ দীন নাযিল করেছেন। রাসূলে করীম (সা.) তাঁর তেইশ বছরের যিন্দিগীতে তা বাস্তবরূপ দান করে কিয়ামত অবধি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে রেখে গিয়েছেন। রাসূলে করীম (সা.) -এর ইন্তিকালের পর তাঁরই সাহচর্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবা-ই-কিরাম বিশেষ করে খুলাফা-ই-রাশেদীনও শরীয়াতের এ পবিত্র আমানত পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষণ করেন ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করেন এবং পরবর্তী উম্মাতের কাছে তা যথাযথভাবে পৌছিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সুহবতের বরকতে তাঁরা ছিলেন ইসলামের পূর্ণ অনুসারী। তাঁদের মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তাই পরবর্তী উম্মাতের জন্য তাঁরা ছিলেন আদর্শ। সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য তাঁরা ছিলেন তারকারাজির ন্যায়। তাবিঈগণ সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ পবিত্র আমানত গ্রহণ করে তাঁদের পরবর্তী লোকদের কাছে তা যথাযথভাবে পৌছিয়ে যান। পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এমন সব ঘটনা ও সমস্যা উদ্ভব হতে থাকে, যা পূর্বে ছিল না। এ ধরণের নিত্য নতুন সমস্যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। এ সকল ঘটনা ও সমস্যার সমাধান দেওয়া অবশ্য কতর্ব্য হয়ে পড়ে আলিমগণের উপর। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যাহেরী-নসূসে এ সব সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় নি। তাই এমন তরীকা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করা সম্ভবপর হয়। এ প্রেক্ষিতে উলামা-ই-উম্মাত ইজতিহাদের মাধ্যমে উসূল ও নীতিমালা প্রণয়ন শুরু করেন।[১]

সহীহ্ হাদীস দ্বারাও উক্ত পদক্ষেপের সমর্থন পাওয়া যায়,

أن رَسول الله صلى الله عليه و سلم لما بَعث مُعا ذا إلى اليمن قاضيا قال له بم تقضى يا مُعا ذ قا ل بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسوله قال فان لم تجد قال أجتهد فيه برائى فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى وفق رَسول رسوله بما يرضى به رسوله،

১. উমদাতু-রি'আয়াহ্, মুকাদ্দিতাতু শারহি'ল বিকায়া, পৃষ্ঠা ৬।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হযরত মু'আয (রা.) কে কাযী হিসাবে ইয়ামনে পাঠান, তখন মু'আয (রা.)-কে লক্ষ্য করে নবী করীম (সা.) বললেন ঃ হে মু'আয! 'তুমি কিসের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দিবে ? হযরত মু'আয (রা.) বললেন, "কিতাবুল্লাহ্র মাধ্যমে।" নবী করীম (সা.) বললেন, 'যদি কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে সমাধান খুঁজে না পাও। তার উত্তরে মু'আয (রা.) বললেন, সুন্নাহ্র মাধ্যমে। এরপর তিনি বললেন, যদি এতেও না পাও তখন হযরত মু'আয (রা.) বললেন, আমি এমন সব ব্যাপারে ইজতিহাদ করব। এ উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খুশী হয়ে বললেন, সকল প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহ্র যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে তাঁর রাসূলের (সা.) সন্তুষ্টি প্রদানের তাওফীক দান করেছেন।[১]

উক্ত হাদীসে হযরত মু'আয (রা.) -এর উক্তি - "اجتهد فيه برائي" আমি এ সকল ব্যাপারে ইজতিহাদ করব -এর উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সন্তুষ্টি প্রকাশ করাই ইজতিহাদের বৈধতা বরং প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।

ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দিমূন কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে মাসআলা ইসতিম্বাতের নীতিমালা প্রণয়ণ করেন এবং দীনী আহ্কামের মূল উৎস দলীল চতুষ্টয় (ادلة اربعة) থেকে ফুরূঈ আহ্কাম (فروعى احكام) ইসতিম্বাত করেন। যে সকল মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন সে গুলো আকাট্য সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। আর যে সকল মাসআলায় তাঁরা ইখ্তিলাফ করেছেন তা উম্মাতের জন্য রহমত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।[২]

যেহেতু মাসআলা ইসতিম্বাতের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ণ করে এর মাধ্যমে সহীহ্ মাসআলা বের করাই মুজতাহিদগণের উদ্দেশ্য। তাই মাসআলা ইসতিম্বাত করার বেলায় তাঁদের কারো যদি ভুলও হয়ে থাকে তবুও তিনি নেকীর অধিকারী হবেন। আর যিনি সহীহ্ভাবে মাসআলা ইসতিম্বাত করতে সক্ষম হন তিনি দ্বিগুণ নেকীর অধিকারী হবেন। ইখ্তিলাফী মাসআলার বেলায় প্রকৃতপক্ষে সহীহ্ হুকুম একটিই হয়ে থাকে। তবে তা কোন্‌টি, সে ব্যাপারে আল্লাহ-ই-অধিক জানেন। উল্লেখ্য যে, উসূল ও আকাইদ সংক্রান্ত মাসআলা মাসাইলের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কোন ইখতিলাফ বা মতানৈক্য হয়নি। অবশ্য শাখা-প্রশাখা মাসাইলে তাঁদের মধ্যে ইখ্তিলাফ হয়েছে।[৩]

যে সকল মনীষী ইজতিহাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ফকীহ্ রয়েছেন। কতক এমন আছেন যাঁরা কুরআন-হাদীস হতে সরাসরি উসূল ও নীতিমালা বের করেন এবং তার মাধ্যমে মাসাইল ইসতিম্বাত করেন। আবার কতক এমন আছেন যাঁরা সরাসরি কুরআন, হাদীস থেকে নীতিমালা প্রণয়ন করতে সক্ষম নন। তবে অন্যের নীতিমালা অনুসরণ করে মাসাইল ইসতিম্বাত করতে পারেন। আবার কিছু সংখ্যক এমন আছেন, যে ব্যাপারে ইমাম থেকে কোন অভিমত বর্ণিত নেই সে ব্যাপারে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১. তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা। ২. উমদাতু-রি'আয়াহ্, মুকাদ্দিতাতু শারহি'ল বিকায়া, পৃষ্ঠা ৬।
৩. নূরুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা ২৪৭।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, যাঁরা নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুজতাহিদের ইজতিহাদী মাসাইল বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। যেমন, ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম সুফইয়ান সাত্তরী (র.), ইমাম ইব্‌ন আবূ লাইলা (র.), ইমাম আওযাঈ (র.) ইমাম শাফিঈ (র.), ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র.), ইমাম দাউদ ইব্‌ন আলী ইস্‌ফাহানী (র.) প্রমুখ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবার চার ইমাম যথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফিঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) -এর ইজতিহাদী মতামত পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় মাযহাব হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ চার মাযহাবের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফার মাযহাব সবচেয়ে অধিক প্রসার লাভ করেছে। কেননা তাঁর ইজতিহাদের যৌক্তিকতা ও ব্যাপকতা এবং তাঁর ইল্‌মের যোগ্য উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা ও কর্মতৎপরতা সবচেয়ে বেশী ছিল। তিনি ছিলেন মুজতাহিদগণের শিরোমণি। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.), বলেছিলেন,"اَلنَّاس كلهم عِيَال على أَبى حنيفة فِى الفقه"ফিকহ্ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মুখাপেক্ষী। মুজতাহিদগণের যোগ্যতার এ পার্থক্যের কারণে তাঁদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যাতে মুফ্‌তীগণ প্রত্যেক মুজতাহিদের ইজতেহাদী স্তর উপলব্ধি করে ফাত্‌ওয়া প্রদানে সমর্থ হন।[১]

মুজতাহিদ-এর সংজ্ঞা

মুজতাহিদ ("مُجْتَهِدٌ") কর্তৃকারক (إسم فَاعل) এর শব্দ। এর মাসদার হল 'اِجْتِهَاد' মূল ধাতু 'جهد' অর্থ আপ্রাণ চেষ্টাকারী।[২]

শরী'আতের পরিভাষায় ঐ ব্যক্তিকে মুজতাহিদ বলা হয় যিনি কিতাবুল্লাহ্‌র ইল্‌ম ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সকল নীতিমালা এবং ইল্‌মে হাদীসের সনদ, মতন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পারদর্শী, বিশুদ্ধ কিয়াসে যোগ্যতা সম্পন্ন ও মানব সমাজের রীতি-নীতি, আচার আচরণ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

মুজতাহিদগণ এসব যোগ্যতা দিয়ে কুরআন-হাদীস থেকে শরী'আতের হুকুম-আহ্‌কাম ইসতিম্বাত করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন।

মুজতাহিদগণের শ্রেণী বিন্যাস

আল্লামা শামী (র.) 'শারহে উকূদি রাসমুল-মুফ্‌তী' কিতাবে লিখেন –

ان الوَاجب على من أراد ان يعمل لنفسه ويفتى لغيره أن يتبع القول الذى رجحه عُلمَاء مذهبه .

১. কাওয়াইদুল ফিকহ্, সাইয়িদ মুফ্‌তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.) ৪৬৫ পৃষ্ঠা। ২. মিসবাহুল লুগাত, পৃষ্ঠা ১২৫।

www.pathagar.com

যিনি নিজে আমল করতে চান কিম্বা শরী'আতের মাসআলা মাসাইলের ব্যাপারে অন্যকে ফাত্ওয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে স্বীয় মাযহাবের আলিমগণ যে অভিমতের প্রাধান্য দিয়েছেন তার অনুসরণ করা। এটা মুজতাহিদগণের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে অবগতি ব্যতীত সম্ভব নয়। কেননা, তাঁদের শ্রেণী ও মান সম্পর্কে অবহিত হলে কার অভিমত সবল ও কার অভিমত দুর্বল তা বুঝতে পারা যায় এবং সে প্রেক্ষিতে গ্রহণ ও বর্জন করা সহজ হয়।

আল্লামা শামসুদ্দীন ইব্ন কামাল পাশা (র.) মুজতাহিদগণকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

প্রথম শ্রেণী ঃ মুজতাহিদ ফিশ্-শার'আ (مجتهد فى الشرع)

ঐ সকল ফিকহ্বিদ যাঁরা স্বাধীনভাবে সরাসরি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস হতে ইজ্তিহাদ করে মাসাইল বের করতে সক্ষম এবং উসূল (أصول) ও فروع -এর ক্ষেত্রে কারো নির্ধারিত নীতিমালার অনুসারী বা মুকাল্লিদ নন। বরং তাঁরা নিজেরাই কুরআন ও হাদীস থেকে ইজ্তিহাদের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাঁদেরকে 'মুজ্তাহিদে-মুত্লাক' (مجتهد مطلق) এবং 'মুজ্তাহিদে মুস্তাকিল' (مجتهد مستقل) ও বলা হয়। যেমন, চার ইমাম–ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) এবং ইমাম সুফ্ইয়ান সাওরী (র.), ইব্ন আবূ লাইলা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.), ইমাম আব্দুর রহমান আল-আওযাঈ (র.), দাউদ ইব্ন আলী ইস্ফাহানী (র.) প্রমুখ।[১]

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ মুজ্তাহিদ ফি'ল-মায্হাব (مجتهد فى المذهب)

ঐ সকল ফিকহ্বিদ যাঁরা ইজতিহাদ করে কুরআন ও হাদীস থেকে মাসাইল বের করতে সক্ষম। তবে উসূল ও নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন নন বরং এ ব্যাপারে তাঁরা মুজতাহিদে মুত্লাকের কোন ইমামের তাক্লীদ বা অনুসরণ করা যরুরী মনে করেন। অবশ্য ফুরু'য়ী মাসাইলের ব্যাপারে তাঁরা উস্তাদের খেলাফ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। এ ধরণের মুজ্তাহিদগণকে মুজতাহিদে-মুন্তাসিব (مجتهد منتسب) ও বলা হয়। এই শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান শুধু এতটুকু যে, প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদগণ নীতিমালার ক্ষেত্রে কারো অনুসারী নন, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মুজতাহিদগণ নীতিমালার ক্ষেত্রে মুজতাহিদে মুত্লাকের অনুসারী। যেমন ইমাম আবূ ইউসূফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.), ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র.), ইমাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.), ইমাম ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ্ (র.), ইমাম হাফ্স ইবন্ গিয়াস ইব্ন তলক্ (র.), ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ যাকারিয়া (র.), ইমাম নূহ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র.), ইমাম আবূ মুতী' বাল্খী (র.), ইমাম ইউসুফ

১. কাওয়াইদুল ফিকহ্ ঃ মুফ্তী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.) পৃষ্ঠা ৪৬৫।

www.pathagar.com

ইবন খালিদ (র.), ইমাম আসাদ ইবন আমর আল-কাযী (র.) প্রমুখ।[১]

আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত না করায় আপত্তি করে বলেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উসূল ও নীতির খেলাফ করতে পারেন না একথা ঠিক নয়। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম আবূ হানীফ (র.) -এর বহু উসূলের খেলাফ করেছেন। যেমন– মাজায (রূপক অর্থ) হাকীকত (প্রকৃত অর্থ)-এর খলীফা লফয ও হুকুম উভয়ের মধ্যে, না শুধু হুকুমের মধ্যে? ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, লফয (لفظ) ও হুকুম উভয়টার মধ্যেই মাজায হাকীকতের খলীফা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র.) বলেন, শুধুমাত্র হুকুমের বেলায় মাজায হাকীকতের খলীফা। হাকীকত যদি সম্ভাবনাময় (ممكن) বিষয় হয় এবং কোন কারণে হাকীকতের উপর আমল করা না যায়। তখনই মাজাযের উপর আমল করা হবে। আর যদি হাকীকতটা একেবারে অসম্ভব বিষয় হয় তবে কথাটাকে 'লগব' বা নিরর্থক বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার (র.) নীতি অনুযায়ী হাকীকত একেবারে অসম্ভব হলেও মাজাযী অর্থ মুরাদ নেওয়া যাবে। (এরূপে নাজাসাতে গালীযা ও নাজাসাতে খফীফার মূল ভিত্তি নিয়েও ইমাম আ'যম (র,) এবং সাহিবাইন (র.) -এর মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে)।[২]

ইমাম গাযালী (র.) 'আল-মানখূল' (المنخول) নামক গ্রন্থে লিখেন "انهما خالفا أباحنيفة في ثلاث مذهب" ইমাম আবূ হানীফা (র,) -এর দুই তৃতীয়াংশ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইখতিলাফ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুজতাহিদে মুতলাকের মধ্যে গণ্য। এ প্রসংগে মুহাম্মদ ইবন আবদুস সাত্তার কারদারী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর শাগরিদদ্বয় ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তখন তিনি তাঁদেরকে দলীল প্রমাণ ব্যতীত তাঁর মতামতের অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। আর বলেন, কোন মুজতাহিদের পক্ষে অন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা দুরস্ত নয়। ইমাম সাহেবের উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাঁরা দলীল প্রমাণাদি খুঁজতে আরম্ভ করেন। তাঁরা যে সকল মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের পক্ষে দলীল পান নাই বরং তাঁর অভিমতের বিপক্ষে দলীল পেয়েছেন সে ক্ষেত্রে তাঁরা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নির্দেশ অনুসারে তাঁর অভিমত গ্রহণ না করে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসংগে মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) বলেন ঃ

---

১. শারহু উকূদি রাসমূল মুফতী, ২৮ পৃষ্ঠা; শামী, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা; উমদাতুর রি'আয়াহ; মুকাদ্দিমাতু শারহিল বিকায়া, ৯ পৃষ্ঠা; আন্ নাফিউল কাবীর লিমান ইউতালিউ জামি-আস্-সাগীর, ১০ পৃষ্ঠা।

২. রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা; শারহু উকূদি রাসমূল মুফতী, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা; আন্- নাফিউল কাবীর, মুকাদ্দিমা জামিউস্ সাগীর, ১০ পৃষ্ঠা; উমদাতুর রি'আয়াহ মুকাদ্দামাতু শারহিল বিকায়া, ৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

فالحق أنهما مجتهدان مستقلان نالا رتبة الإجتهاد المطلق الا انهما لحسن تعظيمهما لإستاذهما وفرط جلالهما اصله وسلكا نحوه وتوجها إلى نقل مذهبه وتأييده وإنتصاره والإنتساب إليه ۰

মূলত তাঁরা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র.) উভয়ে ছিলেন মুজতাহিদে মুসতাকিল (প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদ)। ইজতিহাদে মুত্লাকের মর্যাদা তাঁরা উভয়েই লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁরা উস্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আদাব-সম্মানের লক্ষ্যে তাঁর উসূল ও নীতির অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর মাযহাব প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থন করে সাহায্য সহায়তা ও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং নিজেদেরকে উস্তাদের মাযহাবের অনুসারী হিসাবেই প্রকাশ করেছেন।[১]

প্রখ্যাত ফকীহ্ আল্লামা যাহিদ কাওসারী (র.) রচিত গ্রন্থ 'লামহাতুন নাযার ফী-সীরাতিল ইমাম যুফার' -এর মধ্যে ইমাম যুফার (র.) -কে মুজতাহিদে মুত্লাক-এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আল্লামা আবূ যায়িদ দাবূসী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, ইমাম যুফার (র.) উসূল ও ফুরূ' উভয় ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে ইমাম সাহেবের খেলাফ করেছেন। আল্লামা সায়্যিদ আহ্মদ আল-হামভী (র.) রচিত 'উকূদুদ্-দুরার ফীমা ইউফ্তা বিহী ফি'ল মাযহাবে মিন আকওয়ালি যুফার' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, সতেরটি মাসআলায় হানীফা মাযাহাবে ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত অনুসারে ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং যিনি উসূল (اصول) ও ফুরূ' (فروع) কোন ক্ষেত্রেই কারো মুকাল্লিদ নন এবং যাঁর মতামত অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়েছে, তিনি অবশ্যই মুজতাহিদে মুত্লাক। তবে উস্তাদের সম্মানার্থে নিজের মাযহাব প্রচলন না করে উস্তাদের অনুসারী হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার (র.) প্রচুর উক্তির বর্ণনা করতেন। সম্ভবত সে কারণেই কিছু সংখ্যক ফকীহ্ তাঁকে ইমাম আবূ হানীফার (র.) উসূলের মুকাল্লিদ ধারণা করে মুজতাহিদীন-ফিল মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[২]

আল্লামা যাহিদ কাওসারী (র.) 'হুসনুত্ তাকাযী ফী-সীরাতিল-ইমাম আবী ইউসুফ আল-কাযী' কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম যুফার, ইমাম মুহাম্মদ (র.) সম্পর্কে আল্লামা মারজানীর উক্তি উদ্ধৃত করেন যে,

حالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعي وأمثالهما فليسوا بدونهما ۰

তাঁরা ইল্মে ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.) ইমাম শাফিঈ (র.) প্রমুখের উর্ধ্বে না হলেও কোনক্রমেই তাঁদের চেয়ে নীচে নন।[৩]

---

১. উমদাতুর রি'আয়াহ, মুকাদ্দামাতু শারহিল বিকায়া, পৃষ্ঠা ৮-৯। ২. লামহাতুন্ নাযার-ফী-সীরাতিল-ইমাম যুফার, ২০-২১ পৃষ্ঠা। ৩. রাদ্দুল-মুহতার, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা ; শারহু উকূদি রাসমুল মুফতী, ৩১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

উক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে. ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ও ইমাম যুফার (র.) সকলেই মুজতাহিদে মুত্লাক ছিলেন। ইব্ন পাশার শ্রেণী-বিন্যাস মূলত অস্পষ্ট।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ মুজতাহিদ ফি'ল মাসাইল (مجتهد فى المسائل)

ঐ সকল ফিকহ্‌বিদ যাঁরা উসূল ও ফুরূ' কোন ক্ষেত্রেই স্বীয় ইমামের বিরোধী মত পেশ করেন নি। অবশ্য স্বীয় ইমামের উসূল ও ফুরূ' নীতিমালার উপর পূর্ণ দখল ও পারদর্শীতা থাকার ফলে এমন যোগ্যতা অর্জন করেছেন, যা দ্বারা তাঁরা ঐ সব ব্যাপারে হুকুম ও ফয়সালা দিতে সক্ষম; যে সব ব্যাপারে মাযহাবী ইমামগণ থেকে কোন মতামত বর্ণিত নাই। তাঁদের মধ্যে হচ্ছেন, ইমাম তাহাবী, ইব্ন উমার খাস্সাফ (র.) ইমাম আবুল হাসান কার্খী (র.) শামসুল আইম্মা হাল্ওয়ায়ী (র.) শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র.) ইমাম ফাখরুল ইসলাম বাযদূবী (র.) ফখর উদ্দীন কাযীখান প্রমূখ ফকীহ্গণ। এ সকল ফাকীহ্গণের উসূলী ও ফুরূয়ী ব্যাপারে স্বীয় ইমামগণ থেকে ভিন্নমত পোষণ করার যোগ্যতা নেই বটে, কিন্তু যে সকল মাসআলায় ইমাম থেকে কোন মতামত বর্ণিত নেই সেই সব মাসআলায় ইমাম কর্তৃক নির্ধারিত উসূল ও নীতিভিত্তিতে হুকুম প্রদান করতে তাঁরা সক্ষম।[১]

এই শ্রেণীতে যে ফকীহ্গণকে গণ্য করা হয়েছে তাঁদের মধ্য থেকে ইমাম খাস্সাফ. তাহাবী ও কারখী (র.) সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লাখ্নৌবী (র.) বলেন. তাঁদেরকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে. তারা ফুরূয়ী ও উসূলী কোন ব্যাপারেই ইমাম সাহেবের খেলাফ করতে সক্ষম নন। অথচ ফিকহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, অনেক মাসআলায় তাঁরা ইমাম আবূ হানীফার (র.) খেলাফ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেই হিসাবে তাঁদের মর্যাদা মুজতাহিদ-ফিল- মাসাইলের উর্ধ্বে।[২]

চতুর্থ শ্রেণী ঃ আসহাবুত্ তাখ্রীজ (اصحاب التخريج)।

ঐ সকল ফিকহ্‌বিদ যাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান নেই। তবে উসূল ও নীতির উপর পারদর্শীতা ও দালাইলের উপর বিচক্ষণতা থাকার কারণে মাযহাবের ইমামগণ থেকে বর্ণিত কোন অস্পষ্ট (مجمل) বাক্যের ব্যাখা বিশ্লেষণ এবং দু'রকম অর্থবোধক (ذوالوجهين) বাক্যের কোন একটিকে নির্ধারণ করার যোগ্যতা রয়েছে। যেমন- হিদায়া গ্রন্থের কোন কোন স্থানে রয়েছে, 'كذا فى تخريج الكرخى كذا فى تخريج الرازى. ' এ ধরণের ফিকহ্‌বিদগণকে 'আসহাবুত্-তাখরীজ' বলা হয়। যেমন- আবূ বকর আর্-রাযী (র.)।[৩]

উক্ত শ্রেণীর মধ্যে আবূ বাকর আর্-রাযীকে অন্তর্ভূক্ত করার কারণে আল্লামা আবদুল হাই লাখ্নৌবী (র.) ইব্ন কামাল পাশার (র.) সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আবূ বাকর

১. রাদ্দুল-মুহতার, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা; শারহু উকূদি রাসমুল মুফ্তী ৩১ পৃষ্ঠা আন্- নাফিউল কাবীর, ১০ পৃষ্ঠা।
২. উমদাতুর রি'আয়াহ, ৭ পৃষ্ঠা।
৩. রাদ্দু'ল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা; শারহু উকূদি রাসমুল-মুফ্তী, ৩১ পৃষ্ঠা; আন্- নাফিউল কাবীর, ১০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আর্-রাযীকে চতুর্থ শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত করে তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। কেননা তিনি তো তৃতীয় শ্রেণীর মুজতাহিদ। তিনি শামসুল-আইম্মা হালওয়ায়ী ও কাযীখান প্রমূখ হতে ইল্ম ও যোগ্যতা উভয় দিক থেকেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।[১]

অধিকন্তু তিনি ছিলেন তাঁদের থেকে পূর্ব যুগের ফকীহ্। এরই সমর্থনে মুফ্তী মুজাহির হোসাইন সাহারানপুরী (র.) 'শারহু উকূদি রাসমিল-মুফ্তী' এর পাদটিকায় লিখেন যে, আবূ বাকর রাযীকে চতুর্থ শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত করে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা হতে নিম্নস্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। কেননা তাঁর কিতাবাদি ও মতামত সমূহ অধ্যয়ন করলে প্রত্যেকেই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী ও তাঁর পরবর্তী ফকীহ্গণ যাঁদেরকে মুজতাহিদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে সকলেই আবূ বকর আর্ - রাযীর (র.) ইল্ম থেকে উপকৃত হয়েছেন। শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.) নিজেই বলেন, আবূ বকর আর্-রাযী বিজ্ঞ আলিম ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। আমরা তাঁর অনুসরণ করি ও তাঁর অভিমত গ্রহণ করি। সুতরাং ইব্ন কামাল পাশা (র.) কেমন করে শামসুল-আইম্মা হালওয়ায়ীকে মুজতাহিদ-ফিল-মাসাইল এবং আবূ বকর আর্-রাযীকে মুকাল্লিদ হিসাবে গণ্য করলেন। সম্ভবত ইব্ন কামাল পাশা(র.) আমাদের ফিকহ্ গ্রন্থে আলিমগণের উক্তি ঃ 'كَذَا فِى تَخْرِيجِ الرَّازِى' এই উক্তি দ্বারা ধারণা করেছেন যে, তাঁর একমাত্র কাজই ছিল তাখ্রীজ এবং এটা তাঁর সর্বোচ্চ যোগ্যতা। অথচ অন্যান্য আইম্মায়ে মুজতাহিদীনেরও তাখরীজাত (تخريجات) রয়েছে প্রচুর। তবুও তাঁদেরকে মুজতাহিদ গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে তাখরীজ করার কারণে ইমাম আবূ বাকর আর্-রাযীকে (র.) ও মুজতাহিদ গণ্য করাতে কোন বাধা নেই।[২]

পঞ্চম শ্রেণী ঃ আস্হাবুত তারজীহ (أَصحاب الترجيح)।

ঐ সকল ফিকহ্বিদ যাঁদের ইজতিহাদ করার কোন রকমের যোগ্যতা নেই। তবে তাঁরা দালাইলের আলোকে বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। একাধিক মতামতের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত কোনটি তা নির্ধারণ করতে সক্ষম। যেমন তাঁরা বলেন, 'هذا أَولى' (এটা উত্তম), 'هذا أَصح' এটা বিশুদ্ধতম 'هذا أَوفق بالقياس' এটা অধিক যুক্তিযুক্ত। এ সকল ফিকহ্বিদকে আসহাবুত-তারজীহ্ (أَصحَاب الترجِيح) বলা হয়। যেমন, আবুল-হাসান কুদূরী ও হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা প্রমূখ।

আল্লামা আবদুল হাই লাখ্নৌবী (র.) উক্ত শ্রেণীর মধ্যে আবুল হাসান কুদুরী ও হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতাকে গণ্য করার উপর আপত্তি করেছেন এবং এতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা তাঁরা কাযী খানের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ বলে বিবেচিত। অন্ততঃপক্ষে মুজতাহিদ হিসাবে সমান সমান তো বটেই। তাই তাঁদেরকেও তৃতীয় শ্রেণীর মুজতাহিদ

১. উমদাতুর রি'আয়াহ,৭ পৃষ্ঠা।
২. পাদটিকা ঃ শারহ্ উকূদি রাসমিল-মুফ্তী, ৩১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন ছিল।[১]

রাসমুল মুফ্তীও টিকাকারও উপরোক্ত বিন্যাসের উপর প্রশ্ন তুলছেন যে, কুদূরী ও হিদায়া প্রণেতাকে আসহাবে তারজীহ্ এবং কাযী খানকে মুজতাহিদের অর্ন্তভূক্ত করা কেমন করে হতে পারে? অথচ কুদূরী প্রণেতা শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.) হতে যুগ ও ইল্ম হিসাবে অগ্রগামী।

অবশ্য হিদায়া প্রণেতা তাঁর যুগের অদ্বিতীয় ফকীহ্ ছিলেন। তদানীন্তন কালের আলিমগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। যেমন ইমাম ফখর উদ্দীন কাযীখান ও যাইন উদ্দীন আল-ইতাবী (র.) বলেন, তিনি (হিদায়া প্রণেতা) ফিকহ্ শাস্ত্রে সমবয়সীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। বরং শুয়ূখ তথা বড়দের উপরেও। সুতরাং তাঁকে কাযী খানের নিম্নস্তরে গণ্য করা সমীচীন নয়।[২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) এবং হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা ও কাযী খান এবং শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.)-এর ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ মুজতাহিদ ফিল- মাসাইল (مُجتهد فى المسائل) এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য।

ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ আসহাবুত্ তামীয (أصحاب التميز)।

ঐ সকল ফিকহ্বিদ যাঁরা ইমামে মাযহাবের মুকাল্লিদ। তবে তাঁরা দুর্বল (ضعيف) সবল (قوى) অধিক সবল (أقوى) এ গুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। এ শ্রেণীর ফকীহ্গণকে 'আসহাবুত্ তামীয' বলা হয়। যেমন নির্ভরযোগ্য মুতূনের (متون)গ্রন্থকার তথা সাহিবে বিকায়া (র.) সাহিবে কানয্ (র.) সাহিবে মুখ্তার (র.) সাহিবে মাজ্মা (র.) প্রমুখ। তাঁরা নিজ গ্রন্থাবলীতে দুর্বল অভিমত বর্ণনা না করার নীতি অবলম্বন করেছেন।[৩]

সপ্তম শ্রেণী ঃ মুকাল্লিদীনে মাহয (مقلدين محض)

ঐ সকল মুকাল্লিদ যাঁরা উল্লেখিত যোগ্যতাসমূহ থেকে কোন একটির উপরও ক্ষমতা রাখেন না। যাঁরা দুর্বল ও সবলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না বরং যেখানে যে ধরণের মতামত পান তা-ই বর্ণনা করে থাকেন। এ সকল আলীমগণকে 'মুকাল্লিদীনে মাহয' বলা হয়। এঁদের নিজস্ব মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।[৪]

আল্লামা কাফবী (র.) -এর শ্রেণী বিন্যাস

আল্লামা আবদুল হাই লাখ্নৌবী (র.) 'উমদাতুর রি'আয়া' কিতাবে আল্লামা কাফবী (র.) থেকে মুজতাহিদগণের পাঁচ শ্রেণীতে বিন্যস্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করেন। তিনি লিখেন ঃ

---

১. উমদাতুর রি'আয়াহ, ৯ পৃষ্ঠা। ২. পাদটিকা ঃ শারহু উকূদি রাসমিল-মুফ্তী, ৩২ পৃষ্ঠা। ৩. রাদ্দুল মুহ্তার, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা; শারহু উকূদি রাসমুল-মুফ্তী, ৩৪ পৃষ্ঠা; আন্- নাফিউল কাবীর; লিসান ইউতানিউ আল- জামিউস্ সাগীর, ১১ পৃষ্ঠা।
৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

فاعلم أنه ذكر الكفوى فى طبقات الحنفية أن الفُقهَاء يعنى من المشائخ المقلدين على خمس طبقات.

তবে ইব্‌ন কামাল পাশা ও কাফবীর (র.) -এর শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আল্লামা কাফবী (র.) এখানে দু' শ্রেণীর উল্লেখ করেন তথা মুজতাহিদে মুত্‌লাক ও মুকাল্লিদে মাহয।

তিনি কেবলমাত্র মুকাল্লিদীনে হানাফিয়্যার শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। তাঁর শ্রেণী বিন্যাসের সাথে উপরোক্ত দু' শ্রেণীকে সংযোজন করা হলে সাত শ্রেণী-ই হয়ে যায়।[১]

ফিকহ্‌বিদগণের শ্রেণী বিন্যাস বর্ণনায় আল্লামা আলা উদ্দীন হাস্‌কাফী (র.) থেকে পদ্‌স্খলন ঘটেছে। কেননা তিনি 'দুররে মুখ্‌তার'গ্রন্থে লিখেন,

وقد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقدوا اما المقيد فعلى سبع طبقات مشهورة.

তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, মুজতাহিদ-ই-মুত্‌লাক এর অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু মুজতাহিদে মুকাইয়্যাদ -এর সাত শ্রেণী বিদ্যমান। অথচ মুজতাহিদে-মুকাইয়্যাদের সাত শ্রেণী নয় বরং ছয় শ্রেণী।[২]

আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাজার আল-মাক্কীর (র.) শ্রেণী বিন্যাস

আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাজার আল-মক্কী-আশ-শাফিঈ ইমাম নববী (র.) রচিত 'শারহুল-মুহায্‌যাব' গ্রন্থ থেকে মুজতাহিদগণের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন।

মুজতাহিদ প্রথমত দুই প্রকার ঃ

১. মুজতাহিদ মুস্‌তাকিল (مجتهد مستقل) ২. মুজ্‌তাহিদে মুনতাসিব (مجتهد منتسب)

প্রথম প্রকার তথা মুজ্‌তাহিদে মুসতাকিলের জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা শর্ত।

১. ফিক্‌হুন-নাফস (فقه النفس)

২. বিশুদ্ধ মেধা (سلامة الذهن)

৩. বিদগ্ধ গবেষণা (رياضة الفكر)

৪. বিশুদ্ধ ইস্‌তিম্বাত (صحة التصرف و الإستنباط)

৫. সজাগ দৃষ্টি (التيقظ)

৬. আদিল্লা-ই শারইয়্যাহ্‌-এর শর্তসমূহের পরিচিতি লাভ।

৭. বিচক্ষণতার সাথে দলীল নির্ধারণ এবং যথাস্থানে প্রয়োগ।

---

১. উমদাতুর রি'আয়াহ, মুকাদ্দিমাতু শারহিল-বিকায়া, ৮ পৃষ্ঠা। ২. উমদাতুর রি'আয়াহ, ৭ পৃষ্ঠা। ৩. প্রাগুক্ত, ৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৮. ফিকহের মৌলিক মাসাইলের উপর পূর্ণজ্ঞান অর্জন ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারীকে মুজতাহিদে মুসতাকিল বলা হয়। বহুকাল পূর্ব থেকেই এ পর্যায়ের মুজতাহিদ পাওয়া যায় না।[১]

মুজতাহিদে মুনতাসিব (مجتهد منتسب) চার শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. ঐ সকল মুজতাহিদ যাঁরা ইজতিহাদে পূর্ণ পারদর্শী (مستقل) হওয়ার ফলে মাযহাব ও দালাইলের কোন ক্ষেত্রেই ইমামের তাক্লীদ করেন না। তবে ইমামের ইজতিহাদের পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে তাঁদেরকে সেই ইমামের দিকে নিসবত করা হয়।

২. ঐ সকল মুজতাহিদ যাঁরা কোন এক মাযহাবের সংগে সম্পৃক্ত। তাঁরা ইমামের উসূলও নীতিমালার সীমা অতিক্রম করেন না।

এ শ্রেণীর মুজতাহিদগণকে 'আসহাবুল উজূহ্' (اصحَاب الوُجوه) বলা হয়।

৩. ঐ সকল মুজতাহিদ যাঁরা আসহাবুল-উজূহ্ (اصحَاب الوُجوه) -এর স্তরে পৌছতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা ফকীহ্, নিজ ইমামের মাযহাবের হাফিয, স্বীয় ইমামের মাযহাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইস্‌তিম্বাতে দুর্বলতা ও সবলতা বর্ণনা করতে সক্ষম। চারশ' শতাব্দির শেষ পর্যন্ত এ ধরণের মুজতাহিদগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল প্রচুর। যাঁরা মাযহাবের মাসাইলগুলো ধারাবাহিক বিন্যাস করেছেন।

৪. ঐ সকল ফকীহ্ যাঁরা মাযহাবের মাসাইলের হিফয ও উদ্ধৃতিতে সুদৃঢ়, মুশকিল ও দুর্বোধ্য মাসআলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কিন্তু কিয়াস ও দালাইলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দুর্বল, ফিক্‌হ গ্রন্থ থেকে তাঁদের উদ্ধৃত করা ফাত্‌ওয়া ও মাসাইল গ্রহণযোগ্য।[২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রকাশ পায় যে, বর্তমান যুগে ঐ সকল আলিমের ফাত্‌ওয়া নির্ভরযোগ্য যাঁদের মাযহাবী মাসাইল জানা আছে, মূল গ্রন্থ থেকে বিশুদ্ধভাবে মাসাইল উদ্ধৃত করতে সক্ষম এবং মুশকিল ও দুর্বোধ্য ব্যাপারগুলো বুঝার ক্ষমতা রাখেন। সংগে সংগে তাঁরা যুগ সম্পর্কেও সচেতন।

১. উমদাতুর রি'আয়াহ্, ৮ পৃষ্ঠা। ২. উমদাতুর রি'আয়াহ্; মুকাদ্দিমাতু শারহিল-বিকায়া, ৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৯

হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহের স্তর, শ্রেণী বিন্যাস ও পরিচিতি

হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহ তিনটি স্তরে বিভক্ত।

প্রথম স্তর ঃ মাসাইলে উসূল বা মৌলিক মাস'আলা

একে যাহিরুর রিওয়ায়াতও বলা হয়। মাসাইলে উসূল ঐ সকল মাস'আলাকে বলা হয়, যা হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর যোগ্য শাগিরদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট হতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ্গণের কাছে এ তিন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব 'আল-উলামাউস্ সালাসা' (العلماء الثلاثة) বা তিন মহাজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। তবে মাসাইলে উসূল বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইমাম যুফার ও ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র.) প্রমূখকেও শামীল করা হয়ে থাকে।

যাহিরুর রিওয়ায়াত গ্রন্থ ছয়খানি ঃ

১. আল-মাবসূত (اَلْمَبْسُوط) ২. আল-জামিউস্ সাগী (اَلْجَامِع الصغير)
৩. আল-জামিউল কাবীর (اَلْجَامِع الكَبِير) ৪. আস্-সিয়ারুস্ সাগীর (اَلسِّير الصغير)
৫. আস্-সীয়ারুল কাবীর (اَلسِّيرالكَبِير) ৬. আয্-যিয়াদাত (اَلزِّيَادَات)।

এ ছয়খানা গ্রন্থের সব কয়টিই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর যোগ্য ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র.) (জন্ম ঃ ১৩২ হিজরী, মৃত্যু ঃ ১৮৯ হিজরী) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে সংকলন করেছেন। এ ছয়খানা গ্রন্থকে ফিকহ্ শাস্ত্রে একত্রে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' (ظَاهِرالرِّوَايَة) বলা হয়ে থাকে। এ গ্রন্থগুলোর প্রতিটি মাস'আলার নির্ভরযোগ্যতা সকলের নিকট স্বীকৃত। হানাফী আলীম ও ফকীহ্গণ এসব গ্রন্থের মাস'আলাগুলোকে 'মাসাইলে উসূল' হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ্ হাকিম শহীদ (র.) (মৃত্যু ঃ ৩৪৪ হিঃ) রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল কাফী' (كِتَاب الكَافِى) -এর মধ্যে যাহিরুর রিওয়ায়াতের মাস'আলাসমূহ একত্র করা হয়েছে। অতএব মাস'আলা বর্ণনায় এ গ্রন্থখানির নির্ভরশীল। অনেকেই এ গ্রন্থখানির শরাহ্ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র.) -এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থখানি সমাধিক

www.pathagar.com

প্রসিদ্ধ। যা সাধারণত 'মাবসূতে সারাখ্সী' নামে খ্যাত।

এ গ্রন্থখানির গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লামা তারতূসী (র.) বলেন, এ গ্রন্থে রচিত মাস'আলার পরিপন্থী কোন মাস'আলার উপর আমল করা যাবে না। মাস'আলা বা ফাত্ওয়া প্রদানের ব্যাপারে একমাত্র এ গ্রন্থের দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। এ গ্রন্থ হতেই ফাত্ওয়া প্রদান করতে হবে এবং একমাত্র এর উপরই নির্ভর করতে হবে।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ্ হাকিম আশ্-শহীদ (র.) (মৃত্যু ঃ ৩৩৪হিঃ) রচিত 'আল-মুন্তাকা' (المنتقى) কিতাবখানিও হানাফী মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে এ স্তরের মাস'আলাসমূহের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

দ্বিতীয় স্তর ঃ মাসাইলে নাওয়াদির

'যাহিরুর রিওয়ায়াত' গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত মাস'আলা সমূহ। এ মাস'আলাগুলো হলো যাহিরুর রিওয়ায়েতের মাস'আলা বহির্ভূত। যা মাযহাবের ইমামগণ হতে কুতুবে উসূল বা মৌলিক গ্রন্থ ছাড়া অপরাপর গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ সব মাস'আলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন ঃ

১. কাইসানীয়াত (كَيسَانِيَات) গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানা ইমাম মুহাম্মদ (র.) জনৈক কাইসান নামক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সংকলন করেছিলেন।

২. জুরজানীয়াত (جُرجَانِيَات) গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানা তিনি জুরজান শহরে অবস্থান কালে সংকলন করেছিলেন।

৩. হারুনীয়াত (هَارونيات) গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানা তিনি খলীফা হারুন-অর-রশীদের উদ্দেশ্যে সংকলন করেছিলেন।

৪. রাক্কিয়াত (رقيات) গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানা তিনি রিক্কা শহরের কাযী থাকাকালে সংকলন করেছিলেন।

৫. আমালী মুহাম্মদ (اَمَالِى محمد) ইত্যাদি।

এ ছাড়া নাওয়াদির মাস'আলা যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর সংকলিত উল্লেখিত গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন 'মুজাররাদ' (مجرد) গ্রন্থ। ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ কূফী (র.) এটি প্রণয়ন করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর একজন তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও সচেতন শাগরিদ ছিলেন। তিনি হিজরী ১৯৪ সনে কূফায় কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং হিজরী ২০৪ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি উক্ত 'মুজর্রাদ' গ্রন্থ ছাড়াও 'কিতাবুল আমালী' নামক অন্য একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাওয়াদির মাস'আলা সমূহের জন্যে কুতুবুল আমালীও (كتب الأمالى) গন্থাবলীও উল্লেখযোগ্য। এ সব মাস'আলার

www.pathagar.com

জন্যে 'রিওয়ায়াতে মুতাফাররিকা' (رواية متفرقة) বা বিভিন্ন বর্ণনাবলীও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যেমন -

১.'নাওয়াদিরে ইব্ন সামা'আহ'(র.) (نوادر ابن سماعة) এ গ্রন্থ রচয়িতার নাম মুহাম্মদ ইব্ন সামা'আহ (র.)। তিনি হিজরী ১৩০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৩৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর নিকট থেকে শুনে 'নাওয়াদির' (نوادر) গ্রন্থ রচনা করেন।

২. নাওয়াদিরে ইব্ন হিশাম (র.) (نوادر ابن هشام)। এ গ্রন্থখানা রচনা করেছেন হিশাম ইব্ন আবদুল্লাহ্ রাযী (র.)। তিনি একজন নির্ভরশীল ফকীহ্ ছিলেন। তিনিও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) নিকট থেকে শুনে হানাফী ফিকহের উপর নাওয়াদির কিতাব রচনা করেন। যা 'নাওয়াদিরে ইব্ন হিশাম' (نوادر ابن هشام) নামে খ্যাত। তিনি রায় শহরে ইন্তিকাল করেন।

৩. নাওয়াদিরে ইব্ন রুস্তম (র.) (نوادر ابن رستم)। এ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন ফকীহ্ ইব্রাহীম ইব্ন রুস্তম (র.)। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর নিকট থেকে ফিকহ্ এবং ইমাম মালিকের (র.) নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন ও বর্ণনা করেন। তিনি একাধিকবার বাগদাদে আগমন করেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম আহ্মাদ (র.) শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর নিকট থেকে শুনে 'নাওয়াদির কিতাব' রচনা করেন, যা 'নাওয়াদিরে ইব্ন রুস্তম (র.)' (نوادر ابن رستم) নামে খ্যাত। তিনি নিশাপুরে হিজরী ২১১ সনে ইন্তিকাল করেন। উল্লেখিত গ্রন্থাবলীর মাস'আলা সমূহ উসূল বা যাহিরুর রিওয়ায়াত গ্রন্থাবলীর মাস'আলা থেকে ভিন্নতর হওয়ার কারণে এ সকল মাস'আলাকে মাসাইলে নাওয়াদির (مسائل نوادر) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

তৃতীয় স্তর ঃ ফাত্ওয়া বা ওয়াকি'আত

মাস'আলা সমূহের তৃতীয় স্তর হলো ফাত্ওয়া। এগুলোকে ওয়াকি'আত ঘটনাবলীও বলা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে ঐ সকল মাস'আলা যা উলামায়ে মুতাআখ্খিরীন বা পরবর্তী যুগের আলিম ও ফকীহ্গণ অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর ছাত্রগণ এবং তাঁদের উভয়ের ছাত্রদের ছাত্রগণ এবং তাঁদের মত অন্যান্য আলিম ও ফকীহ্গণ বিভিন্ন ওয়াকি'আত বা ঘটনাবলী সম্পর্কে রচনা করেছেন। যেগুলো সম্পর্কে আইম্মা-ই-সালাসা বা ইমামত্রয়ের নিকট হতে কোন বর্ণনা নেই। তবে প্রত্যেকটি মাস'আলাই তাঁদের-ই মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

ফাত্ওয়া বা ওয়াকি'আত, মাস'আলা রচনাকারী আলিম ও ফকীহ্র সংখ্যা অনেক। যেমন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর ছাত্রদের মধ্য হতে ১.

www.pathagar.com

ইমাম ইব্‌ন ইউসুফ বলখী (র.)। তিনি হিজরী ২১০ সালে ইন্তিকাল করেন। ২. ফকীহ্ ইব্রাহীম ইব্‌ন রুস্তম (র.) তিনি হিজরী ২১১ সনে ইন্তিকাল করেন। ৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সামা'আহ (র.) তিনি হিজরী ১৩০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৩৩ সনে ইন্তিকাল করেন। ৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল রাযী (র.) তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) শিষ্য ছিলেন, ৫. নাসীর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া বাল্খী (র.)। তিনি হিজরী ২৬৮ সনে ইন্তিকাল করেন। ৬. আবূ নসর কাসিম ইব্‌ন সালাম (র.) প্রমূখ আলিম ও ফকীহ্গণ। এ সকল আলিম ও ফকীহ্গণ-এর কাছে ফাত্ওয়া বা ওয়াকি'আত রচনা করার ক্ষেত্রে অন্যান্য দলীল প্রমাণ ও কারণ সমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত না হওয়ায় কোন কোন ব্যাপারে তাঁরা মাযহাবের ইমামগণের থেকে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এ সকল আলিম ও ফকীহ্র ফাত্ওয়া বা ওয়াকি'আত সন্নিবেশিত ও সংকলিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ হলো ফকীহ্ আবূল লাইস নসর ইব্‌ন মুহাম্মদ সমরকন্দী হানাফী (র.) (মৃত্যু ঃ ৩৭৬) প্রণীত 'কিতাবুন নাওয়াযিল' (كتاب النوازل) গ্রন্থ। পরবর্তীতে হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম এ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থাবলী সংকলন করেছেন। যেমন নাতফী (র.) এবং বিখ্যাত ফকীহ্ সাদরুশ শহীদ (র.) (মৃত্যু ঃ ৫৩৬ হিজরী) প্রণীত 'মাজমাউন নাওয়াযিল ওয়াল ওয়াকি'আত' (مجمع النوازل و الواقعات) গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এবং মুতাআখ্খিরীন বা পরবর্তী যুগের শ্রেণী-বিন্যাস না করে মিশ্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম ফখরুদ্দীন হাসান ইব্‌ন মানসূর উরফে কাযীখান (র.) (মৃত্যু ঃ ৫৯২ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত 'ফাত্ওয়া-ই-কাযীখান' কিতাব এবং ইমাম তাহির ইব্‌ন আহ্মাদ (র.) (মৃত্যু ঃ ৫৪২) তাঁর বিখ্যাত ' খুলাসাতুল ফাতাওয়া' কিতাব বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ সকল মাস'আলাকে স্তর হিসেবে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন 'মুহীতুস্ সারাখ্সী' (محيط السرخسى) কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এ কিতাবের রচয়িতা তাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ সারাখ্সী (র.) (৬৭১ হিজরী)। প্রথমত মাসাইলে উসূল তারপর মাসাইলে নাওয়াদির এবং তারপর ফাত্ওয়া বর্ণনা করেছেন।

আবার কোন কোন সময় তিনি মাস'আলা সমূহকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো এই যে, তিনি ঐ গুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম প্রকার, যা যাহিরুল্ মাযহাবের মধ্যে উল্লেখ আছে। এর হুকুম হল, আলিমগণ এ সব মাস'আলা সকল অবস্থায় গ্রহণ করে থাকেন। চাই এগুলো উসূলের মোয়াফিক হউক বা মোখালিফ। দ্বিতীয় প্রকার, যা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর শাগরিদ আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট হতে স্বল্পই বর্ণিত হয়েছে, এর হুকুম হল আলিমগণ এগুলোকে উসূলের মোয়াফিক হলে

www.pathagar.com

গ্রহণ করে থাকেন অন্যথায় গ্রহন করেন না। তৃতীয় প্রকার, পরবর্তী আলিমগণের এমন সব সংকলিত মাস'আলা যার উপর সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর হুকুম হল, আলিমগণ সকল অবস্থায় এ সকল মাস'আলা দ্বারা ফাত্ওয়া দিয়ে থাকেন। চতুর্থ প্রকার, তাঁদের এমন সব সংকলিত মাস'আলা যার উপর উলামা-ই-জমহুর ঐকমত্য পোষণ করেন নি, এর হুকুম হল, এ সকল মাস'আলা দ্বারা ফাত্ওয়া দেওয়ার সময় মুফ্তী পূর্ববর্তী ইমামগণের উসূল বা নীতিমালা এবং দৃষ্টান্ত সমূহ সামনে রাখবেন। যদি এ মাস'আলাটিকে ঐগুলোর মোয়াফিক পান তবে তা গ্রহন করবেন অন্যথায় তা বর্জন করবেন।[১]

হানাফী মাযহাবের কিতাবের শ্রেণী বিন্যাস ও পরিচিতি

হানাফী মাযহাবের কিতাবের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা বাংলাদেশের প্রায় সকল মুসলমানই হানাফী মাযহাবের অনুসারী, এই কারণে ফাত্ওয়া ও মাসাইল গ্রন্থ রচনার নীতিমালায় বলা হয়েছে, এ গ্রন্থের মাস'আলা গুলোর উত্তর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী লেখা হবে। অতএব প্রত্যেকেরই হানাফী মাযহাবের কিতাবের শ্রেণী বিন্যাস জানা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, ফিকহে হানাফীর মূল উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ্। কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতিমালার আলোকে ফিকহ্ শাস্ত্র বিন্যস্ত হওয়ার পর হানাফী মাযহাবের যে সকল গ্রন্থাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সে সবগুলো মধ্যে নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহনযোগ্য কিতাব সমূহের মধ্যে প্রথম স্তরের কিতাব হল ইমাম মুহাম্মদ (র.) (জন্ম ঃ ১৩২, মৃত্যু ঃ ১৮৯ হিজরী) রচিত গ্রন্থাবলী।

১. 'আল-মাবসূত' (المبسوط) এ কিতাবখানা 'আস্ল' (أصل) নামে খ্যাত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর রচনাবলীর মধ্যে ইহাই সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এতে তিনি এমন হাজার হাজার মাস'আলা সন্নিবেশিত করেছেন, যে গুলো সম্পর্কে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে স্বয়ং ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এর ভিতর কোন কোন মাস'আলা যাতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অধিকাংশ মাস'আলা ইমাম আবূ (র.) একটি পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত করেছেন যাতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ লাইলার (র.) মধ্যকার মতভেদের উল্লেখ রয়েছে। এ কিতাবের রাবী ইমাম আহমাদ ইব্ন হাফস (র.) এতে কোন কিয়াসী আহ্কাম নেই।

২. 'আল-জামিউস সাগীর' (الجامع الصغير)। এ গ্রন্থে ফিক্হী মাস'আলার চল্লিশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ গ্রহের প্রথম ভাগ 'কিতাবুস্ সালাত'

১.উমাহ্দাতুর রিআয়াহ, মুকাদ্দামাতু শারহে বিকায়াহ, ৯ পৃষ্ঠা; রাদ্দুল মুহতার (শামী); কাওয়াইদুল ফিকহ্,; আদাবুল মুফ্তী; কাশফুল যুনূন । ১খণ্ড ও ২য় খণ্ড বিভিন্ন পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

(كتاب الصلوة) এবং শেষ ভাগে 'কিবাবুল ওয়াসায়া ওয়াল মুতাফাররিকাত' (كتاب الوصايا و المتفرقات) ওয়াসীয়াত এবং বিবিধ মাস'আলা বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ গ্রন্থে শুধু মাস'আলাসমূহের বর্ণনা করেছেন। এতে কোন দলীল বা যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ করেন নি। এ গ্রন্থখানা ঈশা ইব্ন আবান (র.) এবং মুহাম্মদ ইব্ন সামা'আহ্ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এ গ্রন্থ মিসরে ছাপা হয়েছে। মাওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গী মহল্লী (র.) -এর লিখিত টিকা সহকারে ইহা ভারত বর্ষে ছাপা হয়েছে।

৩. 'আল-জামিউল কাবীর' (الجامع الكبير)। এ কিতাবখানা ঠিক 'জামিউস্ সাগীরের' মতই। তবে এতে মাস'আলাসমূহ খুব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪. 'আস্-সিয়ারুস্ সাগীর' (السير الصغير)। এ কিতাবখানায় জিহাদ, প্রশাসন, পৌরনীতি ও রাজনীতির মাস'আলা সমূহের সমাধান দেওয়া হয়েছে।

৫. 'আস্ সিয়ারুল কাবীর' (السير الكبير) এ কিতাব খানার বিষয়বস্তু সিয়ারুস সাগীরের মতই। তবে এর পরিসর অনেক বড় এবং এতে মাস'আলা অনেক বেশী। এ কিতাবখানা ইমাম সারাখ্সী (র.) -এর ব্যাখ্যা সহকারে হায়দরাবাদে ছাপা হয়েছে।

৬. 'আয্-যিয়াদাত' (الزيادات)। এ কিতাবে আসল অর্থাৎ মাবসূতের মাস'আলার উপর অতিরিক্ত মাস'আলা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের রাবী ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাফস (র.)।

উল্লেখিত ছয়খানা কিতাবকে 'যাহিরুর রিওয়ায়েত' (ظاهر الروايات) বলা হয়। এর পরের স্তরের গ্রন্থ হল 'কুতুবুন নাওয়াদির' (كتب النوادر) অর্থাৎ উল্লিখিত ছয়খানা যাহিরুল রিওয়ায়াত কিতাব ছাড়া অন্যান্য যে সব কিতাব ইমাম মুহাম্মদ (র.) লিখেছেন বা যে গুলোর লিখার ব্যাপারটি তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে; সে সব গ্রন্থকে 'কুতুবুন নাওয়াদির' বলা হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকখানা নাওয়াদির গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচিতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. 'কিতাবুল-আমালী' (كتاب الأمالى)। এ কিতাবখানা ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ও 'কিতাবুল আমালী' নামক একখানা গ্রন্থ রয়েছে।

২. 'কিতাবুর রাক্কিয়াত' (كتاب الرقيات) এ গ্রন্থখানা ইমাম মুহাম্মদ (র.) রিক্কা শহরের কাযী থাকাকালে রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

৩. 'কিতাবুল কাইসানীয়াত' (كتاب الكيسانيات) । এ কিতাবখানা ইমাম মুহাম্মদ (র.) জনৈক কাইসান নামক ব্যক্তির উদ্দেশ্য রচনা করেছেন।

৪. 'কিতাবুল হারুনিয়াত' (كتاب الهارونيات)। এ গ্রন্থখানা ইমাম মুহাম্মদ (র.) খলীফা হারুন-অর-রশীদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন।

৫. 'কিতাবুল জুরজানীয়াত' (كتاب الجرجانيات)। এ গ্রন্থখানাও ইমাম মুহাম্মদ (র.) জুরজান শহরে অবস্থানকালে সংকলন করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান শাইবানী (র.) ইরাকের ওয়াসিত শহরে হিজরী ১৩২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফা শহরে লালিত পালিত হন এবং বাল্যকালেই লেখা-পড়া শুরু করেন। তিনি প্রথমে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন বাগদাদে খলীফা মানসূরের কারাগারে ছিলেন। তখন তাঁর কাছে ফিকহ্ শিক্ষা শুরু করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর ইন্তিকালের পর তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কাছে ফিকহ্‌শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তিনি মদীনাশরীফে গিয়ে ইমাম মালিক (র.) -এর কাছে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) অত্যন্ত মেধাবী, প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ ছিলেন। মাস'আলার বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) সময়ই তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, মাস'আলার ব্যাপারে দলে দলে লোক তাঁর শরণাপন্ন হত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাবের শিক্ষা ধারা বেশীর ভাগই ইমাম মুহাম্মদ (র.)এর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। হারুন-অর-রশীদের রাজত্ব কালে তিনি কাযীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৬. 'নাওয়াদিরে ইব্‌ন সামা'আহ্' (نوادر ابن سماعة) । এ গ্রন্থখানা ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন সামা'আহ্ (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ১৩০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২৩৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭. 'নাওয়াদিরে ইব্‌ন রুস্তম' (نوادر ابن رستم)। এ গ্রন্থখানা ফকীহ্ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন রুস্তম (র.) রচনা করেছেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট থেকে ফিকহ্ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম মালিক (র.) -এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একাধিকবার বাগদাদ আগমন করেন। তাঁর কাছ থেকে ইমাম আহ্‌মাদ (র.) হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট হতে 'নাওয়াদির কিতাব' রচনা করেন। তিনি হিজরী ২১১ সালে নিশাপূরে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অন্যান্য কিতাব ও কিতাব রচনাকারীর সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১.'কিতাবুল আমালী'(كتاب الأمالى) ২. কিতাবুন্ নাওয়াদির (كتاب النوادر) ও ৩.'কিতাবুল খিরাজ'(كتاب الخراج)। এ গ্রন্থত্রয় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কর্তৃক রচিত।

ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম আনসারী (র.) হিজরী ১১৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবং এতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং তিনি প্রথমে ফকীহ্ ইব্ন আবূ লাইলার (র.) কাছে ফিকহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মজলিসে গিয়ে বসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ফিকহ্ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর শিক্ষা সহকারী হিসাবে পরিগণিত হন।

তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে কিতাব রচনা করেছেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মাস'আলা ও মতামত মুসলিম বিশ্বে প্রচার করেছেন। খলীফা মাহ্দীর খিলাফত কালে তিনি কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলীফা হারুন-অর-রশীদের শাসনকালে সমগ্র আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৪. 'আল মাবসূত' (المبسوط)। এ কিতাবখানা শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ সারাখ্সী (র.) রচনা করেছেন। তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ইন্তিকাল করেন।

৫.'আল-হিদায়াহ্'(الهداية)

৬.'আত্-তাজনীস'(التجنيس)

৭.'আল-মাযীদ'(المزيد)

৮. 'মানাসিকুল হাজ্জ' (مناسك الحج)। এ কিতাব চতুষ্টয় ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর মুরগীনানী (র.) রচনা করেছেন। তাঁর রচিত হিদায়া গ্রন্থখানি সর্বাধিক প্রচলিত ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ফিকহ্ গ্রন্থ। সুদীর্ঘ তের বছর ই'তিকাফ অবস্থায় তিনি এ কিতাব চতুষ্টয় ছাড়াও আরো অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি ৫৯৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৯. 'আল-মুহীত' (المحيط)। এ কিতাব খানাও শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ সারাখ্সী (র.) রচনা করেন। এ কিতাবখানা নয় খন্ডে বিভক্ত। তিনি হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

১০. 'আল-মাবসূত' (اَلمبسوط)। এ কিতাবখানা শামসুল আইম্মা আবদুল আযীয ইব্‌ন আহ্‌মাদ বুখারী হানাফী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হালওয়ানী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৪৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১১. 'আল-বাদায়েউস্ সানায়ে' (اَلبدَائع الصنَائع)। এ কিতাবখানা ফকীহ্ আবূ বকর ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ কাশানী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৫৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১২.'আল-আহ্‌কাম'(اَلأحكام)

১৩.'শারহুত তাহাভী'(شرح الطحَاوى)

১৪.'মুখ্‌তাসারুত তাহাভী'(مختصر الطحاوى)

১৫. শারহ্ মুখতাসারুত তাহাভী (شرح مختصر الطحَاوى)

এ কিতাব চারখানা বিখ্যাত ফকীহ্ আহমাদ ইব্‌ন আলী আবূ বকর রাযী আল-জাস্‌সাস (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৩০৫ সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩৭০ সনে ইন্তিকাল করেন।

১৬.'আল-যাখীরাহ' (اَلذخيرة)। এ কিতাব খানা ফকীহ্ আবূ বকর খাওয়াহির যাদাহ্ (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৪৭৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

১৭.'আদাবুল কাযী'(أداب القاضى)

১৮.'কিতাবুল ওয়াক্‌ফ'(كتَاب الوقف)

১৯.'শারহুল ওয়াকি'আত'(شرح الوَاقِعات)।

এ তিনটি কিতাব ফকীহ্ আহ্‌মাদ ইব্‌ন উমর আল্ খাস্‌সাফ (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ২৬১ সনে ইন্তিকাল করেন।

২০.'শারহ্ আদাবিল কাযী'(شَرح أدا ب القَاضى) এ কিতাবখানা হুস্‌সামুস শহীদ (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৪৮৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

২১.'উইনুল মাসাইল ওয়াল ওয়াকি'আত ওয়ান নাওয়াযিল'

(عيون المسائل والوَا قعَا ت والنوَازل)

২২.'খাযানাতুল আকমাল'(خَزانة الأكمل)। এ কিতাবদ্বয় ফকীহ্ আবুল লাইস (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৩৯৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

২৩.'খুলাসাতুল ফাত্ওয়া ওয়াল ওয়াকি'আত'(خُلاَصة الفتوى والوَاقعَات)।

এ কিতাবখানা ফকীহ্ শেখ তাহির ইব্‌ন আহ্‌মাদ (র.) রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

তিনি ৫৪০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

২৪.'তাতিম্মাতুল ফাতাওয়া'(تتمة الفتاوى) । এ কিতাব খানা ফকীহ্ আবুল মুআলী (র.) রচনা করেছেন।

২৫.'ফাতাওয়া কাযীখান'(فتاوى قاضيخان)

২৬.'আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা'(الفتاوى الكبرى) এ কিতাবদ্বয় ফখর উদ্দীন হাসান ইব্‌ন মানসূর উরফে কাযীখান (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৫৯২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

২৭.'ফাতাওয়া যাহীর উদ্দীন'(فتاوى ظهيرالدين) । এ কিতাবখানা ফকীহ্ যাহীরুদ্দীন (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৬১৯ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

২৮.'আল-কুনীয়া'(القنية) এ কিতাব খানা ফকীহ্ যাহিদী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৬৮৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

২৯. কীলা-লা ওয়াল বুগ্ইয়া(قيل لا والبغية) । এ কিতাবখানা ফকীহ্ কাওনাবী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৭৭০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৩০.'আল-আজনাস'(الأجناس)

৩১.'আর-রাওযাহ্'(الروضة) ।এ কিতাব দ্বয় ফকীহ্ নাতিফী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৪৪৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৩২.'মুখ্তাসারুল কুদূরী'(مختصرالقدورى) । এ কিতাবখানা ইমাম আবূল হাসান ইব্‌ন আহ্মাদ কুদূরী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৩৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৩৩.'আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারাহ্'(الجوهرة النيرة) । কিতাব খানা মুখ্তাসারুল কুদূরী কিতাবের তিন খণ্ডে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ কিতাব খানা ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন আলী ওরফে হাদ্দাদী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৮০০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৪.' আল-আস্‌রার '(الأسرار) ।এ কিতাব খানা ফকীহ্ আবূ যাইদ (র.) রচনা করেছেন।

৩৫.'আল-মুখ্তার'(المختار) ।

৩৬. আল-মুখতারের ব্যাখ্যা 'আল্ ইখ্তিয়ার'(الاختيار شرح المختار) এ কিতাবদ্বয় ফকীহ্ আবূল ফয্ল মাওসিলী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৫৯৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮৩ হিজরী সানে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

৩৭.'কানযুদ্ দাকাইক'(كنزالدقائق)

৩৮.'আল-ওয়াফী'(ألوافى)

৩৯.'শারহুল ওয়াফী আল-কাফী'(شرح الوافى الكافى)। এ কিতাব তিন খানা ইমাম আবূল বারাকাত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ নাসাফী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৭১০ সনে ইন্তিকাল কারেন।

৪০.'তাবীনুল হাকাইক'(تبين الحقائق)।এ কিতাবখানা ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে অমূল্য সম্পদ কান্‌যুদ্ দাকাইকের ব্যাখ্যা কিতাব। ইমাম ফখরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ উসমান যাইলায়ী (র.) উহা রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৭৪৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪১.'মাজ্‌মাউল বাহ্‌রাইন ওয়া মুল্‌তাকান্ নাহরাইন'(مجمع البحرين وملتقى النهرين) এ কিতাবখানা ইমাম মুযাফ্‌ফর উদ্দীন আহ্মাদ ওরফে ইব্‌নুস্ সা'আতী বাদগাদী হানাফী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৬৯৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪২.'দুরারুল বিহার'(دررالبحار)। এ কিতাব খানা শায়খ শামস্ উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ কুনুবী হানাফী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৭৮৮ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৩. 'আল-বিকায়াহ্'(الوقاية)। এ কিতাবখানা বুরহানুশ্ শরী'আত মাহমূদ ইব্‌ন সাদরুশ্-শরী'আহ্ (১) (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৬৮০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৪.'মুখ্‌তাসারুন্ নিকায়াহ'(مختصرالنقاية)। এ কিতাব খানা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ সাদরুশ্ শরী'আহ্ (২) (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৭৪৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪৫.'আশ্ শুরুহুস্ সাবা'আতু লিল্ জামিয়িস্ সাগীর'(জামি' সাগীর গ্রন্থের সাতখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ) যা পৃথকভাবে সাতজন খ্যাতনামা ফকীহ্ রচনা করেছেন।

৪৬.'আন্ নাফিউ'(النافع)। ইহা কাসিম ইব্‌ন ইউসুফ(র.) রচনা করেন।

৪৭.'আল-মুল্‌তাকাতু শারহুল যিয়াদাত'(الملتقط شرح الزيادات)

৪৮.'মাওয়াহিবুর রাহমান'(مواهب الرحمن)

৪৯.'আল-বুরহান'(البرهان)। এ কিতাবগুলো ইব্‌রাহীম তারাবলুসী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৯২২ সনে ইন্তিকাল করেন।

৫০.'আল-ওয়াকি'আত'(الواقعات)। ইহা সাদরুশ্ শহীদ হুস্‌সামুদ্দীন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বুখারী হানাফী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৫৩৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

৫১.'গুনীয়াতুল ফুকাহা'(غنية الفقهاء)
৫২.'উমদাতুল মুফ্তী'(عمدة المفتى)
৫৩.'আত্ তাজরীদ'(التجريد)
৫৪.'আর্ রাওযাহ্'(الروضة)
৫৫.'মুখ্তারুল ফাতাওয়া'(مختار الفتا وى)।
৫৬.'ফাতাওয়া রাযী'(فتوى رازى)
৫৭.'আস- সিরাজিয়াহ্'(السراجية)।
৫৮.'কিতাবুল মানযুমাহ ফিল খিলাফিয়া'(كتاب المنظومة فى الخلافية)। এ কিতাবগুলো ফকীহ্ ও মুফ্তী উমর ইব্ন মুহাম্মদ আবূ হাফ্স নাসাফী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৪৬১ সনে নাস্ফ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৩৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।
৫৯.'আল-মি'রাজ'(المعراج)
৬০.'মুখ্তারাতুন্ নাওয়াযিল'(مختارات النوازل)
৬১.'ফাত্হুল কাদীর'(فتح القدير)। এ কিতাবগুলো ইমাম কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ উরফে ইব্ন হুমাম (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৮৬১ সনে ইন্তিকাল করেন।
৬২.'নিহায়াতুল কিফায়াহ'(نهاية الكفاية)। এ কিতাবখানা তাজুশ্ শরী'আহ উমর ইব্ন সাদরুশ শারী'আহ্ (প্রথম) রচনা করেছেন। তিনি ৬৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
৬৩.'আল-ইনায়াহ' (العناية)। কিতাবখানা আকমাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ বাবরতী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৭৮৬ সনে ইন্তিকাল করেন।
৬৪.'আল-বিনায়াহ'(البناية)। কিতাবখানা কাযী-বদরুদ্দীন মাহমূদ ইব্ন আহ্মাদ আইনী (র.) রচনা করেন। তিনি ৮৫৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
৬৫.'ফাতাওয়া রাস্তাগ্ফানী'(فتاوى رشتغفانى)। কিতাবখানা ইমাম আবুল হাসান আলী ইব্ন সা'আদ হানাফী (র.) রচনা করেন। তিনি ইমাম মাতুরীদির শাগরিদ ছিলেন।
৬৬.'ফাতাওয়া আসবীজাবী'(فتاوى اسبيجاوى) কিতাবখানা আবূ নসর আহ্মাদ ইব্ন মানসূর (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৫৩৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

৬৭.'ফাতাওয়া হুস্সাম উদ্দীন রাযী'(فتاوى حسام الدين رازى)। কিতাবখানা ইব্ন আবদুল আযীয (র.) রচনা করেন। তিনি ৫৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৬৮.'ফাতাওয়া আল-বায্যাযীয়াহ'(الفتاوى البزازية)। গ্রন্থখানা ইমাম হাফিয উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ উরফে ইব্ন বায্যায কারদারী (র.) রচনা করেন। তিনি হিজরী ৮২৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

৬৯.'ফাতাওয়া তাতারখানীয়া'(فتاوى تاتارخانية) গ্রন্থখানা ফকীহ্ আলিম ইব্ন আল-আনসারী দেহলবী (র.) রচনা করেন। তিনি হিজরী ৬৮৬ সনে ইন্তিকাল করেন।

৭০.'আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া'(الفتاوى الهندية)।

৭১.'দুরারুল বিহার'(دررالبحار)। এ দু-খানা কিতাব শায়াখ শামস্ উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ কুনূবী (র.) রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৭৮৮ সনে ইন্তিকাল করেছেন।

৭৪.'আদ্-দুর্রুল মুখ্তার'(الدر المختار) কিতাবখানা হাস্কাফী (র.) রচনা করেন। তিনি ১০৮৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৭৩.'হাশীয়াতুদ্ দুরার'(حاشية الدرر) কিতাবখানা আল্লামা তাহ্তাবী (র.) রচনা করেছেন।

৭৪.'রাদ্দুল মুহ্তার'(ردالمحتار) কিতাবখানা আল্লামা ইব্নুল আবিদীন (র.) রচনা করেছেন।

৭৫.'আত্-তাহরীরুল মুখ্তার'(التحرير المختار)

৭৬.'আদ্- দুরারু শারহিল গুরার'(الدرر شرح الغرر)

৭৭.'আদ্-দুরারু মুন্তাকা'(الدرر المنتقى)

৭৮.'মাজমাউল আন্হুর'(مجمع الأنهر)

৭৯.'আল-আশ্বাহ ওয়ান্ নাযাইর'(الأشباه والنظائر)।

গ্রন্থখানা আল্লামা যাইনুল আবিদীন ইব্ন নুজাইম মিস্রী (র.) রচনা করেন। তিনি হিজরী ৯৭০ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮০. আল-বাহ্রুর রাইক (البحرالرائق)। কিতাবখানা ফিক্হ শাস্ত্রের অমূল্য কিতাব কানযুদ্ দাকাইকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ শরাহ্ কিতাবখানা আল্লামা যাইনুল আবিদীন ইব্ন নুজাইম মিস্রী (র.) রচনা করেছেন। তিনি ৯৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

৮১.'তান্‌কীহুল হামিদীয়া'(تنقيح الحامدية) ।

৮২.'ফাতাওয়া-ই-খাইরিয়াহ্'(الفتاوى الخيرية) । এ কিতাবখানা আল্লামা যাইনুদ্দীন ইব্‌ন আহ্‌মাদ হানাফী (র.) রচনা করেন। তিনি হিজরী ১০৮১ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮৩.'মারাকিল ফালাহ্'(مراقى الفلاح)। ইহা হাসান ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন আলী শারান্‌বুলালী (র.) রচনা করেন। তিনি হিজরী ১০৬৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮৪.'শারহুল বিকায়াহ'(شرح الوقاية)। কিতাবখানা উবায়দুল্লাহ্ সাদ্‌রুশ্ শরী'আহ্ (র.) রচনা করেন। তিনি ৭৪৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮৫.'উম্‌দাতুল্ হুক্‌কাম'(عمدة الحكام)। কিতাবখানা কাযী নাযম উদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলী তারসূরী হানাফী (র.) রচনা করেন। তিনি ৭৮৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮৬.'নূরুল ইযাহ্'(نور الإيضاح)। কিতাবখানা হাসান ইব্‌ন আয়ায ইব্‌ন আলী শারান্‌বুলালী (র.) রচনা করেন। তিনি হিজরী ১০৬৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

৮৭.'মুনীয়াতুল মুসাল্লী'(منية المصلى)। এ কিতাবখানা সা'দ উদ্দীন আল-কাশ্‌গরী (র.) রচনা করেন। তিনি ৯৫৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৮৮.'জামিউল ফুসূলাইন'(جامع الفصولين) কিতাবখানা শায়খ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ (র.) রচনা করেন। তিনি ৮২৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করে। ইত্যাদি।[১]

১.'الفوائد البهية' কিতাবের বিভিন্ন পৃষ্ঠা ; 'كشف الظنون' কিতাবের ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ডের বিভিন্ন পৃষ্ঠা এবং 'قواعد الفقه'-এর বিভিন্ন পৃষ্ঠা থেকে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

১০

ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের মতপার্থক্য

মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের পরিচিতি

হানাফী ফকীহ্গণের মধ্যে যাঁরা ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর সাক্ষাত লাভ করেছেন তাঁদেরকে'মুতাকাদ্দিমূন'বলা হয়, আর যাঁরা তাঁদের সাক্ষাত লাভ করেন নি তাঁদেরকে'মুতাআখ্খিরূন'বলা হয়। হানাফী ফিকহ্ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূন বলতে তাই বুঝানো হয়েছে।[১]

'জামিউল উলূম' নামক গ্রন্থে 'আল-খিয়ালাতুল্ লাতীকা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পর্যন্ত যত ইমাম আছেন তাঁরা হলেন 'সালাফ' আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.) পর্যন্ত যত ফকীহ্ আছেন তাঁরা হলেন 'খাল্ফ'। আর ইমাম হালওয়ায়ী (র.) হতে ইমাম হাফিযুদ্দীন বুখারী (র.) পর্যন্ত যত ফকীহ্ আছেন তাঁরা হলেন মুতাআখ্খিরূন।

আল্লামা আবদুল হাই লাখ্নৌবী (র.) এ অভিমত সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে বলেন, এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ফকীহ্গণ অনেক সময় ইমাম হালওয়ায়ী (র.) -এর পূর্বেকার ফকীহ্গণকে ও মুতাআখ্খিরূন বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। হেদায়া গ্রন্থের 'সাওম' অধ্যায় পাগলের সাওম কাযা করা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে বলা হয়েছে"এটা কোন কোন মুতাআখ্খিরূনের গৃহীত অভিমত।"

এ প্রসংগে 'ইনায়া' গ্রন্থে বলা হয় ঐ সব মুতাআখ্খিরূনের কয়েকজন হলেন, ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ আল-জুরজানী, ইমাম আররুস্তুগফানী এবং ইমাম যাহিদ আস্-সাফ্ফা প্রমুখ। উল্লেখ্য, ইমাম জুরজানী ও ইমাম হালওয়ায়ী (র.) পূর্বেকার লোক। ইমাম হাওয়ায়ীর মৃত্যু হয় ৪৫২ কিংবা ৪৪৮ হিজরী সনে। অপর দিকে ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল্-জুরজানী (র.)-এর মৃত্যু হয় ৩৯৭ হিজরী কিংবা ৩৯৮ হিজরী সনে।

অনুরূপভাবে ইমাম আররুস্ত গ্ফানীও (র.) ইমাম হালওয়ায়ী (র.) -এর পূর্বের লোক।

১. কাওয়াইদুল ফিকহ্, পৃষ্ঠা ৪৩৬ ও মুকাদ্দিমা শারহিল বিকায়া, পৃষ্ঠা ১৫।

www.pathagar.com

কারণ ইমাম রুস্তগ্ফানী হলেন, ইমাম আবূ মান্সূর মাতুরীদীর (র.) -এর ছাত্র। মাতুরীদী (র.) -এর মৃত্যু হয় ৩৩৩ হিজরী সনে। সুতরাং তাঁর ছাত্রের মৃত্যু ইমাম হালওয়ায়ীর (র.) -এর পরে হওয়াই স্বাভাবিক।

আল্লামা যাহাবী (র.) 'মীযানুল্ ইতিদাল' নামক গ্রন্থের প্রথম দিকে উল্লেখ করেন যে, মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের মধ্যে সীমারেখা হল, তিনশ' হিজরী সনের সূচনা কাল।[১]

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ 'ফিকহ্ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ' নামক গ্রন্থে বলেন, মুতাআখ্খিরূন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. আকাবীরে মুতাআখ্খিরূন, ২. মুতাআখ্খিরূন।

ইমাম আবূ বকর খাস্সাফ (র.), ইমাম কারখী (র.), ইমাম হালওয়ারী (র.), ইমাম সারাখ্সী (র.), ইমাম তাহাবী (র.), কাযীখান (র.) ও তাঁদের সম-সাময়িক ফকীহ্গণ আকাবীরে মুতাআখখিরূন এবং তৎপরবর্তী সকলেই মুতাআখ্রিূন শ্রেণীভুক্ত।

মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের মতপার্থক্যের কারণ

হানাফী মুতাআখ্খিরূন ফকীহ্গণ যদিও হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক নির্ধারিত উসূল এবং মুতাকাদ্দিমূনের তারীকানুযায়ী ইজ্তিহাদ, ইসতিম্বাত, তাখ্রীজ ও তারজীহ্ প্রভৃতি কারণগুলো সমাধা করেছেন। তথাপি নানাবিধ কারণে বিভিন্ন মাসয়ালায় মুতাকাদ্দিমূনের সাথে তাঁদের ইখ্তিলাফ হয়েছে। সে সব কারণে তাঁদের মধ্যে ইখ্তিলাফ হয়েছে নিম্নে তাঁর কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল।

১. উরফ -এর পরিবর্তন

'উরফ্' হল সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, মানুষের আচার-আচরণ। মুতাকাদ্দিমূন ফকীহ্গণ যে সব মাস্য়ালায় তাঁদের যুগের উপর তথা সমাজিক প্রথা, রীতিনীতি এবং মানুষের আচার-আচরণের উপর ভিত্তি করে হুকুম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সময় কালের বিবর্তনের ফলে সে'উরফ'তথা সামাজিক প্রথা, আচার-আচরণ রীতিনীতির পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন মুতাআখখিরূন ফকীহ্গণ শরী'আতের মূল উদ্দেশ্য বজায় রেখে যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে ভিন্ন হুকুম দেন। ফলে মুতাকদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূন ফহীহ্গণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এ প্রসংগে তাঁদের দাবী হল, মুতাকাদ্দিমূন এমন কি স্বয়ং মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবূ হানীফাও (র.) যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে, এ অবস্থায় তিনিও এ হুকুমই দিতেন যা মুতাআখ্খিরূন দিয়েছেন।

এর একটি উদাহরণ হল, কুরআন শিক্ষা দিয়ে ও দীনী তা'লীম প্রদান করে এবং ইমামতী ও মুয়াযযেনী করে পারিশ্রমিক নেওয়া। মুতাকদ্দিমূনের অভিমত ছিল, এসব ইবাদত বন্দেগীর কাজ করে পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে না। কিন্তু মুতাআখ্খিরূন এসব কাজ করে পারিশ্রমিক

১. মুকাদ্দিমা শারহিল বিকায়া, পৃষ্ঠা ১৫।

www.pathagar.com

নেওয়া যাবে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন। কারণ মুতাকাদ্দিমূনের যুগে এসব কাজে যাঁরা নিয়োজিত থাকতেন তাঁদের সরকারী ভাতা প্রদান করা হত। তাঁরা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসহারা পেতেন। এরপর সরকারী ভাতা ও মাসহারা বন্ধ হযে যায়। এমতাবস্থায় পারিশ্রমিক ছাড়া এ সব কাজ আঞ্জাম দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর যদি এসব পেশায় নিয়োজিত লোকেরা অন্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে তাহলে কুরআনী তা'লীম ও দীনী শিক্ষা বন্ধ হয় পড়বে, মসজিদগুলোত দীনের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আযান ও জামায়াত কায়েমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তাই এ রকম অবস্থায় যরূরতের ভিত্তিতে মুতাআখ্খিরূন ফকীহ্গণ এসব কাজে বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহন করা যাবে বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। কারণ পারিশ্রমিক না পেলে এসব পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ পরিবার পরিজন ও সংসার পরিচালনার ব্যাপারে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ফলে তাঁরা দীনী তা'লীম তারবিয়াতের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন।[১]

এ বিষয়ে আর একটি উদাহরণ হল, মুতাকাদ্দিমূন যাহেরী আদালতের (শরী'আতের দৃষ্টিতে সাক্ষ্যদান যোগ্য) উপর নির্ভর করে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বিচার করা জায়িয বলে হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু মুতাআখ্খিরূন ফকীহ্গণ উক্ত মতের বিপরিত হুকুম দেন। কারণ, মুতাআখ্খিরূনের যুগে মানুষের চরিত্র পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন মানুষের মধ্যে মিথ্যা প্রচারণা ধোঁকাবাজী সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক শ্রেণীর ধোঁকাবাজ লেবাস-পোষাকে ভাল মানুষ সেজে প্রতারণা করতে থাকে। এ অবস্থায় তাঁরা মনে করেন পূর্বের হুকুম বহাল (থাকলে) এসব দুষ্ট লোকদের কারণে জনগণের জান-মাল প্রভৃতির নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সুতরাং তাঁরা পূর্বের হুকুমের বিপরীতে নতুন হুকুম দেন।[২]

এর আর একটি উদাহরণ হল মুতাকাদ্দিমূনের অভিমত ছিল, ওয়াকফের ঘর বাড়ী এক বছরের অধিক এবং চাষাবাদের জমি তিন বছরে অধিক ইজারা দেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ইজারা দানের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেননি। কিন্তু মুতাআখ্খিরূন তাঁদের যুগে মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে ওয়াকফের বাড়ীঘর এক বছরের অধিক আর চাষাবাদের জায়গা জমি তিন বছরের অধিক ইজারা দেওয়া যাবে না বলে ফাত্ওয়া দেন।[৩]

এর আরও একটি উদাহরণ হল, মুতাকাদ্দিমূন ফকীহ্গণ ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ককে ইয়াতীমের মাল নিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মুতাআখ্খিরূন তাঁদের যুগে মুদারাবার নামে ইয়াতীমের মাল অবৈধভাবে গ্রাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করে ইয়াতীমের মাল দিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়কগণ ব্যবসা করতে পারবে না বলে ফাতওয়া দেন।[৪]

১. রাদ্দুল মুহ্তার, পৃষ্ঠা ৬৫৫-৫৬ ; শারহু উকূদি রাসমুল মুফ্তী, পৃষ্ঠা ৩৭ ও শারীয়াতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩১।
২. শারীয়াতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩০ ; উসূলুত্ তাশরী'আল- ইসলামী, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫ ; রাসমুল মুফ্তী, পৃষ্ঠা ৩৭। ৩. রাসমুল মুফ্তী, পৃষ্ঠা ৩৭ ও শারীয়াতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩২। ৪. রাসমুল মুফ্তী, পৃষ্ঠা ৩৭ ও শারীয়াতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৩৩।

www.pathagar.com

২. হাদীস সংক্রান্ত কারণ

যে সব কারণে মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্খিরূনের মধ্যে মতপার্থক্য হয় তার মধ্যে আর একটি কারণ হল, হাদীস সংক্রান্ত।

হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন কারণেই মত পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন, মুতাকাদ্দিমূনের কাছে হাদীস না পৌছার কারণে তাঁরা কিয়াস করে বা অন্যভাবে এক রকম হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে মুতাআখ্খিরূনের কাছে হাদীস পৌছলে তাঁরা সে ব্যাপারে ভিন্ন হুকুম দেন। অথবা মুতাকাদ্দিমূনের কাছে হাদীস পৌছেছে কিন্তু সহীহ্ সনদে পৌছেনি। তাই তাঁরা হাদীসটি গ্রহন না করে কিয়াস বা সাধারণ নীতির ভিত্তিতে বা অন্য কোন হাদীসের আলোকে এক রকম হুকুম দেন। পরে ঠিক ঐ হাদীসটি মুতাআখ্খিরূনের কাছে সহীহ্ সনদে পৌছলে তাঁরা তা গ্রহন করে ভিন্ন হুকুম দেন। কিংবা হাদীসটি মুতাকাদ্দিমূনের কাছে সহীহ্ সনদেই পৌছে ছিল। কিন্তু তাঁরা কোন বিশেষ কারণে হাদীসটি গ্রহন না করে অন্য হাদীসের ভিত্তিতে কিংবা কুরআনের মুত্লাক আয়াতের আলোকে এক রকম হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু যে কারণে মুতাকাদ্দিমূন হাদীসটি বাদ দিয়ে ছিলেন মুতাআখ্খিরূনের কাছে তা যুক্তিগ্রাহ্য না হওয়ায় তাঁরা হাদীসটি গ্রহণ করে ভিন্ন হুকুম দেন। অথবা হাদীসটি মুতাকাদ্দিমূনের কাছে সহীহ্ সনদে পৌছে। এরপর তাঁরা তার এক রকম অর্থ করে হুকুম দেন। কিন্তু মুতাআখ্খিরূন তার অন্য অর্থ গ্রহন করে অন্য রকম হুকুম দেন।

এ ছাড়া আরো অনেক কারণেই হাদীস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মুতাকাদ্দিমূন ও মাতাআখ্খিরূনের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়ার ফলে বিভিন্ন মাস্য়ালার হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

১. জামা'আতে নামায আদায় করা সম্বন্ধে মুতাকাদ্দিমূনের অভিমত হল জমা'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ

জামা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মুনাফিক ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে অবহেলা বশত পিছনে পড়ে থাকে না।

অপর দিকে আল্লামা ইব্ন নুজাইম, শেখ আলা উদ্দীন কাসানী এবং আল্লামা ইব্ন হুমাম (র.) মত আরো অনেকের অভিমত হল, জামা'আত ওয়াজিব। এ প্রসংগে মুতাকাদ্দিমূন যে হাদীসকে সুন্নাতের দলিল হিসাবে পেশ করেছেন মুতাআখ্খিরূন ঠিক সে হাদীসকেই ওয়াজিব দলীল হিসাবে গ্রহন করেছেন। হিদায়া প্রণেতার দলীল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা ইব্ন হুমাম (র.) বলেন,

www.pathagar.com

لايطابق دليله الذى فكره الدعوى إذ تقضاه الوجوب إلا لعذر الا ان يريد يثبوتها بالسنة ۰

জামা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ হবার দলীল হিসাবে (হিদায়া প্রণেতা) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা দাবীর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ হাদীসের দাবী হল জামা'আত ওয়াজিব হওয়া। অবশ্য ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। তবে সুন্নাত বলতে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বুঝানো হলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।[১]

২. জানাযার নামাযে কিরাআত হিসাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে হানাফী মুতাকাদ্দিমূন ফকীগণের অভিমত হল কিরাআত হিসাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে না। আর দু'আ হিসাবে কেউ পাঠ করতে চাইলে তা পাঠ করতে পারে। এ প্রসংগে (হেদায়) গ্রন্থে বলা হয়েছে কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছিলেন তেমন কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدُّعاء

যখন তোমরা মৃতের জানাযার নামায আদায় করবে তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে। (আবূ দাঊদ)

এ হাদীসে কেবল দু'আর কথাই বলা হয়েছে কিরাআতের কথা বলা হয়নি।[২]

অপর দিকে মুতাআখখিরূনের মধ্যে আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) ও শেখ শারান্‌বুলানী (র.) এবং শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ (র.) বলেন, প্রথমে তাকবীরের পর সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে হবে। আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) বলেন -এর কারণ হল -

هو الأقوى دَليلا وهو الذِى اختَاره الشربنلانى من أصحابنا وألف فيه رِسالة .

কারণ সূরা ফাতিহা পাঠ করাই দলীলের দিক দিয়ে শক্তিশালী। আর এটাই আল্লামা শারান্‌বুলানী (র.) -এর অভিমত, তিনি এ বিষয়ে একখানা কিতাবও রচনা করেছেন।"[৩]

এ প্রসংগে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর (র.) উক্তি হল,

وَمِن السُّنة قِرأة فَاتحة الكِتَاب لأنها خَير الأدعِية وأجملها علمها الله تعالى عباده فى مُحكم كتابه ۰

---

১. ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা। ২. ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৫ ও শারহি বিকায়া, ১ম খণ্ড।
৩. হাশিয়ায়ে শারহি বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭।

www.pathagar.com

(জানাযার নামাযে) সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ তা হচ্ছে সর্বোত্তম ও ব্যাপক দু'আ আল্লাহ্ এ দু'আটি স্বীয় মুহ্কাম কিতাবে (আল-কুরআন) নিজের বান্দাদের শিক্ষা দিয়েছেন।[১]

তাঁরা তাঁদের অভিমতের পক্ষে নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো পেশ করেন -

عن أبى أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه، ثم يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم و يخلص الدعاء فى الجنازة فى التكبيرات و لايقرأ فى شئ منهن . ثم يسلم سرا فى نفسه . قال فى الفتح إسناده صحيح .

হযরত আবূ উমামা ইব্ন সাহাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে নবী (সা.) -এর জনৈক সাহাবী এ খবর দিয়েছেন যে, জানাযার নামাযের সুন্নাত হল, ইমাম প্রথমে তাকবীর বলবে এরপর অনুচ্চ স্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অতঃপর নবী (সা.) -এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে। জানাযার নামাযে তাক্বীর সমূহের পরে নিষ্ঠার সাথে দু'আগুলো পাঠ করবে। এ গুলোতে কোন কিরাআত পাঠ করতে হবে না। তারপর নিজের মনে মনে সালাম দিবে। ফাতহুল বারীতে এ হাদীস সম্বন্ধে বলা হয়েছে হাদীসটির সনদ সহীহ্।[২]

হযরত তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, একবার ইব্ন আব্বাসের (র.) সাথে আমি জানাযার নামায আদায় করলাম তখন তিনি এতে ফাতিহা পাঠ করলেন এবং বললেন, এটা পাঠ করা সুন্নাত।[৩]

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বর্ণনা দু'টিতে বর্ণনাকারীদের 'من السنة' (সুন্নাহ্ থেকে) কথা থেকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত বুঝানো হয়েছে। তাই তাঁদের মতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

৩. পানিতে নাপাকী পড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে মুতাকাদ্দিমূনের অভিমত হল নাপাকী বেশী হোক কিংবা কম হোক পানি নাপাক হয়ে যাবে। সুতরাং সে পানি দ্বারা অযূ গোসল করা যাবে না। তাঁরা দু'টি হাদীসের ভিত্তিতে এ অভিমত প্রদান করেছেন। হাদীস দু'টি হল ঃ

---

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩৭
২. ফিকহুস সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৩।
৩. বুখারী ও তিরমিযী।

www.pathagar.com

لَايبولن أحدكم فى الْمَاء الدائم ولاَ يغتسل فيه مِن الجنابة .

তোমরা কেউ আবদ্ধ পানিতে পেশাব করবে না আর না তাতে জানাবতের গোসল করবে। অপর হাদীসটি হল ঃ

إذا استيقظ أحدكم من نومه ولا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلث مرات فان أحدكم لَايدرى أين باتت يده .

তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে তিনবার হাত না ধোয়া পর্যন্ত তা পানিতে পাত্রে ঢুকিয়ে দিবে না, কারণ সে জানে না তার হাত কোথায় রাত যাপন করেছে (আবূ দাউদ)।

অপর দিকে বিখ্যাত হানাফী ফকীহ্ শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ (র.) -এর মতে মুতাকাদ্দিমূন এ হুকুম দিয়ে ছিলেন এ কারণে যে, তাঁদের কাছে

إذا بلغ الماء قلتين لَم يحمل الخبث أولَم ينجسه شئ .

পানি যখন দু'কুল্লার সমপরিমাণ হবে তখন তাকে কোন জিনিস না পাক করতে পারবে না।[১] এ হাদীসটি পৌছিনি। তাঁর ভাষায়ঃ

فلم يظهرا الحديث فى عصر سعيد بن المسيب و لاَ فى عصر الزهرى و لم يمش عليه المالكية ولا الحنفية و لم يعملوا به وعمل به الشافعى.

এ হাদীসটি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব ও যুহ্রীর যুগে প্রকাশিত হয়নি। মালেকী এবং হানাফী ফকীহ্গণ তা গ্রহন করেন নি এবং সে মতে আমলও করেন নি। অবশ্য ইমাম শাফি'য়ী (র.) সে মতে আমল করেছেন।[২]

অতএব তাঁর মতে পানি দু'কুল্লার সমপরিমাণ হলে তাতে নাপাকী পড়লেও তার গুণাগুণ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তা নাপাক হবে না। সুতরাং তার দ্বারা অযূ গোসল করা যাবে। তিনি অন্যত্র কুল্লাতাইন সম্পার্কীয় হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

وحديث القلتين إثبت من ذلك كله بغير شبهة .

কুল্লাতাইনের হাদীস এ সবের তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক বেশী শক্তিশালী।[৩]

৪. মুতাকাদ্দিমূন এর মতে জুমু'আর দিন ইমাম নামায্ আদায় করানোর জন্য বের হবার পর খুত্বা শেষ না করা পর্যন্ত কোন রকমের নফল নামায আদায় করা কিংবা কথা বলা নিষেধ।[৪]

১. আবূ দাউদ। ২. হুজ্জতুল্লাহিল বালিগাহ্, ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৩০২ : আল-ইনসাফ ফী আস্বাবিল ইখ্তিলাফ, পৃষ্ঠা ৪৩ : আস্বাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃষ্ঠা ৯৭। ৩. হুজ্জতুল্লাহিল বালিগাহ্, পৃষ্ঠা ৮৫। ৪. শরহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১।

www.pathagar.com

তাঁরা তাঁদের এ অভিমতের পক্ষে বিভিন্ন দলীল পেশ করেছেন। তবে তাঁরা এ অভিমতের পরিপন্থী নিম্নবর্ণিত হাদীসটি গ্রহন করেন নি।

عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل و النبى صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال . لا ، قال قم فاركع .

জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে আসলেন। তখন নবী (সা.) লোকদের উদ্দেশ্যে মসজিদে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে অমুক! তুমি কি কোন নামায আদায় করেছ লোকটি বলল, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, উঠ, নামায আদায় করে নাও।[১] (বুখারী)

অপর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন,

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ليتجوز ويسما فيهما .

তোমাদের কেউ জুম্'আর দিন ইমাম খুত্‌বা দেয়ার সময় মস্‌জিদে আস্‌লে দু'রাক'আত নামায আদায় করে নিবে এবং তাতে সংক্ষিপ্ত করবে (মুসলিম)।

উল্লেখ্য যে, মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্‌খিরূন ফকীহ্‌গণের মধ্যে হাদীস সম্পর্কীত কারণে যে মত পার্থক্য হয়েছে তারই একটি উদাহারণ স্বরূপ এখানে এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে। এ মাসয়ালার হুকুম যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

অপর দিকে মুতাআখ্‌কিরূন ফকীহ্‌গণের মধ্য হতে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.) এ হাদীস দু'টি গ্রহন করে বলেন,

فإذا جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين و ليتجوز فيهما رعاية لسنة الراتبة و أدب الخطبة جميعا بقدر الإمكان . ولايغتر فى هذه المسئلة بما يلهج به أهل بلدله . فان الحديث صحيح واجب إتباعه.

ইমাম খুত্‌বার দেওয়ার সময় কেউ (মসজিদে) আসলে সে দু' রাক'আত নামায আদায় করে নিবে, এবং তাতে সুন্নাহ্ ও জুমু'আর খুত্‌বার আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে সংক্ষেপ করবে।

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯। ২. হীলাতুননাজিযাহ্ ফীল হালীলাতিল অজিযাহ্।

www.pathagar.com

এ মাসয়ালায় তোমাদের দেশীয় লোকদের কর্মকাণ্ড দ্বারা ধোঁকায় পড়বে না। কারণ এর স্বপক্ষের হাদীস সহীহ্ তার অনুসরণ করা ওয়াজিব।[১]

এ ছাড়া হাদীস সংক্রান্ত কারণে মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্‌খিরূনের মতপার্থক্যের আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যায়। ফিকহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহে এ রকম অনেক উদাহরণ বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রয়েছে।

৩. যরূরাতের ভিত্তিতে মতপার্থক্য হওয়া

মুতাআখ্‌খিরূন কর্তৃক যরূরাতের ভিত্তিতে মুতাকাদ্দিমূনের দেওয়া হুকুমের বিপরীত হুকুম দেন। এর উদাহরণ হল, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী সম্বন্ধে মুতাকাদ্দিমূনের ফাত্ওয়া হল, স্বামী কর্তৃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়া কিম্বা স্বামীর মৃত্যুর নির্ভরযোগ্য সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কারো মতে, তাকে সত্তর অথবা নব্বই বছর কিংবা স্বামীর সমবয়সীদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর সে অন্য স্বামী গ্রহন করতে পারবে।

মুতাকাদ্দিমূনের এ হুকুমের ফলে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর জীবন মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়, জীবন যৌবন এক কাল্পনিক লোকের আশায় ক্ষয় হতে থাকে। সে হয়তবা খোর- পোষের অভাবে ভিখারিণীর ন্যায় মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হতে পারে। সে সমাজে পরিত্যক্ত হিসাবে গন্য হতে থাকে। এ দুর্বিসহ কষ্ট হতে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে মুতাআখ্‌খিরূন ভিন্ন হুকুম দেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যরূরতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের হুকুম গ্রহন করে বলেন, বিচারকের আদালতে এ মুকাদ্দামা দায়ের হওয়ার পর বিচারক সব কিছু বিবেচনা করে তাকে চার বছর অপেক্ষা করার হুকুম দেবেন। ইত্যবসরে স্বামী ঘরে না আসলে চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করে ইচ্ছা করলে সে অন্য স্বামী গ্রহন করতে পারবে।[২]

৪. ভুল বুঝাবুঝির কারণে মতপার্থক্য

যে সব কারণে মুতাকাদ্দিমূন ও মুতাআখ্‌খিরূনের মধ্যে মতপার্থক্য হয়, তার মধ্যে আর একটি কারণ হল ভুল বুঝাবুঝি। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়, নামাযের তাশাহ্হুদ এ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

বলার সময় অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা মুতাকাদ্দিমূনের মতে সুন্নাত। অপর দিকে মুতাআখ্‌খিরূনের মধ্যে জাহীরিয়া, খোলাসা, বাযাযিয়া, তাতারখানিয়া, ইত্যাদি গ্রন্থের লেখকগণ বলেন, আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা সুন্নাত নয় বরং মাকরূহ। তাঁদের মধ্যে কাইসানী

১. উমদাতুর রিয়াআহ্ আলা শারহিল বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪।
২. রাদ্দুল মুহ্তার, পৃষ্ঠা ৬৫৬ ; রাসমুল মুফতী, পৃষ্ঠা ৬-৭।

www.pathagar.com

আরো একধাপ এগিয়ে বলেন, অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা হারাম। তাঁদের এ অভিমত ভুল প্রতিপন্ন করতে গিয়ে আল্লামা আবদুল হাই লাখ্নৌবী (র.) বলেন, "তাঁরা যা বলেছেন তার স্বপক্ষে তাঁদের কাছে কোন দলীল নেই। আর না তাঁদের কাছে রেওয়ায়ত বা দেরায়াতের কোন সনদ আছে। তা ছাড়া তাঁদের এ অভিমত সহীহ্ হাদীসের বিরোধী, আমাদের ইমামগণের অভিমতেরও পরিপন্থী। অতএব যে সকল মশায়েখ অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করাকে মাকরূহ বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন; তাঁদের অনুসরণ করা নবী করীম (সা.) আমল এবং ইমামগণের মতের পরিপন্থী।[১]

এর আর একটি উদাহরণ হল, মুতাকাদ্দিমূন ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন যে, কোন প্রকারের ইবাদত বন্দেগীর কাজ করে পারিশ্রমিক নেয়া যাবে না। তাঁরা যখন এ ফাত্ওয়া দেন তখন কুরআন শিক্ষা, দীনী তা'লীম, ইমামতী, মুয়ায্যেনী ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদেরকে সরকারী ভাতা দেওয়া হত। কিন্তু পরবর্তীকালে এসব ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। এ মতো অবস্থায় কুরআন তা'লীম, দীনী শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। মসজিদগুলোতে মুয়াযযিন ও ইমামের অভাবে নামায কায়েমের ব্যাপারে সংকট দেখা দেয়। সুতরাং 'শা'আইরে ইসলাম' (ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনা স্বরূপ বিধানসমূহ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুতাআখ্খিরূন কুরআন শিক্ষা, দীনী তা'লীম, মুয়ায্যেনী ও ইমামতী করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয বলে ফাত্ওয়া দেন।

কিন্তু 'সিরাজুল ওয়াহ্হাজ' ও 'জাওহারা' নাম গ্রন্থদ্বয়ের লেখকগণ কুরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক নেয়া যাবে বলে মত দেন। তাঁদের এ অভিমত এ কারণেই ভুল যে, মুতাআখ্খিরূন যরূরতের ভিত্তিতে উপরোক্ত কাজ করে পারিশ্রমিক নেওয়ার পক্ষে ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন। অন্যথায় কুরআন শিক্ষা ও দীনী তা'লীম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা এবং দীনের শায়াইর আযান ও জামা'আত কায়েমে ব্যাঘাত ঘটার আশংকা দেখা দিত। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের পারিশ্রমিক ইবাদত -এর আওতায় আসে না। তাই মুআখ্খিরূন এক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহন করা জায়িয বলে ফাত্ওয়া দেন ।[২]

ইমামগণের মতভেদ উম্মাতের জন্য রহমত

'ইমামগণের মতভেদ উম্মাতের জন্য রহমত' এ কথাটির উৎস লোকমুখে মাশ্হূর একটি হাদীস। সে হাদীসটি হল -"إختلاف امتى رحمة للناس" আমার উম্মাতের মতভেদ মানুষের জন্য রহমত। অপর এক বর্ণনায় বলা হয় ঃ"إختلاف اصحابى لكم رحمة" আমার সাহাবীদের মতভেদ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।

---

১. আস্-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯ ; আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা, পৃষ্ঠা ৩০-৩৫ ; শারীয়াতিল ইসলাম, ইলমুল মুআখ্খিরূন। ২. রাদ্দুল মুহ্তার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬।

www.pathagar.com

উল্লেখিত হাদীস দু'টি সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণের অভিমত নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

মুহাদ্দিসগণ উপরিউক্ত হাদীস দু'টির সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে 'জারাহ্ কাত্তা' করেছেন। সনদ সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত হল হাদীস দু'টি 'লা-আসল' – ভিত্তিহীন।

অবশ্য কেউ কেউ এ হাদীসটি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে মাওকূফ হিসাবে রেওয়ায়াত করেছেন। সে সনদ সহীহ্ নয়। মোদ্দাকথা, এটি লোক মুখে প্রচলীত মাশ্হুর হাদীস, যার কোন ভিত্তি নেই।

মতভেদের ক্ষেত্র ও প্রকার

১. শরী'আতের যে সব বিষয় 'قطعى الثبوت' ও 'قطعى الدلالة' অর্থাৎ অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে একক অর্থ দানকারী দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং বিষয়টির দীনের যরূরিয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

কারণ এর ফলে কুরআনের আয়াতও হাদীসে মুতাওয়াতিরকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং মৌলিক আকীদার বিষয় যথা- তাওহীদ, রিসালাত, আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের ব্যাপার, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়া সম্বন্ধে, সূদ যিনা, মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকারের মতভেদ করার কোনই অবকাশ নেই।

২. যে সব বিষয়ে 'قطعى الثبوت' ও 'قطعى الدلالة' দলীল আছে কিন্তু বিষয়টি জানা দীনের জরুরিয়াতের মধ্যে শামিল নয় সে সব বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ইজমায়ে উম্মাতের বিরোধী মতপোষণ করা হারাম।

৩. আর যে সব বিষয়ের 'ظنى الثبوت' ও 'ظنى الدلالة' অর্থাৎ দ্বিধা সন্দেহ সহকারে প্রমাণীত ও দ্বিধা সন্দেহযুক্ত অর্থদায়ক বা 'قطعى الثبوت' কিন্তু 'ظنى الدلالة' অর্থাৎ অকাট্যভাবে প্রমাণীত কিন্তু দ্বিধা সন্দেহযুক্ত অর্থদানকারী দলীল বিদ্যমান। কিংবা বিষয়টি এমন যে তাতে উপরোক্ত কোন প্রকার দলীল নেই তাই কিয়াসের ভিত্তিতে বা ইস্তিহাবে হাল, বা মাসালিহে মুরাসালা, কিংবা উরফ অথবা সাহাবীগণের অভিমতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে হচ্ছে সে সব বিষয়ে মতভেদ হতে পারে। এসব বিষয়ে মতভেদ করা শুধু জায়িযই নয় বরং এ জাতীয় বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব হওয়ার ফলে অনেক সময় সে সব মতভেদ উম্মাতের জন্য রহমত হিসাবেই দেখা দিয়েছে।[১]

উল্লেখ্য মতভেদ তখনই রহমত হবে যখন তা সঠিক ইজিতহাদের ভিত্তিতে হবে।

উপরোক্ত শিরোনাম গ্রহনের তাৎপর্য

উল্লেখ থাকে যে, বক্ষমান গ্রন্থে আলিমগণের মতভেদ বা উম্মাতের মতভেদ উম্মাতের জন্য <u>রহমত এ কথা না বলে 'ইমামগণের মতভেদ উম্মাতের জন্য রহমত' এ কারণেই বলা হয়েছে</u>

১. রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬।

www.pathagar.com

যে, ইমামগণ কখনও প্রথম কিংবা দ্বিতীয়-রকমের বিষয়ে মতাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হননি। তাঁদের মধ্যে কেবল তৃতীয় রকমের বিষয়েই মতভেদ হয়েছে, তাও আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় নয় বরং মাসআয়ালা সমূহের সঠিকরূপ নিরূপনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভংগীর বিভিন্নতার কারণে সে সব মতভেদ হয়েছে। এ কারণেই তাঁদের মতভেদ উম্মাতের জন্য রহমত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত শিরোনাম দেওয়া হয়েছে।

হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বহু বিষয়ে মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। এমন কি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দুই বিশেষ ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাসআলায় তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[১]

তাঁদের এ মতানৈক্যের ফলে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য বিরাট সুযোগ এসে যায় এবং তা আমাদের জন্য রহমত হিসাবে দেখা দেয়। কারণ ঃ

১. কোন হানাফী বিচারক বা মুফ্তী ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের (র.) বা মযহাবের অন্য কোন ইমামের মতানুযায়ী হুকুম দিলে সে হুকুম ও নীতিগতভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মত বলে গন্য করা হবে।[২]

২. কোন মাসআলায় মাযহাবে দু'টি সহীহ্ অভিমত থাকলে সে ক্ষেত্রে মাযহাবের অনুসারীদের যে কোন একটি অভিমত গ্রহণ করার অধিকার থাকে। এ প্রসংগে 'রাসমুল মুফ্তী'তে উল্লেখ রয়েছে,

- وإن تجد تصحيح قولين و رد فاختر لما شئت فكل معتمد.

যদি দু'টি অভিমতই সহীহ্ দেখতে পাও তখন তুমি যে কোন একটি মত ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করতে পার উভয় মতই নির্ভরযোগ্য।

৩. যরূরত ও প্রয়োজনে সময় মুফ্তী মাযহাবের দুর্বল অভিমতও গ্রহণ করতে পারেন। মানুষের জন্য সহজ পন্থা উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে যদি এ কাজটি করা হয় তবে তা আরো উত্তম।[৩]

ইমামগণের মতভেদ কিভাবে কতটুকু রহমত বয়ে নিয়ে আসে তার কয়েকটা উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল ঃ

১. হজ্জ সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত হল, ফরয হবার সাথে সাথেই আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং আদায় করতে অহেতুক বিলম্ব করলে

১. রাদ্দুল মুহ্তার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২। ২. শারীয়াতুল ইসলাম, ৮৩ পৃষ্ঠা। ৩. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬-১৮।

www.pathagar.com

গুনাহগার হবে। অপর দিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হল হজ্জ ফরয হবার সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব নয়। পরে আদায় করলেও চলবে। তাতে কোন গুনাহ হবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত গ্রহণ করা হলে তা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়। অন্য দিকে এ অভিমতের ফলে বিলম্বে আদায় করার কারণে লোকেরা গুনাহগারও হয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত গ্রহণ করা হলে লোকদের জন্য সহজতর হয়। লোকেরা গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে। হজ্জ ফরয হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক বিলম্বে তা পালন করা থেকেও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা বিলম্ব করার কারণে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনও বিলম্ব করতেন না। তা ছাড়া যে সব হাদীসের ওপর ভিত্তি করে সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব বলা হয়েছে সে সব হাদীসও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে দুর্বল।[১]

২. কৃষি ফসল ও ফল ফলাদির হিসাব নির্ধারণ সর্ম্পকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হল জমিতে উৎপাদিত ফসল ফল-ফলাদি বেশী হোক কিংবা কম হোক তাতে যাকাত (উশ্‌র) ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে কোন হিসাব নির্ধারিত নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ"ما أخرجت الأرض ففيه العُشر" জমি থেকে যে ফসল উৎপাদিত হয় সে ফসলের ওপর উশ্‌র ধার্য হবে।[২]

وأخرج البُخارى عنه عليه السلام فيما سقت السماء والعيون وكان عشريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ·

যে জমি বৃষ্টির কিম্বা ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত হয় তার উপর উশর ধার্য হবে আর সেঁচ ব্যবস্থা যে জমি সিক্ত হয় তা' উপর নিসফে-উশ্‌র ধার্য হবে।[৩]

এ হাদীস দু'টি স্পষ্ট অর্থবোধক। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিসাবের কোন শর্ত থাকবে না। অপর দিকে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হল, কৃষি ফসল ও ফল-ফলাদি পাঁচ 'অসক' সমপরিমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

لَيس فيما دون خمسة أوسق صدقة ·

পাঁচ অসকের কম পরিমাণের উপর যাকাত হয় না। (অসক হল ষাট সা' অর্থাৎ ৬৫ কেজি) এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়। এতে মুসলিম সাধারণের জন্য বিশেষ অবকাশ রয়েছে।

---

১. ফাতহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা (বুখারী শরীফ) ২. হেদায়া (যাকাত অধ্যায়)। ৩. হেদায়া, ফাতহুল ক্বাদীর, ৬ খণ্ড ১৫৭ ; শরীয়াতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪৪।

www.pathagar.com

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদের আলোচনা প্রসংগে যে সব জিনিস ওযন ও কাইল (পাত্র) দ্বারা পরিমাপ করে কম দিয়ে বেশী নেওয়া বা বেশী দিয়ে কম নেওয়া হারাম ঘোষণা করেছেন, সে সব জিনিস সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হল হাদীসে যে সব জিনিসকে 'কাইলী' বলা হয়েছে যথাঃ খেজুর, লবণ, গম, ও যব তা কিয়ামত পর্যন্ত 'কাইলীই' থাকবে আর যে সব জিনিসকে 'ওযনী' বলা হয়েছে যথা - স্বর্ণ ও রৌপ্য তা কিয়ামত পর্যন্ত 'ওযনীই' থাকবে। এমনকি লোকেরা সেসব জিনিস পরিমাপের সে পুরাতন প্রথা ছেড়ে দিয়ে নতুন প্রথানুযায়ী আমল করতে থাকলেও এর কোন পরিবর্তন হবে না।

অপর দিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত হল হাদীসটি সে যুগের প্রথার ওপর ভিত্তিক করেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব সে প্রথার যদি পরিবর্তন হয়ে খেজুর, লবণ, যব ও গম ওযন করে বিক্রি হতে থাকে যেমন বর্তমান যুগে হচ্ছে তখন নতুন প্রথানুযায়ী আমল করতে হবে। সুতরাং খেজুর, লবণ, গম ইত্যাদি ওযন দিয়ে সমান সমান বিক্রি করা যাবে, কমবেশী বিক্রি করা যাবে না। কারণ পুরাতন প্রথা মেনে চলা বিধানদাতার উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া তা মানুষের জন্য কষ্টকরও বটে।

বর্তমান যুগে ইমাম আবূ ইউসফ (র.) -এর এ অভিমত গ্রহণ করা হলে মানুষের জন্য অনেক কষ্ট লাঘব হয়, তাদের জন্য লেনদেন করা ও ক্রয়-বিক্রয় সহজসাধ্য হয়। তাই এ অভিমত লোকদের জন্য রহমতরূপে পরিগনিত।[১]

অন্যান্য ইমামগণের মতভেদ রহমত হওয়ার প্রমাণ

বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে নানা কারণেই মত পার্থক্য হয়েছে। এ সব মত পার্থক্যের মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে যা উম্মতে মুসলিমার জন্য রহমত স্বরূপ। কারণ উম্মাত প্রয়োজনের সময় সহজ বিধান হিসাবে ঐসব অভিমত থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন।[২]

পূর্ববর্তী ইমামগণও বেশ কিছু বিষয়ে উম্মাতের জন্য সহজ করণের উদ্দেশ্যে কিংবা বিশেষ কোন কারণে অন্য মাযহাবে মতানুযায়ী ফাতওয়া দিয়েছেন। ফলে মাযহাবের অনুসারীদের দীনী বিধান মেনে চলা সহজতর হয়েছে।

১. নিখোঁজ লোকের স্ত্রী সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ মুতাকাদ্দিমূন হানাফী ইমামগণের অভিমত হল, যতদিন পর্যন্ত স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক দানের বা স্বামীর মৃত্যুর বা তার মুরতাদ হয়ে যাওয়ার নির্ভরযোগ্য সংবাদ না পাবে ততদিন পর্যন্ত ঐ স্ত্রী লোকটিকে পূর্বের স্বামীর স্ত্রী হিসাবে তার জন্য অপেক্ষা করত হবে। কেউ কেউ সত্তর কিংবা নব্বই কিংবা স্বামীর সমবয়সী লোকদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথাও বলেছেন।

---

১. হেদায়া (যাকাত অধ্যায়)। ২. হেদায়া, ফাতহুল ক্বাদীর, ৬ খণ্ড ১৫৭ ; শরীয়াতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪৪।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে ইমাম মালিক, ইমাম আহ্মাদ (র.) এবং এক বর্ণনায় ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর অভিমত বিচারকের কাছে এ বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পর বিচারক সব কিছু যাচাই করে তাকে চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করে অন্য স্বামী গ্রহন করতে পারবে।

হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাঁদের মতের স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীল সমূহ পেশ করেছেন ঃ

ক. হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

إمرأة المفقود إمرأته حتى يأتيها البيان.

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী তার স্বামী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট খবর না আসা পর্যন্ত তারই স্ত্রী থাকবে (দারু-কুত্নী কর্তৃক দুর্বল সনদে বর্ণিত)।

খ. হযরত আলী (রা.) হতে মাওকূফ সনদে বণিত আছে,

إمرأة المفقود امرأة أبتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته.

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী এক বিপদগ্রস্ত নারী, তাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। যতদিন না স্বামীর নিশ্চিত মৃত্যুর সংবাদ আসে (শাফি'য়ী কর্তৃক বর্ণিত)।

গ. তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল নিশ্চিত প্রমাণিত। অতএব সে সম্পর্ক অবসানের জন্যও অনুরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণের প্রয়োজন।

অন্যদিকে ইমাম মালিক, ইমাম আহ্মাদ (র.) প্রমুখ হযরত উমর (রা.) -এর একটি ফায়সালাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) -এর যুগে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেলে তার স্ত্রী হযরত উমর (রা.) -এর দরবারে সমস্যাটি পেশ করে এর সমাধান চান। তখন হযরত উমর (রা.) অন্যান্য সাহাবীদের সাথে আলোচনার পর বলেন ঃ

إمرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকবে এরপর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে (এতেই সে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে)। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'য়ী (র.)।

এ ক্ষেত্রে হানাফী মুতাকাদ্দিমূনের অভিমত গ্রহন করে ঐ স্ত্রী লোকটিকে গোটা জীবন, বা স্বামীর সমবয়সীদের মৃত্যু পর্যন্ত বিবাহ হীন রাখা হলে স্ত্রী লোকটির জীবন যৌবন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়, তার অধিকার ক্ষুন্ন হয়। অথচ এ বিষয়ে যে 'মারফূ' হাদীসটির উপর ভিত্তি করে হুকুমটির দেওয়া হয়েছে সে হাদীসটিকে ইমাম আবূ হাতিম, ইমাম বায়হাকী, আবদুল হক (মুহাদ্দিসে দেহ্লবী) (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন।

www.pathagar.com

২. দ্বিতীয় দলীলটি ছিল হযরত আলী (রা.) এর ব্যক্তিগত অভিমত। অসংখ্য সাহাবীর মুকাবিলায় হযরত আলী (রা.)-এর অভিমত গ্রহণ করা যায় না। আর তৃতীয় যুক্তিটি গ্রহণ করা হলে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অথচ পবিত্র কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণীত যে মানুষের জন্য শরী'আতের বিধান সহজ করা হয়েছে। কঠিন করা হয়নি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ বিধান চান কঠিন বিধান চান না (বাকারা ঃ ১৮৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

يسروا ولَا تعسروا بَشروا ولَا تنفروا

তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠোরতা আরোপ করো না, (মানুষকে) সুসংবাদ দাও, দূরে সরিয়ে দিও না (বুখারী ও মুসলিম)।

তিনি আরো বলেন,

لَا تشددوا فيشدد اللّٰه عليكم . فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد اللّٰه عليهم فتلك بقايا هم الصومعة .

তোমরা নিজেদের উপর কঠোর নীতি অবলম্বন করো না তাহলে তোমাদের উপর কঠোর বিধান আরোপ করা হবে। তোমাদের পূর্বে একটি জাতি নিজেদের জন্য কঠোরতা অবলম্বণ করলে তখন তাদের উপর ও কঠোর বিধান আরোপ করা হয়। সুতরাং তাদের অবশিষ্টরা গির্জাগুলোতে অবস্থান করেছেন (আবূ ইয়ালী, তাফসীরে ইব্ন কাসীর)।

তাই এসব কারণে মুতাআখ্খিরূন হানাফী ইমামগণ এ মাসয়ালায় অর্থাৎ স্বামী চার বছর পর্যন্ত নিখোঁজ থাকলে সে ক্ষেত্রে মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে আদালতের রায়ের পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে তাঁদের এ ফাত্ওয়া উম্মাতের জন্য এক বিরাট রহমত।[১]

২. ক্রেতা-বিক্রেতা কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে সরকার কর্তৃক দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে একদল ফকীহ্র অভিমত হল, কোন অবস্থাতেই সরকার তা করতে পারে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুগে একবার মদীনা শরীফের বাজারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

১.শরীয়াতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪ : সুবলুস সালাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭-২০৯ : ইলামূল মু'কিয়ীন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪ ; ফাত্ওয়াই রাশিদিয়া, পৃষ্ঠা ৪৮৭ ; ইমদাদুল ফাতাওয়া।

www.pathagar.com

أن الله هو المسعر القابض الباسط وإني أرجو أن ألقى الله و

ليس في عنقي مظلمة لأحد.

আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রক। তিনিই দ্রব্য মূল্য কমান আবার তিনিই বাড়ান, আমি চাই এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে যখন আমার ঘাড়ে কারো প্রতি যুলুমের ভার থাকবে না (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা ও ইব্ন হাব্বান)।

তাছাড়া ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই দেশের নাগরিক। তাই বিক্রেতার স্বার্থের চেয়ে ক্রেতার সার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা কিছুতেই সমাচীন হয় না। সব কারণে উভয়ের স্বার্থই সমানভাবে দেখতে হবে।

অন্য দিকে এ প্রসংগে একদল তাবিঈ ফকীহ্ এবং হানাফী, মালিকী, হাম্বলী ও শাফি'য়ী মাযহাবের কিছু সংখ্যক ফকীহ্‌র অভিমত হল, সরকারের জন্য দ্রব্যের একটি ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া শুধু জায়িযই নয়, বরং কোন কোন সময় তা যরুরী হয়ে পড়ে। এ প্রসংগে তাঁরা আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের একটি কারণ ছিল, সে কারণটি হল, সে সময় বাজারে পূণ্য দ্রব্যের সরবরাহ কমে যাওয়ায় অপর দিকে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিকভাবেই মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া'র পিছনে কোন কারো হাতের কারসাজি ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলাই দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রক তিনিই মুল্য বাড়ান আবার তিনিই মূল্য কমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর উক্তি থেকে তার প্রমাণ। বিশেষত, সে সমাজটি ছিল, উন্নত চরিত্র ও তাক্ওয়ার আদর্শ সমাজ। দ্রব্য মূল্য নিয়ে অসৎ পন্থা অবলম্বন করার মন মানসিকতা তাঁদের মধ্যে ছিল না। বস্তুত বর্তমান সমাজে অসৎ পন্থা অবলম্বকারী লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোর মওজুদদার, কালো বাজারী ব্যবসায়ী নানাভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বা অন্য কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির করে রাতারাতি ধনী হওয়ার চিন্তায় থাকে। এ অবস্থায় সরকার কর্তৃক দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা না হলে এতে দেশের সাধারণ জনগণকে ঐসব দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোদের কবলে ছেড়ে দেওয়া হলে তারা দেশের সাধারণ জনগণকে শোষণ করার বিরাট সুযোগ পায়। ইমামগণের এ মতভেদের ফলে বর্তমানে উম্মাতে মুসলিমার জন্য বিরাট কল্যাণ ও ফায়দার পথ সুগম হয়েছে। উপরোক্ত দ্বিতীয় অভিমতটি গ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে তাদের দেশের নাগরিকদের এসব দুনীর্তিবাজ ব্যবসায়ীদের শোষণের হাত থেকে অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।[১]

৩. ইহ্‌রাম বিহীন অবস্থায় মক্কা শরীফ প্রবেশ করা সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর

১.শরীআতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫২ ; সুবুলুস্ সালাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৫ ; ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্, ৩য় খণ্ড, ১০৪-১০৫ ; নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৫।

www.pathagar.com

অভিমত হল, মক্কা শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্য যাই হোক না মক্কাগামী সে অবশ্য মিকাত হতে ইহ্রাম বেঁধে মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

لَاتجاوزوا الميقات إلاّ بإحرام

ইহ্রাম বিহীন অবস্থায় তোমরা মীকাত অতিক্রম করবে না (ইবন আবূ শাইবা)।

এ সম্পর্কে ইমাম আহ্মদ, ইমাম শাফি'য়ী ও অন্যান্য ইমামগণের অভিমত হল, যাঁরা হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ প্রবেশ করতে চায় কেবল তাদেরকেই মীকাত অতিক্রম করার সময় ইহ্রাম বাঁধতে হবে। আর যারা অন্য উদ্দেশ্য মক্কা শরীফ যেতে চায় তাদেরকে ইহ্রাম বাঁধতে হবে না, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

هن لهن ولمن أتى عليهن من غير هن لمن أراد الحج أو العمرة

এসব মীকাত ঐ সকল লোকদের জন্য যাঁরা তথায় বসবাস করছে এবং যাঁরা ঐ সব মীকাত অতিক্রম করে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য (বুখারী ও মুসলিম)।

এ দ্বিতীয় অভিমতটি গ্রহণ করা হলে গাড়ির ড্রাইভার, ব্যবসায়ী, ডাক পিয়ন ইত্যাদি চাকুরীজীবি যাদেরকে প্রায়ই মক্কা শরীফ প্রবেশ করতে হয় তাদের কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। কেননা ইহ্রাম পরলে উমরা আদায় না করা পর্যন্ত তা খোলা যাবে না এবং প্রতিবার উমরা পালন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং অভিমতটি গ্রহণ করা হলে তারা অনেক কষ্ট থেকে রেহাই পাবে। হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর উক্তরূপ অভিমত রয়েছে। মুয়াত্তা মুহাম্মদে আছে,

قَالَ مُحَمد وبهذا نأخذ هذه مواقيت وقتها رَسُولَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم . فلا ينبغى لأحد أن يجاوزها إذاأراد حجا أو عمرة إلاَّمُحرماً .

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটাই আমাদের অভিমত। এসব মীকাত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্ধারণ করেছেন। কেউ হজ্জ কিংবা উমরার ইচ্ছা করলে সে এসব বিনা ইহ্রামে অতিক্রম করবে না (মুয়াত্তা মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৩৩)।

এ অভিমতটি গ্রহণ করা নিসন্দেহে অনেকের জন্য-ই রহমত।[১]

৪. যৌনাকর্ষণ নারীদেহ কিংবা নিজ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে ইমাম শাফি'য়ী (র.) ও অন্যান্য কতক ইমামের মতে অযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। তাঁরা দলীল হিসাবে নিম্নলিখিত আয়াতটি পেশ করেন।

১. শারহে বিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮ ; সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬ ; ফিকহুস্ সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে কিম্বা তোমরা নারী স্পর্শ করে এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। (সূরা ঃ নিসা ৪৩)

এ ছাড়া নিম্নবর্ণিত হাদীসটি দিয়েও তারা দলীল পেশ করেন।

من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاء ·

যে ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন অযূ না করে নামায আদায় না করে (মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরিমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাযা ও তিরমিযী)।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ অনেকের অভিমত হল, এতে অযূ ভঙ্গ হয় না। কারণ হাদীস শরীফে আছে,

إن القبلة لا تنقض الوُضوء ولا تفطر الصَائم ·

চুম্বনে অযূ ভঙ্গ হয় না, আর না তা রোযাদারের রোযা নষ্ট করে। (ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াই ও বায্যার (র.) হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নিজ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার ব্যাপারে এক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "তা স্পর্শ করার কারণে অযূ ভঙ্গ হয় না কেননা তা তোমার দেহেরই একটা অংশমাত্র" (মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)[১]

এখানে লক্ষণীয় যে প্রথমোক্ত অভিমতটি পালন করা কষ্টকর। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অভিমতটি গ্রহন করা হলে সে কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং এ অভিমতটি রহমত হিসাবে গণ্য। এ ছাড়া আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যায়। এখানে কেবলমাত্র কয়েকটি উদাহরণ পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো।

১. ফিক্হুস্ সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।

www.pathagar.com

১১

ফিকহ্ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ

হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ

আল-মাবসূত, আস্-জামিউস্ সাগীর, আস্-সিয়ারুল কাবীর, আস্-সিয়ারুস্ সাগীর, আয্-যিয়াদাত, আন্ নাওয়াদির, আল-আমালী, আর্-রাক্কিয়াত, আল-কায়সানিয়াত, আল-হারুনিয়াত, আল-জুরজানিয়াত ও কিতাবুল হুজ্জাজ। এ সব গ্রন্থ হল ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রণীত। আল্-আমালী, আন-নাওয়াদীর, আল-মাবসূত সারাখ্সী ও আল-খারাজ।এ গ্রন্থসমূহ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কর্তৃক প্রণীত। আল-হিদায়া, আত-তাজনীস, আল-মাযীদ ও মানাসিকুল হাজ্জ। এ গ্রন্থ সমূহ আল্লামা মুরগীনানী (র.) কর্তৃক রচিত।

আল-মুহীত ঃ সারাখ্সী; আল-মাবসূত ঃ হালওয়ানী; আল-বাদায়িউস্ সানায়ি ঃ কাসানী; আল-আহ্কাম ঃ আবূ বাক্র রাযী; শারহুত্ তাহাবী, মুখ্তাসারুত তাহাবী, শারহ্ মুখ্তাসারুত্ তাহাবী, জাসসাস্, আয যাখীরা ঃ আবূ বাক্র খাহিরযাদা; আদাবুল কাযী, কিতাবুল ওয়াক্ফ, শারহুল ওয়াকিয়াত ঃ খাস্সাফ; শারহে আদবুল কাযী ঃ হুসাম আশ্-শহীদ; উয়ূনুল মাসাইল ওয়াল-ওয়াকি'আত, আন-নাওয়াযিল, খাযানাতুল আকমাল ঃ ফকীহ্ আবুল লাইস; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ওয়াল-ওয়াকিয়াত ঃ শায়খ তাহির; তাতিম্মাতুল ফাতাওয়া ঃ আবুল মা'আলী; ফাত্ওয়ায়ে কাযী খান, আল-ফাত্ওয়াতুল কুবরা-খাসী, ফাতাওয়া যাহীর উদ্দিন, আল্কুনিয়া ঃ যাহিদী; আল-বুগীয়া ঃ কাওনাওয়ী; (এ গ্রন্থখানা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে)।

মুনইয়াতুল মুফ্তী ঃ সিজিস্তানী; আল-আজনাস, আর রাওযা ঃ নাতিফী; মুখ্তাসারুল কুদূরী, শারহে কুদূরী, আল-জাওহারাতু নাইরা ঃ হাদ্দাদী; আল-আসরার ঃ আবূ যায়িদ; আল-মুখ্তার, আল-ইখ্তিয়ার শারহে মুখ্তার ঃ আবুল ফযল মুসিলী; আল-কান্য ঃ আল-ওয়াফী; শারহে ওয়াফী ঃ আবুল বারাকাত নাসাফী; তাবয়ীনুল হাকাইক ঃ যাইলায়ী; মাজমাউল বাহরাইন ঃ ইবনুস সা'আতী; দুরারুল বিহার ঃ বিহারী; আল-বিকায়া ঃ তাজুশ্ শরীয়াত; আল-নিকায়া ঃ সাদরুশ্ শরীয়াত; জামিউস্ সাগীরের ৭খানা শরাহ্ আবুল লাইসকৃত, কাযী খান, হুস্সামি, বুরহানি ঃ সাদরুশ্ শহীদ; ইতাবিঃ তামারতাশি; যাহির রিয়ায়েতের ৬খানা কিতাবের সমন্বয় গ্রন্থ 'আল-কাফী' এবং 'আল-মুন্তাকা' ঃ হাকিম

www.pathagar.com

আশ্-শহীদ, নাফীঃ কাসিম ইব্ন ইউসুফ; আল মুলতাকাত শারহুয যিয়াদাত, মাওয়াহিবুর রহমান, আল-বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমান ঃ ইব্রাহীম তারাবলিসি; আল-ওয়াকিয়াত ঃ সাদরুশ্ শহীদ; গুনইয়াতুল ফুকাহা, উস্তাদুল মুফ্তী, আত্-তাজরীদ, আর-রাওযাহ্, মুখ্তারুল ফাত্ওয়া, ফাত্ওয়ায়ে রাযী, আস্-সিরাজিয়া, কিতাবুল মানজুমা ফিল খিলাফিয়াত ঃ আবূ হাফস আন্-নাসাফী; কিতাবুল মুকাদ্দিসাতুল গাযনুবিয়া ঃ গাযনুবী; আল-মিরাজ মুখ্তারাতুন নাওয়াযিল ও ফাতহুল ক্বাদীর; ইব্ন হুমাম; আল্ কিফায়া ঃ কারলানী; নিহায়াতুল কিফায়া ঃ তাজুশ্ শরীয়াত; আল-ইনায়া ঃ বাবরতী; আল-বিনায়া ঃ আইনী; ফাত্ওয়ায়ে রুসতগ্ফানী, ফাতাওয়ায়ে আল-ইসবীজাবী, ফাতাওয়ায়ে হুসাম উদ্দিন রাযী, ফাতাওয়ায়ে হালওয়ায়ী, ফাত্ওয়ায়ে কিরমানী, আল-ফাতাওয়া আল-বায্যাযিয়া ঃ কারদারী; আত্ তাতার খানীয়া ঃ আলায়ী; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, দুরারুল বিহার, কুনূবী, আদ-দুররুল মুখ্তারঃ হাস্কাফী; হাশীয়াতুদ্দুরার ঃ তাহতাবী; আর্-রাদ্দুল মুহতার ঃ ইব্ন আবিদীন; তাহরীরুল মুখ্তার হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার, আদ্ দুরারু শারহুল গুরার ঃ মোল্লা খসরু; আদ-দুরারুল মুন্তাকা, মাজমাউল আনুহার, আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর, বাহরুর রাইক, তানকিহুল হামিদীয়া, আল-ফাতাওয়া আল-খায়রিয়া, আল-ইমদাদ ও মারাকিউল ফালাহ্ ঃ সারনবুলালী; শারহুল বিকায়া, নূরুল ইযাহ্, মাজাল্লাতুল আহ্কামুল আদলিয়া, মুনিয়াতু মুসাল্লী, গুনিয়াতুল মুসতামিলী, আল-ফাতওয়া আল-ইমাদিয়া, জামিউল ফুসূলাইল, সিরাজী, শরীফী, শারহুল মানসিক ঃ মোল্লা আলী কারী ইত্যাদি ।[১]

হানাফী মাযহাবের অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহ

নাহার, শারহে কানয ঃ আইনী; দুররুল মুখ্তার, আশবাহ্ প্রভৃতি কিতাব সমূহ যদিও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু অধিক সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এসব কিতাব দিয়ে ফাতাওয়া প্রদান করা সমীচীন নয়, যে পর্যন্ত উক্ত কিতাব সমূহের হাশিয়া, শরাহ্ বা যথেষ্ট গবেষণার মাধ্যমে সে ব্যাপারে ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভুলে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদূরিত না হয়।

শারহে কানয ঃ মোল্লা মিসকীন ও শারহে নিকায়া ঃ কুহিস্তানী। কিতাব দু'খানার প্রণেতা সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিতি না জানার কারণে এ কিতাব দু'খানা দিয়ে ফাতাওয়া দেওয়া জায়িয নয়।

কুনিয়া, হাবী ও আস্-সিরাজ নামক গ্রন্থত্রয়ে দুর্বল উক্তি বর্ণিত থাকার কারণে এ সব কিতাব দিয়ে ফাতাওয়া প্রদান করাও না জায়িয। তবে উল্লেখিত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ থেকে কোনে কথা বর্ণনা করা হয়েছে বলে জানা গেলে সে কথা গ্রহণ করা যেতে পারে।

---

১. কাওয়াইদুল ফিক্হ ঃ সাইয়িদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.)

www.pathagar.com

অনুরূপ মুশতামালুম আহ্কাম, কানযুল ইবাদ, মাতালিবুল মু'মিনীন, খাযানাতুর রিওয়ায়াত, শির'আতুল ইসলাম, আল্ ফাতাওয়াস্ সূফিয়া, আল-ফাতাওয়াত তাউরী, ফাতাওয়া ইব্রাহীম শাহী, ফাতাওয়া ইব্ন নুজাইম, শারহুল কানয ঃ আবুল মুকারিম ও খুলাসাতুল কাইদানী নামক কিতাবসমূহ ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে 'শিরা'আতুল ইসলাম' নামক কিতাবখানা দিয়ে ফাতাওয়া দেওয়া যেতে পারে বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১]

ফকীহ্গণের মতবিরোধের কারণসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে পৃথকভাবে আহ্কামে ফিকহ্ ও তার গবেষণার প্রচলন ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেভাবে অযূ ,নামায ও হাজ্জ ইত্যাদি আদায় করতেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তা দেখে দেখে সেভাবে পালন করতেন। কোন্‌টি সুন্নাত আর কোন্‌টি ফরয তার ব্যাখ্যা চাইতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই শরয়ী মাস'আলার সিদ্ধান্ত গ্রহণে মত পার্থক্যের সূত্রপাত হয়। মোটামোটি ছয়টি কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) -এর মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ

প্রথমত ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাবলীগে দীনের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সেখানকার সাধারণ মানুষ শরয়ী বিষয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। এতে তাঁরা জিজ্ঞাসিত বিষয়ে নিজ নিজ ইল্‌ম অনুযায়ী কিংবা গবেষণা করে ফাত্ওয়া প্রদান করেতেন। এতে এক এক জনের ইল্‌ম অন্যান্য জনের ইল্‌ম ও গবেষণা থেকে বিচিত্ররূপ ধারণ করতো।

দ্বিতীয়ত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন কাজ করেছেন এবং তা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দেখেছেন। এতে কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ আমলকে ইবাদত মনে করেছেন আবার কেউ একে ইবাহত (হালাল) মনে করেছেন। যেমন হজ্জের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর 'আবিতাহ্' নামক স্থানে অবস্থান করা। এ অবস্থান থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হজ্জে এখানে অবস্থান করাকে সুন্নাত মনে করতেন। কিন্তু আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, এ অবস্থান ইবাদত স্বরূপ ছিল না বরং তা ছিল ঘটনাক্রমিক অবস্থান।

তৃতীয়ত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কোন আমল দেখে বিভিন্ন সাহাবী (রা.)-এর ভিন্ন ভিন্ন ধারনা হত। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হজ্জ সম্পাদন করলেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারের হজ্জ পালন করলেন তা বলেন নি। এথেকে কেউ মনে করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তামাত্তুকারী ছিলেন আবার কেউ ভাবেন তিনি 'কারিন' ছিলেন অপর কেউ ভাবেন তিনি 'মুফরিদ' ছিলেন।

---

১. আদাবুল মুফ্তী ঃ মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.) ১৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

চতুর্থত ঃ বিষয়বস্তু ভুলে যাওয়ার কারণে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিত। যেমন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রজব মাসে উমরা পালন করতেন। আয়েশা (রা.) তা শুনে বলেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) ভুলে গেছেন।

পঞ্চমত ঃ স্মরণশক্তির তারতম্যের দরুন তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য হত। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনের ক্রন্দনের দরুন শাস্তি দেওয়া হবে।"

আয়েশা (রা.) এ কথা শুনে বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হাদীসটিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন নি। ঘটনা হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক মৃত ইয়াহূদী মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন, তার উপর তাঁর পরিজনেরা ক্রন্দন করছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ "তারা এ মৃতের উপর ক্রন্দন করছে অথচ কবরে তার আযাব হচ্ছে।" এ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) ধারনা করেন আযাব হচ্ছে ক্রন্দনের কারণে এবং এ হুকুম সকল মৃতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে আয়েশা (রা.)-এর মতে ক্রন্দনই শাস্তির কারণ নয়।

ষষ্ঠমত ঃ কোন কোন বিষয়ের কারণ নির্দ্ধারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) -এর মাঝে মতানৈক্য হতো। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার ও আওতাদের বছর মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। আওতাদের পর তা নিষেধ করেছেন। এ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, মুত'আর ইজাযত জরুরতের কারণে ছিল, জরুরত শেষে তা উঠায়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু জমহুর উলামাদের মত ছিল ইজাযত ইবহাতের (হালালের) কারণে ছিল। পরে নিষেধ আসার কারণে ইবাহাত রহিত হয়ে গেছে।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে তাবিঈগণ নিজ নিজ তাওফিক অনুযায়ী শরয়ী মাসাইল হাসিল করেছেন। হাদীসে রাসূল (সা.) ও মাযাহিবে সাহাবা (রা.)-কে তাঁরা সংরক্ষণ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন অভিমতকে একত্রিত করেছেন। কোন অভিমতকে অন্য অভিমতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন অথবা তাকে দুর্বল মনে করেছেন। এতে তাঁরা নিজ নিজ ইজতিহাদ ও রায়কে কাজে লাগিয়েছেন। এভাবে তাবিঈ আলিমগণের পৃথক পৃথক মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন, মদীনায় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্, ইব্ন উমর এবং তারপরে ইমাম যুহরী, কাযী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও রাবীঈ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইমাম ছিলেন। এভাবে মক্কায় আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্, কূফায় ইব্রাহীম নাখ্য়ী ও শা'বী বসরায় হাসান বাস্রী, ইয়ামানে তাউস ইব্ন কায়সান ও সিরিয়ার মাকহূল (র.) ইমাম ছিলেন। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র.) তাঁর সঙ্গীদের ধারনা ছিল ইল্মে ফিক্হে, হারামাইন শরীফাইনের ইমামাগণ অগ্রাধিকার প্রাপ্তিরযোগ্য। তাঁদের মাযহাবের ভিত্তি ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের ফাতাওয়া সমূহ এবং মদীনার কাযীগণের

www.pathagar.com

ফায়সালা সমূহ। যে মাসআলাগুলোতে তাঁরা মদীনার উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য দেখেছেন সেগুলোকে খুব দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছেন। এবং যেগুলোতে মতানৈক্য দেখেছেন তাতে অধিকতর শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করেছেন।

ইব্রাহীম নাখ্য়ী (র.) ও তাঁর শিষ্যগণের রায় ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) ফিকহ্শাস্ত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এজন্য আলকামা মাসরূককে বলেছিলেন, কোন ফকীহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম আওযায়ীকে বলেছিলেন, ইব্রাহীম, সালিম (র.) থেকে অধিকতর ফকীহ্। তিনি এও বলেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সাহাবী না হলে, আমি বলতাম, আলকামাই (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে অধিকতর ফকীহ্ আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) তো সবার শীর্ষস্থানীয় ফকীহ্। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের ভিত্তি হল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর ফাতাওয়া সমূহ, আলী (রা.) ও কাযী শুরাইহ্ (র.) ও অন্যান্য কূফার অধিবাসী কাযীগণের ফায়সালা সমূহের উপর।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আয়েশা, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) ও তাঁদের অনুসারী তাবিঈ যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়াহ্ ও সালিম প্রমূখ মদীনা বাসীদের ফাতাওয়া ও ফায়সালাকে অনুসরণ করা জরুরী মনে করতেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ইল্মে ফিকহ্ প্রণয়নের কাজ যথারীতি শুরু হয়। তখন থেকে এর দায়িত্ব মুজতাহিদ ইমামগণই পালন করতে থাকেন। যে সময় থেকেই মতভেদের পরিধি প্রশস্ত হয়ে উঠে। এ সময়ের মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীসে মুসনাদ দ্বারা দলীল তো প্রদান করতেন তবে হাদীসে মুরসাল ও সাহাবায়ে কিরামের কথা সমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণে তাঁদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। সাহাবায়ে কিরামের মতকে তখনই সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হতো, যখন তাঁদের মতামতের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যেত না। অপর দিকে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের মতামতে কোন মতভেদ দেখা দিলে প্রত্যেক ইমাম নিজ নিজ মাশায়েখের আমলকে অগ্রাধিকার দিতেন। এক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.) সাধারণত মদীনার সাহাবী ও তাবিঈগণের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) কূফার সাহাবী ও তাবিঈগণের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। হাদীসে রাসূল, সাহাবীদের বাণী ও তাবিঈগণ থেকে কোন মাস'আলায় মীমাংসা না পাওয়া গেলে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ অনুসৃত পূর্বসূরীদের নীতি অনুযায়ী ফাতাওয়া প্রদান করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুগামীগণ মনে করতেন ফিকহী মাসাইল জ্ঞান বহির্ভূত নয়। মাস'আলা সমূহ পরস্পর সামঞ্জস্যশীল থাকা আবশ্যক। এমন মানদন্ডের উপর তাঁরা কুরআন হাদীসের নির্দেশাবলীকে যাচাই করেন। এজন্য তাঁরা রায় বা নিজ জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে মাস'আলা প্রণয়নের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত

www.pathagar.com

করেছেন। ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতবাদ ছিল – মাস'আলার হেতু ও উৎস মূল অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের যে অর্থ তাঁরা বুঝতেন তা জ্ঞানের সাথে খাপ না খেলেও মাস'আলা প্রণয়নে ইতস্তত করতেন না। তাঁরা রায় বা কিয়াসকে সহজে ব্যবহার করতেন না, তবে একান্ত প্রয়োজন হলে তাঁরাও কিয়াসের আশ্রয় নিতেন। এ দুই ইমামের মতবিরোধের স্বরূপ নিম্নের উদাহরণে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। হাদীসে বর্ণিত চল্লিশটি বকরীর মধ্যে একটি বকরী যাকাত দিতে হয়। সাদাকায় ফিত্‌রে জন প্রতি এক সা' শুকনো খেজুর অথবা যব আদায় করতে হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর অনুসারীগণ এ হাদীসের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে বলেছেন, ১টি বকরী বা এর সম মান, এভাবে এক সা' খেজুর বা তার সম মান কোন কিছু দান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ যাকাত বা ফিত্‌রার উদ্দেশ্য হল দরিদ্র লোকের উপকার করা।

অপরদিকে ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর অনুসারীগণ শরী'আত প্রবতর্কের উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ না করে হাদীসের শব্দরাজি হতে বাহ্যত যে অর্থ বুঝা যায় তার আলোকেই তা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁরা মনে করতেন নির্দিষ্ট বকরী ও নির্দিষ্ট খেজুরই আদায় করতে হবে, মূল্য দেয়া যথেষ্ট নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর অনুসারীগণ এবং ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর অনুসারীগ-ণের মধ্যে এ সময়কার মতভেদের সৃষ্টি নিম্নোক্ত কারণে হয়।

১. মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের ফাতাওয়া প্রচুর পরিমাণে ছিল। ইরাকে এর তুলনায় কম ছিল। ফলে ইমাম মালিক (র.) ও মদীনার ইমামগণ হাদীসে রাসূল ও ফাতাওয়ায়ে সাহাবার উপর নির্ভর করে মাসয়ালা মাসাইলের সমাধান করছেন। অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইরাকী ইমামগণের নিকট হাদীসের সঞ্চয় অপেক্ষাকৃত কম থাকার কারণে তাঁদেরকে অধিকতরভাবে ইজতিহাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

২. ইমাম আবূ হানীফার আবাসভূমি ইরাকে শিয়া, খারিজী ও অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। এরা মিথ্যা হাদীস বানানো ছাড়াও সহীহ্ হাদীসকে বিকৃত করার কাজে লিপ্ত ছিল। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইরাকী ফাকীহ্গণ হাদীস গ্রহণে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং হাদীস গ্রহণ করতে হাদীসটি ফিক্‌হবিদগণের নিকট সুপরিচিত হওয়ার শর্ত আরোপ করতেন। হাদীসটি ইসলামী দর্শনের পরিপন্থী হলে তাঁরা এর অর্থ নিরূপনে চেষ্টা করতেন। অন্যথায় তা পরিত্যাগ করতেন। হিজায এ সকল ফিৎনা থেকে পবিত্র ছিল। সুতরাং এতটা সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে নাই। ফলে হাদীসের যাহেরী অর্থ ও তাৎপর্যগত অর্থ গ্রহণের কারণে হিজায ও ইরাকের ফকীহ্গণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

৩. পারস্য সাম্রাজ্য ইরাকীদের আচার অনুষ্ঠান, লেন-দেন ও আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বিচিত্রময় প্রভাব রেখে গিয়েছিল। ফলে ফিকহ্উদ্ভাবনের নানাবিধ দিক নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তথায় প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়েছে নানা রূপ দৃষ্টিভঙ্গিও যুক্তির অবতারণা। হিজাযের ফকীহ্গণ তাঁদের পূর্বপুরুষ সাহাবা ও তাবিঈগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরাও সে সব সমস্যার সম্মুখীন হতেন না। কারণ তাঁদের সামাজিক পরিবেশ এক ও অভিন্ন ছিল। তাঁরা এমন সব সমস্যার খুব কমই সম্মুখীন হতেন যেগুলোর সমাধান তাঁরা হাদীস বা সাহাবায়ে কিরামের ফাতাওয়া হতে জানতে পারতেন না। ফলে ইরাকী মুজতাহিদগণ ফিক্হ্ উদ্ভাবনে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন হিজাযী মুজতাহিদগণ সেরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি। এ কারণেই হিজাযী ফকীহ্গণ ইসলামী নির্দেশাবলীর হেতু আবিষ্কার ও এর লক্ষ্য উদ্ভাবনে গভীর চিন্তা করার আবশ্যকতা অনুভব করেন নি।

ইমাম আবূ হানীফা (রা.) -এর শিষ্যগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খলীফা হারুন রশীদের আমলে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আরেক শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) যেমন ছিলেন একজন মেধাবী ফকীহ্ তেমনই ছিলেন একজন ফিকহ্-হাদীস বিষয়ে উন্নতমানের রচয়িতা। তিনি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে ইল্মে ফিকহ্ হাসিল করেছিলেন। এ ইমামত্রয়ের মধ্যেও কোন কোন মাসা'আলায় মতবিরোধ হত। এ মত বিরোধের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কোন মাস'আলা হয়ত ইব্রাহীম (র.)-এর মত থেকে বের করেছেন। কিন্তু ইব্রাহীম (র.) থেকে এ মাস'আলা বের করার ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁদের শায়খের সাথে একমত হতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, ইব্রাহীম (র.) ও তাঁর সমকালীন ইমামগণের মধ্যে কোন মাস'আলায় ভিন্ন মত ছিল। এ থেকে কোন একটিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) গ্রহণ করেছেন, তাঁর শিষ্যদ্বয় অন্যটিকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী (র.) ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর শাগরিদ। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.) -এর মাযহাব প্রকাশিত এবং মাযহাব নীতিমালা ও তার শাখা-প্রশাখা লিপিবদ্ধ হওয়ার পর ইমাম শাফিয়ী (র.) -এর অভ্যুদয় হয়। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের সংগে অনেক বিষয়ে একমত হতে পারেনি। যার ফলে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মাযহাব সৃষ্টি হয়।

নিম্নলিখিত কারণসমূহের দরুণ পূর্বসূরীদের সাথে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতভেদ সৃষ্টি হয়ঃ

১. ইমাম শাফিয়ী (র.) হাদীসে মুরসাল ও মুনকাতি' দ্বারা দলীল গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। পক্ষান্তরে তাঁর পূর্বসূরীগণ এ গুলো গ্রহণ করতে কোন দ্বিধা করতেন না।

www.pathagar.com

২. পূর্ববর্তী ইমামগণের যুগে পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ছিল না। যার কারণে ইজতিহাদী মাস'আলা সমূহে অনেক ত্রুটি দেখা যেতো। এ ত্রুটি সমূহ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ইমাম শাফিয়ী (র.) ফিকহ্ উদ্ভাবনের নীতিমালা নির্ধারণ করেছিলেন যাকে 'উসূলে ফিকহ্' (اُصول فِقه) বলা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম শাফিয়ী (রা) -ই এ বিষয়ে সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেন।

৩. অনেক বিশুদ্ধ হাদীস তাবিঈ ইমামগণের নিকট পৌঁছেনি। সুতরাং তাঁরা রায় দ্বারা ইজতিহাদ করেছেন অথবা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.) -এর সময়ে সে হাদীসগুলো 'মশহুর' হয়ে যাওয়ায় তা দিয়ে মাসয়ালার হুকুম আহ্কাম নির্দ্ধারণ করতে পেরেছেন।

৪. সাহাবায়ে কিরামের ফাত্ওয়াসমূহ ইমাম শাফিয়ী (র.) -এর যুগে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সকল ফাতাওয়ার মধ্যে বহু মতভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকগুলি বিশুদ্ধ হাদীসের খেলাফ বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে তিনি সাহাবীগণের 'কাওল' বাদ দিয়ে সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী মাস'আলা দিতেন। আর সাহাবীগণ যে সব মাসয়ালার ব্যাপারে ঐক্যমত হননি, তিনি সে সব ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণ না করে নিজেই ইজতিহাদ করতেন এবং বলেছেন – 'هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ'

৫. ইমাম শাফিঈ (র.) দেখলেন যে, পূর্বসূরীগণের অনেক শরী'আতের সংগতিপূর্ণ কিয়াসের স্বার্থে ইসতিহ্সানের নামে সংগতিহীন কিয়াসকেও মিলিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি তাঁদের কিয়াসকে বর্জন করে নিজের ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে মাস'আলার হুকুম দিয়েছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র.) মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে সবচেয়ে অধিক হাদীস বিশারদ ছিলেন। ইলমে ফিকহে্ও তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। হাদীসের মান নির্ণয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সহীহ্ হাদীসের অনুকূলেই তাঁর অধিকাংশ ফাত্ওয়া ছিল। সুতরাং তাঁকে অনেকে আহলে হাদীস বা 'আসহাবে যাওয়াহির' মনে করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি এক লাখ হাদীস জানলে তাঁর জন্য ফাত্ওয়া দেয়া কি ঠিক হবে ? তিনি বললেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করা হল,পাঁচ লাখ হাদীস জানলে কি ফাত্ওয়া দিতে পারবে ? উত্তরে তিনি বললেন, আমারা আশা করি যে ফাত্ওয়া দিতে পারবে।[১]

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্, ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহদ্দিস দেহলবী (র.) ও খুলাসাহ্ তারীখিশ্ শরীয়াতিল ইসলাম ঃ আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ (র.) অবলম্বনে।

www.pathagar.com

১২

ফাত্ওয়ার সংজ্ঞা ও ক্রমবিকাশ

অভিধানিক অর্থের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে ফাত্ওয়া বলা হয়। চাই সে প্রশ্ন শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কিত হোক কিম্বা পার্থিব কোন সমস্যার ব্যাপারে হোক। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.) বন্দী থাকাবস্থায় তাঁর নিকট মিসরের বাদশাহর পক্ষ থেকে একটি স্বপ্নের তাবীর জানতে চাওয়া হয়েছিল। স্বপ্নটি ছিল এই যে, সাতটি সুস্বাস্থ্য গাভী অন্য সাতটি দুর্বল গাভীকে ভক্ষণ করছে। এ স্থলে 'أَفْتُونَا' (ফাত্ওয়া) শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

অনুরূপ সুলায়মান (আ.)-এর সময় সাবা কাওমের বাদশা বিল্কীস তাঁর মন্ত্রী পরিষদের কাছে যখন পরামর্শ চেয়েছিলেন, তখন তিনি 'أَفْتُونِي' (আমাকে ফাত্ওয়া দাও) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। উপরোল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই ফাত্ওয়া শব্দটি পার্থিব সমস্যার সমাধান চাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু শরী'আতের পরিভাষায় শুধুমাত্র দীনী কোন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ফাত্ওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও একাধিক হাদীস পেশ করা যেতে পারে। যেমন,

يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ط

লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের বিষয়ে ফাত্ওয়া জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ্ তোমাদের তাদের সম্পর্কে ফাত্ওয়া বলে দিচ্ছেন (৪ : ১২৭)

يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ط

লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের বিষয়ে ফাত্ওয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদের আল্লাহ্ ফাত্ওয়া বলে দিচ্ছেন (৪:১৭৬)।

উপরোক্ত আয়াত দু'টির প্রথমটিতে মহিলাদের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়টিতে ফারাইয সম্পর্কে প্রশ্ন এবং উত্তর উভয় ক্ষেত্রে 'ফাত্ওয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে উল্লেখিত রয়েছে, "الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس ।"

www.pathagar.com

(বৈধ বলে ফাত্ওয়া দেওয়া সত্ত্বেও) সে বিষয়ে যদি তোমার অন্তরে কোন খটকার সৃষ্টি হয় তবে সেটা গুনাহ। অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

اجسركم على الفتيا اجسركم على النار

ফাত্ওয়া দেওয়ার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই দুঃসাহসী যে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেপরওয়া।

উভয় হাদীসে ফাত্ওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধারণ ভাবে ফাত্ওয়া বলতে দীনি যে কোন সমস্যার সমাধানকে বুঝায়।[১]

যাহোক কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ফিক্হ গ্রন্থসমূহের সাহায্যে স্থান-কাল-পাত্র ভেদের প্রতি দৃষ্টি রেখে একজন দক্ষ ফকীহ্ বা মুফ্তী যে রায় প্রদান করেন শরী'আতের দৃষ্টিতে তাকেই 'ফাত্ওয়া' বলা হয়।

নবী করীম (সা.) -এর জীবদ্দশায় ফাত্ওয়া

সর্বপ্রথম যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেন তিনি হলেন, নবী করীম (সা.)। কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। পরবর্তীকালে নবী করীম (সা.) -এর ফাত্ওয়াসমূহ ইসলামী আহ্কামের অন্যতম মূল উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের পরেই এর স্থান। মুসলিম সমাজে এ সব হাদীস পরিচিত। সাহাবায়ে কিরাম এ সব গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষণ করেছেন। এবং কেউ কেউ কাগজে কলমেও লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। নবী করীম (সা.) -এর জীবদ্দশায় কোন সাহাবী ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন নি। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন সাহাবীকে স্বয়ং নবী (সা.) ফাত্ওয়া প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। নবী করীম (সা.) যখন হযরত মু'আয ইবন জাবাল (র.) -কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ভাবে ফয়সালা করবে? উত্তরে তিনি বলেন, আমি প্রথমত কুরআনের আলোকে সমাধান দিব। কুরআনে সমাধান না পেলে হাদীসে রাসূল (সা.) থেকে। এরপর আমার ব্যক্তিগত রায় দ্বারা সমাধান করব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে দু'আ করে বিদায় দিলেন।[২]

সাহাবায়ে কিরামের যামানায় ফাত্ওয়া

সাহাবায়ে কিরামের ফাত্ওয়া প্রদানের ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাহাবায়ে কিরামের যামানায় মাহরের কোন উল্লেখ ছাড়া এক মহিলার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই স্বামী মারা যান, তখন ঐ মহিলার মাহর কত ধার্য হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) -এর নিকট ফায়সালার জন্য যাওয়া হল। তিনি উপস্থিত সাহাবাগণের সামনে বললেন, এখন আমার রায়

১. মাওলানা তাকী উসমানী : উসূলে ইফ্তা। ২. তিরমিযী, আবূ দাউদ, ৩২৪ পৃষ্ঠা :

www.pathagar.com

(মত) দিয়ে ইজতিহাদ করা ছাড়া অন্য কোন পথ দেখছি না। কারণ কুরআন ও সুন্নাহয় এরূপ কোন স্পষ্ট হুকুম পাওয়া যাচ্ছে না। এই রায় প্রযোজ্য করায় আমি যদি সঠিক হই তবে তার প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। আর যদি ভুল করি তবে তা আমার ও শয়তানের ঘাড়ে পড়বে। উপস্থিত সাহাবাগণ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) -এর এ কথার কোন প্রতিবাদ করেন নি। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) সে ক্ষেত্রে 'মাহরে মিসাল' এর রায় দিয়ে দিলেন। সাহাবীর এ কাজ দ্বারা 'ফাত্‌ওয়া' দেওয়া প্রমাণিত হয়।[1]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য যে সকল সাহাবায়ে কিরামের ফাত্‌ওয়াসমূহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। তাঁদের সংখ্যা প্রায় ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মহিলা ও রয়েছেন। তাঁদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. বহু সংখ্যাক মাসআলার ফাত্‌ওয়াদাতা ঃ তাঁদেরকে 'مُكثرين' মুকাস্‌রীন বলা হয়।

খ. বেশী কিছু সংখ্যক মাসআলার ফাত্‌ওয়া দাতা ঃ তাঁদেরকে ' مُتوسطين ' মুতাওয়াস্‌সিতীন বলা হয়।

গ. অল্প সংখ্যাক মাসআলার ফাত্‌ওয়াদাতা ঃ তাঁদেরকে 'مُقلين' মুকিল্লীন বলা হয়।

মুকাস্‌সিরীন সাহাবা কেরাম (রা.)

মুকাস্‌সিরীন হলেন, ঐ সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যাঁদের প্রত্যেকের এত অধিক সংখ্যক ফাত্‌ওয়া বর্ণিত ও রক্ষিত আছে, যা স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করা হলে প্রত্যেকেরই এক একটি বিরাট কিতাব হয়ে যায়। এই স্তরের সাহাবাদের সংখ্যা সাত।

১. দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) (মৃত্যু ঃ ২৩ হিজরী)।

২. চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) (মৃত্যু ঃ ৪০ হিজরী)।

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) প্রথম কাতারের মুসলমান ছিলেন। নবী (সা.)-এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। (মৃত্যু ঃ ৩২ হিজরী)।

৪. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকরের (রা.) কন্যা এবং রাসূলে পাক (সা.)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৫৭ হিজরী)।

৫. হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর যুগে কাতিবে ওহী ছিলেন এবং হযরত আবূ বকর ও উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের দায়িত্ব পালন করেন।

৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)। তিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ্ ও মুফাস্‌সির ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৬৮ হিজরী)।

১. নূরুল আনওয়ার, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)। তিনি মদীনার বড় ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৭৩ হিজরী)।

মুতাওয়াস্সিতীন সাহাবা কেরাম (রা.)

মুতাওয়াস্সিতীন হচ্ছেন, ঐ সকল সাহাবা (রা.) যাঁদের ফাত্ওয়াসমূহ সংকলীত হলে প্রত্যেকেরই এক একটি ছোট কিতাব হয়ে যাবে। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বিশজন।

১. প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। (মৃত্যু ঃ১৩ হিজরী)।

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)। তিনি হুযুরে পাক (সা.) -এর সহধর্মীনী ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৬২ হিজরী)।

৩. হযরত আনাস (রা.)। তিনি নবী (সা.)-এর খাদেম ছিলেন। দশ বছর যাবৎ নবী করীম (সা.) -এর খেদমত করেছেন। (মৃত্যু ঃ ৯৩ হিজরী)।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মৃত্যু ঃ ৫৮ হিজরী)।

৫. তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)। (মৃত্যু ঃ ৩৫ হিজরী)।

৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা.)। তিনি রাসূলে পাক (সা.) -এর অনুমতিক্রমে লিপিবদ্ধ করে হাদীস সংরক্ষণ করেছিলেন। আর তিনি অতি আবিদ ও যাহিদ সাহাবী হিসাবে খ্যাত ছিলেন।

৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.)। তিনি প্রথম হিজরীতে মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে মদীনায় সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৩ হিজরীতে শহীদ হন।

৮. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)। তিনি সপ্তম হিজরী মদীনায় আসেন। (মৃত্যু ঃ ৫২ হিজরী)।

৯. হযরত সাঈদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)। তিনি ছিলেন আশারা-ই-মুবাশ্শারার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। (মৃত্যু ঃ ৫২ হিজরী)।

১০. হযরত সালমান ফারসী (রা.)। নবী করীম (সা.) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৩৫ হিজরী)।

১১. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.)। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৭৪ হিজরী)।

১২. হযরত যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা.)। তিনি আশারা-ই-মুবাশ্শার মধ্যে একজন ছিলেন (মৃত্যু ঃ ৩৬ হিজরী)।

১৩. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)। তিনি হিজরতের পূর্বে দ্বিতীয় আকাবার সময়

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে ইয়ামনের গভর্ণর মু'আল্লিম ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ১৮ হিজরী)।

১৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)। তিনি বহু সংখ্যাক হাদীস মুখস্থকারীদের অন্যতম ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৭৪ হিজরী)।

১৫. হযরত তালহা (রা.)। তিনি আশরা-ই- মুবাশ্শরার একজন সাহাবী ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৩৬ হিজরী)।

১৬. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.)। তিনি আশারা-ই- মুবাশ্শার একজন সাহাবী ছিলেন। (মৃত্যু ঃ ৩২ হিজরী)।

১৭. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.)। তিনি ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। (মৃত্যু ঃ ৫২ হিজরী)।

১৮. হযরত আবূ বাকরাহ্ (রা.)। তিনি তায়িফের যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। (মৃত্যু ঃ ৫১ হিজরী)।

১৯. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা.)। তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় আনসারী সাহাবী। (মৃত্যু ঃ ৩৪ হিজরী)।

২০. হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.)। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খুলাফায়ে বনূ-উমাইয়্যার প্রতিষ্ঠাতা। (মৃত্যু ঃ ৬০ হিজরী)।[1]

মুকিল্লীন সাহাবা কেরাম (রা.)

মুকিল্লীন ঐ সকল সাহাবা কিরামদেরকে বলা হয় যাঁদের ফাত্ওয়ার সংখ্যা অতি অল্প। এই স্তরের কোন কোন সাহাবী থেকে মাত্র একটি ফাত্ওয়া বর্ণিত হয়েছে। তথাপি তাঁদের সমস্তের ফাত্ওয়াগুলো একত্রিত করা হলে একখানা ফাত্ওয়ার কিতাব হয়ে যায়। এই শ্রেণীর সাহাবাগণের সংখ্যা ১২২ জন। এই সাহাবাগণের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত আবূ দারদা (রা.)।
২. হযরত আবুল ওয়ালিদ (রা.)।
৩. হযরত আবূ সালামা খাযুমী (রা.)।
৪. সাঈদ ইব্ন যায়িদ (রা.)।
৫. আবূ ওবায়দা ইব্নুল জাররাহ্ (রা).।
৬. হযরত ইমাম হাসান (রা.)।
৭. হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)।
৮. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.)।
৯. হযরত আবূ মাসঊদ (রা.)।
১০. হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)।
১১. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.)।
১২. হযরত আবূ তালহা (রা.)।
১৩. হযরত আবূ যার (রা.)।
১৪. হযরত আতিয়াহ্ (রা.)।

১. তাকী উসমানী ঃ উসলে ইফ্তা।

www.pathagar.com

১৫. উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.)। ১৬. হযরত নাফি' (রা.)।
১৭. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবিবাহ্ (রা.)। ১৮. হযরত জাররাদ (রা.)।
২১. হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.)। ২২. হযরত জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা.)
২৩. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা.)। ২৪. হযরত কুরাযাহ ইব্ন কা'ব (রা.)।
২৫. হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা.)। ২৬. হযরত আবূ সানাবিল (রা.)।
২৭. হযরত লাইলী বিন্ত কাইফ (রা.)। ২৮. হযরত আবূ মাহযূবাহ্ (রা.)।
২৯. হযরত মাগ্নিহ্ (রা.)। ৩০. হযরত আবূ বুরযাহ্ (রা.)।
৩১. হযরত আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা.)। ৩২. হযরত উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা.)।
৩৩. হযরত খাওলা বিন্ত তাওবিত(রা.)। ৩৪. হযরত সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রা.)।
৩৫. হযরত যিহাক ইব্ন কায়িস (রা.)। ৩৬. হযরত হাবীব ইব্ন মুসলিমা (রা.)।
৩৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনিস (রা.)। ৩৮. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামন (রা.)।
৩৯. হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.)। ৪০. হযরত সামামাহ ইব্ন আসাল (রা.)।
৪১. হযরত আবুল গাদিয়া সালমী (রা.)। ৪২. হযরত আমর ইব্ন আ'স (রা.)।
৪৩. হযরত উম্মে দারদা কুবরা (রা.)। ৪৪. হযরত যিহাক ইব্ন খলীফা মাযুনী রা
৪৫. হযরত হিকাম ইব্ন আমর গিফারী (রা.)। ৪৬. হযরত ওয়াবিসাহ ইব্ন মাবাদ আল-আসাদী (রা.)
৪৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর বারামেকী (রা.) ৪৮. হযরত আউফ ইব্ন মালিক (রা.)।
৪৯. হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা.)। ৫০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.)।
৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা.)। ৫২. হযরত আমর ইব্ন আবাসাহ (রা.)।
৫৩. হযরত ইতাব ইব্ন উসাইদ (রা.)। ৫৪. হযরত উসমান ইব্ন আবুল আ'স (রা.)।
৫৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সারহাস (রা.)। ৫৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)।
৫৭. হযরত আকিল ইব্ন আবূ তালিব (রা.)। ৫৮. হযরত আয়িয ইব্ন আমর (রা.)।
৫৯. আবূ কাতাদাহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুয়াযযাম (রা.) ৬০. হযরত উমাই ইব্ন সুলাহ্ (রা.)।
৬১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা.)। ৬২. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.)
৬৩. হযরত আতিকা ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর (রা.) ৬৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আউফ যুহরী (রা.)।
৬৫. হযরত সা'দ ইব্ন মুয়ায (রা.)। ৬৬. হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা.)।
৬৭. হযরত মুসাইয়্যাব (রা.)। ৬৮. হযরত কায়েস ইব্ন আসাদ্র (রা.)।
৬৯. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন সাহল (রা.)। ৭০. হযরত সামুরা ইব্ন জান্দাল (রা.)।
৭১. হযরত সাহল ইব্ন সা'দ আস-সাঈদী (রা.) ৭২. হযরত মুয়াবিয়া ইব্ন হিকাম (রা.)
৭৩. হযরত সাঈদ ইব্ন মাকরান (রা.) ৭৪. হযরত আমর ইব্ন মাকরুন (রা.)

www.pathagar.com

৭৫. হযরত সুহাইল ইব্‌ন সাহীল (রা.)
৭৬. হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন আতবীহ্‌ (রা.)
৭৭. হযরত সালমা ইব্‌ন আকওয়া (রা.)
৭৮. হযরত যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা.)
৭৯. হযরত জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহিল বাজালী (রা.)
৮০. হযরত জাবির ইব্‌ন সালামা (রা.)
৮১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)
৮২. হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)
৮৩. হযরত হাবীব ইব্‌ন আদী (রা.)
৮৪. হযরত কুদামা ইব্‌ন মাযউন (রা.)
৮৫. হযরত উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা.)
৮৬. উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা (রা.)
৮৭. হযরত মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা.)
৮৮. হযরত আবূ উমামাহ বাহিলী (রা.)
৮৯. হযরত মোহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা.)
৯০. হযরত খিবাব ইব্‌ন ইরত (রা.)
৯১. হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)
৯২. হযরত যামরাহ্‌ ইব্‌ন ফায়িয (রা.)
৯৩. হযরত তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা.)
৯৪. হযরত জাহির ইব্‌ন রাফী' (রা.)
৯৫. হযরত রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.)
৯৬. হযরত সাইয়্যেদাতুন্‌ নিসা ফাতিমা (রা.)
৯৭. হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়িস (রা.)
৯৮. হযরত হিশাম ইব্‌ন হাকিম (রা.)
৯৯. হযরত হাকিম ইব্‌ন খুররাম (রা.)
১০০. হযরত শারজিল ইব্‌ন সামূত (রা.)
১০১. হযরত উম্মে সালামা (রা.)
১০২. ওয়াহিয়া ইব্‌ন খলীফা কালগী (রা.)
১০৩. হযরত সাবিত ইব্‌ন কায়িস (রা.)
১০৪. হযরত সাওবান (রা.)
১০৫. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.)
১০৬. হযরত বুরাইদ ইব্‌ন খাসিব (রা.)
১০৭. হযরত রাবী'আ ইব্‌ন সাবিত (রা.)
১০৮. হযরত আবূ হামিদ (রা.)
১০৯. হযরত আবূ উসাইদ (রা.)
১১০. হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবাইদ (রা.)
১১১. আবূ মুহাম্মদ মাসউদ ইব্‌ন আউস আনসারী (রা.)
১১২. হযরত জয়নাব বিন্‌তে উম্মে সালামা (রা.)।
১১৩. হযরত আতবাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)।
১১৪. হযরত মু'আয ইব্‌ন বিলাল (রা.)।
১১৫. হযরত উরওয়া ইব্‌ন হারিস (রা.)।
১১৬. হযরত সিয়াহ্‌ ইব্‌ন রুহ্‌ (রা.)।
১১৭. হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)
১১৮. হযরত বাশীর ইবন আরত্তাহ্‌ (রা.)।
১১৯. হযরত সুহাইব ইব্‌ন সানান (রা.)।
১২০. হযরত উম্মে আইয়াম (রা.)।
১২১. হযরত উম্মে ইউসুফ (রা.)।
১২২. হযরত আবূ আবদুল্লাহ্‌ বাশীর (রা.)।[১]

তাবিঈগণের যামানায় ফাতওয়া

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং এর পরবর্তীকালে মুসলিম রাষ্ট্রের পরিধি অনেক গুণ বেড়ে যায়, দিগ-দিগন্তে ইসলামী আলো ছড়িয়ে পড়ে। বহু নতুন দেশ ও জাতির মধ্যে ইসলাম প্রসার লাভ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিত্য নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন ফাতওয়া দেওয়ার কাজ স্বাভাবিকভাবেই তাবেঈগণের দায়িত্বে চলে আসে। কিন্তু তাবেঈগণের মধ্যে

১. ফিকহ্‌ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ।

www.pathagar.com

অনেকেই শুধু ফাত্‌ওয়া প্রদানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা পছন্দ করেননি। বরং তাঁদের কেউ কেউ হাদীসের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। আবার কেউ কেউ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ইজতিহাদী শক্তি ব্যবহার করে সমাজের নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত হন। ফলে তাবেঈগণের কার্যপ্রণালী দু'ধারায় চলতে থাকে। প্রথম দলের কাজ ছিল সাধারণত হাদীস সংক্রান্ত। তবুও প্রয়োজনে তাঁরা ফাত্‌ওয়া প্রদান করতেন। দ্বিতীয় দলের আলিমগণ ফিকহ্‌ ও ফাত্‌ওয়ার কাজে বেশী ব্যস্ত ছিলেন। তবে হাদীস সংরক্ষণ হাদীস সংকলনে তাঁদের ভূমিকাও কম নয়। তাবেঈ আলিমগণের কার্যধারার এরূপ ছিল যে, তাঁরা ফাত্‌ওয়ার কাজ সাধারণত হাদীসের খেদমতের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখতেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর তাবেঈ আলিমগণ বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ধীরে ধীরে আলিম সমাজ কুরআন হাদীস থেকে মাসআলা-মাসাইল উদ্‌ঘাটনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তাই তাঁরা কুরআন হাদীসের আলোকে মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিকহ্‌ শাস্ত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে বহুবিধ মাসআলা-মাসাইল ও ফাত্‌ওয়া রচিত ও সংকলিত হয়। ইমাম শা'বী (র.) -এর 'أَبْوَابُ شَعْبِى' ও ইমাম মাকহুল (র.) -এর 'سُنَن مَكْحول' -এর উজ্জ্বল প্রমাণ। উভয় শ্রেণীর তাবেঈগণের শাগরিদ ও অনুসারীগণ ইসলামী দেশগুলিতে তাঁদের কর্মস্থল প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এ পর্যায়ের তাবেঈগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র.), হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র.)।

হযরত আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা), হযরত উরওয়াহ্‌ ইব্‌ন যুবাইর (র.), হযরত উবাইদুল্লাহ্‌ (র.), হযরত কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.), হযরত সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (র.) এবং হযরত খারিজাহ ইব্‌ন যায়িদ (র.), তাঁদেরকে একত্রে 'فقهاء سبعة' বলা হয়। তাঁরা সকলেই মদীনার কাযী ও মুফ্‌তী ছিলেন।

ইমাম যুহরী (র.), ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.), ইমাম রাবিয়াহ্‌ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.), হযরত আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্‌ (র.), হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও হযরত আবদুল মালিক ইব্‌ন জুরায়েজ (র.) মক্কা নগরীতে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেন।

হযরত ইব্‌রাহীম (রা.) নাখঈ, হযরত আমির ইব্‌ন শারজীল আশ-শাবী (র.), হযরত আলকামাহ্‌ (র.), হযরত আসওয়াদ (র.) ও হযরত মুরারা আল-হামদানী (র.) কূফা নাগরীর মুফ্‌তী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। তাছাড়া হযরত হাসান বাসরী (র.) বসরায় হযরত তাউস ইব্‌ন কাইসান (র.) ইয়ামনে ও হযরত মাকহুল (র.) শাম-সিরিয়ার মুফ্‌তী ছিলেন।

মুফ্‌তীগণের যোগ্যতা

সমাজে উদ্ভূত সমস্যাবলীর ব্যাপারে শরী'আতের আলোকে ফয়সালা দানকারী অভিজ্ঞতা

www.pathagar.com

সম্পন্ন আলিমে-দীনকে মুফ্তী বলা হয়।

এই জাতীয় মুফ্তীর যোগ্যতা যাঁচাইয়ের জন্য নিম্নেবর্ণিত গুণাগুণগুলির প্রতি সদয় দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু আল্লামা খাতীবে বাগদাদী (র.) "আল ফিকহ্ ওয়াল মুতাফাক্কিহ্" কিতাবে বলেন, সরকারীভাবে প্রতিটি আলিম ও মুফ্তীর যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। যাঁরা ফাত্ওয়া কাজের উপযুক্ত শুধুমাত্র তাঁদের দ্বারা এ কাজ করান উচিত। অন্য সকলের জন্য এহেন সুক্ষ্মকাজ থেকে বিরত থাকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাহোক যে সকল মুফ্তীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ফাত্ওয়ার মেজাজ দান করেছেন, শত বাধার মাঝেও তাঁদের এ কাজে পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করা একান্ত কর্তব্য।

মুফ্তীর গুণাগুণ

ক. মুফ্তীকে অবশ্য মুসলমান হতে হবে। কারণ শরয়ী ব্যাপারে ইসলাম ও মুসলমানের উপর অমুসলিমের কর্তৃত্ব খাটাবার কোন অধিকার নেই।

খ. ফিকহ্ -এর মাসাইল, উসূলে ফিকহ্, নাসিখ, মানসূখ ও অন্যান্য আহ্কাম সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরী।

গ. তাঁকে শরয়ী ও ফিক্হী পরিভাষা তথা-হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরুহ্ ও মুবাহ্ ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়ালীফহাল হতে হবে।

ঘ. তাঁকে কুরআন, হাদীস ও ইলমে ফিকহের জ্ঞানসহ ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী ও পরহিযগার হতে হবে।

ঙ. সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি এবং সবার জন্য তাঁর দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

চ. মুফ্তীর এমন যোগ্যতা (মালাকাহ্) থাকতে হবে যাতে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত লেখিত দীনী কিতাবসমূহ বুঝতে পারেন এবং এর থেকে যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করে ফাত্ওয়া প্রদানে সক্ষম হন।

ছ. সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রতি সচেতন থাকাও একান্ত প্রয়োজন। বলা হয়ে থাকে, মুফ্তীর জন্য "مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَحْوَالَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ" যে ব্যক্তি তাঁর যমানার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় সে জাহিল।

জ. কোন যোগ্যতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ মুফ্তীর নিকট থেকে ফাত্ওয়া এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী শিক্ষা করা তাঁর জন্য অপরিহার্য।

ঝ. একজন মুফ্তী আমল, আখ্লাক, তাক্ওয়া, পরহিযগারী, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আত্মচেতনা, দৃঢ়চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, ইবাদতের প্রতি অনুরাগ, অসাধারণ

www.pathagar.com

প্রতিভা, কর্মদক্ষ ও জ্ঞানী হবেন এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সকলের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবেন।[১]

ফাত্‌ওয়া প্রদানের নীতিমালা

যখন কোন সমস্যা মুফ্‌তীর দৃষ্টিগোচর হয় এবং মুফ্‌তী সে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অথবা যদি তাঁর নিকট কোন মাসআলার ব্যাপারে শরয়ী হুকুম জানতে চাওয়া হয়, তখন সর্বপ্রথম কুরআন করীমের -এর সমাধান খুঁজে দেখতে হবে। তাতে যদি এ ব্যাপারে সমাধান পাওয়া না যায় তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর হাদীসের মধ্যে তাঁর সমাধান খুঁজতে হবে। হাদীসেও এর কোন সমাধান পাওয়া না যায় তখন ইজমার উপর আমল করবে। অর্থাৎ যদি কুরআন ও হাদীসে তাঁর উত্তর খুঁজে না পান, অথচ সমস্যার ব্যাপারে তৎকালীন উলামা কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে যাকে ফিক্‌হী পরিভাষায় 'ইজমা' বলা হয়, সে মোতাবেক আমল করা হবে। কিন্তু যদি ইজমায়ও তাঁর সমাধান পাওয়া না যায়, তখন কুরআন হাদীসের আলোকে নিজের বিবেক খাটিয়ে উক্ত ব্যাপারে ফয়সালা করতে হবে। শরয়ী পরিভাষায় একে 'কিয়াস' বলা হয়। নীতিমালা শুধুমাত্র মুজতাহিদ মুফ্‌তীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমান কালের মুফ্‌তীদের নীতিমালা সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের 'মুফ্‌তীর জ্ঞাতব্য বিষয়াদি' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফাত্‌ওয়া প্রদানের শর্তাবলী

১. ফাত্‌ওয়া প্রদানের শর্ত প্রসংগে আল্লামা ইব্‌ন আবেদীন শামী (র.) তাঁর রচিত "قرة عيون الأخيار"(প্রথম খণ্ডের ৪৩/৪৪ পৃষ্ঠায়) গ্রন্থে বলেন ঃ

لَايَجوز أخذ الأُجرة على الإفتا باللسان ويجوز أخذ اُجرة الكتابة ومع هذا الكف عن ذالك أولى

মৌখিকভাবে ফাত্‌ওয়া দেওয়ার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয নয়। অবশ্য লিখিতভাবে ফাত্‌ওয়া প্রদানের বিনিময়ে পরিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয আছে। তবে লিখিত ফাত্‌ওয়া প্রদানের বেলায় ও পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই উত্তম।

২. যেখানে নিজের চেয়ে অন্য কোন অভিজ্ঞ মুফ্‌তী রয়েছেন, সেখানে ফাত্‌ওয়া দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামী হবেন না। বরং অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিবেন। তবে উক্ত মুফ্‌তীর অনুমতি ও পরামর্শ সাপেক্ষে সে নিজে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৩. যখন লিখিত আকারে মুফ্‌তীর নিকট কোন ফাত্‌ওয়া চাওয়া হয় তখন মুফ্‌তী প্রথমত প্রশ্নটি ধীরস্থীরভাবে পড়ে লক্ষ্য করে দেখবেন যে, প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার যোগ্য কিনা কিম্বা এর

১. ফিকহ্ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ।

www.pathagar.com

উত্তর দেওয়া হলে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা কোন অবান্তর ফিত্ন-ফাসাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? যদি প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় অথবা এর উত্তর দেওয়া হলে ভুল বুঝাবুঝি বা ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে তবে এর উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। আর যদি প্রশ্নটি উত্তর দেওয়ার যোগ্য হয় তবে প্রশ্নের সাথে সমতা রক্ষা করে যথাযথভাবে ফাত্ওয়া প্রদান করবেন।

৪. প্রশ্নকারীর প্রশ্ন পত্রে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে তবে মুফ্তী প্রশ্নকারী দ্বারা স্পষ্টভাবে লেখিয়ে নিবেন। আর সে যদি এতে অপারগ হয় তবে মুফ্তী তার থেকে মৌখিক বিবরণ শুনে নিজে প্রশ্নপত্র ঠিক করে নিতে পারেন।[১]

৫. ইস্তিফ্তায় একাধিক প্রশ্ন থাকলে প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী নয়। বরং ফাত্ওয়া প্রণয়নের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নগুলির ক্রমিক নম্বর নির্ধারিত করা যেতে পারে।

৬. ফাত্ওয়া লিখার নিয়ম এই যে, প্রশ্নের সর্বদিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ ও সরল ভাষায় উত্তর লিপিবদ্ধ করা হবে এবং শেষে বিস্তারিতভাবে কিতাবের হাওয়ালা উল্লেখ করা হবে।

৭. প্রশ্নটি যদি ইসলামের মৌলিক বিষয় বা শুধুমাত্র উসূলে দীন বা অবশ্য পালনীয় ইবাদত সম্পর্কীয় হয় তবে উত্তরে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে হবে। যেমন আল্লাহ্র একত্ববাদ, রাসূলের (সা.) রিসালাত, হাশর, মদ, মিথ্যা, ব্যভিচার ইত্যাদির হুরমত সম্পর্কীয় প্রশ্ন।

তবে ইসতিফ্তা যদি শরী'আতের ফুরূয়ী মাসাইল বা সমকালীন কোন নতুন সমস্যা সম্পর্কীয় হয়, তবে নির্ভরযোগ্য ফিকহের ফাত্ওয়ার কিতাব থেকে উদ্ধৃতি বরাত উল্লেখ করতে হবে।

৮. মুফ্তীর জন্য উচিত, যেন শান্তি মন ও সুস্থ পরিবেশে ফাত্ওয়া প্রদান করেন। প্রশ্নকারীর পীড়াপীড়ি কিম্বা চাপের মুখে তিনি যেন তাড়াহুড়া করে কোন ফাত্ওয়া না দেন।

৯. প্রশ্নকারীর আচরণে মুফ্তী কখনও বিরক্ত হবেন না। বরং ধৈর্য সহিষ্ণুতার সাথে ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ সম্পন্ন করবেন। যেমন আল্লাহ্র নবী হযরত দাউদ (আ.) -এর নিকট কতিপয় লোক মাসআলা জানার জন্য দেওয়াল ডিংগীয়ে উপস্থিত হওয়ার কারণে তিনি কোনরূপ বিরক্ত না হয়ে তাদের প্রশ্নের জওয়াব জানিয়ে দিয়েছিলেন। কারো লিখিত ফাত্ওয়া সত্যায়নের জন্য কোন মুফ্তীর নিকট পেশ হলে তাঁর দৃষ্টিতে ফাত্ওয়া প্রদানকারী যদি ফাত্ওয়া দেওয়ার ব্যাপারে অযোগ্য বলে প্রতিয়মান হয় তবে তিনি উক্ত ফাত্ওয়া সত্যায়ন করা থেকে বিরত থাকবেন, আর ফাত্ওয়া প্রদানকারী যোগ্যতা সম্পন্ন হলে সে ক্ষেত্রে তাঁর ফাত্ওয়ায় প্রমাণাদি এবং মতামত যদি সঠিক বলে বিবেচিত হয় তবে তিনি উক্ত ফাত্ওয়া

১. উসূলে ইফ্তা কিতাবের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সত্যায়িত করতে পারেন। অন্যথায় তিনি আলাদাভাবে নিজে উক্ত মাসআলার সঠিক দলীল প্রমাণের আলোকে ফাত্ওয়া প্রদান করবেন।

ফাত্ওয়া লিখার নিয়মাবলী

ক. মুফ্তী ফাত্ওয়া লিখার বেলায় হাতের লেখা সুন্দর হওয়া এবং ভাষা প্রাঞ্জল হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। এছাড়া সে ক্ষেত্রে শব্দ চয়নের বেলায় ও সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

খ. ইস্তিফ্তার লেখা যেখানে শেষ হয়, জায়গা খালি না রেখে সেই পৃষ্ঠায় নিম্নাংশ থেকেই উত্তর লেখা আরম্ভ করতে হবে, যেন অন্য কোন লেখা এর ভিতরে প্রবেশ না করা যেতে পারে।

গ. বিস্মিল্লাহ্ ও হামদ –সালাতের সাথে উত্তর পত্র লেখা শুরু করবেন।

ঘ. ফাত্ওয়া লিখা শেষে ' والله اعلم ' লিখা উচিত। এ ব্যাপারে 'বাহরুর রাইক' -এর লেখক বলেন, যদি কোন ফিক্হী মাসআলার উত্তর লেখা হয় তবে তাঁর শেষে ' والله اعلم ' আর যদি আকাইদের কোন প্রশ্নর উত্তর লেখা হয় তবে 'والله الموفق' লেখা উচিত।

ঙ. সবশেষে যে দিন ফাত্ওয়া চূড়ান্তভাবে লিখার কাজ সমাপ্ত হয় তখন মুফ্তীর দস্তখত সম্ভব হলে সীলমোহর সহ সে দিনের তারিখ লিখা বাঞ্ছনীয়।

মুফ্তীর জ্ঞাতব্য বিষয়াদী

এমন কতগুলো নিয়মনীতি নিম্নে তুলে ধরা হল যার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা একজন মুফ্তীর অবশ্য কর্তব্য। বিষয়গুলিকে এক একটি দফার অধীনে লিপিবদ্ধ করা হল।

প্রথমত ঃ ফাত্ওয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য শুধুমাত্র পাঠ্য তালিকা ভূক্ত ফিক্হের কিতাব পড়াই যথেষ্ট নয়। বরং ফাত্ওয়া প্রদানের নিয়ম-নীতি সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যায়ন করা, প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ফাত্ওয়া কিতাবসমূহ পাঠ করা এবং কোন অভিজ্ঞ মুফ্তীর সাহচর্যে থেকে তাঁর পথ নির্দেশনা লাভ করা মুফ্তীর জন্য একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত ঃ শুধু অভিজ্ঞ মুফ্তীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করলেই ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালনেই সফলতা লাভ করা যায় না। যতক্ষণ নিজের মধ্যে এমন এ দক্ষতা ও নৈপুন্য সৃষ্টি না হয়, যা দ্বারা সে উসূলে আহ্কাম, ইল্লাত ও মাসআলার কাওয়াইদ নির্দ্বিধায় অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ফাত্ওয়ার কাজে সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা ও ফিক্হ ফাত্ওয়ার বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা দ্বারাই এ গুণ অর্জিত হতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ যদি কোন ফিক্হী মাসআলা সম্পর্কে হানাফী ফকীহ্গণের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা না দেয় তবে ইতস্তত না করে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দিতে হবে।

চতুর্থত ঃ যদি কোন মাসয়ালা সম্পর্কে দুই বা ততধিক অভিমত দেখা যায় তবে সে ক্ষেত্রে 'আসহাবে তারজীহ্' রায় গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁরা যে রায়কে অগ্রাধিকার

www.pathagar.com

দিয়েছেন, মুফ্তীকে সে রায়কেই অনুসরণ করতে হবে। চাই সেটা আবূ হানীফা (র.) থেকে হোক, চাই অন্য ইমামদের। কেননা তাঁরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদকে সামনে রেখে মানুষের প্রায়োজন, সামাজিক অবস্থা মোটকথা সব দিক লক্ষ্য রেখেই কোন রায়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

পঞ্চমত ঃ মুফ্তীর শুধুমাত্র নিজ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবের উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দিবেন। নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ফিকহ্ গ্রন্থে কোন কোন মাসআলায় একাধিক অভিমতের উল্লেখ করা আছে। এ সকল অভিমতের মধ্যে লেখকের নিকট কোন অভিমতটি রাজিহ্ (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত) তা সুস্পষ্ট বাক্যে বলা না থাকলেও লেখকের কিতাব রচনায় এমন কিছু বিশেষ নিয়ম তিনি অনুসরণ করেন যা দ্বারা তাঁর নিকট অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অভিমতের সন্ধান করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন কোন ফকীহ্ একাধিক মতের কথা উল্লেখ করেন তবে প্রথমোক্ত মতটিই থাকে তার নিকট তারজীহ্প্রাপ্ত। আবার কেউ কেউ বিপরীতভাবে শেষোক্ত মতটি তারজীহ প্রাপ্ত বলে বুঝিয়ে থাকেন। মুফ্তীকে সে ফিকহ্ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের এ সকল নিজস্ব নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত থাকা আবশ্যক।

ষষ্ঠমত ঃ মুফ্তীকে অবগত থাকতে হবে, আসহাবে তাঁরজীহ্দের ব্যবহৃত বাক্য বা শব্দ সম্পর্কে, যেহেতু তারজীহ্ কখনও সরীহ্ অর্থাৎ স্পষ্টাকারে হয়ে থাকে।

যেমন - وهو الصحيح - هو الاصح - وبه يفتى المعتمد - ইত্যাদি। উপরোল্লিখিত বাক্যই তাঁর অগ্রাধিকারের পদমর্যাদা বলে দিচ্ছে। যেমন ইমাম কাযী খান (র.) বলেন, আমার লিখায় যেখানে একাধিক মতের উল্লেখ থাকবে সেখানে আমার কাছে প্রথম মতই বেশী গ্রহণযোগ্য। মুলতাকা আল-আবহুর ও বাদায়ে প্রণেতাদ্বয়ও সাধারণত তাঁদের প্রথম রায়কেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হিদায়ার লেখক এবং মাবসূতের লেখক অন্যতম। প্রথমত, অন্যান্যদের মত ও প্রমাণাদী বর্ণনা করেন। অতঃপর সবশেষে তাঁদের অধিক পছন্দের মতটি প্রমাণাদীর দ্বারা অলংকৃত করেন। আবার কারো অভ্যাস হল যে, তিনি যে মত পছন্দ করেন শুধুমাত্র তারই দলীল প্রমাণ ব্যক্ত করেন। আবার কেউ তাঁর উল্টো করেন অর্থাৎ প্রতিটি মতের বিরুদ্ধে প্রমাণাদির পাহাড় উল্লেখ করেন তবে যে, মতটি তাঁর পছন্দের সে সম্পর্কে চুপ থাকেন।

মোদ্দাকথা, এ জাতীয় তারজীহ্ একমাত্র লিখকদের লেখার দ্বারাই বুঝে নিতে হয়। তাই একে অস্পষ্ট তারজীহ্ বা তারজীহে ইলতিযামী বলা হবে।

সপ্তমত ঃ তারজীহ্ এর জন্য বেশ কতগুলি শব্দ আছে। তবে সেগুলি সবই সমমানের নয়। তন্মধ্যে কিছু শব্দ অন্য কিছু শব্দের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। সবচেয়ে শক্তিশালী

www.pathagar.com

'عليه عمل الامة' তারপর 'عليه الفتوى' এরপর 'وبه يفتى' তারপর যথাক্রমে -

'الفتوى عليه' ও 'هو الصحيح' -এর পরের সমস্ত অগ্রাধিকার বোধক বাক্যই শব্দ সমমানের।

যেমন -

وهو الاشبه – وبه ناخذ – وعليه فتوى مشائخنا – و هو الأوجه و هو الأصح – وهو المعتمد

ইত্যাদি।

অষ্টমত ঃ যদি কোন মাসাআলায় দু'রকম মত পাওয়া যায় এবং উভয় মতটি আসহাবে তারজীহ্ পক্ষ থেকে গ্রহীত হয়েছে বলে দেখা যায়। তবে দেখতে হবে যে উভয় মত এক ব্যক্তি থেকেই উদ্ঘাটিত হয়েছে কি না। একাধিক ব্যক্তি থেকে প্রথম অবস্থা হলে শেষ মতটি হবে গ্রহণযোগ্য। এটা তারিখের দ্বারা জানতে হবে কোন্টি আগের কোন্টি পরের। আর এরূপ ক্ষেত্রে যদি সঠিক তারিখ জানা না যায়, অথবা উভয় মত একাধিক ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়, তবে এমতাবস্থায় মুফ্তীর নিকট যে মতটি তারজীহ্ পায় সেটা তিনি গ্রহণ করবেন। আর যদি কোন মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া মুফ্তীর পক্ষে সম্ভব না হয় তখন মুফ্তী তাঁর বিবেকের সমর্থনে যে কোন একটি মত গ্রহণ করতে পারেন।

এ প্রসংগে তারজীহ্ দেওয়ার কয়েকটি কারণ বর্ণিত হচ্ছে।

ক. যদি কোন স্থানে তারজীহ্ সরীহ্ ও তারজীহ্ ইলতিযামী অর্থাৎ স্পষ্ট তারজীহ্ ও অস্পষ্ট তারজীহ্ একত্র হয়ে থাকে তবে সরীহ্ বা স্পষ্ট তারজীহ্ -এর উপর আমল করতে হবে।

খ. উভয় তারজীহ্ -এর মধ্যে যদি একটি 'أقوى' অধিকতর শক্তিশালী হয়, তবে তার উপর আমল করতে হবে। যেমন ঃ

১. একটি মত 'মতন' বা মূল কিতাবে লেখা আছে। পক্ষান্তরে অন্য মতটি উক্ত কিতাবের শরাহ বা ব্যাখ্যার কিতাবে লেখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রথম মতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. একটি মত যাহিরি রিওয়ায়েতে পাওয়া যাচ্ছে অপরটি নাদেরে রিওয়ায়েতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানেও প্রথমটিকে গ্রহণ করতে হবে।

৩. যদি কোথায়ও একটি মত ইমাম আবূ হানীফার (র.) হয়, অপরটি সাহিবাইনের মত হয় তবে এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমটির উপর ফাত্ওয়া দিতে হবে।

৪. এমন কোন মাসআলা যেটাকে অধিকাংশ ফকীহ্গণ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বিপক্ষে খুই কম ফকীহ্ রয়েছেন। এমতাবস্থায় অধিকাংশের অভিমত মেনে নিতে হবে।

৫. যদি দু'টি মতের মধ্যে একটি হয় কিয়াস সম্মত আর অপরটি হয় ইসতিহ্সন সম্মত তবে দ্বিতীয়টি গ্রহনীয় হবে।

www.pathagar.com

যদি উভয় মতের মধ্যে একটি ' أَنفع لِلفقراء ' অর্থাৎ গরীবের জন্য অধিক কল্যাণকর হয়, তবে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। যেমন, যাকাতের বেলায় আমাদের দেশে স্বর্ণের নেসাব সাড়ে সাত তোলা হিসাবে ধারা হলে অনেকের উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্যকে নেসাব ধরা হলে এটা গরীবের জন্য হবে লাভজনক। কাজেই মুফ্তী এটাই গ্রহণ করবেন।

২. ওয়াক্ফ সম্পতি বা ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার কোন ব্যাপারে যদি দু'টি মত পাওয়া যায়, তবে যে মতটি ওয়াকফের জন্য উল্লেখযোগ্য লাভজনক হবে মুফ্তী সে মতটিই গ্রহণ করবেন। 'হদ্' সম্পর্কীয় কোন মাসআলায় যদি দু'টি বিপরীত মত পাওয়া যায়, একটি মতে 'হদ্' সাব্যস্ত হয়, আর অপর মতে 'হদ্' সাব্যস্ত হয় না। এক্ষেত্রে যে মতে 'হদ্' সাব্যস্ত হয় না মুফ্তী সেটি গ্রহন করবেন। কোন মাসআলার ব্যাপারে যদি হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মত দেখা যায় তবে মুফ্তী হারাম -এর মতের উপর ফাত্ওয়া দেবেন।

ফায়দা ঃ যে ছয়টি কিতাবকে সর্বসম্মতিক্রমে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' 'হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেগুলোর নাম যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হল,

১. আল- মাবসূত (اَلْمَبْسُوط), ২. আল- জামিউস্ সাগীর (اَلْجَامِع الصغير),
৩. আল- জামিউল কাবীর (اَلْجَامِع الصغير), ৪. আয্- যিয়াদাত (اَلزِّيَادَات),
৫. আয্- সিয়ারুস সাগীর (اَلسير الصغير), ৬. আয্- সিয়ারুল কাবীর। (اَلسير الكبير),

উপরোল্লিখিত কিতাবগুলো ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক রচিত এবং তা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর আদেশক্রমে রচনা করা হয়েছে। আর যে কিতাবগুলোর নামের শেষে 'সাগীর' শব্দ লেখা আছে সে গুলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে সত্যায়িত হয়েছে।

www.pathagar.com

১৩

তাক্লীদ ও তাক্লীদে শাখ্সী

তাক্লীদ

'তাক্লীদ' (تقليد) শব্দটি আরবী। অর্থ-গরদানে হার, রশি ইত্যাদি পরিয়ে দেওয়া। ব্যবহারিক অর্থে অনুসরণ করা, বাধ্যতামূলকভাবে অন্যের কথা মান্য করা।

তাক্লীদের সংজ্ঞা প্রসংগে আল্লামা সাইয়িদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.) বলেন, 'তাক্লীদ' হল, কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির সত্যতায় বিশ্বাস করে প্রমাণের প্রতি দিকপাত ব্যতীত তাঁর অনুসরণ করা। অন্য কথায় প্রমাণ ছাড়াই অপরের মতামত গ্রহন করাকে 'তাক্লীদ' বলা হয়।

ফিকহ্ শাস্ত্রের নীতিমালা বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতে তাক্লীদের সংজ্ঞা হল, "العمل بقول إمام مجتهد من غير مطالبة دليل" প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত কোন মুজ্তাহিদ ইমামের কথা অনুসারে আমল করাকে তাক্লীদ বলে। প্রমাণ অন্বেষণ না করার অর্থ– অনুসরণকৃত মুজ্তাহিদের কাছে কোন প্রমাণ নেই, অথবা কোন প্রমাণ ছাড়াই মুজতাহিদের মনগড়া কথার উপর আমল করা হচ্ছে তা নয়, বরং প্রকৃত বিষয় হল, মুজতাহিদের কাছে অবশ্যই কোন না কোন প্রমাণ আছে। কিন্তু মুকাল্লিদ অনুসরণের জন্য তা অন্বেষণ করা আবশ্যকবোধ করবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, তাক্লীদকারী ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে প্রমাণ অন্বেষণের শর্ত করা ছাড়াই যদি প্রমাণ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় অথবা নিঃশর্তভাবে তাক্লীদ করার পর যদি হুকুমের দলীল জানতে সচেষ্ট হয়, তবে তা তাক্লীদের পরিপন্থি হবে না। মুকাল্লিদ তাঁর ইমামের প্রতি এরূপ আস্থা পোষণ করবে যে, অনুসরণীয় বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামের কাছে অবশ্যই প্রমাণ আছে এবং তা সত্য। মুকাল্লিদের তা বোধগম্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে প্রমাণ পাওয়া আর না পাওয়ার উপর ভিত্তি করে তাক্লীদে কোনরূপ ব্যতিক্রম হবে না।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর মূলত আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা.) -এর ইত্তিবা অনুসরণ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর অনুসরণ ফরযের কারণ এই যে, আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত, আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ প্রাপ্তির তিনিই একমাত্র মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) -এর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম পালন করা আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) -এর অনুসরণের জন্য অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের দিকে ধাবিত হতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, কুরআন ও হাদীসের সব মর্মই কি সব মানুষ সমভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম ? না-তা নয়। বরং কুরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক. যে সব মর্ম অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তা উদ্ধারে কোন সন্দেহ, অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। যথা – নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়া। যিনা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়া। এসবের হুকুম কুরআন ও হাদীস হতে সবাই উদ্ধার করতে সক্ষম। তাই এই শ্রেণীর মর্ম অনুধাবনে ইজতিহাদ ও তাক্‌লীদের কোন প্রয়োজন নেই।

দুই. এমন সব আয়াত ও হাদীস যার মধ্যে কোন না কোন অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। যথা–

১. আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ

اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ

তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন 'কুরূ' (قروء) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনের জন্য) অপেক্ষা করবে। অত্র আয়াতে 'কুরূ' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। যার এক অর্থ হায়িয (ঋতুস্রাব) ও অন্য অর্থ 'তুহ্‌র' (পবিত্রাবস্থা)। এ আয়াতে কোন অর্থটি উদ্দেশ্য হবে তাতে দ্বিধা বিদ্যমান। তাই আয়াতের যুক্তিযুক্ত অর্থ নিরূপণে গবেষণার প্রয়োজন। যা সর্ব সাধারণের জন্য সম্ভব নয়।

২. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) -এর বাণী

مَنْ لَمْ يذر الْمُخَابرة فليُؤْ ذن بِحَرب مِنَ اللّٰهِ وَرَسوله ・

যে ব্যক্তি মুখাবারাহ্‌ পরিত্যাগ করবে না, সে যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) -এর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় (আবূ দাঊদ)।

এখানে অস্পষ্টতা এই যে, 'মুখাবারাহ্‌' (ভূমি চাষ ব্যবস্থা) বহু প্রকারে হতে পারে, যথা - টাকার বিনিময়ে, ফসলের অংশের বিনিময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে, নির্দিষ্ট স্থানের ফসলের বিনিময়ে। এ হাদীসে কোন প্রকার উদ্দেশ্য, তা নিরূপণ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) -এর বাণী

لَاصلٰوة لمن لَم يقرأ بِفاتحةِ الكتاب

যে ব্যক্তি (নামাযে) সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তাঁর নামায হবে না।

www.pathagar.com

অপর একটি হাদীসে আছে – রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায আদায় করবে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত হিসাবে গন্য হবে।

হাদীসদ্বয়ের মধ্যে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত পড়া বিষয়ে দ্বন্ধ বিদ্যমান। যার সমাধান সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এরূপ অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব নিরসনে প্রত্যেক ব্যক্তি হয়তো নিজ নিজ বিবেক, বিবেচনা অনুযায়ী আমল করবে। অথবা কোন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করবে। একথা অনস্বীকার্য যে, এরূপ বিষয় সাধারণ মানুষের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মারাত্মক ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। অপর দিকে কুরআন হাদীস বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণে সে আশঙ্কা থাকে না। কারণ তাঁদের ইল্ম, আমল, তাক্ওয়া ও ইখ্লাসের সাথে সাধারণ লোকের কোন তূলনা হয় না। এছাড়া তাঁদের যুগ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর যুগের নিকটতম হওয়ার কারণে তাঁরা সে যুগের পরিবেশ পরিস্থিতি ও সার্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন। ফলে কুরআন ও হাদীসের মর্ম উদ্ধার করা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল, যা পরবর্তীদের জন্য মোটেই সহজ সাধ্য নয়। সেই মুজতাহিদ ইমামগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে কুরআন ও হাদীসের অন্তর্নিহিত হুকম আহ্কাম সম্বলিত ফিকহ্ শাস্ত্রের অভ্যূদয় ঘটেছে। এ প্রেক্ষিতে সে সকল ইমাম মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা পরবর্তী লোকদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বস্তুত এ অনুসরণকেই তাক্লীদ বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ইন্তিকালের পর কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উদ্ধারের জন্য সাহাবীগণ একে অপরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতেন। পরবর্তীতে উলামায়ে কিরামের মধ্যে এই ধারা অব্যাহত থাকে। এ ভাবেই তাক্লীদের উন্মেষ ঘটে। সাহাবায়ে কিরামের যুগের তাক্লীদ ও পরবর্তী যুগের তাক্লীদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। বস্তুত তাক্লীদ দুই প্রকার ঃ

১. তাক্লীদে মুত্লাক, (সাধারণ অনুসরণ) ব্যক্তি বিশেষকে অনুসরণ না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের মতামত অনুসরণ করা।

২. তাক্লীদে শাখ্সী (ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ) অর্থাৎ শরী'আতের সামগ্রিক বিষয়ে একজন ইমামের অনুসরণ করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, মাযহাব অর্থ চলার পথ। ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদীস। পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পূরক দু'টি উৎস ইজমা ও কিয়াসের সংযোজন ঘটে।

মুজতাহিদ ইমামগণ এই চারটির ভিত্তিতে ইসলামী শরী'আতকে পূর্ণাঙ্গরূপে সুবিন্যস্ত

www.pathagar.com

করেছেন মাত্র। কুরআন ও হাদীস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্তেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। এর ফলে অনেক মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী সময়ে সে সবের মধ্যে চারটি মাযহাবের উপরে মুসলিম মিল্লাতের ইজ্‌মা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চারটি মাযহাব হলো ঃ ১. হানাফী, ২. শাফিয়ী, ৩. মালিকী ও ৪. হাম্বলী।

এই চার মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করলেই কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাক্‌লীদের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা, সকল ক্ষেত্রে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতেই সমাধান পাওয়া যেত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর অনুপস্থিতিতে সে যুগেও তাক্‌লীদের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ইন্তিকালের পর নূতন বিষয়ে ওহী দ্বারা শরী'আতের সমাধান পাওয়ার দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সাহাবা-ই-কিরামদের মধ্যে ইজতিহাদ ও তাক্‌লীদের সূচনা হয়। তবে সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ তাক্‌লীদে শাখ্‌সীর অনুসারী হলেও তাক্‌লীদে মুতলাকই তখন অধিক প্রচলিত ছিল। এই তাক্‌লীদে মুত্‌লাকের ধারা ক্রমান্বয়ে তাক্‌লীদে শাখ্‌সীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। হিজরী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে তাক্‌লীদে শাখ্‌সীও প্রচলিত ছিল। এবং তখন মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী মাসাইলের প্রসারের ফলে বহু মাযহাব সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে মুসলিম মিল্লাত হানাফী, শাফি'য়ী, মালিকী ও হাম্বলী এ চার মাযহাব অনুসরণের উপর (তাক্‌লীদে শাখ্‌সীর উপর) ঐক্যমত পোষণ করে। কেননা পূর্ণ ইজতিহাদী ক্ষমতাসম্পন্ন আর কোন যোগ্যতম ব্যক্তির আবির্ভাব হয় নি। বর্তমানে তাক্‌লীদ বলতে তাক্‌লীদে শাখ্‌সীকেই বুঝানো হয়। বর্তমানে এ মাযহাব চতুষ্ঠয়ের মুকাল্লিদগণ সকলেই আহলে হক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত।

তাক্‌লীদে শাখ্‌সী ও তার প্রমাণ

কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে এর সঠিক মর্ম উদ্ধার করে আমল করা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই শরী'আত মোতাবেক আমল করার জন্য কোন ইমামের অনুসরণ অপরিহার্য, এ কথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। সাহাবা-ই-কিরামের যুগে ব্যাপকভাবে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ তাক্‌লীদের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে মুজতাহিদ ইমামগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে কুরআন ও হাদীসের অন্তর্নিহিত হুকুম-আহ্‌কাম সম্বলিত 'ফিক্‌হ্ শাস্ত্র' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন মুসলমানরা কোন না কোন মাযহাবের তাক্‌লীদ স্বীকার করে নেয়। সে প্রেক্ষিতে তাক্‌লীদে শাখ্‌সী সর্বাত্মকরূপ পরিগ্রহ করে। ইজতিহাদের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। তবে উক্ত মাযহাবগুলো একটি অপরটির সাথে মিলেমিশে শেষ পর্যায়ে মাত্র চারটি মাযহাবে সীমাবদ্ধ হয়।

www.pathagar.com

কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মাপকাঠীতে মুসলিম মিল্লাতের নিকট উক্ত চারটি মাযহাবই সত্য ও সঠিক বলে স্বীকৃতি লাভ করে। এবং এ চার মাযহাবের অনুসারী সকলেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, 'তাক্লীদে শাখ্সী' শুধু বৈধই নয় বরং অপরিহার্যও বটে। এর সমর্থনে বহু প্রমাণও রয়েছে। নিম্নে তাঁর কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم إنى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى وأشار إلى أبى بكرو عمر.

হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি জানি না কতদিন তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার পরবর্তীতে এ দু'জনের অনুসরণ করবে। এই বলে তিনি আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর দিকে ইংগিত করলেন (তিরমিযী)।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পরবর্তীকালে তাঁদের দু'জনের খলীফা হওয়ার ইংগিত রয়েছে। এবং তাঁদের খিলাফতের সময়ে তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশও এ হাদীসে দেওয়া হয়েছে। আর এটা সবার জানা যে, কোন এক সময়ে মাত্র একজনই খলীফা হয়ে থাকেন। সুতরাং যিনি যখন খলীফা থাকবেন তখন শুধুমাত্র তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। হাদীসের ভাষ্যে একথাই বুঝা যায়। বলা বাহুল্য যে, নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির কথা মান্য করাই 'তাক্লীদে শাখ্সী।'

عن أسود بن يزيد رضى الله عنه قال اتانا معاذ باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفى وترك ابنه واختا فقض للابنة بالنصف وللاخت بالنصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى.

হযরত আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মু'আয (রা.) ইয়ামনে আমাদের কাছে শিক্ষক ও আমীর হিসেবে আগমন করলেন। আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক কন্যা ও এক ভগ্নি রেখে মারা গিয়েছে তাঁর সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে ? তিনি তখন অর্ধেক কন্যার জন্য ও ভগ্নির জন্য অবশিষ্ট অর্ধেক প্রদানের ফয়সালা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন জীবিত ছিলেন (আবূ দাউদ)।

এই হাদীসে এক দিকে যেমন ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণিত হয়, অনুরূপ তাক্লীদও

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মু'আয (রা.) -কে ইয়ামানের আমীর ও শিক্ষক মনোনীত করে পাঠিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানকার অধিবাসীদের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর অনুসরণ করাও অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন। এটাই 'তাক্‌লীদে শাখ্‌সী'।

সুনানে আবূ দাউদ ও জামে' তিরমিযী শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত হুযাইল ইব্‌ন-শুরাহ্‌বীল (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কিছু লোক কোন এক বিষয়ে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) -এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার জবাব দেন। এবং উক্ত বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) -এর নিকটও জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দেন। তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) -এর নিকট সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর বিপরীত সমাধান দেন। তখন লোকগুলো পূণরায় আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) -এর নিকট ফিরে এসে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) যে সমাধান দিয়েছিলেন তাঁকে তা অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, "لَا تَسْئَلُوْنِى مَا دَامَ هٰذَا الحبر فِيكم" যতদিন এই বিজ্ঞ আলিম তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবেন, ততদিন তোমরা আমার কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না (আবূ দাউদ)।

এ কথায় আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) লোকগুলিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) -এর অনুসরণ (তাক্‌লীদে শাখ্‌সী) করার নির্দেশ দেন। এতেও তাক্‌লীদে শাখ্‌সী প্রমাণিত হল।

হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,একদা মদীনাবাসী কিছু লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) -কে এমন একজন মহিলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, যে মহিলা হজ্জের মধ্যে তাওয়াফে ইফাযাহ (ফরয তাওয়াফ) করার পর হায়িযা (ঋতুমতী) হল, তাঁর সম্বন্ধে শরী'আতের হুকুম কি? জবাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন,সে বাড়ী রওয়ানা করে যাবে (অর্থাৎ তাঁর বিদায়ী তাওয়াফ করা প্রয়োজন হবে না) এতদ্‌শ্রবণে মদীনাবাসী লোকগুলি বললো, "لا نتبعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا" হে ইব্‌ন আব্বাস (রা.)! আমরা আপনার অনুসরণ করব না, কারণ আপনি যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) -এর বিপরীত ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তখন তাঁদেরকে মদীনায় ফিরে গিয়ে বিষয়টির প্রকৃত হুকুম অন্বেষণ করার পরামর্শ দেন। তাঁরা মদীনায় ফিরে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) -এর মাধ্যমে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.) -এর অনুরূপ ঘটনায় স্বয়ং নবী করীম (সা.) -এর দেওয়া সমাধান জানতে পারেন। যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) -এর দেওয়া সমাধানের অনুরূপ ছিল। এরপর বিষয়টি হযরত যায়িদ (রা.) -কে জানানো হলে, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। (এ ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে)।

www.pathagar.com

এখানে লক্ষণীয় যে, মদীনাবাসী হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) এর তাক্‌লীদ করতেন যার কারণে তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর মত ব্যক্তিত্বের কথাও গ্রহণ করতে রাযী হননি। এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাঁদের এ উক্তির কোন প্রতিবাদও করেন নাই। যদি প্রকৃতই তাক্‌লীদে শাখ্‌সী না জায়িয হত, তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতেন।

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত 'তাক্‌লীদে মুত্‌লাক' -এর স্থলে পরবর্তী সময়ে 'তাক্‌লীদে শাখ্‌সী' গ্রহণ করার কারণ হলো প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্বাভাবিকভাবে তাক্‌লীদে শাখ্‌সীর প্রয়োনীয়তা অনুভূত হয়নি। কেননা তখন প্রায় সবাই কুরআন ও হাদীস হতে নিজে নিজেই বেশীর ভাগ মাসআলা সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই সক্ষমতা লোপ পায়।

তাছাড়া তখনও শরী'আতের প্রতিটি বিষয়ে কোন মুজতাহিদের ফায়সালা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যাতে কোন এক জনের অনুসরণই যথেষ্ট হয়। এ কারণে তখন বিভিন্ন জনের অনুসরণ করা হত।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলমানদের সময়কাল নবী করীম (রা.)-এর যুগের কাছাকাছি হওয়ার কারণে তাঁদের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছিল না বললেই চলে। তাঁরা সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে 'তাক্‌লীদে মুত্‌লাক' করতেন না। বরং যখন যে বিষয়ে যাঁর ফায়সালা সঠিক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন তখন সে বিষয়ে তাঁর ফায়সালা গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ চাহিদা মত বিভিন্ন মুজতাহিদের ফায়সালা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাক্‌লীদে মুত্‌লাক অনুযায়ী শরী'আতের যে কোন বিষয়ে যে কোন ইমামের অনুসরণ অবধারিত থাকলে শরী'আতের বিধি-বিধান খেল-তামাশায় পরিণত হয়ে পড়ে। যেমন - ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর মতে শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে তাতে অযূ ভঙ্গ হয় না, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তাতে অযূ ভঙ্গ হয়। আবার ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর মতে মহিলাদের শরীর স্পর্শ করলে তাতে অযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তাতে অযূ ভঙ্গ হয় না। কোন ব্যক্তি যদি এ মত পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফি'য়ী (র.) -এর এবং মহিলাদের শরীর স্পর্শ করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অনুসরণ করেন, তবে তা বৈধ হবে না। কারণ, এ সুবিধাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। এরূপ সুবিধাবাদের দ্বারা শরী'আতের মাসআলা মাসাইল খেলো হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। এ জন্যই নির্দিষ্টভাবে মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো এক ইমামের তাক্‌লীদ করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

উল্লেখিত কারণে চতুর্থ শতাব্দীর উলামায়ে কিরামের যুগে তাক্‌লীদে মুত্‌লাকের অনুমতি রহিত হয়ে 'তাক্‌লীদে শাখ্‌সী' ওয়াজিব হওয়ার উপর ইজ্‌মা প্রতিষ্ঠিত হয় (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যা সাহাবা-ই কিরামদের যুগে ওয়াজিব ছিল না, তা পরবর্তীতে ওয়াজিব হল কি করে ? এ প্রশ্নের জবাব আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) তাঁর 'আল্-ইনসাফ ফী বায়ানি সবাবিল ইখ্‌তিলাফ' নামক পুস্তকে এ ভাবে প্রদান করেছেন যে, ওয়াজিব দুই প্রকার - ১. ওয়াজিব লি-আইনিহি ও ২. ওয়াজিব লি-গাইরিহি।

যা আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর নির্দেশে সরাসরি ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে তাকেই 'ওয়াজিব লি-আইনিহি' বলে। এই ওয়াজিব অপরিবর্তনীয় এবং এর উপর আমল করা অপরিহার্য। এই 'ওয়াজিব লি-আইনিহি' পালনের জন্য কোনো পন্থাবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়লে ফুকাহায়ে কেরামের মতে সে পন্থা অবলম্বন করাও ওয়াজিব হয়ে যায়। এরূপ ওয়াজিবকেই 'ওয়াজিব লি-গাইরিহি' বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর যুগে হাদীস সংরক্ষণ ওয়াজিব ছিল। সাহাবা-ই-কিরামদের স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট প্রখর ছিল। তাই মুখস্ত করার মাধ্যমে তাঁরা হাদীস সংরক্ষণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের স্মৃতি যখন দুর্বল হয়ে গেল তখন হাদীস লেখাও ওয়াজিব হল। তাক্‌লীদের বিষয়টিও তদ্রূপ। সাহাবা ও তাবিঈনে কিরামদের যুগে মুজতাহিদগণ এমন ব্যক্তিদের জন্য তাক্‌লীদে মুত্‌লাক ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীতে যখন মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রবণতা বেড়ে গেল, তখন তাক্‌লীদে শাখ্‌সীকে ওয়াজিব করা হল। মূলত একটা বিরাট বিপর্যয় এড়ানোর জন্যই তাক্‌লীদে শাখ্‌সীকে ওয়াজিব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাক্‌লীদে শাখ্‌সী ওয়াজিব হওয়ার উপরে উম্মাতে মুহাম্মাদীর ইজ্‌মা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী কালের মুসলমানের জন্য যা অনিবার্যভাবে পালনীয়।

তাক্‌লীদকে অস্বীকার শুধু একটা স্বীকৃত ওয়াজিবকেই অস্বীকার করা নয় বরং তা এ ব্যাপারে 'ইজমায়ে উম্মাত'কেও অস্বীকার করা বটে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাক্‌লীদের দলীল

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার 'উলূল্ আম্‌র'-এর অনুসরণ করবে। (৪ ঃ ৫৯)

www.pathagar.com

যদিও অধিকাংশ মুফাস্‌সীরের মতে 'উলুল আম্‌র' এর অর্থ হচ্ছে শাসক। তবুও বহু বিখ্যাত মুফাস্‌সীর বলেছেন, এর অর্থ মুজতাহিদ ও ইমাম। এদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.), জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.), হাসান বাসরী, আতা ইব্‌ন আবূ আরাবাহ্ আতা ইব্‌ন সাইব, আবূল আলীয়া (র.) প্রমুখ মনিষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এ আয়াত হচ্ছে তাক্‌লীদের সুস্পষ্ট দলীল।

২. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَاِذَا جَاءَ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اُولِى الاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ط

যখন তাঁদের কাছে আসে কোন নিরাপত্তার বিষয় অথবা কোন ভীতির বিষয় তখন তাঁরা তা প্রচার করে। যদি তাঁরা-তা রাসূলও তাঁদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় আলিম (উলূল আম্‌র) -দের নিকট উপস্থিত করত তবে তাঁদের মধ্য হতে যারা উহা যাচাই বাছাই করে তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানতে পারত (৪ ঃ ৮৩)।

আলোচ্য আয়াতে উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে মুজতাহিদগণের অভিমত গ্রহণ করার প্রতি ইংগিত রয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের জন্য তাক্‌লীদের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় (তাফসীরে কবীর)।

৩. কুরআন মজীদে আছে,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ٥

অতঃপর কেন বের হয় না প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট দল, যেন তারা দীনের আহ্‌কাম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং যখন তারা তাদের কাউমের কাছে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা সতর্ক হয় (৯ ঃ ১২২)।

এ আয়াতে কিছু সংখ্যক লোকদের ইল্‌ম দীনে গভীর জ্ঞান-আহরনের কথা বলা হয়েছে। এবং তাঁদের উপর কাউমের লোকদেরকে ভয় দেখাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে কাউমের লোকদের জন্য তাঁদের কথা মান্য করা অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হয়। এরূপ মান্য করাকেই 'তাক্‌লীদ' বলা হয়।

৪. আল্লাহ্ তা'আলার অমোঘ নির্দেশ,

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ٥

www.pathagar.com

তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।

বস্তুত যারা জানে না তাঁদেরকে এ আয়াতে আলিমদের নিকট থেকে জেনে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদ্বারা তাক্‌লীদ করার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

৫. সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ،

(হে আল্লাহ্) আমাদিগকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাঁদের পথ যাদের উপর আপনি নিয়ামত দান করেছেন (১ ঃ ৫-৬)।

অন্য আয়াতে এই নিয়ামত প্রাপ্তদের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা যাদের প্রতি নিয়ামত বর্ষণ করেছেন, তাঁরা হলেন, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ।

এ আয়াতের সাথে সূরা ফাতিহার আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই চার শ্রেণীর নিয়ামতভুক্ত লোকদের পথপ্রাপ্তির প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রকারান্তরে এদের পদাংক অনুসরণের আদেশ ও প্রদান করেছেন। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বকালের সৎকর্মশীলগণ শামীল এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তাঁদের ইখ্‌লাস, খিদমত, জনপ্রিয়তা এর প্রমাণ।

৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ"انتموابى و ليأتم بكم من بعدكم" তোমরা আমার অনুসরণ করবে। এবং তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের অনুসরণ করবে। হাদীসটি জামা'আতে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়ে থাকলেও এর আবেদন সার্বজনীন ও ব্যাপক। সুতরাং নামাযের বাইরেও শরী'আতের মাসআলা মাসাইলের ব্যাপারে শীর্ষ স্থানীয় ইমাম হিসাবে যাঁরা স্বীকৃত তাঁদের অনুসরণের নির্দেশনাও এর মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং এ হাদীস দ্বারাও তাক্‌লীদ প্রমাণিত হয়।

عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين وتاويل الجاهلين.

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-আযারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ এই ইল্‌ম পরবর্তী যুগের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করবেন, যারা

www.pathagar.com

এ ইল্‌ম (ইসলামী জ্ঞান) থেকে চরম পন্থীদের বিকৃত করণ, বাতিল পন্থীদের ষড়যন্ত্র ও মূর্খদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দুরীভূত করবেন (বায়হাকী)।

বস্তুত ইমামগণ দীনী শিক্ষায় অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। হাদীসের ভাষ্যমতে তাঁরাই চরম বাতিল পন্থীদের বিকৃত ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দুরীভূত করবেন এবং করেছেন ও । তাই সঠিক পথে চলার জন্য তাঁদের অনুসরণ অপরিহার্য।

তাক্‌লীদ বিরুদ্ধে পেশকৃত প্রমাণাদির জওয়াব

ইতিপূর্বে তাক্‌লীদ অনিবার্য হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাক্‌লীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর জওয়াব পেশ করা হল ঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا

এবং যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা যার উপর আমাদের পূর্ব পুরুষদের পেয়েছি তার অনুসরণ করব।

এ আয়াতে পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করাকে কাফিরদের কর্ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাক্‌লীদের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং তাক্‌লীদও বৈধ হতে পারে না।

কিন্তু এ আয়াতের প্রকৃত মর্মের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, তাদের এ যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, কাফিরগণ ঈমান গ্রহণ না করার ব্যাপারে তাদের মূর্খ পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুসরণের যে যুক্তি খাড়া করত, মূলত আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে তারই নিন্দা করেছেন। তাই এ আয়াত ইমাম ও মুজতাহিদগণের তাক্‌লীদের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

কাফিরদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণের ব্যাপারটি ছিল আল্লাহ্ পাকের আয়াত প্রত্যাখ্যান করে কুফ্‌রীর উপরে বহাল থাকার লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে ইমাম ও মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা হয় আল্লাহ্‌র দীন ও শরী'আতের উপর সঠিকভাবে আমল করার উদ্দেশ্যে। উভয়ের অনুসরণ সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্যে। সুতরাং তাক্‌লীদের বিরুদ্ধে এ যুক্তিটি সম্পূর্ণ অমূলক।

২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তারা (আহলে কিতাব-ইয়াহূদী ও খৃষ্টান) আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলিম

www.pathagar.com

ও পাদ্রীদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে। (সূরা তাওবা)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিরমীযী শরীফ -এ (২য় খন্ড ১৪৮ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হয়েছে, কিতাবী সম্প্রদায় তাদের ইবাদত করত না তবে আলিম ও পাদ্রীগণ যখন কোন কিছু হালাল বলত, তখন তারা তা হালাল জানত। এবং যখন তারা কোন কিছু তাদের জন্য হারাম ঘোষণা দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত। বস্তুত তাক্‌লীদের মধ্যেও অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান। সুতরাং ইমাম মুজতাহিদগণের তাক্‌লীদের ব্যাপারেও উক্ত নিন্দাবাদ প্রযোজ্য হবে।

এ কথার জওয়াব হল যে, আহলে কিতাদের সম্পর্কে কথিত তাক্‌লীদ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের তাক্‌লীদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কিতাবী তাদের অনুসরণকৃত আলিম ও রাহিবদেরকে শরী'আত প্রণেতা এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তের অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে মুজতাহিদ ইমামগণের তাক্‌লীদে এ বিশ্বাস করা হয় না যে, তাঁরা শরী'আতের প্রবর্তক। বরং তাঁরা কুরআন হাদীসের ব্যাখা বিশ্লেষক হিসাবে তাঁদের অনুসরণ করা হয়। তাই মুজতাহিদ ইমামগণের তাক্‌লীদের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও হাদীসের-ই অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

৩. আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

আমি উপদেশ গ্রহনের জন্য কুরআন সহজ করে দিয়েছি, অতএব উপদেশ গ্রহনকারী কেউ আছে কি ?

এ আয়াতে কুরআনকে সহজ বলা হয়েছে। সুতরাং কুরআনকে দুর্বোধ্য মনে করে ইমাম মুজতাহিদগণের তাক্‌লীদ করা এ আয়াতের মর্মের পরিপন্থী।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। এ আয়াতে ' يَسَّرْنَا ' উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথার দ্বারা পবিত্র কুরআনে অন্তর্নিহিত হুকুম আহ্‌কাম, মাসআলা-মাসাইলও যে সকলের জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে তা প্রমাণিত হয় না।

অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে ব্যখ্যা প্রদানের দায়ীত্ব (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ) আলিমগণের নিকট থেকে মাস'আলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা করে নেওয়ার নির্দেশ (فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) এবং দীনের বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনের হুকুম (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ) ইত্যাদি কুরআনের বাণীসমূহ (مَعَاذَ اللّٰهِ) অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যা কোন মুসলমান কখনও মেনে নিতে পারে না। সুতরাং ইমাম মুজতাহিদগণের তাক্‌লীদ করা কোনক্রমেই এ আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচিতি

ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যে সব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে তন্মধ্যে সর্বযুগে সত্যাশ্রয়ী

www.pathagar.com

গরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম যে মত ও পথ অনুসরণ করেছেন, তা-ই যুগে যুগে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে যাঁরা কুরআন, হাদীস ও সাহাবা-ই-কিরামের যথাযথ অনুসারী তাঁরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

ইসলামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটায় সঠিক ইসলামী আকাইদ যখন বিপন্ন প্রায়, সে সময়ে সত্যাশ্রয়ী উলামা-ই-কিরাম বাতিল আকীদা সমূহের করাল গ্রাস থেকে ইসলামকে রক্ষার নিমিত্তে বিপথগামী ও বাতিলপন্থী সম্প্রদায়সমূহের ভ্রান্তি নির্ধারণ ও তার দাঁতভাংগা জবাব প্রদানের সাথে সাথে সঠিক ইসলামী আকাইদের রূপরেখা প্রনয়ণের প্রয়াস পান। যা কুরআন হাদীস ও সাহাবা-ই-কিরামের আকাইদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে ইসলামী আকাইদ শুধু বাতিল পন্থীদের ষড়যন্ত্র থেকেই রক্ষা পেল না, বরং একটি নির্ভেজাল সত্য আকাইদ শাস্ত্রেরও জন্ম হল। এই সঠিক আকাইদে বিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামে নামকরণ করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাহ্ তথা হাদীস এবং তাঁর সহচরবৃন্দ তথা সাহাবা-ই-কিরামের পদাংক অনুসরণে সঠিক আকাইদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ই হল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'।

এই আকাইদ সুবিন্যস্তকরণের ব্যাপারে দু'জন মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন ঃ

১. ইমাম আবূ মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মাহমূদ আল্-মা'তুরীদী (র.) (মৃত্যু ঃ ৩৩৩ হিজরী)। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

২. ইমামুল মুতাকাল্লিমীন আবুল হাসান আলী ইব্ন ইসমাঈল আল-আশ'আরী (র.) (মৃত্যু ৩৩০হিজরী)। তিনি শাফি'য়ী মতাবলম্বী ছিলেন।

আল্লামা মুফ্তী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.) -এর ভাষায় 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

মুতাযিলী, শী'আ ও রাফিযী ইত্যাদি মতবাদ উদ্ভবের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যে মতবাদের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই তরীকার উপর যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরাই হচ্ছে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নেতা হলেন, দু'জন। তাঁর একজন হলেন, হানাফী অপর জন শাফি'য়ী। হানাফী জনের নাম ইমাম আবূ মানসুর মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ আল্-মাতুরীদী ইমামুল হুদা (র.)। তাঁর লিখনীর মধ্যে কিতাবুত-তাওহীদ, কিতাবুল মাকা'লাত, কিতাবু তাবীলাতিল কুরআন অন্যতম। তিনি ৩৩৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আর শাফি'য়ী জন হলেন ইমাম আবুল হাসান আলী ইব্ন ইসমাইল আল-আশ'আরী (র.)। তিনি ২৬২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি

www.pathagar.com

আল-জুবায়ীর অনুসারী ছিলেন। এবং ৪০ বছসরকাল মুতাযিলী আকীদায় বিশ্বাসী থাকেন। এরপর যখন তিনি মুতাযিলী মাযহাব পরিত্যাগ করেন । তখন তিনি ও তাঁর অনুগামীগণ মুতাযিলীদের মতবাদ বাতিল করণ এবং হাদীসে বর্ণিত ও গরিষ্ঠ দলের অনুসৃত মতবাদকে প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন তাঁরা নিজেদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামে নামকরণ করেন। ইমাম আশ'আরী (র.) ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। (কাওয়াইদুল ফিকহ্, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামকরণের মধ্যে 'সুন্নাত' শব্দ দ্বারা হাদীস অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর কথা কাজ এবং সাহাবীদের কাজে তিনি সম্মতি প্রদান করেছেন তা উদ্দেশ্য। আর জামা'আত শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের জামা'আত উদ্দেশ্য। অথবা পূর্ববর্তী সত্যাশ্রয়ী সম্প্রদায় উদ্দেশ্য, যাঁদের মধ্যে সাহাবা-ই-কিরাম শ্রেষ্ঠতম। শারহে আকাইদে নাসাফীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নিব্রাস' কিতাবের গ্রন্থকার এ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন ঃ

فسموا باهل السنة والجماعة اى اهل الحديث واتباع الصحابة .

এরপর তাঁদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামে নামকরণ করা হল, অর্থাৎ হাদীসের অনুসারী ও সাহাবীদের অনুগামী সম্প্রদায়।

ইমাম আবুল হাসান আলী আল-আশ্'আরী (র.) -এর মুতাযিলা মতবাদ পরিত্যাগের পিছনে একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণিত আছে।

একদা শায়খ আশ্'আরী স্বীয় উস্তাদ মুতাযিলা মতবাদের অন্যতম ইমাম আবূ আলী আল্-জুবায়ীকে প্রশ্ন করলেন, এমন তিন ভাই সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? যাদের একজন বড় হয়ে ঈমানদার অবস্থায় মারা গেল, দ্বিতীয় জন বড় হয়ে কাফির অবস্থায় মারা গেল। এবং তৃতীয় জন শৈশব অবস্থায় মারা গেল। জবাবে আল-জুবায়ী বললেন, তাদের প্রথম জন জান্নাতবাসী হয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। দ্বিতীয় জন জাহান্নামী হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর তৃতীয় জন পুরস্কার বা শাস্তি কোনটাই প্রাপ্ত হবে না। একথা শুনে ইমাম আশ্'আরী বললেন, তাদের তৃতীয় জন অর্থাৎ যে শিশুকালে মারা গিয়েছে সে যদি প্রশ্ন করে, হে আমার প্রভূ! আপনি কেন আমাকে বয়ঃপ্রাপ্ত করলেন না, তাহলে তো আমি আপনার প্রতি ঈমান আনতাম এবং আপনার অনুগত বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতাম ? জবাবে আল-জু'বায়ী বললেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন যে, আমি তোমার বিষয়ে ভালভাবে জানি। যদি তুমি বড় হতে তাহলে তুমি অবাধ্যদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে জাহান্নামী হতে। সুতরাং তোমার জন্য শৈশব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাই অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর হয়েছে। তখন শায়খ আশ্'আরী আবার প্রশ্ন

www.pathagar.com

করলেন, তাদের দ্বিতীয় জন যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে কাফির অবস্থায় মারা গেছে, সে যদি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কেন আমাকে শিশুকালে মৃত্যু দান করলেন না ? তাহলে তো আমি আপনার অবাধ্য হওয়ার সুযোগ পেতাম না এবং আমাকে জাহান্নামের এই ভীষণ শাস্তিভোগ করতে হতো না!

এ প্রশ্নের জওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কি দেওয়া হবে ? তখন আল-জুবায়ী নিরুত্তর ও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। প্রকাশ থাকে যে আল-জুবায়ী এ জবাব প্রদান'মুতাযিলী সম্প্রদায় মতবাদ - 'আল্লাহ্ তা'আলার উপর নেক্কারের পুরস্কার ও বদ্কারের শাস্তি দেয়া ওয়াজিব ও আবশ্যক" এর উপর ভিত্তি করে ছিল। অদের মতে আল্লাহ্ তা'আলার উপর এরূপ নির্ধারিত না করলে আল্লাহ্ তা'আলার যালিম (অত্যাচারী) হওয়া সাব্যস্ত হয় (নাঊযু বিল্লাহ্)। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যে ইন্সাফগার-ন্যায়বিচারক তা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বান্দার জন্য যা কল্যাণকর তাই করা আল্লাহ্র জন্য ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে হবে। কুরআন শরীফের বহু আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নেক কাজের জন্য পুরস্কার ও বদ কাজের জন্য শাস্তির ঘোষণা দিয়ে তা নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্র উপর কোন কিছু ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হলে তাঁর অসীম ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যা আল্লাহ্ তা'আলার শানের পরিপন্থী । তিনি নেক্কারের জন্য পুরস্কার ও বদ্কারের জন্য শাস্তির ওয়াদা করেছেন এবং এ ওয়াদা তিনি পূরণও করবেন। তবে এর ব্যতিক্রম করাও আল্লাহ্ তা'আলা অধিকার রয়েছে। তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পূর্ণ ক্ষমতাবান। শায়খ আশ্'আরীর প্রশ্নের জওয়াবে উস্তাদ আল-জুবায়ীর নিরুত্তর হওয়ার দ্বারা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বাতুলতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং তিনি মুতাযিলা মতবাদ পরিত্যাগ করলেন। এরপর তিনি মুতাযিলী আকাইদ ভ্রান্ত প্রমাণ করার এবং সুন্নাহ্ ও সালাফে সালেহীনের মাতাদর্শ মুতাবেক সঠিক আকাইদ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হাতেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভিত্তি মজবুত হয়। সমসাময়িক সুবিজ্ঞ হানাফী ইমাম আল্-মাতুরীদীর সাধনাও এ উদ্দেশ্যে পূর্ব হতেই নিবেদিত ছিল। আশ'আরীর আগমনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের শক্তি আরও সুসংহত হল। সব বাতিল আকাইদের বেড়াজাল ছিন্ন করে এ দল 'সাওয়াদুল আযম' (বৃহত্তম দল) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। শায়খ আবুল হাসান আলী আল-আশ'আরী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (র.) -এর অধঃস্তন বংশধর ছিলেন। তাই তিনি আশ'আরী (اشعرى) সম্বন্ধবাচক আখ্যায় আখ্যায়িত। তাঁর অনুগামী সম্প্রদায় 'আশাইরা' নামে পরিচিত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অপর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবূ মান্সুর আল-মাতুরীদীর বাসস্থান ছিল সমরকন্দের

www.pathagar.com

মাতুরীদ গ্রামে। এ কারণে তিনি মাতুরীদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এবং তাঁর অনুসারীগণ মাতুরীদীয়া সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উলামায়ে মুতাআখ্‌খিরীন (পরবর্তী যুগের আলিমগণ) আশাইরা ও মাতুরীদীয়া উভয় সম্প্রদায়কেই 'আশাইরা' নামে আখ্যায়িত করেছেন। স্মরণযোগ্য যে, ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমামদ্বয় হানাফী ও শাফি'য়ী মাযহাব মতাবলম্বী হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রসিদ্ধ চারটি হক মাযহাবের সবাই আকাইদের দিক দিয়ে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' অনুসারী এবং চার মাযহাবের সব মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন,

عن عبد الله بن عمر و رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنى إسرا ئيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة و تفرق أمتى على ثلث و سبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة وَا حدة قالُوا من هى يارسول الله قَالَ مَا انَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ .

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মাতগণ তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল ব্যতীত বাকী সব দলই জাহান্নামী হবে। সাহবা-ই কিরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটি কোন দল? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর আছি। অর্থাৎ আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসৃত পথের অনুসারীগণই জান্নাতী হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবা-ই কিরামের পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটতে লাগল, তখন হাক্কানী উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত পথ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথে মুসলমানদের একত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এরাই 'أهل السنة' নামে খ্যাত হন। কেননা সুন্নাহ্ (سنة) শব্দটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর নীতি ও সাহাবীগণের নীতির উপরেই প্রযোজ্য। হাদীসে এসেছে,

عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيًّا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلفا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين .

www.pathagar.com

হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার এবং নেতার কথা শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি যদিও সে হাবসী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার ইন্তিকালের পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমার সুন্নাত এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সৎপথপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাত মজবুতভাবে ধারণ করা।

সত্যাশ্রয়ী এ দলটি নিজেদের 'আহলুস্ সুন্নাহ্' নামের পাশে আল্-জামা'আহ্ (الجماعة) শব্দটিও সংযুক্ত করেন। জামা'আত শব্দের অর্থ 'দল'।

হাদীসে আছে ঃ "يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ" সত্যাশ্রয়ী দলটির উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থাকে। যে ব্যক্তি এ দল হতে বিচ্ছিন্ন থাকবে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে।

তাছাড়া যুগে যুগে এ দলই ছিল বৃহত্তম দল। বহু বাতিল সম্প্রদায় কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আজ তাদের এতটুকু নাম নিশানাও অবশিষ্ট নেই। পক্ষান্তরে 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' তার সূচনা কাল হতে প্রদীপ্ত সূর্যের মত ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এর উজ্জ্বলতা একটুও ম্লান হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ.

আমার উম্মাতের মধ্যে হতে একটি দল সব সময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী থাকবে। যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে তারা বিন্দুমাত্র তাদের ক্ষতি করতে পারবে না (বুখারী ও মুসলিম)।

যুগে যুগে এ দলই বৃহত্তম মুসলিম জন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাই তো সমগ্র মুসলিম জাহানে এ দল 'সাওয়াদুল আযম' এর (বড় দলের) মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে। সাওয়াদুল আযমের অনুসরণ করার নির্দেশ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদান করেছেন,

إتبعوا السَّواد الأعظم

তোমরা বৃহত্তম দলের অনুসরণ করবে।

তাই বাতিল আকীদার ধূম্রজাল ছিন্ন করে সত্য সঠিক আকীদা গ্রহণ করে 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল্ জামা'আতের' পতাকা তলে সমবেত হওয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড

ঈমান অধ্যায়

كتاب الايمان

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈমান পরিচিতি

ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সান – এ তিনের সমষ্টির নাম হল 'দীন'। এ দীনে দাখিল হওয়ার জন্যই মহান আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশের বাস্তবায়ন আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য। অবশ্য এর জন্য পূর্ব শর্ত হল, উপরোক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা। অন্যথায় আমাদের পক্ষে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব হবে না।

ঈমানের আভিধানিক অর্থ

'ঈমান' (إِيْمَان) শব্দটি বাবে 'إِفْعَال' এর ক্রিয়ামূল (مصدر) 'أَمْن' ধাতু হতে উদ্ভূত। 'أَمْن' অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা। আরবী ভাষায় 'ঈমান (إِيْمَان) শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে এর অর্থের মধ্যেও কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষ তা বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।১

অপর এক বর্ণনা মতে, ঈমানের আভিধানিক অর্থ- 'اَلتَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ' অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা।২

ঈমানের শর'য়ী অর্থ

ঈমানের শর'য়ী অর্থ আলিমগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলিমের মতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র নিকট হতে যে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন তাতে এবং তিনি যে পথ প্রদর্শন করেছেন তাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। আলিমগণের এক শ্রেণীর মতে, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা মুখে উচ্চারণ করাও ঈমানের অঙ্গীভূত। মতান্তরে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আমলে সালিহ্ অর্থাৎ সৎকর্ম এ তিনের সমন্বয় ঈমান।

আল্লামা ইদ্রীস কান্দলবী (র.) -এর মতে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর আনীত আদর্শকে মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া এবং তৎপ্রতি মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করাকে শরী'আতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়।৩

---

১. ফায়যুল বারী ঃ আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.), (সংক্ষেপিত) ১ম খণ্ড, ২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠা।

২. কাওয়াইদুল ফিক্হ ঃ সাইয়্যিদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান, (র.), ২০০ পৃষ্ঠা।

৩. মা'আরিফুল কুরআন ঃ মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী (র.), ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ইমাম গাযালী (র.) বলেন,

تصديق النبى بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم

নবী করীম (সা.) কর্তৃক আনীত সকল বিষয়সহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে।

ঈমানের সংজ্ঞায় ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্-শাইবানী (র.) বলেন,

تصديق النبى بما جاء به مع التبرى عن جميع ما سوى الله

নবী করীম (সা.) কর্তৃক আনীত সকল বিষয়সহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, সাথে সাথে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সমস্ত কিছু থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা।[১]

কাযী সানা উল্লাহ্ পানিপথী (র.) বলেন, নবী করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব কিছুই মেনে নেওয়া, অনুরাগ ও ভক্তির সাথে বিশ্বাস করা এবং মৌখিকভাবে তা স্বীকার করা। তবে বিশেষ অবস্থায় মৌখিক স্বীকার অপরিহার্য নয়।[২]

আল্লামা মাহমূদ আলূসী আল-বাগদাদী (র.) তৎপ্রণীত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল মা'আনীতে' উল্লেখ করেছেন যে,

تَصدِيق بمَا علم مجى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم به ضرورة تَفصيلا فيما علم تَفصيلا وإجمَالا فيما علم إجمَالا ٠

নবী করীম (সা.) কর্তৃক আনীত বিষয়াদি যা জানা গিয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা বিস্তারিতভাবে এবং যা সংক্ষিপ্তভাবে জানা গিয়েছে তার প্রতি বিস্তারিতভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে শরী'আতের ভাষায় ঈমান বলা হয়।[৩]

উপরে ঈমানের যে বিভিন্ন সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে এ গুলোর লক্ষ্য একই। এ সকল সংজ্ঞা সমন্বিত করা হলে তার মর্ম দাড়ায় নিম্নরূপ,

নবী করীম (সা.) কর্তৃক আনীত সকল বিষয়াদি যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, বিস্তারিত হোক বা সংক্ষিপ্ত, নবী করীম (সা.) -এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে মনেপ্রাণে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত কিছু থেকে নিজের সম্পর্কহীতার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করাকে শরী'আতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ঈমানের প্রাথমিক স্তর হল অন্তরের বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকৃতি এবং ঈমানের উচ্চতর স্তর হল হৃদয়ের প্রশান্তি তথা শরী'আতের দাবীসমূহ স্বভাবসুলভ দাবীতে পরিণত হওয়া। অর্থাৎ স্বভাবসুলভ কাজসমূহ মানুষ

---

১. তানযীমুল আশ্‌তাত ঃ মাওলানা আবুল হাসান (র.), ১ম খণ্ড, ২৫-২৬ পৃষ্ঠা। ২. মা- লা -বুদ্দা মিনহু ঃ কাযী সানা উল্লাহ্ পানিপথী (র.), ১০-১১পৃষ্ঠা। ৩. তাফসীরে রুহুল মা'আনী ঃ আল্লামা মাহমূদ আলূসী আল-বাগদাদী (র.),১ম খণ্ড।

www.pathagar.com

যেভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে থাকে আর তা সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত অস্বস্তিবোধ করে অনুরূপ শরী'আতের আমলসমূহ যথাযথভাবে আদায় না করা পর্যন্ত যদি উদ্বেগ ও অস্বস্তিবোধ হয় তবে এ স্তরে উপনীত হওয়া বুঝা যাবে। নিম্নোক্ত হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

لَايؤمن أُحدكم حتى يكون هَواه تبعاً لما جئتُ به

তোমাদের কেউ মু'মিনে কামিল হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ইচ্ছা - আকাংখা আমার আনীত আদর্শের অনুগত হয়।[১]

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম (الإسلام) শব্দটি "سلم" ধাতু থেকে উৎপন্ন। "سلم" অর্থ শান্তি, সন্ধি স্থাপন। "الإسلام" শব্দটি "باب إفعال" এর ক্রিয়ামূল (مصدر)।এর আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ও শরী'আতের হুকুম আহ্কাম মেনে চলা।

শরী'আতের পরিভাষায় ইসলামের সংজ্ঞা কী ? এ প্রসঙ্গে হাদীসে জিব্রীলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

ألإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلوة وتؤت الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.

ইসলাম হল, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযানের সাওম পালন করা এবং যাতায়াতের সামর্থ থাকলে বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ আদায় করা (বুখারী)।

এই বাহ্যিক আমলগুলো তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা ঈমানী বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হবে। কুরআন ও হাদীসের দ্বারা এও প্রামাণিত হয় যে, ঈমান পরিপূর্ণ হবে তখন যখন তার সাথে বাহ্যিক আমলও থাকবে। এই প্রেক্ষিতে ঈমান ও ইসলাম অভিন্ন (مرادف)।

এ অর্থেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥

---

১. মা'আরিফুল কুরআন ঃ মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী(র.), ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

সেথায় যে সব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি (৫১ ঃ ৩৫-৩৬)।

উক্ত আয়াতে যাদেরকে মু'মিন বলা হয়েছে, তাদেরকে মুসলিমও বলা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান এবং ইসলাম এক ও অভিন্ন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে 'ইসলাম' তার আভিধানিক অর্থে শুধু বাহ্যিক আমল এবং 'ঈমান' শুধু অন্তরের বিশ্বাস এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন ঈমান ও ইসলামের মধ্যে ভিন্নতা (تباين) প্রকাশ পায়। এ অর্থে কারে ইসলাম (ঈমান বিহীন আমল) আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۝

আরব মরুবাসীগণ বলে, আমরা ঈমান এনেছি, বল,তোমার ঈমান আন নি। বরং তোমরা বল, আমরা মুসলমান হয়েছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি (৪৯ ঃ ১৪)।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী, লাওহ্-কলম, গাছ-পালা, বৃক্ষ-লতা, এক কথায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যত কিছু এ পৃথিবীতে রয়েছে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ্। তিনি স্ব-অস্তিত্বে সর্বদা বিরাজমান। তিনি চিরঞ্জীব। তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। বস্তুত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিষয়টি কোন জটিল বিষয় নয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য কোন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। স্বভাবগতভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, এ বিশ্ব কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফসল নয়। বরং এর পেছনে রয়েছে মহান স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও অজ্ঞতা বা জ্ঞান দৈন্যতার কারণে যুগে যুগে একদল লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেন,

اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে কী, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ? (১৪ ঃ ১০)

মহান রাব্বুল আলামীন এ মহা বিশ্বকে তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদায় সুবিন্যাস্ত ও সুনিপূণভাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

www.pathagar.com

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, এরপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে, তারপর অস্থি ও পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দ্বারা; এরপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! (২৩ ঃ ১৪)

এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, মানব সৃষ্টির ন্যায় আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টিই সুবিন্যস্ত সুসজ্জিত। অদৃশ্য এক স্রষ্টার ইচ্ছায়ই এ সব কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ মহাবিশ্ব আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার ফসল নয়। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ. اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ○

তারা কি স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা ? নাকি তারা নিজেরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে ? (৫২ ঃ ৩৫-৩৬)

মূলত এ মহা বিশ্বের অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি হলেন, মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি স্বঅস্তিত্বে সর্বদা বিরাজমান। তাঁর অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরত সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا. وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যেন এগুলো স্থানচ্যুত না হয়, এগুলো স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে এগুলো সংরক্ষণ করবে ? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ (৩৫ ঃ ৪১)।

আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন,

يدل على انه واحد * وفى كل شئ له شاهد

প্রতিটি বস্তুতে তাঁর সাক্ষী বিদ্যমান * ঘোষণা করেছে তিনি একক মহান।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়

সমগ্র সৃষ্টিজগতের ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ্। সত্তার দিক থেকে তিনি যেমনি এক, অনুরূপভাবে গুণাবলীর দিকে থেকেও তিনি একক অনন্য; তাঁর কোন শরীক নেই। এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও শৃঙ্খলা বিধানে তাঁর কোন অংশীদার বা সহযোগী নেই। ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

তোমাদের ইলাহ্ তিনিই একমাত্র ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অতি দয়াময়, অসীম দয়ালু (২ : ১৬৩)।

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ. وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

বলুন, তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং কেউ তাঁর সমতুল্য নয় (১১২ : ১-৪)।

একাধিক ইলাহ্ -এর সম্ভাবনাকে নাকচ করে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

لَوْكَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান (২১ : ২২)।

একাধিক ইলাহ্ হওয়ার ধারণা অবাস্তব। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ্ নেই, যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করত । তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র ! (২৩ : ৯১)

একাধিক ইলাহ্ হওয়ার ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষ নিজেদের

www.pathagar.com

বিবেক- বুদ্ধিকে জলাঞ্জলী দিয়ে কখনো পাথরের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। আবার কেউ নিজে ইলাহ্ হওয়ারও দাবী করে বসেছে। যেমন, ফির'আউন ও নমরূদ। এ বিষয়ে নমরূদের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিতর্কও হয়েছে । আল-কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ٥

আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেন নি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বললেন, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বললেন, আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় ঘটাও এবং যে কুফরী করছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না (২ ঃ ২৫৮)।

অনুরূপভাবে ইয়াহূদী এবং খৃষ্টানরাও তাদের নবী রাসূলগণের মর্যাদা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা তাঁদেরকে ইলাহ্ পদ মর্যাদায় উন্নত করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অথচ তাঁরা সকলেই এক আল্লাহ্র বান্দা।

হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلاَنِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الاٰيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ٥

মাসীহ্ ইব্ন মারইয়াম তো কেবল একজন রাসূল, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তাঁর মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা উভয়ে পানাহার করতেন। দেখুন, তাদের জন্য আমি আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরো দেখুন, তারা কি ভাবে সত্য বিমুখ হয় (৫ ঃ ৭৫)।

উপরের বর্ণনার ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে,আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অদ্বিতীয় লা-শরীক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং নেই কোন সহকারী ও সহযোগীও।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে জ্ঞান ও যুক্তির নিরিখেও একথা প্রামাণিত যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র ইলাহ্। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। এ প্রসংগে কতিপয় যৌক্তি প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হল ঃ

এক ঃ একাধিক ইলাহ্ হওয়া অসম্ভব। কেননা অন্যান্য ইলাহ্ থাকলে কে তাদের বাকশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেদের কোন হুকুমই মহা বিশ্বে নাযিল করছে না কেন ? তাদের ইলাহ্ হওয়াকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অথচ তারা কোন জওয়াব দিচ্ছে না। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। যত কল্পিত ইলাহ্ সাব্যস্ত করা হচ্ছে সবই রুগ্ন চিন্তার অস্থির কল্পনা মাত্র।

দুই ঃ একাধিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব অসম্ভব। কেননা, আল্লাহ্র জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। প্রত্যেক ইলাহ্ -এর ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন থাকাই স্বাভাবিক। একজন যদি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে তবে অন্য জন হয়তো তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। যদি সক্ষম হয় তবে প্রথম জন হবে অক্ষম। আর যদি একাত্মতা পোষণ করতে বাধ্য হয় তবে দ্বিতীয় ইলাহ্ হবে অক্ষম। অথচ ইলাহ্ হওয়ার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

তিন ঃ প্রতিটি বস্তুরই একটি বিন্দু রয়েছে। যেমন লক্ষ বা কোটি সংখ্যার সূচনা হল এক। এমনি করে তাপ যা দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে, এগুলো যত ধরনের হোক না কেন এর সূচনা ও হল সূর্য। এমনিভাবে এই মহাবিশ্বের একটি সূচনা বিন্দু রয়েছে তা হল মহান রাব্বুল আলামীনের সত্তা। সুতরাং একাধিক প্রভূর ধারণা অবান্তর অবাস্তব।

চার ঃ যারা একাধিক ইলাহ্ হওয়ার প্রবক্তা তাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা ; এ মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ইলাহ্ কি যথেষ্ট নন ? যদি যথেষ্ট হন, তবে তো অন্য ইলাহ্ বেকার; তার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা তার প্রতি মুখাপেক্ষীহীন। অথচ আল্লাহ্ তো এমন সত্তা যিনি কোন বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। বরং সমস্ত কিছুই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর যদি এক ইলাহ্ এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট না হন তবে তো তিনি অপারগ হবেন। আর অপারগ এবং অক্ষম সত্তা আল্লাহ্ হতে পারবে না।

পাঁচ ঃ যারা একাধিক ইলাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন, তাদের প্রত্যেকেই পরস্পর একে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে অথচ একজন মুখাপেক্ষীহীন আর অন্যরা সবই হল মুখাপেক্ষী। যদি তারা সকলেই পরস্পর একে অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে তারা কেউ আল্লাহ্ হওয়ার উপযুক্ত হবে না। আর যদি তাদের একজন মুখাপেক্ষীহীন হয় আর অন্য সবই হয় মুখাপেক্ষী তবে এ-ই একজনই ইলাহ্ হতে পারবে। বাকী কেউ ইলাহ্ হতে পারবে না। সুতরাং একাধিক ইলাহ্ হওয়ার ধারনা একেবারেই অযৌক্তিক।

www.pathagar.com

ছয় ঃ ব্যবসার মধ্যে শরীকানা থাকে এবং জমা-জমির মধ্যে শরীকানা থাকা এক ধরণের ত্রুটি। এমনিভাবে উলূহিয়্যাতের মধ্যে শরীকানা থাকাও বিশেষ ধরণের ত্রুটি। অথচ আল্লাহ্ তো এমন সত্তা হবেন যাঁর সত্তা সব ধরনের ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতএব "আল্লাহ্ তা'আলা লা-শরীক, তাঁর কোন শরীক নেই" একথাই বিশুদ্ধ এবং ভ্রান্তিমুক্ত।

সাত ঃ একাধিক ইলাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী লোকদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা; হয়তো প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় প্রোগ্রাম অন্য ইলাহ্ হতে গোপন রাখতে সক্ষম হবে না। যদি সক্ষম হয় তা হলে অপরজন অক্ষম প্রমাণিত হবে। আর যদি সক্ষম না হয় হবে প্রথম জন অক্ষম হবে। এরূপ সত্তা কখনো আল্লাহ্ হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ তো এমন সত্তা যিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

আট ঃ যদি ইলাহ্ দু'জন হন তবে একজন অন্য জনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবেন অথবা হবেন না। যদি সক্ষম হন তা হলে অপর জন অক্ষম হবেন অথবা হবেন না। আর যদি অন্য জনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম না হন, তবে সে নিজেই অক্ষম প্রমাণিত হবেন। এরূপ সত্তা কখনো ইলাহ্ হতে পারেন না। কেননা, ইলাহ্ তো ঐ শক্তি যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। সুতরাং একাধিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মেনে নেয়া আদৌ যুক্তিসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

শিরক এবং একাধিক ইলাহ্‌র অস্তিত্ব খণ্ডন করে পূর্বসূরী আলিমগণ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং যুক্তি ভিত্তিক আরো বহু প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ সবের মাধ্যমে একথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ একক। তিনি লা-শরীক, তাঁর কোন শরীক নেই। সুতরাং আল্লাহ্‌র সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে এবং ইবাদত ও উপাসনায় তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে নির্ভেজাল তাওহীদ আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। এই হল সীরাতে মুস্তাকীম।

ঈমানের বিষয়বস্তু

ক. আল্লাহ্‌র যাত (সত্তা)

'আল্লাহ্' সৃষ্টিকর্তার ইস্‌মে যাত বা সত্তাবাচক নাম। আকাইদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

أَللهُ علم على الأصح لِلذات الوَاجِب الوُجود المستجمع بجميع صفات الكمال.

বিশুদ্ধতম মতানুসারে 'আল্লাহ্' শব্দটি ঐ চিরন্তন সত্তার নাম, যাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, যিনি সমস্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাই 'আল্লাহ্' শব্দের কোন দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। অধিকাংশ আলিমের মতে, এ শব্দটি কোন বিশেষ ধাতু হতে উদ্ভূত নয়। আরবী ভাষায়

www.pathagar.com

এর হুবহু অর্থজ্ঞাপক কোন প্রতিশব্দ নেই। অন্য কোন ভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দের কোন অনুবাদ সম্ভব নয়।

শারহুল আকাইদ আন্ নাসাফিয়া, আকীদাতুত্ তাহাভী ও আল-আকীদাতুল হাসানা ইত্যাদি আকাইদ গ্রন্থে আল্লাহ্র পরিচয় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। যিনি কাদীম-অনাদি ও অনন্ত। তিনি সব সময় ছিলেন এবং সব সময় থাকবেন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণের অধিকারী ও সব ধরনের দোষত্রুটি থেকে তিনি পূত ও পবিত্র। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভূক্ত। সকল বিষয়ের উপর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সকল সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। তাঁর কোন উদাহরণ নেই। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই এবং কোন সহযোগী নেই; তাঁর নযীর নেই কিছুই, বে-মিসাল তিনি। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও সদা অস্তিত্বে, ইবাদত বন্দেগী লাভের অধিকারে, বিশ্ব জাহানের শৃঙ্খলা বিধানে কেউ বা কোন কিছুই তাঁর শরীক নেই, সহযোগী নেই। ইবাদত ও চূড়ান্ত সম্মানের অধিকারী কেবল তিনিই। তিনিই অসুস্থকে সুস্থ করেন, সকল প্রাণীকে রিযিক দেন, আপদ-বিপদ, বালা-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট দূর করেন তিনিই। আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন সত্তায় প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সব কিছুতেই অনাদি-অনন্ত। তিনি দেহ ও আকৃতি বিশিষ্ট নন এবং কোন দিক বা স্থানের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। জান্নাতে মু'মিনগণ তাঁর দীদার লাভ করবেন।

তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর উপর কারো আইন, কারো নির্দেশ চলে না। তাঁর কাজ সম্পর্কে তাঁকে জবাবদিহী করতে হয় না। কিছু করা তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। তাঁর প্রতিটি কাজই হিক্মতপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি ব্যতীত যথাযথ কোন নির্দেশদাতা এবং কোন হাকিম নেই।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, আল্লাহ্র সত্তা অসীম। আর আমাদের জ্ঞান হল সসীম। এ সসীম জ্ঞানের মাধ্যমে অসীম প্রভূর সত্তা সম্বন্ধে যথাযথ পরিচয় লাভ করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর সত্তাবাচক পরিচয় না দিয়ে আল-কুরআনের বহু আয়াতে তিনি নিজের গুণবাচক পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ গুণাবালীর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করতে হবে। এ কারণেই পূর্বসূরী গবেষক আলিমগণ তাঁর সত্তাবাচক পরিচিতির অতল সমুদ্রে অবগাহন না করে তাঁর গুণবাচক পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

খ. আল্লাহ্র সিফাত (গুণাবলী)

আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য ও অগণিত সিফাত রয়েছে। সিফাত সবগুলো এক ধরণের নয় এবং এক পর্যায়েরও নয়। বরং তাঁর এ সিফাতগুলো প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১. ثُبُوتِيَة (ইতিবাচক) ২. سَلبِيَة (নেতিবাচক)।

www.pathagar.com

صفات ثبوتية আবার দু'ভাগে বিভক্ত।

১. صِفَاتْ ذَاتِيَة (সত্তাবাচক গুণাবলী) ২. صِفات اُفعَالية (কর্মবাচক গুণাবলী)।

শায়খ আবূ হাফস উমর (র.) তৎপ্রণীত 'মুখ্তাসারুল আকাইদ' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার নেতিবাচক গুণাবলী (صفات سلبية) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

فَالله تعالى لَيس بعرض ولاَ جسم ولاَ جوهر ولاَ مصور ولاَ محدود ولا معدود ولاَ متبعض ولاَ متجز ولاَ مركب منها ولاَ متناه ولاَ يوصف بالهيئة ولاَ بالكيفية ولاَ يتمكن فى مكَان ولاَ يجرى عليه زمان ولاَ يشبهه شئ ولاَ يخرج عن علمه وقدرته شئ.

আল্লাহ্ তা'আলা 'আরয নন অর্থাৎ এমন সত্তা নন, যিনি অন্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি দেহ বিশিষ্ট নন এবং তিনি জাওহারও নন। অর্থাৎ এমন সত্তাও নন যিনি নিজ সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু কোন স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি আকৃতি বিশিষ্ট নন। বরং তিনি নিরাকার। তিনি অসীম। তিনি সংখ্যা ও পরিমাপ হতে উর্ধ্বে। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য অস্তিত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি নিজ অস্তিত্বে অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রিত নন। স্থান ও কালের গণ্ডি হতে তিনি মুক্ত। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। কোন প্রকার রং ও বর্ণ থেকে পবিত্র। তাঁর কোন নযীর নেই, তিনি বে-মিসাল। কোন কিছুই তাঁর ইল্ম এবং ক্ষমতা বহির্ভূত নয়।[১]

ইমাম আবূ মনসূর আল-মাতুরীদী (র.)-এর মতে আল্লাহ্র সত্তামূলক গুণ (صِفات ذَاتية) আটটিঃ

১. হায়াত, ২. ইচ্ছা ও ইরাদা, ৪. কুদরত ও শক্তি, ৫. শ্রবণ, ৬. দর্শন, ৭. কালাম ও ৮. তাক্ভীন। পর্যায়ক্রমে এ গুলোর ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. হায়াত ঃ হায়াত আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ। যা অনাদি ও অনন্ত। তিনি চির-জীব তিনি সব সময় আছেন এবং সব সময় থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। তিনি নিজের ইচ্ছা ও পসন্দ অনুযায়ী যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা হায়াত দান করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ

আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট বিশ্বধাতা। তাঁকে তন্দ্র অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না (২ ঃ ২৫৫)।

১. শারহুল আকাইদ আন্ নাসাফিয়্যা, ৪১ - ৪৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.

আর আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত (২৫:৫৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير.

আল্লাহ্ চিরঞ্জীব। তিনি অমর। তাঁর হাতেই রয়েছে সমগ্র কল্যাণ। তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান (তিরমিযী)।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করার স্থির করে তখন তিনি বলেন, 'হও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় (৪০ ঃ ৬৮)।

২. ইল্‌ম বা জ্ঞান ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তাঁর মহান সত্তা যেমন অনাদি অনন্ত, তেমনি তাঁর জ্ঞান এবং সকল গুণও অনাদি, অনন্ত ও চিরন্তন। সকল প্রকার অজ্ঞতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। প্রকাশ্য অথবা গোপন, অতীত অথবা ভবিষ্যত, দুনিয়া অথবা আখিরাত সব কিছুই তাঁর নিকট সমান। তিনি তাঁর গোটা সৃষ্টির প্রতি সর্বদা নযর রাখেন। যমীনের বুকে বিশাল মরুভূমিতে যত বালুকণা আছে, সাগর মহাসাগরে পানির যত ফোটা আছে, বন-বনানীর গাছপালায় যত পাতা রয়েছে, প্রতিটি শাখায় যতটি ফল এবং প্রতিটি ছড়ায় যত শস্যদানা রয়েছে, মানুষের মাথায় ও পশুর চামড়ায় যত লোম রয়েছে ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহ্‌র ইল্‌মের মধ্যে রয়েছে। সৃষ্টি জগতের প্রতিপালনে যখন যার যা কিছু দরকার সবই তাঁর অসীম জ্ঞানে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য এমন কি মানুষের মনে ও কল্পনায় যা রয়েছে সে সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল কিংবা প্রকাশ্যে বল তিনি তো অন্তর্যামী। তিনি কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন ? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত (৬৭ ঃ ১৩-১৪)।

এ সুপ্রশস্ত জ্ঞান এবং পূর্ণ অবহিতি মহান প্রভুরই বৈশিষ্ট্য। তিনিই অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত। গায়বের

www.pathagar.com

ইল্‌ম কোন মানুষের নেই। ইরশাদ হয়েছে,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِى كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

গায়বের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জল ও স্থলভাগে যা কিছু আছে এর সব কিছুই তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা ভিজা কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই (৬ ঃ ৫৯)।

তবে আল্লাহ্ তা'আলা নবী রাসূলগণের মধ্যে যাঁকে যে পরিমাণ ইচ্ছা গায়েব সম্পর্কীয় ইল্‌ম দান করেছেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত (৭২ ঃ ২৬-২৭)।

৩. **ইচ্ছা ও ইরাদা ঃ** আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় তা করেছেন। তিনি যে ভাবে চেয়েছেন এ বিশ্ব জগৎ সে ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সে সব জিনিষ যখন অস্তিত্ববান করতে চেয়েছেন তা করেছেন। এর সাথে যে সব বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করতে চেয়েছেন তা যুক্ত করেছেন। তিনি কারো বাধ্য নন। নানা প্রকার ও নানা রং -এর যে সব জিনিস আসমান ও যমীনে দেখা যায় এগুলো সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ.

আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন (২৮ ঃ ৬৮)।

এ বিশ্বজগতে যত প্রকার সৃষ্টি রয়েছে এর গতি প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা এ সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা রাজত্ব হারা করেন। তিনি যা চান এবং যে ভাবে চান তাই হয়; তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

www.pathagar.com

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা আপনি পরাক্রমাশালী করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩ঃ ২৬)

আল্লাহ্র যা ইচ্ছা তাই করেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন (১১ ঃ ১০৭)।

৪. **কুদরত ও শক্তি ঃ** আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ বিশ্ব, এর গতি এবং স্থিতি সবই তাঁর অসীম কুদ্‌রত এবং শক্তিমত্তাই বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি জিনিষের মধ্যে যে উদ্যম ও শক্তি নিহিত রয়েছে তার উৎস সে নিজে নয়। বরং এর উৎস হলেন, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। মাটি ভেদ করে চারা গাছ বের হয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে তা বড় হতে থাকে; শেষ পর্যন্ত এ চারা গাছটি শক্তিশালী হয়ে নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। এ মূলত আল্লাহ্র অসীম কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ ।

সমুদ্রের উত্তাল তরংগ প্রবল বেগে ধাবিত হয়ে বেলাভূমিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে। সকাল-সন্ধ্যা অবিরত তা চলতে থাকে। তার কোন বিশ্রাম বা ক্লান্তি নেই। এ সবই আল্লাহ্র অসীম কুদরতের খেলা। মানব দেহের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড,হৃদয়ের স্পন্দন এবং শিরায় উপশিরায় রক্ত প্রবাহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনুভূতি এসবই আল্লাহ্র কুদরতের লীলাখেলা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

পবিত্র ও মহান তিনি যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে (৩৬ ঃ ৩৬)।

৫. **শ্রবণ ঃ** আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলীর মধ্যে 'سَمِيْعٌ' 'শ্রবণাকারী' তাঁর একটি অন্যতম গুণ। মহাবিশ্বের সব কিছু তিনি শুনতে পান। উচ্চস্বর, নিম্নস্বর, জোরে কি আস্তে সকল আওয়াজেই তিনি সমভাবে শুনতে পান। মাটির নীচে পিপিলিকার পায়ের আওয়াজই হোক,

www.pathagar.com

সাগরের তলদেশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের সঞ্চালনের মৃদু ধ্বনিই হোক, কিংবা নিহারিকা লোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে কোন ধ্বনিই হোক, কোন কিছুই তাঁর শ্রবণের বাইরে থাকে না। সকল কথোপকথন, সকল পরামর্শ, সকল গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা সমভাবে তিনি শুনতে পান। কোন কিছুই তিনি তাঁর অগোচরে থাকে না, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, এমনকি মনের কল্পনাও তিনি জানতে পান। সকল সৃষ্ট জীবকে তিনিই শ্রবণ শক্তি দান করেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ হচ্ছে ,

فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (২ ঃ ২২৯)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ
وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥

হে রাসূল! আল্লাহ্ মহিলাটির কথা শুনতে পেয়েছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ্ আপনাদের কথোপকথন শোনেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (৫৮ ঃ ১)।

নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে যে কথোপকথন হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে যে আলোচনা ও পরামর্শ হয়ে থাকে, দয়াময় আল্লাহ্‌র কান সব কিছুর আগেই তা শুনে নেয়। একজনের কথা শুনতে গিয়ে তিনি অন্য জনের কথা থেকে বে-খবর হয়ে যান না। গণ্ডগোল এবং হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও যদি কোন গোপন পরামর্শ হয় তবে তাও তিনি শুনতে পান। যে ভাষাই কথা বলা হোক না কেন সব ভাষাই তিনি শুনেন এবং বুঝেন। এমন কি গহীন সমুদ্রের অতল তলে বসেও যদি কেউ কোন কথা বলে তাও তিনি শুনতে পান।

৬. দর্শন ঃ যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা অনুরূপভাবে তিনি সম্যক দ্রষ্টাও বটে। সৃষ্টির সমস্ত কিছুই তিনি দেখেন । সব কিছুই তাঁর দৃষ্টির অধিগত। এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে। দেখার জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না তাঁর। যত গভীর অন্ধকারই হোক না কেন তিনি তা দেখতে পান। আলো-আঁধার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু তিনি সমভাবে দেখেন।

ইরশাদ হয়েছে, 'اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ' তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও কত সুন্দর শ্রোতা (১৮ ঃ ২৬)।

৭. কালাম ঃ মনের ভাব, অনুভূতি এবং তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। অনুরূপভাবে কাউকে কোন কিছু বলা, কোন কিছু বুঝানো, উপদেশ দেওয়া এবং কোন ইচ্ছা, আকাংখা

www.pathagar.com

প্রকাশ করার মাধ্যমও হল এ কালাম বা ভাষা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যেও এ গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কেননা, এ বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় জিন্ন, ইনসান, ফিরিশ্‌তা তথা সৃষ্টিকূলের পরিচালনার জন্য কত আদেশ, নিষেধ, হুকুম-আহ্‌কাম চালু করতে হচ্ছে এবং জারী করতে হয়েছে কত বিধি-বিধান। এসব কিছু তো ভাষা এবং কালামের মাধ্যমেই হয়েছে। তিনি যেমন অসীম অনুরূপভাবে তাঁর কালামেরও কোন শেষ নেই, তাঁর কালামও ভাষা সমস্ত ভাষাকে পরিবেষ্টন করে আছে। অবশ্য এ ভাষা বর্ণমালা ও ধ্বনি যোগে তৈরী নয়। সমস্ত আসমানী কিতাব তাঁর মৌলিক কালামেরই বহিঃপ্রকাশ। কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম; কাদীম বা চিরন্তন। মাখলূক নয়। তাঁর অসংখ্য কালামের প্রতি ইংগিত করে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ○

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (৩১ ঃ ১৭)।

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا○

বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে - সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও। (১৮ ঃ ১০৯)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার কথা বলার ধরন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ এমন একটি বিষয় যা আমাদের জ্ঞান সীমার বাইরে এবং আমাদের জ্ঞানের পরিমণ্ডল হতে অনেক উর্ধ্বে। সে পর্যন্ত পৌছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, জিহ্‌বার সাহায্যে সৃষ্টি কথার নাম আল্লাহ্‌র কালাম নয়। তা হল মানুষের কথা।

৮. তাকভীন ঃ আসমান-যমীন, লাওহ্-কলম, গাছ-পালা, জীব-জন্তু এ সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের কর্মের স্রষ্টাও তিনিই। এ সম্বন্ধে আল-কুরআনে ইরশাদ,

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ○

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্ম সমূহকেও (৩৩৭ ঃ ৯৬)।

www.pathagar.com

সৃষ্টি করার এ গুণটিও তাঁর আযলী- অনাদি ও আবাদী-অনন্ত। যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাঁর কোন নমুনা প্রয়োজন হয় না। এ মহাবিশ্ব ধ্বংস করে তিনি পুনরায় তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ. اِنَّمَا اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ٥

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন , তিনি কি তাদেরকে অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা সর্বজ্ঞ। তাঁর নিয়ম তো এই , যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন, 'হও' সঙ্গে সঙ্গেই তা হয়ে যায় (৩৬ ঃ ৮১-৮২)।

সত্তামূলক গুণ (صِفَات ذَاتِيَة) ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার যত সিফাত রয়েছে সবগুলো হল কর্মমূলক গুণ (صِفَات أَفْعَالِية) বা (صِفَات إِضَافِية – صِفَات إِضَافِية) ঐ সিফাতকে বলা হয় যার মধ্যে সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রকাশ রয়েছে। যেমন-তিনি اَلْخَالِق- সৃষ্টিকর্তা; اَلْمُصَوِّر -রূপদাতা ; اَلْحَيُّ - জীবনদাতা ; اَلْمُمِيْتُ - মৃত্যুদাতা; اَلرَّحْمٰن - দয়াময় ; اَلرَّحِيْم - পরম দয়ালু ; اَلْغَفُوْر- ক্ষমাশীল; اَلسَّلَام- শান্তিদাতা; اَلتَّوَّابُ - তাওবা কবূলকারী ইত্যাদি।[১]

আল্লাহ্ তা'আলার ' صِفَات إِضَافِية ' অসংখ্য ও অগণিত। এ দিকে ইংগিত করেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ٥

এককে মুহূর্তে তিনি এককে শানে থাকেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত আছেন (৫৫ ঃ ২৯)।

তাঁর শান যেমন অসংখ্য ও অগণিত অনুরূপভাবে তাঁর 'صِفَات' ও অসংখ্য ও অগণিত। হাদীসের একটি বর্ণনায় আল্লাহ্র 'صِفَات' বা গুণ প্রকাশক নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি (সিফাতী) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই । তিনি হলেন ঃ

১. নূরুন্ নুজম ঃ সুল্লাম-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০।

www.pathagar.com

১. اَلرَّحمٰن (আর্ রাহ্মানু)-অসীম দয়াময়;
২. اَلرَّحِيمُ (আর্ রাহীমু)-পরমদয়ালু;
৩. اَلمَالِكُ (আল-মালিকু)-অধিপতি;
৪. اَلقدوس (আল্-কুদ্দুসু)-পবিত্র;
৫. اَلسَّلَام (আস্ সালামু)-শান্তিময়;
৬. اَلمؤمِن (আল-মু'মিনু)-নিরাপত্তা বিধায়ক;
৭. اَلمهيمِن (আল-মুহায়মিনু)-রক্ষক;
৮. اَلعزِيز (আল-আযীযু)-পরাক্রমশালী;
৯. اَلجبَار (আল-জাব্বারু)-প্রবল;
১০. اَلمتَكبّر (আল-মুতাকাব্বিরু)-মহিমান্বিত;
১১. اَلخَالِق (আল-খালিকু)-স্রষ্টা;
১২. اَلبَارِئ (আল-বারিউ)-উদ্ভাবন কর্তা;
১৩. اَلمصور (আল-মুসাওভ্যিরু)-আকৃতিদাতা;
১৪. اَلغفار (আল-গাফ্ফারু)-পরম ক্ষমাশীল;
১৫. اَلقَهار (আল-কাহ্হারু)-মহাপরাক্রান্ত;
১৬. اَلوَهابُ (আল-ওয়াহ্হাবু)- মহাদাতা;
১৭. اَلرزَاق (আর্ রাযযাকু) - রিযক্দাতা;
১৮. اَلفتاح (আল-ফাত্তাহ্)-মহাবিজয়ী;
১৯. اَلعَلِيم (আল-আলীমু)-মহাজ্ঞানী;
২০. اَلقَابِض (আল-কাবীযু)-সংকোচনকারী;
২১. اَلبَاسِط (আল-বাসিতু)-সম্প্রসারণকারী;
২২. اَلخَافِض (আল-খাফিদু)-অবনমনকারী;
২৩. اَلرافِع (আর্-রাফিউ)-উন্নয়ন কারী;
২৪. اَلمعِز (আল-মুইয্যু)-সম্মানদাতা;
২৫. اَلمذل (আল-মুযিল্লু)-অপমানকারী ;
২৬. اَلسَّمِيع (আস্ সামীউ)-সর্বশ্রোতা;
২৭. اَلبصِير (আল-বাছীরু)-সম্যক দ্রষ্টা;
২৮. اَلحَكم (আল-হাকামু)-মীমাংসাকারী;
২৯. اَلعدلُ (আল-আদ্লু)-ন্যায়নিষ্ঠা;
৩০. اَللطِيف (আল-লাতীফু)-সূক্ষ্মদর্শী;
৩১. اَلخبِير (আল-খাবীরু)-সর্বজ্ঞ;
৩২. اَلحَلِيم (আল-হালীমু)-সহিষ্ণু;
৩৩. اَلعَظِيم (আল-আযীমু)-মহিমাময়;
৩৪. اَلغفور (আল-গাফূরু)-পরম ক্ষমাকারী;
৩৫. اَلشكُور (আশ্ শাকূরু)-গুণগ্রাহী;
৩৬. اَلعلى (আল-আলীউ)-অত্যুচ্চ;
৩৭. اَلكَبِير (আল-কাবীরু)-শ্রেষ্ঠ;
৩৮. اَلحَفِيظ (আল-হাফীযু)-মহারক্ষক;
৩৯. اَلمقِيت (আল-মুকীতু) -আহার্যদাতা;
৪০. اَلحَسِيب (আল-হাসীবু)-হিসাব গ্রহনকারী;
৪১. اَلجَلِيل (আল-জালীলু)-মহিমান্বিত;
৪২. اَلكَرِيم (আল-করীমু)-অনুগ্রহণকারী;
৪৩. اَلرَّقِيب (আল-রাকীবু)-পর্যবেক্ষণকারী;
৪৪. اَلمجِيب (আল-মুজীবু)-প্রত্যুত্তরদাতা;
৪৫. اَلوَاسِع (আল-ওয়াসিউ)-সর্বব্যাপী;
৪৬. اَلحَكِيم (আল-হাকীমু)-প্রজ্ঞাময়;
৪৭. اَلودُود (আল-ওয়াদূদু)-প্রেমময়;
৪৮. اَلمجِيد (আল-মাজীদু)-গৌরবময়;
৪৯. اَلبَاعِث (আল-বা'ইসু)-পুনরুত্থানকারী;
৫০. اَلشهِيد (আশ্ শাহীদু)-প্রত্যক্ষকারী;
৫১. اَلحَق (আল-হাক্কু)-সত্য;
৫২. اَلوكِيل (আল-ওয়াকীলু)-কর্মবিধায়ক;

www.pathagar.com

৫৩. اَلْقَوِى (আল-কাবীয়্)-শক্তিশালী;
৫৪. اَلْمَتِيْنُ (আল-মাতীনু)-দৃঢ়তা সম্পন্ন;
৫৫. اَلْوَالِى (আল-ওয়ালীউ)-অভিভাবক;
৫৬. اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদু)-প্রশংসিত;
৫৭. اَلْمُحْصِى (আল-মুহ্সীউ)-হিসাব গ্রহণকারী;
৫৮. اَلْمُبْدِى (আল-মুবদীউ-আদি স্রষ্টা;
৫৯. اَلْمُعِيْد (আল-মুঈদু)-পুনঃসৃষ্টিকারী;
৬০. اَلْمُحِى (আল-মহিয়্)-জীবনদাতা;
৬১. اَلْمُمِيْتُ (আল-মুমীতু) -মৃত্যুদাতা;
৬২. اَلْحَىُّ (আল-হায়্যু)-চিরঞ্জীব;
৬৩. اَلْقَيُّوْمُ (আল-কায়্যূমু)-স্বাধিষ্ট বিশ্বধাতা;
৬৪. اَلْوَاجِد (আল-ওয়াজিদু)-প্রাপক;
৬৫. اَلْمَاجِد (আল-মাজিদু)-মহান;
৬৬. اَلْوَاحِد (আল-ওয়াহিদু)-একক;
৬৭. اَلْاَحَدُ (আল-আহাদু)-এক, অদ্বিতীয়;
৬৮. اَلصَّمَد (আস্ সামাদু)-অনপেক্ষ;
৬৯. اَلْقَادِرُ (আল-কাদীরু)-শক্তিশালী;
৭০. اَلْمُقْتَدِر (আল-মুকতাদিরু)-ক্ষমতাশালী;
৭১. اَلْمُقَدِّمُ (আল-মুকাদ্দিমু)-অগ্রবর্তীকারী;
৭২. اَلْمُؤَخِّر (আল-মুআখ্খারু) -পশ্চাদবর্তীকারী;
৭৩. اَلْاَوَّلُ (আল-আওয়ালু)-প্রথম অর্থাৎ অনাদি;
৭৪. اَلْاٰخِر (আল-আখিরু)-শেষ অর্থাৎ অনন্ত;
৭৫. اَلظَّاهِر (আয্ যাহিরু)-প্রকাশ্য;
৭৬. اَلْبَاطِن (আল-বাতিনু)-গুপ্ত;
৭৭. اَلْوَالِى (আল-ওয়ালীউ)-অধিপতি;
৭৮. اَلْمُتَعَالِى (আল-মুতা'আলীউ)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;
৭৯. اَلْبَر (আল-বার্রু)-কৃপাময়;
৮০. اَلتَّوَّاب (আত্ তাওয়াবু)-তাওবা কবুলকারী;
৮১. اَلْمُنْتَقِم (আল-মন্তাকিমু)-শাস্তিদাতা;
৮২. اَلْعَفُو (আল-'আফুউ)-ক্ষমাকারী;
৮৩. اَلرَّؤُف (আর রাউফু)-দয়ার্দ্র;
৮৪. مَالِكُ الْمُلْك (মালিকুল মুল্ক)-সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক;
৮৫. ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام (যুল জালালূ ওয়াল ইকরামু) - মহিমাময় মহানুভব;
৮৬. اَلْمُقْسِط (আল-মুক্সিতু)-ন্যায়পরায়ণ;
৮৭. اَلْجَامِع (আল-জামিউ)-একত্রকরণকারী;
৮৮. اَلْغَنِى (আল-গাণীয়্)-অভাবমুক্ত;
৮৯. اَلْمُغْنِى (আল-মুগ্নীয়্)-অভাব মোচণকারী;
৯০. اَلْمَانِع (আল-মানিউ)-প্রতিরোধকারী;
৯১. اَلضَّار (আয্ যাররু)-অকল্যাণের মালিক;
৯২. اَلنَّافِع (আন্ নাফিউ)-কল্যাণকারী;
৯৩. اَلنُّوْرُ (আন্ নূরু)-জ্যোতির্ময়;
৯৪. اَلْهَادِى (আল-হাদীউ)-পথ প্রদর্শক;
৯৫. اَلْبَدِيْع (আল-বাদীউ)-অভিনব সৃষ্টিকারী;
৯৬. اَلْبَاقِى (আল-বাকীউ)-চিরস্থায়ী;
৯৭. اَلْوَارِث (আল-ওয়ারিসু)-সত্ত্বাধিকারী;
৯৮. اَلرَّشِيْد (আর্ রাশীদু)-সত্যদর্শী;
৯৯. اَلصَّبُوْر (আস্ সাবূরু)-ধৈর্যশীল।[১]

১. মিশকাত শরীফ : ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ ছাড়া আরও সিফাতী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–

১. اَلرَّبُ (আর্ রাব্বু)-প্রতিপালক; ২. اَلْمُنْعِم (আল্ মুন্‌ইমু)-নি'মাত দানকারী; ৩.اَلْمُعْطِى (আল্ মু'তীউ)-দাতা; ৪. اَلصَّادِق (আস্ সাদিকু)-সত্যবাদী; ৫. اَلسَّتَار (আস্ সাত্তারু) - গোপনকারী।

'আল-আসমাউল হুসনার' যথাযথ বাংলা অনুবাদ হয় না।এখানে যে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে তা ইংগিত মাত্র। আল-আসমাউল হুসনার মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক গুণাবলী আল্লাহ্‌র জন্য সত্তাগত, অনাদি-অনন্ত, ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এ গুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত অস্থায়ী ও সীমিত।

আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র কতেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।

যেমন- يد-হাত• وجه - মুখ-মন্ডল, عين - চক্ষু। এ গুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাত সম্পর্কে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.) যা বলেছেন, তার উপর ঈমান রাখাতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

قَال الإمام مَالك لما سُئل عن الإستوَاء؟ الإستوَاء مَعلوم والكيف مَجهول والإيمَان به وَاجب وَالسوَال عنه بِدعَة كل من عند ربنا وهو حق وصواب ٠

ইমাম মালিক (র.) -কে যখন 'ইস্‌তিওয়া' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আরশে সমাসীন হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, ইস্‌তিওয়া-এর অর্থ জানা রয়েছে। কিন্তু এর অবস্থা অজানা। এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন করা বিদ্'আত। এ সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তা সত্য এবং সঠিক।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান

মানব জাতির হিদায়েতের উদ্দেশ্যে মহান রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূল কাকে বলা হয় এ সম্পর্কে সাইয়্যিদ মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.) তৎপ্রণীত 'কাওয়াইদুল ফিকহ্' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে,

مَن اوحى إلى وحيا خاصا من الله بتوسط الملك أو بالهام في قلبه أو بالرؤيا الصالحة وقد ختمت النبوة وانقطع الوحى بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فالرسول أخص منه لإن الرسول هو من أوحى الله بالرسالة وبتنزيل الكتاب من الله تعالى.

ফিরিশ্তার মাধ্যমে অথবা ইল্হামের মাধ্যমে বা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে যাঁর প্রতি বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশ বা ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁকে নবী বলা হয়। খাতামুন্ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর মাধ্যমে নবূওয়্যাতের এ সিল্সিলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং পরিসমাপ্ত হয়ে গিয়েছে ওহীর এ সুমহান ধারা। রাসূল-নবী হতে খাস্। কেননা, রাসূল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে যাঁকে পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।১

মতান্তরে রাসূল ঐ পয়গাম্বরকে বলা হয় যাকে নূতন শরী'আত এবং নূতন কিতাব প্রদান করা হয়েছে। আর নবী প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই বলা হয়, চাই তাঁকে নূতন শরী'আত এবং নূতন কিতাব প্রদান করা হোক বা না হোক। যে পয়গম্বরকে নতুন শরী'আত এবং নতুন কিতাব প্রদান করা হয়নি তিনি পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হয়েই দীনের প্রচারের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম বান্দাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য মহান রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.) হতে আরম্ভ করে আখিরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত অগণিত নবী-রাসূল দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আল্-কুরআনে তাঁদের সংখ্যা নির্ধারিতভাবে বর্ণনা কর হয়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

---

১. কাওয়াইদুল ফিক্হ, ঃ সাইয়্যিদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (র.), ৫২১পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ٥

আমি তো আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো কথা আপনার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা আপনার নিকট বিবৃত করি নি (৪০ ঃ ৭৮)।

নবী-রাসূলগণের সংখ্যা কত ? এ সম্পর্কে হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) একদা নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নবী-রাসূলগণের সংখ্যা কত ? জবাবে তিনি বললেন, তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার।[১]

তিনশ' পনের জন ছিলেন রাসূল। তাঁদের সকলের উপর ঈমান আনায়ন করা আমাদের উপর ফরয। কুরআন-হাদীস এবং অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে এর মধ্যে যাঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা গেছে তাঁদের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা এবং যাঁদের সম্বন্ধে ইজমালীভাবে জানা গেছে তাঁদের উপর ইজমালীভাবে ঈমান আনা জরুরী।[২]

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর স্বীয় সত্তার উপর ঈমান আনয়নের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনায়নের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ٥

রাসূল, তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছেন। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না আর তারা বলে আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন আপনারই নিকট (২ ঃ ২৮৫)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রতি ঈমান

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সর্বশেষ নবী এর উপরও ঈমান আনা আবশ্যক। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত যা কালেমায়ে শাহাদতের দ্বিতীয় অংশে ব্যক্ত করা হয়েছে কারো ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে না।

১. মিরকাতঃ শরহে মিশকাত, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা। ২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَالِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اتَّبَعُوْا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبَعُوْا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ٥

যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে আর তা-ই তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলোকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তা এ জন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন (৪৭ : ১-৩)।

আখিরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শুধু একজন নবী বা রাসূল বলে বিশ্বাস করলেই ঈমান শুদ্ধ হবে না। বরং তাঁকে বিশ্বনবী, শ্রেষ্ঠনবী এবং সর্বশেষ নবী বলেও বিশ্বাস করতে হবে। অন্যথায় এ ঈমান আল্লাহ্‌র নিকট ঈমান বলেই গণ্য হবে না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মর্যাদা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলে এক পর্যায়ের নন। বরং মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ٥

এ রাসূলগণ, তাদের কাউকে অন্য কারো উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (২ : ২৫৩)।

নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বহুবিদ কারণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় কারণ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মধ্যে নবূওয়্যাত এবং রিসালাত ছিল বিশেষ যুগ ও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ। আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনি বিশেষ কোন যুগের অথবা সম্প্রদায় বা অঞ্চলের জন্য নবী নন। বরং তিনি হলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের জন্য নবী। তিনি খাতামুন্ নাবিয়্যীন। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন

www.pathagar.com

নবী-রাসূল এ দুনিয়তে আর আসবেন না। আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে,

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষনবী (৩৩ ঃ ৪০)।

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ٥

আমি তো আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি (২১ ঃ ১০৭)।

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ٥

আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি (৩৪ ঃ ২৮)।

২. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন কোন বিশেষ কাওম বা গোত্রের প্রতি। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোন বিশেষ কাওম বা গোত্রের নবী নন। বরং তিনি হলেন, বিশ্ব নবী। এমন কি তিনি ছিলেন নবীদেরও নবী। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ٥

স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিক্মত যা কিছু দিয়েছি এর শপথ, তোমাদের নিকট যা আছে এর সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে ? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে ? তাঁরা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম (৩ ঃ ৮১)।

৩. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সমস্ত নবীগণের ইমাম। মি'রাজ রজনীতে তাঁর ইমামতিতেই নামায আদায় করেছিলেন সমস্ত নবীগণ।

৪. হযরত মুহাম্মদ (সা.) আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টির পূর্বেও নবী ছিলেন।

www.pathagar.com

মুসনাদে আহ্‌মাদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

كُنتُ نَبِيا وَآدم بَين الرُّوح وَالجَسَد.

আমি তখনো ছিলাম নবী, যখন হযরত আদম (আ.) ছিলেন রূহ্ এবং দেহের মধ্যে। অর্থাৎ যখন তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণতা লাভ করেনি তখনো আমি নবী।

৫. মহানবী হযরত মহাম্মদ (সা.)-কে কেন্দ্র করেই আল্লাহ্ তা'আলা আরশ, কুরসী, লাওহ্ কলম এক কথায় সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অন্যান্য নবীদের বেলায় এমনটি ঘটেনি। হাদীসে কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَلَولاَ مُحَمَّد مَا خلقت آدم ولاَ الجنة ولاَ النَّار.

মুহাম্মদকে সৃষ্টি না করা হলে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না এবং সৃজন করতাম না জান্নাত ও জাহান্নাম কোন কিছুই (মুস্তাদরাক)।

৬. রূহ্ জগতে যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত রূহ্ থেকে তাঁর রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি নিয়েছিলেন তখন সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এ ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী।

৭. হযরত ইস্রাফীল (আ.) যখন শিংগায় ফুঁক দেবেন তখন কবর থেকে সবার আগে উঠে দাঁড়াবেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ।

৮. কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) -কেই সর্বপ্রথম 'মাকামে মাহমূদে' আসীন হয়ে আল্লাহ্র তারীফ ও প্রশংসা করার জন্য আহবান করা হবে এবং সিজ্দা করার জন্য তাঁকেই সর্বপ্রথম অনুমতি প্রদান করা হবে।

৯. কিয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কেই সর্বপ্রথম শাফা'আতের অধিকার প্রদান করা হবে এবং অধিকার প্রদান করা হবে তাঁকে শাফা'আতে কুব্রা অর্থাৎ হাশরের মাঠে সমবেত সকলের ব্যাপারে ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করার । তাঁর শাফা'আতের পর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ, এরপর সাহাবা, তাবিঈন, তাবি, তাবিঈন পর্যায়ক্রমে আলিম ও হাফিযগণ গুনাহ্গার ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করবেন।

১০. অন্যান্য নবী-রাসূল যখন হাশরের ময়দানে নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে থাকবেন , এমতাবস্থায় মহানবী (সা.)-কে প্রথম পুলসিরাত পার হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তার আগে কেউ পুলসিরাত পার হওয়ার অনুমতি পাবে না।

১১. সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কেই অনুমতি প্রদান করা হবে এবং প্রথমে তিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করার নসীব হবে না কারোরই।

www.pathagar.com

১২. অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মু'জিযা ছিল খাস্ খাস্ বিষয়ে। যেমন - হযরত আদম (আ.) কে বস্তুর নাম সংক্রান্ত ইল্ম, হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) কে বিহংগকূলের ভাষাজ্ঞান, হযরত ইউসুফ (আ.) -কে স্বপ্নের ব্যাখ্যাজ্ঞান এবং হযরত ঈসা (আ.) কে মৃতকে জীবন্ত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা ইত্যাদি মু'জিযা প্রদান করা হয়েছিল। আর আমাদের নবীজীকে প্রদান করা হয়েছিল আল্লাহ্র পক্ষ হতে সর্ব বিষয়ের ইল্ম্ ও অফুরন্ত মু'জিযা।

১৩. অন্যান্য নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে এমন কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যার হুকুম পরবর্তীতে রদ ও রহিত হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের নবীজী (সা.) আল্লাহ্র পক্ষ হতে এমন কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন যা কখনও রদ ও রহিত হবে না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে।

১৪. অন্যান্য নবীগণ যে দীন নিয়ে এসেছেন তাতে ছিল না জীবনের সর্বকালের সর্ব বিধি-বিধান। আর আল্লাহ্র হাবীব মুহাম্মদ (সা.) যে দীন নিয়ে এসেছেন তাতে সর্বকালের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়া-আখিরাত সর্ববিষয়ের ও পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান ও হিদায়েত রয়েছে। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম (৫ ঃ ৩)।

১৫. হযরত মূসা (আ.) -এর শরী'আতে বিধান ছিল কঠোর এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর শরী'আতে বিধান ছিল খুবই কোমল ও শিথিল। আর ইসলামী শরী'আতের বিধান চরমও নয় শিথিলও নয় বরং তা হচ্ছে মধ্যপন্থা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বানিয়েছেন মধ্যপন্থী উম্মাত। ইরশাদ হয়েছে,

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا ۝

এ ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি (২ঃ ৪৩)।

১৬. পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতে একটি নেকীর বদলায় একটি সাওয়াব প্রদান করা হত। আর আমাদের নবীর শরী'আতে মহান আল্লাহ্ একটি নেকীর বদলায় ন্যূনপক্ষে দশটি সাওয়াব প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۝

www.pathagar.com

কেউ কোন সৎকর্ম করলে সে এর দশগুণ পাবে (৬ ঃ ১৬০)।

১৭. পূর্ববর্তী নবীগণের যুগে ইবাদতখানায় নামায আদায় করার বিধান ছিল। ইবাদতখানার বাইরে নামায আদায় করা কারো জন্যই বৈধ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.) এবং তাঁর উম্মাতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যমীনের যে কোন স্থানেই নামায আদায় করা বৈধ করে দিয়েছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

جُعِلَتْ لِى الأَرْض مَسْجِدًا وطَهورا

আমার জন্য গোটা যমীনকে মসজিদ এবং পবিত্রতার বস্তু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৮. পূর্ববর্তী নবীগণকে আল্লাহ্ তা'আলা যে মু'জিযা দান করেছেন তা হল আমলী মু'জিযা। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা আমলী মু'জিযা দান করার পাশাপাশি ইল্মী মু'জিযাও দান করেছেন। অন্যান্য নবীদের মু'জিযা তাঁদের হায়াত পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। আর আমাদের নবীজীকে মহান আল্লাহ্ যে ইল্মী মু'জিযা কুরআন মজীদ প্রদান করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত অরহিত, অবিকৃত ও অক্ষুন্ন থাকবে। কেননা, এর হিফাযতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ٥

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক (১৫ ঃ ৯)।

১৯. বহু নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের নাম উল্লেখপূর্বক সম্বোধন করেছেন। যেমন,

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ٥

হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর (২ ঃ ৩৫)।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ٥

হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর (১৯ ঃ ১২)।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ ٥

হে দাউদ। আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি (৩৮ ঃ ২৬)।

কিন্তু আমাদের নবী (সা.) কে আল্লাহ্ তা'আলা নাম ধরে সম্বোধন না করে

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ - يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ - يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ .

ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন।

www.pathagar.com

২০. আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে ব্যাপক অর্থবোধক কালাম দান করেছেন। যা ইতিপূর্বে কোন নবী রাসূলকে দান করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

আমি ব্যাপক অর্থবোধাক কালাম প্রাপ্ত হয়েছি।

২১. হাশরের ময়দানে প্রত্যেক নবীর হাতে একটি করে পতাকা থাকবে। এ পতাকার নীচে তাঁর উম্মাতগণ সমবেত থাকবেন। আর আমাদের নবীজীর হাতে থাকবে 'লিওয়াউল্ হামদ' নামক একটি পতাকা। এ পতাকার নীচে উম্মাতে মুহাম্মদীসহ হযরত আদম (আ.) হতে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এ দুনিয়াতে এসেছেন সকলেই সমবেত থাকবেন।

২২. আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবীজীকে দান করেছেন 'মাকামে মাহমূদ'। ইরশাদ হয়েছে,

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ০

আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ ঃ ৭৯)।

এই মর্যাদা অন্য কোন নবী বা রাসূলগণকে দান করেন নি।

২৩. হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের সরদার হবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর একথা প্রমাণের ঊর্ধ্বে। এতদসত্ত্বেও বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য কয়েকটি প্রমাণ উপরে উল্লেখ করা হল। এ বিষয়ে আরো বহু প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে।[১]

তিনি বিশ্ব নবী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর পূর্বে যত নবী-রাসূল এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা ছিলেন গোত্রীয় নবী বা আঞ্চলিক নবী। তাঁদের আগমন গোটা বিশ্বের হিদায়েতের জন্য ছিল না। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)হলেন, বিশ্বনবী। বিশ্ব মানবতার হিদায়েত এবং কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ০

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন (২৫ ঃ ১)।

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শ্রেষ্ঠ নবী বিষয়টি হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যেব সাহেব কর্তৃক প্রণীত 'খাতামুন্ নাবীয়্যীন' কিতাব দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তাঁর আগমন বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ০

আমি তো আপনাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি (২১ ঃ ১০৭)।

সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে,

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ০

আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না (৩৪ ঃ ২৮)।

মহানবী (সা.) থেকেও অনুরূপ ঘোষণার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ইরশাদ করেন,

- بُعِثْتُ إِلى النَّاس كَافة الأحمر والأسود وكان النبى قَبلِى يبعث إلى قومه ·

লাল কালো (আরব-অনারব) তথা সমগ্র মানব গোষ্ঠীর প্রতি আমি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। আর আমার পূর্বের নবীগণ শুধু কেবল তাদের কাওম এবং গোত্রের জন্য প্রেরিত হতেন (মুসনাদে আহ্মাদ, সূত্র ঃ কানযুল্ উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০৯ পৃ.)।

তিনি আরো বলেছেন,

إن الله يبعثنى رَحمةً لِلعٰلمين وَهُدى لِلعٰلمين ·

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছেন (মুসনাদে আহ্মদ ও তাবারানী)।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন বিশ্ব নবী, আলমী নবী তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য নবী। এক কথায় সর্বযুগের সকল দেশের মানুষের জন্যই তিনি নবী। কোন দেশ, কোন জাতি বা কোন কাল তাঁর নবূওয়াতের আওতা বহির্ভূত নয়।

www.pathagar.com

খত্‌মে নবূওয়াত

খত্‌মে নবুওয়াত আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব

আলোচ্য শিরোনামে উল্লেখিত খত্‌মে নবূওয়াত দু'টো শব্দই আরবী। খত্‌ম অর্থ শেষ এবং নবূওয়াত অর্থ পয়গাম্বরী। সুতরাং খত্‌মে নবূওয়াত অর্থ হল, মানব জাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.) হতে নবী প্রেরণের যে ধারা প্রবর্তন করেছেন এর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন - তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। তিনি হলেন, এ ধারার সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি আখেরী নবী, তিনি খাতামুন্ নাবিয়্যীন। তাঁর পর কোন নবী-রাসূল আর পৃথিবীতে আসবেন না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তিনিই সর্বশেষ নবী। কুরআন হাদীস, ইজমা কিয়াস তথা শরী'আতের দলীল চতুষ্টয় দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -ই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ। তারপর আর কোন নবী-রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। যদি কেউ নবী-রাসূল হওয়ার দাবী করে তবে সে হবে দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী ও মুর্‌তাদ। তাদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক সর্ম্পক রাখা কোন মুসলমানের জন্য আদৌ জায়িয নেই। কেননা, খত্‌মে নবুওয়াতের আকীদা যরুরিয়্যাতের দীনের অন্তর্ভূক্ত। যরুরিয়্যাতে দীন ইসলামী শরী'আতের এটি বিশেষ পরিভাষা। এর মর্মার্থ হল, শরী'আতের ঐ সমস্ত হুকুম আহ্‌কাম এবং আকীদাগত বিষয়সমূহ যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ ও সর্বত্র পালিত হওয়ার দরুন তা জানার জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। বরং বংশ পরম্পরায় মানুষ এ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। যরুরিয়্যাতে দীনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 'ওযর' হিসাবে গৃহীত হয় না। খত্‌মে নবূওয়াতের এ আকীদাকে অস্বীকার করা অন্য সব মৌলিক আকীদাকে অস্বীকার করার শামিল। সুতরাং যারা খত্‌মে নবূওয়াতের এ সর্বজন স্বীকৃত আকীদাকে অস্বীকার করে তারা কাফির। তাদের নামায, রোযা, যাকাত, কলেমা কোন কিছুই আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কাফির, মুর্‌তাদ, যিন্দীক এবং ধর্মত্যাগী। কেননা, আল্লামা ইব্‌ন হুমাম (র.) তৎপ্রণীত গ্রন্থ 'আল মুসায়িরা' -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে,

قَالَ العُلَمَاءُ مَن كَفَرَ بِشَيْءٍ مِن ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ أَو اسْتَخَفَّ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِعِ وَلَو سُنَّةً فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ الإِيمَانَ هُوَ تَصْدِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ مِن عِندِ اللّٰهِ وَرِضَاءُ القَلْبِ بِهِ وَتَسْلِيمُ القَلْبِ لَهُ مَعَ غَايَةِ الإِجْلَالِ وَنِهَايَةِ التَّعْظِيمِ .

উলামায় কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, যদি কেউ যরুরিয়্যাতে দীনের কোন বিষয়কে অস্বীকার করে অথবা শরী'আতের কোন বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে, যদিও ঐ বিষয়টি সুন্নাত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি কাফির সাব্যস্ত হবে। কেননা, নবী করীম (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যে আদর্শ

www.pathagar.com

নিয়ে এসেছেন তা অত্যন্ত মহব্বত ও আযমতের সাথে সর্বান্তকরনে মেনে নেওয়া এবং হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করাকে ঈমান বলা হয়।১

সুতরাং পরিপূর্ণ মু'মিন হতে হলে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে খত্‌মে নবূওয়াতের আকীদা ও বিশ্বাসের প্রতি আমাদের আস্থাশীল হতে হবে এবং ঈমান আনয়ন করতে হবে। অন্যথায় এ ঈমান স্বীকৃত হবে না এবং আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্যও হবে না।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের আলোকে খতমে নবূওয়াত

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বশেষ নবী" এ কথাটি আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই বিভিন্ন আসমানী গ্রন্থে এ কথাটির বিবরণ সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর প্রতি যে সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে লিখা রয়েছে,

إنه كائن من ولدك شعوب حتى يأتى النبى الأمى الذى يكون خاتم الأنبياء.

আপনার সন্তানদের মধ্যে বংশের ক্রমধারা চলতে থাকবে, অবশেষে উম্মী নবী আগমন করবেন। তিনি হবেন সর্বশেষ নবী।২

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) হযরত আবুল আলিয়া (র.) -এর সূত্রে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যখন এ দু'আ করেছিলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ

(হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন) তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, আপনার দু'আ কবূল হয়েছে। তিনি শেষ যুগে আগমন করবেন। ইব্‌ন সাদ (র.) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর প্রতি এ মর্মে ওহী অবতীর্ন করেন যে,

إنى أبعث من ذريتك مُلوكا وأنبياء حتى أبعث النبى الحرمى الذى تبنى أمته هيكل بيت المقدس وهو خَاتم الأنبياء واسمه أحْمَد

আমি আপনার সন্তানদের মধ্যে বাদ্‌শাহ্ এবং নবী সৃষ্টি করব। অবশেষে আমি প্রেরণ করব একজন নবী যিনি হবেন, হরমের অধিবাসী। তাঁর উম্মাতগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের নক্‌শা বা

---

১. নাবীউল কারীম : মুশাহিদ আলী (র.) ২. খাসাইসুল কুবরা : জালালুদ্দীন সায়ূতী (র), ১ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আকৃতি তৈরী করবে। তিনি হবেন, সর্বশেষ নবী এবং তাঁর নাম হবে আহ্‌মাদ।[১]

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ' وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ ' এর আলোচনায় তাওরাত গ্রন্থের ফলক সমূহের উল্লেখ করে এ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লেখ রয়েছে,

قال موسى إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون الخلق السابقون فى دخول الجنة رب اجعلهم أمتى قال تلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

হযরত মূসা (আ.)বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতের ফলক সমূহে এমন এক উম্মাতের কথার উল্লেখ পেয়েছি , যাদেরকে সৃষ্টি করা হবে সর্বশেষে আর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে সর্বপ্রথম। হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মাত বানিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এরা মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মাত।[২]

হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বনূ মালিকের লোক নিয়ে মিশর ও ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মুকাউকাসের নিকট গেলাম। সেখানে মুকাউকাসের সাথে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়। হযরত মুগীরা (রা.)বলেন, এরপর আমরা জনৈক পাদ্রীর নিকট গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, আমাকে বলুন! নবীদের মধ্যে কোন নবীর আগমন এখনো কি অবশিষ্ট রয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ, অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি হলেন, সর্বশেষ নবী। তাঁর এবং ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.)-এর মধ্যবর্তী কালে আর কোন নবী আসবেন না। হযরত ঈসা (আ.) আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি হলেন, উম্মী নবী এবং তিনি হলেন, আরবী নবী। তাঁর নাম আহ্‌মাদ। তিনি না দীর্ঘকায় না বেটে (বরং মধ্যম দেহের অধিকারী)। তাঁর চোখের শুভ্রতার মধ্যে কিছুটা লাল ডোরা থাকবে।[৩]

ইমাম তাবারী (র.) বর্ণনা করেন, মা'আদ ইব্‌ন আদ্‌নান বখ্‌তে নসর-এর যুগে বার বছরের কিশোর ছিলেন। ঐ যুগের নবী হযরত আরমিয়া ইব্‌ন হাবলকীয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন যে, আপনি বখ্‌তে নসরকে বলুন, আমি তাকে আরবের উপর বিজয়ী করব। আপনি সা'আদ ইব্‌ন আদ্‌নানকে আপনার নিজের বাহনের উপরে সাওয়ার করে নিন যাতে তার কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। কেননা,

فَانى مُستخرج من صلبه نبيا كريما اختم الرسل.

আমি তাঁর ঔরস হতে একজন সম্মানিত নবী প্রকাশ করব এবং তাঁর দ্বারাই আমি নবুওয়াতির ধারার পরিসমাপ্তি ঘটাব।[৪]

১. খাসাইসুল কুবরা, জালালুদ্দীন সায়ূতী (র.), ১ম খণ্ড, পৃ-৯ ২. সীরাতে মুস্তফা, ২য় খণ্ড পৃ-৯২-৯৩। ৩. খাসাইসুল কুবরা, জালালুদ্দীন সায়ূতী (র.), ২য় খণ্ড, পৃ-১২। ৪. মা'আরিফুল কুরআন (মূল) ১ম খণ্ড, ৫০-৫২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য আসমানী গ্রন্থেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী বহু নবী-রাসূলগণ এ কথাটি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে গিয়েছেন নিজ নিজ যুগে।

আল-কুরআনের আলোকে খত্‌মে নবূওয়াত

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বশেষ নবী" একথা আল-কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম ফকীহ্ হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন, "হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী" - এ কথাটি আল-কুরআনেই শতাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আলিমগণ বলেন, গোটা কুরআনই হল, খত্‌মে নবূওয়াতের জ্বলন্ত প্রমাণ। কেননা "কুরআন সর্বকালের জন্য সংরক্ষিত, অরহিত, অবিকৃত এক আসমানী কিতাব। সুতরাং এরপর আর কোন নবী কিম্বা কিতাব বা শরী'আত আসার একেবারেই অবকাশ নেই। যদি কেউ নবূওয়াতের দাবী করে তবে সে হবে মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ, দাজ্জাল, কাফির"। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বশেষে নবী, এ প্রসঙ্গে আল - কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ٥

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৩৩ ঃ ৪০)

খাতামুন্ নাবিয়্যীন শব্দের ব্যাখ্যা

ইল্‌মে তাফসীরের উৎস

আয়াতে উল্লেখিত 'خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ' এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে, কুরআন ব্যাখার মূল উৎস কয়টি ও কি কি ? তবেই আমরা সঠিক এবং বিশুদ্ধভাবে শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অবগত হতে পারব। অন্যথায় শব্দটির সঠিক অর্থ জ্ঞাত হওয়া আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না।

হযরত আল্লামা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.) তৎপ্রণীত তাফসীর গ্রন্থ "মা'আরিফুল কুরআন" এর উল্লেখ করেছেন যে, ইলমুত্ তাফসীর এর মূল উৎস ছয়টি।

১. **কুরআন শরীফ ঃ** "ইলমুত্ তাফসীর" এর প্রথম উৎস হল, কুরআন শরীফ। আল-কুরআনে এমন বহু আয়াত রয়েছে যা সংক্ষেপ-ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু অপর আয়াতে উক্ত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। তাই বলা হয়, "القرآن يفسر بعضه بعضا" কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে থাকে। এ কারণেই মুফাস্‌সিরগণ কোন আয়াতের তাফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

খোদ কুরআন শরীফের অপর কোন আয়াতে রয়েছে কিনা। যদি থাকে তবে ব্যাখ্যা হিসাবে ঐ আয়াতকেই তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। আর যদি কুরআন শরীফে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা না পাওয়া যায় তবে অন্য উৎসের মধ্যে তাঁরা ব্যাখ্যা তালাশ করে থাকেন।

২. হাদীস শরীফ ঃ কুরআন শরীফের ভাষ্যকার হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে মনোনীত করেছেন। তিনি নিজের কথা ও কাজ উভয় বিষয়ের দ্বারা এ মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। বস্তুত মহানবী (সা.)-এর গোটা জীবনই ছিল আল-কুরআনের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্য। এজন্য মুফাস্সিরগণ কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য দ্বিতীয় উৎস হিসাবে হাদীসের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং হাদীসের আলোকেই তাঁরা কুরআনের মর্মার্থ নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন।

৩. সাহাবা কিরামের বক্তব্য ঃ সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (সা.) হতে সরাসরি কুরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। ওহী নাযিলের সময় তাঁরা জীবিত ছিলেন; কুরআন নাযিলের পটভূমি তাঁদের সামনে ছিল। তাই নবী করীম (সা.)-এর পরে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও অর্থ সম্বন্ধে তাঁরাই সর্বাধিক প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য হবেন। অতএব যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় না সেক্ষেত্রে সাহাবীগণের বক্তব্যই সবচাইতে অধিক গুরুত্বের অধিকারী। এজন্য মুফাস্সিরীনে কেরাম তাঁদের বক্তব্যের আলোকে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

৪. তাবিঈগণের বক্তব্য ঃ তাফসীরের ব্যপারে সাহাবীগণের পরবর্তী মর্যাদা হল তাবিঈগনের। তাঁরা সাহাবাগণের মুখ থেকে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা শুনার সুযোগ লাভ করেছেন। এ কারণে তাবিঈনগণের বক্তব্য ও তাফসীর শাস্ত্রে বিরাট গুরুত্বের অধিকার ।

৫. আরবী সাহিত্য ঃ কুরআন শরীফ যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষার পূর্ণ দখল ও দক্ষতা একান্ত জরুরী। আল-কুরআনে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেগুলোতে শানে নুযূল কিংবা ফিক্হী মাসাইল বা আকীদাগত বিষয়ে কোন জটিলতা নেই। সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের কোন বক্তব্য না থাকলে তখন আরবী সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বন করেই ঐ সব আয়াতের তাফসীর করা হয়। তাই কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে আরবী জ্ঞান খুবই জরুরী।

৬. চিন্তা ও গবেষণা ঃ তাফসীরের সর্বশেষ উৎস হল, চিন্তা ও গবেষণা। আল-কুরআনের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী এমন এক অকূল সমূদ্র যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান করেছেন, তিনি যতই চিন্তা গবেষণা করবেন ততই নতুন রহস্যাবলী তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। মুফাস্সিরগণ নিজেদের গবেষণার ফলাফল নিজেদের তাফসীরসমূহের বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন এ ব্যাখ্যা পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অতএব

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি যদি আল-কুরআনের এমন কোন ব্যাখ্যা পেশ করে যা কুরআন, সুন্নাহ্‌, ইজ্‌মা বা সাহাবী-তাবিঈনগণের বক্তব্যের পরিপন্থী অথবা আরবী ভাষাগত ভাবধারার বিপরীত অথবা শরী'আতের কোন মূলনীতির বরখিলাফ তাহলে সে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

আল্‌-কুরআনের দৃষ্টিতে 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন'-এর অর্থ

'خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ' শব্দের কি অর্থ? তা আল-কুরআনের ও বিবৃত হয়েছে।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী আল্লামা ইব্‌ন কাসীর এবং আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) 'وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ' এর স্থলে 'وَلٰكِنْ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيّٖنَ'। পাঠ করতেন। এখানে 'خَتَمَ النَّبِيّٖنَ' শব্দটি 'نَبِيًّا'-এর 'صِفَتْ' (বিশেষণ) হয়েছে। এ হিসাবে এর অর্থ হবে, কিন্তু 'তিনি এমন এক নবী যিনি নবীদের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন'। উপরোক্ত কিরাআতের আলোকে সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -ই হলেন, সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোন নবী-রাসূলের আবির্ভাব হবে না। উপ-নবীও আসবেন না। এবং আসবেন না সহকারী কোন নবী। নবূওয়াতের বিষয়ে যত রকমের সম্ভাবনা থাকতে পারে সব কিছুরই পরিসমাপ্তিকারী তিনি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আখিরী নবী। তাঁর পর এ বিশ্বধরায় আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) -এর মাধ্যমে সর্বকালের এবং বিশ্বমানবের জন্য তাঁর দীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে কোন নতুন সংজোনের অবকাশ নেই। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ ـ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম (৫ ঃ ৩)।

এ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে,দীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং নবূওয়াত ও ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী-রাসূল আর এ পৃথিবীতে আসবেন না। সর্বোপরি নবী আসার কোন প্রয়োজনীতাও নেই। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সর্বকালের জন্য নবী। তাঁর আনীত দীন এবং পবিত্র কুরআন সর্বকালের সমগ্র মানবের জন্য দীন। এ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (৭ ঃ ১৫৮)।

সুতরাং এ কুরআন, এ দীন কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে এবং মহানবী (সা.)-এর নবূওয়াতও জারী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। যে এ কথা অস্বীকার করবে সে কুরআন অস্বীকারকারী কাফির।

১। মা'আরিফুল কুরআন:(মূল) মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), ১ম খণ্ড, ৫০-৫২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

কেননা, উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'النّاس' শব্দের الف ও لام অক্ষরটি إستغراق এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল, কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষ। অতএব রাসূল (সা.) যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের রাসূল। তাই তিনিই হলেন, সর্বশেষ নবী।

হাদীসের দৃষ্টিতে 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন'-এর ব্যাখা

পবিত্র কুরআনের তাফসীরের দ্বিতীয় উৎস হল হাদীস। হাদীসের মধ্যেও 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

لاَ تَقوم السَّاعة حتى يبعث دَجَّالون كَذَّابون كلهم يزعمون أنه نبى وأَنَا خَاتَم النبين لاَ نبى بَعدِى .

কতিপয় মিথ্যাবাদী দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নবী । অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবে না (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)।

হযরত আবূ হুযায়ফা (রা.)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন,"أَنَا خَاتَم النبين لاَ نبِىَّ بَعدِى"আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পর আর কোন আসবে না (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও তাবরানী)।

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

إن مَثلى مَثل الأَنبيَاء من قبل كمثل رَجل بنى بيتا فأَحسنه وأَجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فَانَا اللبنة وأَنا خَاتم النبيين .

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের অবস্থা এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘর তৈরী করল এবং তা খুব সৌন্দর্যমণ্ডিত করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। লোকজন এর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করত এর নির্মাণ কৌশল দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলতে লাগল, কেন এ ইটটি স্থাপন করা হয়নি ? (তাহলে তো নির্মাণ পূর্ণ হয়ে যেত) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন আমিই ঐ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবূ উমামা (রা.) দীর্ঘ হাদীসে নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

اَنَا اٰخر الأَنبيَاء وَأَنتم اٰخر الأُمم.

আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মাত (ইবন মাজা)।

www.pathagar.com

বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন,

أيها الناس لا نبى بعدى ولا أمة بعدكم فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكواة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ولاه أمركم تدخلوا جنة ربكم.

হে লোক সকল! আমার পর আর কোন নবী নেই এবং তোমাদের পর আর কোন উম্মাত নেই। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে,পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রামাযানের রোযা রাখবে, সন্তুষ্ট চিত্তে মালের যাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আনুগত্য করবে, তাহলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (মুনতাখাবুল কান্‌য)।

উপরোক্ত হাদীস সমূহের আলোকে একথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' এর মর্ম হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -ই হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটবে না এ পৃথিবীতে।

সাহাবা, তাবিঈ এবং মুফাসসিরগণের দৃষ্টিতে 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন'-এর ব্যাখ্যা

ইল্‌মে তাফসীর সম্পর্কে যে ক্রমধারা প্রথম বর্ণনা করা হয়েছে এর তৃতীয় এবং চতুর্থ উৎস হল সাহাবী এবং তাবিঈগণের তাফসীর । তাই 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' এর ব্যাখ্যায় তাঁরা কি মতামত ব্যক্ত করেছেন, নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' এর ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে,

عَنْ قَتَادَةَ ولٰكِنْ رَسُول اللّٰه وَخَاتَم النَّبِيّين اى اخرهم

হযরত কাতাদা (রা.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলএবং 'খাতামুন নাবিয়্যীন' অর্থাৎ সর্বশেষ নবী (তাফসীর ইবন্ জারীর, ২২তম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা সুয়ূতী (রা.) 'দুররে মানসূর' গ্রন্থে আবদ ইবন্ হুমাইদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

عَنِ الحسن فى قوله وخَاتَم النبيين قال خَتم الله النبيين مُحمدا صلى الله عليه وسلم وكَان اٰخر من بعث.

হযরত হাসান (র.) হতে 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের সিলসিলা মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। তিনি সর্বশেষ

www.pathagar.com

নবী এবং সর্বশেষ রাসূল (দুর্‌রে মানসুর, ৫ম খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)।

ইমামুল মুফাস্‌সিরীন আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَلٰكنه رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ الَّذِى خَتَمَ النبوة فطبع عليها فلاَ تفتح لأَحد بعده إلى قِيام السَّاعة ·

কিন্তু 'তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং খাতামুন্ নাবিয়্যীন' অর্থাৎ তিনি নবূওয়াতের ক্রমধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং এর উপর মুহর লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা আর কারো জন্য খোলা হবে না (ইবন্ জারীর, ২২তম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা)।

তাফসীরের বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'খাযিন'- এ বর্ণিত আছে যে,

ولاَ معه خَاتَمَ النَّبِيِّينَ خَتَمَ اللهُ به النبوة فلاَ نبوة بعده اى ولاَ معه ·

'খাতামুন নাবিয়্যীন' অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে নবূওয়াতের ধারা খতম করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পর নবূওয়াতের সিল্‌সিলা জারী হতে পারে না এবং তাঁর জীবদ্দশায় কেউ নবুওয়তের দাবী করতে পারে না (তাফসীরে খাযিন, ৩য় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)।

এতদ্ব্যতিত অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ সবের আলোকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -ই হলেন, সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী ও রাসূলএ পৃথিবীতে আসবেন না। যদি কেউ নবূওয়তের দাবী করে তবে সে হবে কাফির-ধর্মত্যাগী-মুর্‌তাদ।

আরবী অভিধানের দৃষ্টিতে খাতামুন্ নাবিয়্যীন এর ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতে ' خَاتَم' শব্দটির দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রয়েছে। যদিও শব্দটি আকার-ইকার তথা خَاتَم এবং خَتِم উভয় ভাবেই বর্ণিত রয়েছে। যদিও শব্দটি 'خَاتَم' সমধিক পঠিত হয়ে আসছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) তৎপ্রণীত তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাসান এবং আসিম (র.) শব্দটিকে যবরের সাথে পড়েছেন। এছাড়া অন্যান্য ক্বারীগণ শব্দটিকে যের এর সাথে পড়েছেন। তাই উভয় কিরাআত সম্বন্ধে কিছুটা বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

খাতাম এবং খাতিম শব্দ দু'টোর প্রত্যেকটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটির মধ্যে শব্দ দু'টো 'مُشترك' অবশিষ্ট একটি অর্থ হল খাস্, যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। খাতাম ও খাতিম এর প্রথম পাঁচটি অর্থ হল এই -

www.pathagar.com

১. নগীনা মুহর; (আংটির পাথর) ২. আংটি; ৩. কাওমের সর্বশেষ ব্যক্তি; ৪. ঘোড়ার পায়ের সাদা চিহ্ন; ৫. গদীর নীচের গর্ত।

'খাতাম' শব্দের বিশেষ অর্থ একটি। তা হল, মুহর বা সীলের যে চিত্র কাগজের উপর অংকিত হয় উহাকে 'খাতাম'বলা হয়। আর 'খাতিম' শব্দের বিশেষ অর্থও একটি। তা হল, কোন কিছু সমাপ্তকারী। 'খাতাম'এবং 'খাতিম' শব্দের এ বিশ্লেষণ বিখ্যাত অভিধান লিসানুল আরব, তাজুল আরূস, সিহাহ্ জাওহারী, কামূস ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে।

উপরোক্ত অর্থ সমূহের প্রথমটি, দ্বিতীয়টি, চতুর্থটি এবং পঞ্চমটি কোন ক্রমেই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না। এখানে তৃতীয় এবং ষষ্ঠ অর্থাৎ কাওমের শেষ ব্যক্তি এবং কোন কিছু সমাপ্তকারী এ দ'টো অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে।

আলোচ্য শব্দটির দ্বিতীয় অংশ হল 'النبيين'-আন্নাবিয়্যীন শব্দে উল্লেখিত 'الف و لام' অব্যয় পদটি 'استغراق'(কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত নবীকে বুঝানোর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে 'খাতাম'শব্দটি 'النبيين'এর দিকে 'مضاف'(সম্বোধিত হয়ে ব্যবহৃত) হয়েছে । এতে শব্দটির অর্থ হচ্ছে, নবীদের শেষ বা নবীদের ক্রমধারা সমাপ্তকারী।

'কামূস' নামক বিশ্ব বিখ্যাত আরবী অভিধানে 'খাতাম'শব্দটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'খাতাম'বা 'খাতিম' শব্দটি যখন কোন দল, জামা'আত, সম্প্রদায় বা গোত্রে প্রতি 'مضاف' হয়ে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার অর্থ হয় দল, জামা'আত, সম্প্রদায় বা গোত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি। যেমন বলা হয়, 'خاتم القوم' জাতির সর্বশেষ ব্যক্তি। 'خاتم النبيين'-'খাতামুন নাবিয়্যীন' অর্থ নবীগণের সর্বশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী(র.) মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

وخاتم النبيين لانه ختم النبوة اى تممها بمجيئه ٠

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' এজন্য বলা হয় যে, তিনি নবূওয়াতের ক্রম-ধারাকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আগমন করে নবুওয়াতকে পূর্ণত্ব দান করেছেন এবং এর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন (মুফরাদাতে রাগিব, ১৪২ পৃষ্ঠা)।

আল-কুরআনের শব্দমালার নির্ভরযোগ্য অভিধান গ্রন্থ 'আল-মুহ্কাম লি ইব্নিস সায়্যিদা' কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

وخاتم كل شئ و خاتمته عاقبته و اخره

'খাতিম' এবং 'খাতিমা' প্রত্যেক বস্তুর শেষ এবং সমাপ্তিকে বলা হয় (লিসানুল আরব)।

www.pathagar.com

তাজুল আরূসে বর্ণিত আছে ,

ومن أسمائه عليه السلام الخَاتِم والخَاتَم وهو الذى ختم النبوة بمجيئه

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র নাম সমূহের মধ্যে 'খাতিম' বা 'খাতাম'অন্যতম। 'খাতিম' বা 'খাতাম'ঐ ব্যক্তি যার আগমনে নবুওয়াতের ক্রমধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কুল্লিয়্যাতে আবিল বাকা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,

وتسمية نبينا خاتم الأنبياء لأدم إلى أخر القوم قال الله تعالى
مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ٥

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে 'খাতিমুল আম্বিয়া' এজন্য বলা হয় যে, 'খাতিম' কাওমের সর্বশেষ ব্যক্তিকে বলা হয়। এ অর্থেই আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে পুরুষের পিতা নয় বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী (কুল্লিয়াতে আবিল বাকা, ৩১৯ পৃষ্ঠা)।

এ ছাড়া ও মাজমাউল বিহার, সিহাহ্, সুরাহ্ এবং মুন্তাহাল আরব ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থে এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যে যারা বলে,"খাতামুন্ নাবিয়্যীন"অর্থ শ্রেষ্ঠনবী ও নবীগণের অলংকার তাদের এরূপ বলা অর্বাচীনতা বৈ কি? কেননা অভিধান গ্রন্থের কোথাও এ অর্থ বিবৃত হয় নি।

সর্বোপরি কুরআন এবং হাদীসে কোথাও এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় না। এ একান্তই মনগড়া ব্যাখা। নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই তারা এরূপ ব্যাখ্যা করে থাকে। এ হল বর্ণচোর কাফিরদের চক্রান্ত। এ সম্পর্কে আমাদের সকলকেই সচেতন থাকতে হবে।

পূর্বেই এ কথা বলা হয়েছে যে, আল-কুরআনের শতাধিক আয়াত দ্বারা খত্মে নবূওয়াত বিষয়টি প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে মাত্র একটি আয়াত আলোচিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ٥

আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (৫ : ৩)।

উপোরোক্ত আয়াতে বর্ণিত "তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম" এর মর্ম হল, ফরয ও সুন্নাত, হুদূদ ও আহ্কাম, হালাল ও হারাম তথা মানব জীবনের সকল বিষয়ের বিধান দিলাম। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন বিধান অবতীর্ণ হবে না এবং এর কোন প্রয়োজনও হবে না।

www.pathagar.com

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, 'اكمال دين' তথা দীন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার মানে হল, এ দীন তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে, কখনো বিলুপ্ত বা রহিত হবে না। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবী বা রাসূল আভির্ভূত হবেন না।

ইমামুল মুফাস্সির আল্লামা ইবন্ কাসীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

أى هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لَهم دينهم فلاَ يحتَاجُون إلى دِين غيره ولاَ إلى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلاَمه عليه ولهذا جعله الله خَاتم الأنبياءِ وبعثه إلى الإنس والجن .

এ উম্মাতের জন্য এটা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত যে তিনি এ উম্মাতের জন্য তাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। সুতরাং উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য আর কোন দীনের প্রয়োজন নেই এবং প্রয়োজন নেই কোন নবীর। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আখিরী নবী 'খাতিমুল আম্বিয়া' বানিয়েছেন এবং তাঁকে জিন্ন ও সমগ্র মানব জাতির জন্য নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন (তাফসীরে ইব্ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা)।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ٥

স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিক্মত যা কিছু দিব অতঃপর তোমাদের নিকট এমন কোন নবী আগমণ করবেন, যিনি তোমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে তার সমর্থন করবেন তখন তোমরা তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে, তিনি বলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে ? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে ? তাঁরা বললেন, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম (৩ : ৮১)।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছেন যা তিনি নবীদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে আদিকালে গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত আয়াতের তাফসীর এবং প্রসঙ্গত ঘটনা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আল্লামা সুব্কী (র.) শুধু এ আয়াতের তাফসীরের জন্য একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এর নাম হল 'التعظيم والمنة فى لتؤمنن ولتنصرنه'

www.pathagar.com

এ কিতাবের সারমর্ম হল, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির রূহ্ বা আত্মা সৃষ্টি করে তাদের থেকে স্বীয় প্রভূত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি নবীদের থেকে সাধারণ অঙ্গীকার ছাড়াও অতিরিক্ত আরেকটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তা হল, যদি তোমাদের কারো জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত হন, তাহলে তোমরা তাঁর প্রতি অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সাহায্য করবে।

উক্ত বক্তব্যে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, মহানবী (সা.) কেবল কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্যই নবী নন বরং তিনি নবীদেরও নবী। তাই হযরত ঈসা (আ.) যখন কিয়ামতের পূর্বে পুনঃ আগমন করবেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর একজন উম্মাত হিসাবেই আগমন করবেন, নবী হিসাবে নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'اَلنَّبِيِّيْنَ' শব্দে 'الف لام' শব্দটি হল 'إستغراقى'-এর অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নবীদের থেকেই এ অঙ্গীকার নিয়েছেন। অধিকন্তু 'النبيين' এর পর 'ثم' শব্দ সংযোজন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে 'ثم' শব্দটি ক্রমধারার ক্ষেত্রে পরবর্তী অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে সুস্পষ্টভাবে এ কথাই এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নবী রাসূলগণের শেষে নবী (সা.)-এর আগমন ঘটবে। অতএব মহানবী (সা.)-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার কথাটি এ আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পর শরী'আতপ্রাপ্ত; শরী'আত বিহীন বা ছায়ারূপ অর্থাৎ কোন প্রকার নবীর আগমনেরই আর সম্ভাবনা নেই।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

উপরোক্ত অয়াতে 'النَّاس' শব্দের 'الف ولام' অক্ষরটিও إستغراقى-এর অর্থ হল, কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষ। সুতরাং মহানবী (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের রাসূল বা নবী এ কথাটিও এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। তাই তাঁর পর কোন নবী রাসূলের আগমন ঘটতে পারে; এ কথা আদৌ সম্ভব নয়।

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○

আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না (৩৪ ঃ ২৮)।

আয়াতে উল্লেখিত 'كَافَّةً لِّلنَّاسِ' অর্থ সমগ্র মানব জাতি। তাই মহানবী (সা.) হলেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের নবী। তাঁর পর আর কোন নবী ও রাসূলের আগমন ঘটবে না। যে একথা অস্বীকার করবে সে হবে কুরআন অস্বীকারকারী কাফির।

www.pathagar.com

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার লোকদেরকে ইহজীবন ও পরজীবনে শাশ্বত বাণীর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন (১৪ ঃ ২৭)।

এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর তাফসীর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে,

اَلمسلم إذا سُئِل فِى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذالك قوله يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۝

মুসলিম ব্যক্তিকে তার কবরে যখন প্রশ্ন করা হবে তখন ঐ ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল। এ হল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ (বুখারী)।

কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান দনিয়ায় আসবে তারা সকলেই কবরে এ সাক্ষ্য দিবে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে মহানবী (সা.) হলেন, সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোন নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে আগমন করবেন না। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর অন্য কোন নবী-রাসূল আগমনের সম্ভাবনা থাকত তবে কিয়ামত পর্যন্ত এর জন্য কেবলমাত্র এ সাক্ষ্যই নির্ধারিত থাকত না।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ (৬৮ ঃ ৫২)।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ۝

ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। এর সংবাদ অবশ্যই তোমরা জানবে, কিয়ৎকাল পরে (৩৮ ঃ ৮৭-৮৮)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহানবী (সা.) সমগ্র মানব জাতীর জন্য রাসূল হিসাবে আগমন করেছেন। আরব অনারব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভূক্ত। যারা রাসূল (সা.) এর যুগে ছিল এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করবে, তিনি সকলরেই নবী। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

أَنَا رَسُوْلٌ مَنْ أدرك حَيًّا وَمَنْ يُولَد بَعدِى.

www.pathagar.com

আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য রাসূল যারা আমার জীবদ্দশায় দুনিয়াতে আছে এবং আমি তাদেরও রাসূল যারা আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করবে (ইবন্ সাদ আবিল হাসান, ১০১ পৃষ্ঠা)।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও খত্‌মে নবূওয়াতের প্রমাণ হিসাবে বিপুল সংখ্যক শত আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীসের আলোকে খত্‌মে নবূওয়াত

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বশেষ নবী' এ কথাটি দু' শতাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.)-ই হলেন, সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোন নবী-রাসূল আর এ পৃথিবীতে আগমন করবেন না। এ সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস নিম্নে পেশ করা হল,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم قَالَ إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِن قَبلي كمثل رجل بنى بيتا فأَحسنه وأَجمله إِلاَّ موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأَنَا خَاتَمُ النبيين ·

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, পূর্ববর্তী নবীদের তুলনায় আমার দৃষ্টান্ত এরূপ; যেমন কোন ব্যক্তি একখানা ঘর তৈরী করেছেন এবং সে ঐ ঘরটি সৌন্দর্য্য মন্ডিত ও চাকচিক্যময়ও করেছেন। কিন্তু একটি কোনে নির্মাণের সময় সে একটি ইটের জায়গা শূন্য রেখেছে। লোকজন এর চতুর্দিকে ঘুরে এর সৌন্দর্য্য অবলোকন করে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলতে থাকে যে, 'এ একটি ইট কেন' সংযোজন করা হয়নি ? (তাহলে তো ঘরের নির্মাণ কাজ পূর্ণাঙ্গ হয়ে যেত) আমিই 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন'। অর্থাৎ নবূওয়াতের ইমারত আমার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী)।

কোন্ কোন্ হাদীসে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, এরপর আমিই ঐ শূন্য স্থানটি পূর্ণ করেছি, আমার দ্বারা ঐ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। (আবূ আসাকির প্রণীত 'কান্‌য' নামক গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে)।

যে সমস্ত লোক প্রতারণার মাধ্যমে খাতামুন্ নবূওয়াতকে শরী'আত বিশিষ্ট নবীর সাথে খাস করে 'যিল্লী নবী' ও 'বুরুযী নবী' নামে নবূওয়াতের দু'টি উপধারা বের করে উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা তা মিথ্যা ও অসার প্রমাণিত হয়। তাই মহানবী (সা.) -এর পর নবূওয়াতের দাবী করা জালিয়াত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরও বলেছেন,

www.pathagar.com

عَن أَبِى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كَانت بنو إسرائيل تسوسهم الأَنبِيَاء كلما هلك نبى خلفه نبى وإنه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামই নবী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোন নবী ইন্‌তিকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী আসবে না। বরং খলীফাগণ প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাঁদের সংখ্যা হবে অনেক (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহ্‌মাদ ও ইব্‌ন মাজা)।

عَن أنس بن مَالِك قَال قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلاَ رسول بعدِى ولاَ نبى.

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, রিসালাত ও নবূওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমার পর কেন রাসূল ও নবীর আগমন হবে না (তিরমিযী)।

উপরোক্ত হাদীস দু'টির প্রথমটিতে ' لَانبى بَعدى ' এবং দ্বিতীয়টিতে ' فلاَ رسول بَعدىْ و لا نبى بَعدى ' এ 'رسول ونبى' শব্দ দুটি 'نفى' এরপর 'نكرة' হিসাবে হয়েছে। আরবী ব্যকরণ মতে 'نفى' এরপরে 'نكرة' ব্যবহৃত হলে তার দ্বারা 'عُموم وشمول' তথা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। এ হিসাবে এ বাক্যদ্বয়ের অর্থ হল, আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী-রাসূলই এ পৃথিবীতে আগমন করবে না। এতে সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই হলেন সর্বশেষ নবী।

عَن عِرباض بن سارية قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى عَبدَ الله وَخَاتَم النبيين .

হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং সর্বশেষ নবী (বায়হাকী ও হাকিম)।

عن أَبِى أُمَامة الباهلى عن النبى صلى الله على وسلم فى حديث طويل وأنا اٰخر الأنبيَاء وأنتم اٰخر الاُمم.

হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা.)বলেছেন, আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা হলে সর্বশেষ উম্মাত (ইব্‌ন মাজা, ইব্‌ন খুযায়মা ও হাকিম)।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم فى خطبته يوم حجة الوداع أيها الناس!إنه لاَ نبى بعدى ولا أُمَّةَ بعدكم فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكٰوة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم.

হযরত আবূ উমামা (রা.)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আমার পর কোন নবী আগমন করবেন না এবং তোমাদের পর আর কোন উম্মাত হবে না। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রামাযান মাসের রোযা রাখবে, সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় মালের যাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের নেতাদের (যারা শরী'আতের বিধান মুতাবিক নেতৃত্ব দেয়) আনুগত্য করবে, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে দাখিল হতে পারবে (মুনতাখাবুল কানয্)।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে. হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর পর শরী'আত বিহীন, ছায়ারূপী, আক্ষরিক, আংশিক কোন প্রকার নবী আগমন করবে না। যদি আগমন করত তাহলে মহানবী (সা.) নিজেকে সর্বশেষ নবী এবং স্বীয় উম্মাতকে সর্বশেষ উম্মাত বলে আখ্যায়িত করতেন না।

عَنْ ثوبان قَالَ قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم أنه سيكون فى أُمتى كذّابون ثلٰثون كلهم يزعم أنه نبى وأنَا خَاتَمُ النبيين لاَ نَبِيَّ بَعْدِى.

হযরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবী হওয়ার দাবী করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী আসবে না (মুসলিম)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قَالَ النبى صلى اللّٰه عليه وسلم أنَا خَاتم الأنبيَاء ومسجدِى خَاتم مسَاجد الأنبيَاء.

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ নবীদের সর্বশেষ মসজিদ (কানযুল উম্মাল)।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِى هريرة عنِ النبى صلى الله عليه وسلم قَال فضلت على الأنبياء بست أُعطيت جَوَامع الكلم ونصرت بالرعب وأُحلت لى الغَنَائِم وجعلت لِى الأرض مَسجِدا وطَهورًا وأُرسلتُ إلى الخلق كافةً وخُتم بى النبيون.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সমস্ত নবীর উপর আমাকে ছয়টি বিষয়ে অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে -

১. আমাকে অল্প শব্দে বিপুল ভাব প্রকাশের পূর্ণ যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে; ২. আমি রো'ব (এমন এক শক্তি যার দ্বারা শত্রু মিত্র সকলে প্রভাবিত হয়) দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি; ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে; ৪. আমার জন্য সমস্ত যামীনকে নামায আদায়ের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের বস্তু বানানো হয়েছে; ৫. সমগ্র সৃষ্টির নিকট আমাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার দ্বারা নবীদের ক্রমধারা সমাপ্ত করা হয়েছে (মুসলিম)।

عَنْ جَابربن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَنَا قَائد المرسلين ولاَ فخر وأَنَا خَاتَم النبيين ولاَ فخر وأَنَا أول شَافع ومشفع ولاَ فخر .

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আমি নবী-রাসূলগণের নেতা; এতে আমার কোন গর্ব নেই। আমি সর্বশেষ নবী; এতেও আমার কোন গর্ব নেই। আমি কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশ সর্বপ্রথম গ্রহণযোগ্য হবে; এতে আমার কোন গর্ব নেই (দারিমী, ইব্ন আসাকির ও মিশ্কাত)।

এছাড়াও দুইশ হাদীস রয়েছে যার দ্বারা খত্মে নবূওয়াত বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

ইজ্মা ও কিয়াসের আলোকে খত্মে নবূওয়াত

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বশেষ নবী' এ কথাটি যেভাবে কুরআন-হাদীস দ্বারা ও প্রমাণিত; অনুরূপ এ বিষয়টি 'ইজ্মা'-এর দ্বারাও প্রামণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর আকীদায়ে খত্মে নবূওয়াতের উপরে সাহাবায়ে কিরামের ইজ্মা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদার মুসায়ালামাকে কাফির আখ্যা দেন এবং

www.pathagar.com

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) -এর নির্দেশে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) -এর নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের এক বিরাট বাহিনী ইয়ামামার প্রান্তরে মুসায়লামা ও তার সাংগ পাংগদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। এ অভিযানে মুসায়লামার চল্লিশ-হাজার সহযোদ্ধাদের মধ্যে মুসায়লামাসহ আটাশ হাজার লোক নিহত হয় এবং বাকী লোকেরা কোন উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করে। উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সাহাবী এবং কোন মুসলমানই খলীফাতুল মুসলিমীন এর সাথে দ্বিমতপোষণ করেন নি। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁরা এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজের বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করেন। এতে সাতশ' হাফিয ক্বারী সাহাবীসহ বারোশ' সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। সাহাবীদের এ যুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে অংশ গ্রহণ এবং খত্মে নবূওয়াতের সংরক্ষণে তাঁদের এ কুরবানী এ কথাই প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা.) -ই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী দুনিয়াতে আগমন করবে না। পুরা-নবী, উপ-নবী, সহকারী-নবী, যিল্লী-নবী এবং বুরূযী-নবী এক কথায় আর কোন নবী -ই দুনিয়াতে আসবে না। যুক্তির মানদণ্ডে বিষয়টিকে যদি আমরা বিচার করি তাহলেও একথাই প্রমাণিত যে মহানবী (সা.) -ই হলেন সর্বশেষ নবী। কেননা সাধারণত কয়েক কারণে নবী প্রেরণ করা হয়েছে,

এক. পূর্ববর্তী কালের লোকদের জন্য পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা ও তা'লীমের উপর চলা দুষ্কর হলে নবী প্রেরণ করা হয়েছে।

দুই. পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা ও তা'লীম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে নবী প্রেরণ করা হয়েছে।

তিন. পূর্ববর্তীকালে বিভিন্ন গোত্রে উপগোত্রে নবী প্রেরণ করা হত। পূর্ববর্তী নবীর ইন্তিকালের পর ঐ গোত্র বা উপগোত্রে পুনরায় নবী প্রেরণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তীকালে নবীগণ নিজ নিজ কাওমের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর শিক্ষা নিজ গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। অন্য গোত্রের জন্য তা প্রযোজ্য ছিল না, তাই অন্য গোত্রের জন্য নতুন নবী প্রেরণ করা হত।

চার. কোন নবীর তা'লীম তাঁর যুগের লোকদের জন্য সময়োপযোগী ছিল ও সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু পরিবর্তীতে পরিস্থিতির কারণে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তা অনুপযোগী হওয়ায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে নতুন নবী প্রেরণ করেছেন।

পাঁচ. কোন নবীর জীবদ্দশায় প্রয়োজন হলে সহায়ক নবী প্রেরণ করা হত। কুরআন-হাদীসের প্রতি গভীরভাবে নযর করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত কারণসমূহের কোন কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ওফাতের পরে দেখা দেয় নি বা এর কোন সম্ভাবনাও নেই। তাই যৌক্তিক দিক থেকেও কোন নতুন নবী আগমনের আবশ্যক নেই।

www.pathagar.com

ইমাম ও মুজতাহিদগণের দৃষ্টিতে খত্‌মে নবূওয়াত

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর কেউ যদি নবূওয়াতের দাবী করে তবে সে নিঃসন্দেহে কাফির বলে গণ্য হবে। এমন কি নবূওয়াতের দাবীর পক্ষে উক্ত ব্যক্তির নিকট কেউ যদি প্রমাণ তলব করে তবে সেও কাফির বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা, প্রমাণ তলব করা দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ যে নবূওয়াতের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছেন তাতে তার সন্দেহ রয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্তের পর তার প্রমাণ দাবী করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের উপর সন্দেহ প্রকাশ পাওয়া, এতটুকুই কোন ব্যক্তির কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট (মানাকিবুল ইমাম আল্ আযম আবী হানীফা ঃ ১ম খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা)

২. আল্লামা ইব্‌ন নুজায়ম (র.) কর্তৃক রচিত 'আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কেউ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী হিসাবে বিশ্বাস না করে তবে কিছুতেই সে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে শামিল হতে পারবে না। বরং সে কাফির-মুরতাদ বলে গণ্য হবে। কেননা খত্‌মে নবূওয়াতের আকীদা দীন ইসলামের সে সব মৌলিক আকীদার অন্তর্ভূক্ত যে সব আকীদা যরূরিয়্যাতে দীন হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

৩. ইমাম গাযালী (র.) তৎপ্রণীত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইক্‌তিসাদ' এ উল্লেখ করেছেন যে, হুযুর (সা.) -এর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। এ এমন এক সত্যকথা এবং সর্বসম্মত বিষয় যার ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার কোন অবকাশ নেই। যারা তা করবে তারা কাফির।

৪. বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী আয়ায (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শিফা '-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যে বা যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর বর্তমানে বা তাঁর অবর্তমানে নবূওয়াতের দাবী করবে অথবা সাধনা করে নবূওয়াত লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস করবে অথবা তাঁর নিকট ওহী আসে বলে দাবী করবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

৫. শায়খ মুহী উদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) তাঁর 'ফাতুহাতে মক্কীয়্যা' গ্রন্থে তৃতীয় খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় ৩১০ অধ্যায়ে, এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, নবূওয়াত খত্‌ম হওয়ার পর মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ নিষেধ অবতরণের পথ চিররুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়, তবে সে ব্যক্তি যদি সুস্থ মস্তিষ্ক সাবালক হয় তবে আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তবে আমরা তার কথার কোনই গুরুত্ব দেব না।

৬. বিখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, নবী করীম (সা.) -এর পর নবূওয়াতের দাবী করা কুফরী।

৭. ফিকহ্ শাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' রয়েছে, যে ব্যক্তি হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না সে মুসলমান নয়।

৮. আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং মহানবী (সা.) তাঁর বর্ণনায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পর আর কোন নবী আসবে না। মহানবী (সা.) -এর পর যদি কেউ নবূওয়াতের দাবী করে তবে সে জঘন্য মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, গুমরাহ্ এবং গুমরাহ্‌কারী।

৯. উপমহাদেশের উজ্জল নক্ষত্র হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, কেউ যদি এরূপ বলে যে, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামুন্ নাবিয়্যীন' এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না এবং তিনি শেষ নবী একথা ঠিক নয়, তবে সে যিন্দিক। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। হানাফী, শাফিয়ী সমস্ত ইমামগণ একমত ব্যক্ত করেছেন।

১০. আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.) বলেছেন, খত্‌মে নবূওয়াতের আকীদা যরূরিয়্যাতে দীনের অন্তর্ভূক্ত। যরূরিয়্যাতে দীনকে যে অস্বীকার করবে সে কাফির। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদারদের তালিকা

কুরআন সুন্নাহ্ এবং ইজ্‌মা ও কিয়াসের আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা.)-ই হলেন সর্বশেষ পয়গাম্বর। এতদ্‌সত্ত্বেও কতিপয় পথভ্রষ্ট ব্যক্তি মিথ্যা নবূওয়াতের আসনে সমাসীন হওয়ার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বহু আগেই এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[১]

হাদীসের আলোকে খত্‌মে নবুওয়াত তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যাবাদীদের ত্রিশজন হবে প্রসিদ্ধ। বাকীরা অপ্রসিদ্ধ। হাদীসে প্রসিদ্ধদের কথাই বলা হয়েছে। কারা কোথায় কখন নবূওয়াতের দাবী করেছে নিম্নে তাদের কতিপয়ের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

	নাম	দেশ	সন
১	আসওয়াদে আনাসী	ইয়ামান	৬ হিজরী
২	তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ আসাদী	খায়বার	৮ হিজরী
৩.	মুসায়লামাতুল কাযযাব	ইয়ামামা	১০ হিজরী
৪.	সাজাহ্ বিন্‌ত হারিস	আল্‌জাযিরা	১৪ হিজরী
৫.	মুখতার ইব্‌ন উবায়দ সাকাফী	কূফা	৬৪ হিজরী
৬.	বয়ান ইব্‌ন সাম'আন ইয়ালমাঈ	কূফা	৯৪ হিজরী
৭	আবূ মনসূর আজালী	কূফা	১২০ হিজরী
৮.	মুগারী ইব্‌ন সাঈদ আজালী	কূফা	১২৯ হিজরী
৯.	সালিহ্ ইব্‌ন তুরায়ফ	উন্দুলুস (স্পন)	১৩০ হিজরী

www.pathagar.com

নাম	দেশ	সন
১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুয্‌লাস আল্‌খাত্তাব	কুফা	১৩৪ হিজরী
১১. ইসহাক আখ্‌রাস	মরক্কো	১৩৫ হিজরী
১২. হাকীমে মুনাক্কি'	বাগদাদ (ইরাক)	১৪৮ হিজরী
১৩. উসতাদ সীস	ইরান	১৫৪ হিজরী
১৪. আবূ ঈসা ইব্‌ন ইয়াকূব	ইস্পাহান (ইরান)	২১৮ হিজরী
১৫. ইয়াহুদ ইব্‌ন আবান	বাহ্‌রাইন	২৬০ হিজরী
১৬. আবুল আব্বাস	কায়রো (মিশর)	২৯৮ হিজরী
১৭. বাহা ফরীদ ইব্‌ন মাহে কায্‌ভীন	নিশাপুর	৪৪২ হিজরী
১৮. হুসায়ন ইব্‌ন খাম্‌রান	ইরাক	৪৮৩ হিজরী
১৯. মাহমুদ ওয়াহিদ গীলানী	ইরাক	৬০০ হিজরী
২০. কুতুবুদ্দীন আহ্‌মদ	আফ্রিকা	৬৫৫ হিজরী
২১. আহমদ ইবন হিলাল	দামেস্ক (সিরিয়া)	৭৮০ হিজরী
২২. বায়েযীদ আবদুল্লাহ্‌	হিন্দুস্তান (ভারত)	৯৫৫ হিজরী
২৩. গোলাম আহমদ কাদিয়ানী	পাঞ্জাব (ভারত)	১৯০১খৃষ্টাব্দ
২৪. আহ্‌মদ সাঈদ কাদিয়ানী	সুমাবড়ইয়াল	১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ
২৫. আহ্‌মদ নূর (সুরমা বিক্রেতা)	কাদইয়ান (ভারত)	১৯১৮ খৃষ্টাব্দ
২৬. ইয়াহ্‌ইয়া আয়নুল্লাহ্‌	বিহার প্রদেশ (ভারত)	১৯২০ খৃষ্টাব্দ
২৭. খাজা ইসমাঈল	লণ্ডন (যুক্তরাজ্য)	১৯৩০ খৃষ্টাব্দ
২৮. টুমুথী উরফে কার ডিও আলী	ল্যাটিন আমেরিকা	১৯৪২ খৃষ্টাব্দ
২৯. মুহাম্মদ মূর্দা	নাইজেরিয়া	১৯৮১ খৃষ্টাব্দ
৩০. মুহাম্মদ আলী	গাজীপুর শেখোপূরা	১৯৮২ খৃষ্টাব্দ

যুগে যুগে আকীদায়ে খত্‌মে নবূওয়াতের সংরক্ষণ

সাহাবায়ে কিয়ামের স্বর্ণ যুগ হতে অদ্যাবধি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌ খত্‌মে নবূওয়াতের আকীদার প্রতি এক ও অভিন্ন মতপোষণ করে আসছে। এ আকীদার প্রতি মুসলমানগণ যে আনুগত্য ও ভক্তি শ্রদ্ধার প্রমাণ দিয়ে আসছে, এর নযীর পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে কল্পনা করা যায় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত যখনই কোন দিক থেকে এ আকীদার উপর আঘাত এসেছে, তখনই মুসলিম উম্মাহ্‌ দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঘাতের মুকাবিলা করেছে ।

এতে কোন ইতস্তত করে নি। বরং খত্‌মে নবূওয়াতের আকীদার সংরক্ষণ জান-মাল বিলিয়ে দেওয়াকে তারা পরম সৌভাগ্যের বিষয় হিসাবে লুফে নিয়েছে। সর্বকালের উম্মাতের

এক ও অভিন্ন প্রত্যয় এই যে, আকীদায়ে খত্‌মে নবূওয়াতের সংরক্ষণে যে কোন ত্যাগ এবং কুরবানী দেওয়ার জন্যই আমরা প্রস্তুত আছি । প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে সর্বকালের উম্মাতের একই ঘোষণা ছিল। আমি বেঁচে থাকব আর দীনের উপর আঘাত আসবে ! এ আদৌ হতে পারে না।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আরবে 'আসওয়াদ আনাসী' নামক এক নরাধম নবূওয়াতের দাবী করে। কতিপয় সাহাবীর পরামর্শে ফিরোয-দায়লামী (রা.) তাকে শায়েস্তা করেন এবং এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় করে দেন। এ সংবাদ নবী (সা.)-এর নিকট পৌছলে তিনি তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতে এ কথা প্রামাণিত হচ্ছে, যে নবূওয়াতের দাবী করবে সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা উম্মাতে মুহাম্মদীর উপর ওয়জিব।

জীবন সায়াহ্নে নবী (সা.) যখন পরকালের সফরের প্রস্তুতি গ্রহন করছিলেন, তখন ইয়ামামায় 'মুসায়লামা' নামক এক মিথ্যাবাদী দুরাচার নবূওয়াতের দাবী করে। ইব্‌ন জাবীর তাবারী (র.) তাঁর রচিত 'তারীখে তাবারীতে' উল্লেখ করেছেন যে, মিথ্যাবাদী মুসায়লামা এ কথা ঘোষণা করেছিল যে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর উপর ঈমান রাখি এবং তাঁর সহায়ক নবী হিসাবে আমি প্রেরিত হয়েছি। নবী কারীম (সা.) সাহাবায়ে কিরামের নিকট এ বিষয়ে তাঁর অস্বস্তির কথা ব্যক্ত করেন। নবীজীর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হয়ে সর্বপ্রথম এ ফিত্‌না নির্মূল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সময়টি ছিল খুবই নাজুক। নবীজীর ইন্‌তিকালের শোকে সকলেই মূহ্যমান। সর্বোপরি তখন বিভিন্ন গোত্রে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলছিল। অমুসলিমরা এ সময়ে মদীনা আক্রমণ করে মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। মদীনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার প্রবল আশংকা দেখা দিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা ঘোষণা করলেন যে, আমার প্রথম ও প্রধানতম দায়িত্ব হল, মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদার মুসায়লামাতুল কায্‌যাবকে নির্মূল করা। সমস্যা সংকুল অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর ঘোষণার সাথে বিনাবাক্যে ঐক্যমত ঘোষণা করেন এবং সে অনুসারে সকলেই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করেন। খত্‌মে নবূওয়াতের সংরক্ষণে এভাবে সাহাবীদের গুরুত্বপূর্ণ ইজ্‌মা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ইজ্‌মা ভিত্তিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বীর কেশরী হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) -এর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মুসায়লামা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে শায়েস্তা করার জন্য রওয়ানা করিয়ে দিলেন। ভণ্ড নবী মুসায়লামা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারেরও কিছু বেশী। ইয়ামামার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী এবং মুসায়লামা বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। এ যুদ্ধে মুসায়ালামা সহ তার বাহিনীর আটাশ হাজার লোক নিহত হয়। মুসলিম বাহিনীর সাতশ' হাফিযে কুরআনসহ বারো শ' সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর জীবদ্দশায় যতগুলো যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এবং এতে যে পরিমাণ সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, খত্‌মে নবূওয়াতের আকীদা সংরক্ষণে সংঘটিত এ যুদ্ধে প্রায় এর দ্বিগুণ সাহাবী শহীদ হন। কেননা সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছিলেন যে, খত্‌মে নবূওয়াতের আকীদা সংরক্ষিত না থাকলে কুরআন থাকবে না। তাই মহা ত্যাগের মাধ্যেমে তাঁরা সর্বকালের মুসলমানের নিকট এ দৃষ্টান্তই স্থাপন করে গেলেন, যে কোন ত্যাগের মাধ্যমে এ আকীদা সংরক্ষণ করতে হবে। তাহলে দুনিয়াতে ঈমান থাকবে; দীন থাকবে; কুরআন থাকবে এবং ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত অম্লান ও অক্ষুন্ন অবস্থায় টিকে থাকবে।

ইমাম বায়হাকী (র.) 'কিতাবুল মাহাসিন ওয়াল মুসাভী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে 'তুলায়হা' নামক এক নরাধম নবূওয়াতের দাবী করে। হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (রা.) তাকে হত্যা করার জন্য হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করেন। এ অভিযানের সংবাদ শুনে সে সিরিয়া পালিয়ে যায় এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইন্‌তিকালের পর তাওবা করে সে পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে।

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফতকালে হারিস নামক এক পাপিষ্ঠ নবূওয়াতের দাবী করে। তখন তিনি তৎকালীন আলিমদেরকে ডেকে তাঁদের মতামত গ্রহন করনে। তারা তাকে হত্যা করার হুকুম দিলে তিনি তাকে হত্যা করেন।

খলীফা হারূনুর রশীদ -এর খিলাফতকালেও এক ব্যক্তি নবূওয়াতের দাবী করে এবং বলে আমি হলাম নূহ্ (আ.)। কেননা হযরত নূহ্ (আ.) -এর হায়াত পঞ্চাশ বছর বাকী থাকা অবস্থায় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। সে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ্ পুনরায় আমাকে এ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আল-কুরআনেরও এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, 'أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا' হযরত নূহ দুনিয়াতে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন। হারূনুর রশীদ সমকালীন আলিমদের ফাত্‌ওয়া মুতাবিক মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীর অপরাধে তাকে হত্যা করেন এবং শূলিকাষ্ঠে তার লাশ ঝুলিয়ে রাখেন।

আল্লামা শাতিবী (র.) ৮ম হিজরী সনের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তাঁর রচিত ইতিসাম নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ফাযাযী নামক এক ব্যক্তি নবূওয়াতের দাবী করে এর সমর্থনে লোকদেরকে এমন কিছু দেখাতে আরম্ভ করে যেগুলোকে সাধারণ লোকেরা মু'জিযা মনে করতে থাকে। ফাযাযীর এ তেলেসমাতির ফলে কিছু লোক তার ভক্ত হয়ে যায়। তারা খত্‌মে নবূওয়াত সংক্রান্ত আয়াতের মধ্যে এরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আরম্ভ করে যে, যার ফলে মহানবী (সা.) -এর পরে নবীর আগমনের অবকাশ আছে বলে বুঝা যায়। অবশেষে তৎকালীন যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম ইমাম জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) -এর ফাত্‌ওয়ার ভিত্তিতে তাকে এবং তার ভক্তদের হত্যা করা হয়।

ইংরেজ বেনিয়াদের ভারতবর্ষে আগমনের পর মুসলিম জাতি যখন পরাধীন, যখন তারা

www.pathagar.com

ইংরেজ কর্তৃক নির্যাতিত ও তাদের যুলমের যাতাকলে নিস্পেষিত হচ্ছিল। তখন অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা সর্বদিক হতে মুসলিম জাতিকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এমনি এক চরম বিপর্যয় মুহূর্তে মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা আকীদায়ে খত্মে নবূওয়াত -এর ভিত্তিমূলে আঘাত হানার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীকে প্ররোচিত করে তাকে দিয়ে নবূওয়াতের দাবী করায়। এই চরম আঘাতের মুকাবিলার জন্য হাক্কানী উলামায়ে কিরাম খত্মে নবূওয়তের সর্ববাদীসম্মত আকীদা সংরক্ষণের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এশিয়ার অন্যতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ -এর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.) হক্কানী আলিমদের একটি জামা'আতকে সাথে নিয়ে মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাইয়্যিদ শাহ আতা উল্লাহ্ বুখারীও (র.) তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত মজলিসে আহরার ও মুসলিম জন সাধারণকে নিয়ে এ ফিত্নার সার্থক মুকাবিলা করেন।

১৯৭৪ সালের উপ-মহাদেশ বিভক্তির পর হক্কানী আলিমগণ লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যেমে এ ফিত্নার মুকাবিলা করেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। আলিম ও মুসলিম জনসাধারণের প্রচেষ্টায় মির্জা কাদিয়ানীর দাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও নবূওয়াতের মিথ্যা দাবীদার কাদিয়ানী সমাজ বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে। সাথে সাথে উলামায়ে কিরাম এবং মুসলিম জনসাধারণও এর মোকাবিলা করতে থাকেন অব্যাহত গতিতে।

১৯৫৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরের রাজপথে দশ হাজার মুসলমান একই রাতে বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে আকীদায়ে খত্মে নবূওয়াতের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের রক্তাক্ত ইতিহাস রচনা করেন। এ রাতে শুধু যে আলিম সমাজ শাহাদাত বরণ করেছেন তা নয়। বরং এতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এগিয়ে এসেছিলেন আকীদায়ে খত্মে নবূওয়াত হিফাযত করার জন্য। গ্রাম গঞ্জের হাজার হাজার লোক নবী প্রেমে মত্ত হয়ে শাহাদাতের নেশায় ছুটে এসে বুক পেতে দিয়েছিলেন মেশিনগানের গুলির সামনে। এমনি করে যুগে যুগে হাক্কানী উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম জনসাধারণে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, বুকের তাজা খুন দিয়ে হলেও তারা আকীদায়ে খত্মে নবূওয়াতের সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম মুসলিম জনসাধারণও এ ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা এ কথাটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী আকীদা ঃ একটি পর্যালোচনা

মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস এবং কাদিয়ানীদের ধর্ম বিশ্বাস এক নয়। তাদের ধর্ম ভিন্ন এবং মুসলমানদের ধর্ম ভিন্ন। চৌদ্দশ' বছর যাবত গোটা মুসলিম জাতি যে আকীদা পোষণ করে আসছে কাদিয়ানীরা এর খেলাপ আকীদা প্রচার করে চলছে। নিম্নে মুসলমান এবং কাদিয়ানীদের কতিপয় আকীদা বিশ্বাস সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হল ঃ

www.pathagar.com

১. মুসলমানদের আকীদা, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -ই হলেন, সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী নেই। সমস্ত জিন্ন ও মানুষ এবং সারা জগতের জন্যই হলেন তিনি নবী। এ বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীতে এবং এ ধরনের আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যে তিনি নবীদের মধ্যে আফযল এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁর রিসালাত এবং নবূওয়াতের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে কারো ঈমানই গ্রহনযোগ্য নয়। নবূওয়াতী সিলসিলার পরিসমাপ্তি তাঁর মাধ্যমেই হয়েছে। তাঁর পর হতে নবূওয়াতের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিই হল কাফির, ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত এবং হত্যার যোগ্য। অথচ কাদিয়ানীরা বলে নবূওয়াতের সিলসিলা হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত শেষ নয়। তিনি শেষ নবী নন। বরং তাঁর পর ও চলতে থাকবে নবী আগমনের সিলসিলা। এ দাবীর প্রেক্ষিতে মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর বক্তব্য হলো, আমিও পূর্ববর্তী নবীগণের মত একজন নবীই; যে আমার নবূওয়াতকে অস্বীকার করবে সে কাফির।

২. মুসলমানদের আকীদা হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর পর ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর পর অন্য কারো নিকট ওহী নাযিল হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ নবূওয়াতের দাবী করে তবে সে কাফির। পক্ষান্তরে মীর্যাপন্থী কাদিয়ানীদের আকীদা হল মির্যা গোলাম আহমদের প্রতি বারিধারার ন্যায় ওহী অবতীর্ণ হত। তা কখনো আরবী ভাষায় কখনো উর্দূ ভাষায়। আবার কখনো হিন্দী ভাষায়, কখনো ইরানী ভাষায় আবার কখনো এমন ভাষায় যা বুঝে আসে না।

৩. কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের নাজাত এবং সফলতা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর উপর অবতীর্ণ ওহীর উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু মীর্যা ও মীর্যাপন্থীদের ধারনা পরকালের সফলতা এবং মুক্তি মির্যা সাহেবের তা'লীম এবং তার উপর অবতীর্ণ ওহীর উপরই নির্ভরশীল। এ আকীদা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোন মানুষ নাজাত লাভ করতে পারবে না। এ হল প্লাবণ কালে হযরত নূহ্ (আ.) -এর তরণীর মত।

৪. মুসলমানদের আকীদা মহানবী (সা.) সৃষ্টিকূলের মুকুটমণি। তিনি সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্র পরেই তাঁর মর্যাদা। মীর্যা সাহেব এবং কাদিয়ানীদের দাবী মীর্যা গোলাম আহমদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সম মর্যাদাসম্পন্ন। বরং সে হুযুর (সা.) থেকেও অধিক সম্মানিত এবং আরো অধিক মর্যাদার অধিকারী।

৫. উম্মাতের কোন ব্যক্তিই হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। যে নবী নয় সে কখনো কোন নবী হতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। পক্ষান্তরে মির্যা গোলাম আহমদ নিজেকে ইসরাঈলের নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে এবং বলে, 'ইবন মারইয়ামের কথা বাদ দাও, গোলাম আহমদ তার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। ঈসার সাধ্য কি যে সে আমার অঙ্গিনায় পা রাখতে পারে।

৬. নবী রাসূলদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা ফরয। তাদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাব

www.pathagar.com

প্রদর্শন করা কুফরী। কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ হযরত ঈসা (আ.) -এর প্রতি চরম অবজ্ঞা ও অবমাননাকর বাক্য উচ্চারণ করেছে, এমন কি সে তাঁকে নাদান বলেও আখ্যায়িত করেছে।

৭. মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, নিম্ন বর্ণিত আয়াত,

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا ۢبِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ ۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

স্মরণ করুন, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম বলেছিলেন, হে বণী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহ্‌মাদ' নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসলেন তখন তারা বলতে লাগল এতো এক সুস্পষ্ট যাদু (৬১ ঃ ৬)।

এ আয়াতে উল্লেখিত 'আহ্‌মাদ' দ্বারা মহানবী (সা.) -কেই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মির্যা গোলাম আহ্‌মাদ এবং তার অন্ধ ভক্তদের বিশ্বাস হল, উক্ত আয়াতে 'আহ্‌মাদ' দ্বারা মির্যা গোলাম আহ্‌মদকেই বুঝানো হয়েছে।

৮. মুসলমানদের আকীদা কোন নবীর ভবিষ্যতবাণী মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু মির্যা গোলাম আহ্‌মাদ ও তার অনুসারীদের আকীদা হল হযরত ঈসা (আ.)-এর তিনটি ভবিষ্যতবাণী অবাস্তব এবং মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

৯. মুসলমানদের আকীদা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ঘোষণা জিহাদ শরী'আতের অঙ্গ যা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কিন্তু মির্যা গোলাম আহ্‌মদের ঘোষণা হল জিহাদ একটি অমানুষিক বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফিরদের সাথে জিহাদ করা আমার উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার ধারনা মতে বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা করা এবং জিহাদের অমানুষিক বর্বরতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ হতে বিরত থাকা সকলের জন্য অপরিহার্য।

১০. পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.) থেকে বহু মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করা। মৃত্তিকা থেকে পাখি তৈরী করা এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা প্রভৃতি। মুসলমানদের আকীদা ও বিশ্বাস এ সব মু'জিযা সন্দোহাতীতভাবে সত্য। কিন্তু মির্যা গোলাম আহ্‌মদের মতে হযরত ঈসা (আ.) প্রকাশিত এসব মু'জিযা সত্য নয়; এরূপ আকিদা ভ্রান্ত ও মুশরিকদের আকিদা।

১১. মুসলমানদের আকীদা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহ্‌র পাক হতে আগত ওহীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি কাফির এবং ইসলামের গণ্ডি

www.pathagar.com

১৬. বিশুদ্ধ এবং সর্বসম্মত হাদীসের আলোকে এ কথা প্রামণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) এবং ইমাম মাহদী (আ.) দুই পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি। হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণের আগে হযরত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। তিনি যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়াতে যাবেন; তখন ঈসা (আ.) -এর শুভাগমণ ঘটবে। পক্ষান্তরে মির্যাপন্থীদের দাবী হযরত ঈসা এবং ইমাম মাহদী অভিন্ন ব্যক্তিত্ব। বলাবাহুল্য মির্যা সাহেবই এ অভিন্ন ব্যক্তি একাধারে মসীহ্ ও মাহদী উভয়ই।

১৭. বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত মত এবং অকীদা হল, ইয়াহূদী বংশদ্ভুত এক কানা ব্যক্তিই হবে দাজ্জাল, ইয়াহূদীরা তার অনুসরণ করবে। শেষ যুগে সে ভীষণ ফিত্না এবং দারুন বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। সে নিজকে খোদা বলে দাবী করবে। হযরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয়বার এসে তাকে হত্যা করবেন। পক্ষান্তরে মির্যা পন্থীদের আকীদা দাজ্জাল খৃস্টান পাদ্রী পন্থীদেরই একটি দল।

১৮. হাদীস দ্বারা প্রামাণিত যে ইয়াজুজ মাজূজ দু'টি বিশেষ সম্প্রাদায়ের নাম। হযরত ঈসা (আ.) -এর বদ্ দু'আয় তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের মরা লাশের দুর্গন্ধে গোটা পৃথিবী তখন দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মির্যা সাহেবের দাবী 'ইয়াজূজ মাজুজ' হল রাশিয়ার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম। আর আমিই হলাম 'মাসীহে মাওউদ'।

কাদিয়ানী প্রচার কৌশল ও সংগঠনিক কাঠামো

কাদায়ানী জামা'আত মিথ্যা বানোয়াট এবং ছল চাতুরীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের একটি কৌশল হল, তারা সরলমনা মুসলমানদের নিকট বলে, আমরা আপনারা সকলেই মুসলমান। মুসলমানরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত বিভিন্ন তরীকা অবলম্বন করে থাকে। কেউ চিশ্তিয়া তরীকা কেউ কাদ্রিয়া তরীকা, আবার কেউ নকশ্বন্দীয়া। আবার কেউ অবলম্বন করে সোহ্রাওয়ার্দীয়া তরীকা। এভাবে মুসলিম বিশ্বে বহু তরীকা আছে। আমরাও এক তরীকাবলম্বী মুসলমান। আমাদের তরীকার নাম 'আঞ্জুমানে আহ্মদিয়া' বা আহ্মদিয়া মুসলিম জামা'আত। কিছু-দিন পর্যন্ত আহ্মদিয়া তরীকার ফযীলত বর্ণনা করার পর যখন লোকদের মধ্যে তারা কিছুটা আগ্রহ দেখতে পায় তখন তারা বলে আমাদের এ তরীকার ইমাম এ যুগের মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহ্দী।

এভাবে তরীকাপন্থীর অভিনয় করে সরলমনা এক শ্রেণীর মুসলমানকে তারা মুরতাদ বানানোর কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এ বিষয়ে সর্তক থাকা প্রয়োজন যে, যারা নিজেদেরকে 'আহ্মদিয়া' বলে পরিচয় দেয় তারাই কাদিয়ানী-মুরতাদ-কাফির।

তারা সরলমনা মুসলমানদেরকে কাদিয়ানী বানানোর জন্য মুসলিম সমাজে এ কথাও প্রচার করে থাকে যে, তাদের প্রচারণার ফলে বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ ও ইয়াহূদী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তাদের এ দাবী মিথ্যা। এ হল সরলমনা

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের জালে আবদ্ধ করার একটি অপকৌশল মাত্র।

তারা প্রতারণার ক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করে থাকে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, কবরস্থান, ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দ দেখে অনেকেই তাদেরকে মুসলমান বলে মনে করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমান নয়।

সরলমনা মুসলমাদেরকে মুতারদ বানানোর জন্য তারা 'আহ্‌মদিয়া মুসলিম জামা'আত' ছাড়াও আরো পাঁচটি নামে কাজ করে থাকে।

১. মজলিসে আনসারুল্লাহ ঃ চল্লিশ উত্তীর্ণ বয়সের লোকেরাই সাধারণত এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠন সাধারণ মুসলমান, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্ম মতের প্রচার করে থাকে। এ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদ পত্র সেবীদেরকে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট করা।

২. মজলিসে খুদ্দামে আহমদিয়া ঃ পনের এর উর্দ্ধে এবং চল্লিশের কম বয়স্ক লোকেরাই এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠনের কাজ হচ্ছে যুবকদেরকে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট করা। এ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে কাদিয়ানী বানানের জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তারা সাধারণত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বই পত্র এবং পুস্তক পুস্তিকাও বিতরণ করে থাকে।

৩. মজলিসে আতফালুল আহমদিয়া ঃ পনের বা এর চেয়ে কম বয়সের বালক বালিকারই সাধারণত এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। তারা তাদের সম বয়স্ক শিশু কিশোরদেরকে কাদিয়ানী বানানোর জন্য কাদিয়ানী কর্তৃক রচিত শিশু সহিত্যও বন্টন করে থাকে। এমনকি এ বয়সের কিশোর কিশোরীদেরকে কাদিয়ানী বানানোর জন্য তারা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করে থাকে।

উপরোক্ত সংগঠনসমূহ পুরুষ এবং কিশোরদের মধ্যে কাজ করে থাকে। আর মহিলাদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারের জন্য দু'টি পৃথক সংগঠন রয়েছে।

১. লাজনা ইমাইল্লাহ ঃ পনের বছরের অধিক বয়স্কা মহিলারা এ সংগঠনের সদস্যা হয়ে থাকে। এ সংগঠনের মহিলারা শহর বন্দর ও গ্রামাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচার করে থাকে। এবং এতদুদ্দেশ্য তারা মহিলাদের মধ্যে বই পুস্তকও বিতরণ করে থাকে। এমনকি টাকা পয়সার প্রলোভন দেখিয়েও তারা মহিলাদেরকে কাদিয়ানী বানানোর প্রচেষ্টা চালায়।

২. নাসিরাত ঃ পনের বছরের কম বয়স্কা কিশোরীরা সাধারণত এ সংগঠনের সাদস্য হয়ে থাকে। এ বয়সের কিশোরীরা তাদের সমবয়স্কা কিশোরীদেরকে কাদিয়ানী বানানোর জন্য

www.pathagar.com

পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে এবং এ সুযোগে তাদেরকে তারা কাদিয়ানী ধর্মমত সম্বলিত শিশু সাহিত্যের বই প্রদান করে থাকে।

মুসলমানদের কর্তব্য

মহানবী (সা.) হলেন **খাতামুন্ নাবিয়্যীন**। তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে আসবে না। যদি কেউ নবূওয়াতের দাবী করে তবে সে হবে কাফির। তাই মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা সকলেই উম্মাতে মুহাম্মদীর সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অনুসারে কাফির। যদি কেউ মির্যা কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে মুসলমান বলে মনে করে তবে সেও কাফির।

এ কারণে বিশ্বের প্রায় সব ক'টি মুসলিম রাষ্ট্রে তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের সর্বপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এই ভয়াবহ ফিত্না প্রতিহত করা প্রতিটি মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

মি'রাজ

মি'রাজ এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা। মি'রাজ মহানবী (সা.)-এর এক অবিস্মরণীয় মু'জিযা এবং নবূওয়াতের উজ্জ্বল নিদর্শন। মি'রাজের ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -ই হলেন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় রাসূল, তিনি শ্রেষ্ঠ নবী, বিশ্ব নবী। মি'রাজের ঘটনা কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর সত্যতার উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব।

বস্তুত এ ঘটনা আল-কুরআনে 'ইস্রা' শব্দ প্রয়োগে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ইস্রা' শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈশভ্রমণ। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এ ভ্রমণ রাতেই হয়েছিল তাই, এ ভ্রমণকে 'ইস্রা' বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণকে 'ইস্রা' বলা হয়। আর মি'রাজ শব্দটি 'উরূজুন' ধাতু হতে উদ্গত হয়েছে। এর অর্থ উর্ধ্বে আরোহন করা। যেহেতু হাদীস শরীফে 'عُرِجَ بِىْ' উরিজা বী (অর্থাৎ আমাকে উর্ধ জগতে আরোহণ করানো হয়েছে) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই মহানবী (সা.)-এর এ ভ্রমণকে মি'রাজ নামে অভিহিত করা হয়।[১]

মি'রাজ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি বা সোপান। যেহেতু মহানবী (সা.)-কে জান্নাতী এক সোপানের মাধ্যমেও উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তাই তাঁর এ ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়।[২]

ইসলামের পরিভাষায় মাসজিদে আক্সা থেকে সিদ্রাতুল মুন্তাহা ও তদূর্ধ্ব জগতের ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়। কখনো কখনো উভয় ভ্রমণকে একত্রে 'ইস্রা ও মি'রাজ' বলা হয়।

১. সীরাতুন্ নবী (সা.) ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী (র.), ৩য় খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা।
২. সীরাতে মুস্তাফা, ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর এ মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আকাশমণ্ডলী পরিভ্রমণ

আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহানী অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের নবূওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় কোন এক সময় অনন্ত ও অসীম সত্তার মহা কুদরতের নিদর্শণসমূহ অবলোকন করার জন্য রূহানীভাবে উর্ধ্ব জগতে তাঁদেরকে সায়র ও পরিভ্রমণ করিয়েছেন। তখন দর্শনের যাবতীয় বস্তু ভিত্তিক শর্তাবলীর বাঁধা তাঁদের চোখের সামনে থেকে অপসারণ করা হয়েছে। যাতে নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের গোপনীয় দৃশ্যাবলী উম্মুক্তভাবে তাঁদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

এ প্রসংগে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَكَذَالِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ٥

এ ভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা পরিদর্শন করাই (৬ ঃ ৭৫)।

হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্বন্ধে তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 'ইয়াকূব বীরে সাব'আ (সপ্ত কূয়া) হতে বের হলেন এবং হরান এর দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌছে তিনি এক স্থানে শয্যা গ্রহণ করলেন। কেননা তখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি মাথার নীচে কিছু পাথর রেখে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি দেখলেন যে, আকাশ হতে যমীন পর্যন্ত একটি সিঁড়ি লাগানো রয়েছে। এত চড়ে ফিরিশ্তাগণ উপরে উঠানামা করছেন। উপর থেকে আল্লাহ্ পাক বলছেন, আমি তোমার প্রতিপালক। আমিই তোমার পিতা ইব্রাহীম এবং ইসহাকের স্রষ্টা। যে ভূখন্ডে তুমি শুয়ে আছো তা আমি তোমাকে এবং তোমার বংশধরকে দান করবো।

হযরত মূসা (আ.). তূর পর্বতে আল্লাহ্র নূর দর্শণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে বনী ইস্রাঈলের অন্যান্য নবীগণেরও রূহানী পরিভ্রমণ হাসিল হয়েছিল। তাওরাতের মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। এমনিভাবে ইন্জীলের মধ্যে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

মোদ্দাকথা, রূহানীভাবে নবী-রাসূলগণের সায়র এবং পরিভ্রমণ সর্বকালেই হাসিল হয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মর্যাদা মুতাবিক ঐ অনন্ত ও অসীম কুদরতের নিদর্শন মুশাহাদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতদের জন্য রূহানীভাবে এই মহামর্যাদা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন।

নবী করীম (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন –"اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ" সালাতই হচ্ছে মু'মিনের জন্য মি'রাজ। অন্যান্য নবীদের এ সায়র এবং পরিভ্রমণ ছিল রূহানী

www.pathagar.com

ভাবে। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী ও বিশ্ব নবী তাই তাঁর এ সফর হয়েছে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। এ সফরে তিনি এমন স্থানে পদার্পন করেছিলেন যেখানে তাঁর পূর্বে কোন নবী-রাসূল পৌঁছতে পারেন নি এবং তিনি এমন সব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা অন্য কোন নবী-রাসূল অবলোকন করেন নি।[১]

মি'রাজের রহস্য ও উদ্দেশ্য

আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত অসীম। আর মানুষের জ্ঞান সীমিত। সীমিত জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র কুদরত সম্বন্ধে যথাযথ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আপন অনুগ্রহে তাঁর প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে যান; তাঁর কুদরতের নিদর্শনাবলী অবলোকন করনোর জন্য। এটাই হল মি'রাজের বিশেষ উদ্দেশ্য।

এ প্রসংগে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

পবিত্র ও মহামহিম তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযুগে ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আক্সায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (১৭ ঃ ১)।

মি'রাজের রহস্য "لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا" আয়াতাংশের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করে দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্রতের বিশেষ নিদর্শন দেখানোর জন্যই তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবকে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়েছিলেন। তাই প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (র.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'রূহুল মাআনীতে' "لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا" বাক্যটির উল্লেখ করেছেন যে, "ليرفعه إلى السماء حتى يرى ما يرى من العَجَائِب" আমি আমার বান্দাকে মাসজিদে আক্সা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়ে ছিলাম যাতে আসমানে আরোহণ করে তিনি আমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ থেকে যা কিছু দেখার তা দেখতে পান। বস্তুত একই রাত্রে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্সায় গমন, তথায় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে নিয়ে নামায আদায় করা, সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ, জান্নাত- জাহান্নাম পরিদর্শন সিদ্রাতুল মুনতাহায় অবতরণ এবং আল্লাহ্র দীদার লাভ ও তাঁর সাথে কথোপকথন ইত্যাদি সব কিছুই ছিল চমৎকার কুদরাতের বিস্ময়কর নির্দশন সমূহের অন্যতম। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্র মহা কুদরতের বাস্তব এবং চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করেছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

---

১. সীরাতুন্ নবী (সা.) ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী (র.), ৩য় খণ্ড, ২২১-২২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

এ কথাই সূরা নাজ্‌ম-এ বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى-مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى-وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى-عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُوْمِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الاَعْلٰى-ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى-فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى-مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى-عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى-مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى○

শপথ নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নন বিপথগামীও নন এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এ তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাঁকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন এক সত্তা, তিনি নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলেন, তখন তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে ছিলেন, ফলে তাদের দু'জনের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা এরও কম, তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন, যা তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তকরণ তা অস্বীকার করে নি, তিনি যা দেখেছেন, তোমারা কি সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বির্তক করবে ? নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন, প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া, যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দারা আচ্ছাদিত ছিল। তাঁর দৃষ্টি ভ্রম হয়নি এবং লক্ষচ্যুতও হয় নি তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন (৫৩ ঃ ১-১৮)।

গবেষক আলিমদের মতে মহানবী (সা.) -এর মি'রাজ লাভের আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, আল্লাহ্র নিয়ম এই যে, পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। মাক্কী যিন্দেগীতে মহানবী (সা.) যেহেতু আল্লাহ্র দীনের রাস্তায় কাফির-মুশরিক কর্তৃক অমানুসিক নির্যাতন ভোগ করেছেন, শি'আবে আবূ তালিবে অন্তরীণ অবস্থায় তিন তিনটি বছর অতিবাহিত করেছেন। পরে তায়িফ সফরে ইতিহাসের এক লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাই দয়াময় প্রভূর রহমতের দরিয়া উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তিনি তাঁর বন্ধুর প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হন। ডেকে নেন তাঁকে আপন সান্নিধ্যে। পরিদর্শন করান তাঁকে অসীম কুদরাতের অপূর্ব নিদর্শনসমূহ। ভূষিত করেন তাঁকে হাবীব তথা মহা সম্মানজনক উপাধিতে। অবশেষে বহু সুসংবাদ এবং উপঢৌকন সহ পৌঁছিয়ে দেন তাঁকে নিজ মাতৃভূমিতে।

মোদ্দাকথা সান্ত্বনা দান আল্লাহ্র কুদরতের অপূর্ব মহিমা প্রদর্শন এবং মহানবী (সা.)-কে

www.pathagar.com

মহাসম্মানে ভূষিত করার লক্ষ্যেই মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে মি'রাজের মাধ্যমে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়েছিলেন।

মি'রাজের স্থান ও কাল

মহানবী (সা.)-এর মি'রাজ কখন এবং কোন তারিখে হয়েছিল, এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মহানবী (সা.) -এর মি'রাজ একবার হয়েছিল না দু'বার, এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। অনুরূপভাবে এ মি'রাজ কোন জায়গা থেকে সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে।

বিশুদ্ধতম বর্ণনার আলোকে অধিকাংশ উম্মাতের রায় হল, সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় জীবনে একবারই মহানবী (সা.)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।[১]

সন তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্য গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' কিতাবে এ সম্বন্ধে দশটি মত উল্লেখ করা হয়েছে।

১. হিজরতের ছয় মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল ।

২. মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের আট মাস পূর্বে ।

৩. মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের এক বছর পূর্বে ।

৪. মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের এগার মাস পূর্বে ।

৫. হিজরতের এক বছর দু মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল ।

৬. হিজরতের এক বছর তিন মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল ।

৭. মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের এক বছর পাঁচ মাস পূর্বে ।

৮. হিজরতের এক বছর নয় মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল ।

৯. হিজরতের তিন বছর পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল ।

১০. মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে ।

উপরোক্ত মতামত সমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হল, নববী দশম সনের পর একাদশ সনে তায়ীফ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা.)-এর এ মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। অধিকাংশ আলিম ও ইতিহাস বিশারদ এ মতের পক্ষে রায় ব্যক্ত করেছেন।[২]

অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক এবং আল্লামা ইব্‌ন আসীর (র.) ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩]

---

১. সীরাতুন্ নবী (সা.) ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী (র.), ৩য় খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা।

২. সীরাতে মুস্তাফা, ১ম খণ্ড, ২৮৭-২৯৯ পৃষ্ঠা।

৩. সীরাতুন্ নবী (সা.) ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী (র.), ৩য় খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

মি'রাজ কোন মাসে হয়েছিল, এ বিষয়ে পাঁচটি অভিমত রয়েছে। কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসে, কারো মতে রবিউস্ সানী মাসে, কারো মতে রজবে, কারো মতে রামাযানে এবং কারো মতে শাওয়াল মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হল, রজব মাসের ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাত্রে মহানবী (সা.)-এর এ মি'রাজ হাসিল হয়েছিল।[১]

কোন্ স্থান হতে মি'রাজ শুরু হয়, এ বিষয়েও একাধিক উদ্ধৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বুখারী শরীফের বর্ণনা রয়েছে, নবী করীম (সা.) বলেন, আমি হাতিমে শায়িত ছিলাম। ওয়াকিদীর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি শি'আবে আবূ তালিবে ছিলেন। তিব্রানীর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি হযরত উম্মে হানী (রা.) -এর ঘরে ছিলেন এবং বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি নিজ গৃহে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনায় মূলত কোন মতভেদ নেই। কেননা হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর ঘর শি'আবে আবূ তালিবে অবস্থিত এবং একেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ঘর বলা হয়েছে। এখান থেকেই মি'রাজের সফর শুরু হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে হাতিমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌছেও তিনি পুনরায় শুয়ে পড়েন। তাই কোন কোন রিওয়ায়েতে এ কথাও বিবৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি হাতীমে শায়িত ছিলাম। সারকথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর এ সফর হযরত উম্মে হানী (র.)-এর ঘর থেকে শুরু হয়েছিল।

মি'রাজের ঘটনা

ইসলামের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ-নাজুক সময়ের সমাপ্তি লগ্নে এবং হিজরতের পর শান্তি ও নিরাপত্তার এক নুতন যুগের শুভ সূচনা অত্যাসন্ন এমনি এক সময় মুবারক রাতের আগমন ঘটে, যে রাতে পরম প্রিয়তমের মহামিলনের উদ্দেশ্যে রওনা হন নবীকূল শিরোমণি সায়্যিদুল কাওনাইন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। নবীজীর আগমন উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের দারোগা রিদ্ওয়ানকে হুকুম করলেন অদৃশ্য জগতের মেহমানখানাকে নতুন সাজে সজ্জিত করার জন্য। রূহুল আমীন হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে হুকুম দেয়া হয়, বিদ্যুৎ হতে দ্রুতগামী, আলো হতে অধিক গতি সম্পন্ন যানবাহন যা লাহুত জগতের পর্যটক হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর জন্য নির্ধারিত, তা নিয়ে হারামে ইব্রাহীমে উপস্থিত হওয়ার জন্য। পৃথিবীর কার্যকরী উপাদান সমূহকে নির্দেশ দেয়া হল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুভিত্তিক নিয়মনীতি যেন কিছুক্ষণের জন্য নিস্ক্রিয় করে দেয়া হয় এবং স্থান-কাল, শ্রবণ-দর্শন ইত্যাদির সহজাত নিয়মাবলী যেন উঠিয়ে নেয়া হয়। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হওয়ার পর মহানবী (সা.) -এর ঐতিহাসিক সফর আরম্ভ হয়। হাদীসের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর ঘরে শায়িত অবস্থায় ছিলেন। তখনো ভালভাবে ঘুম আসেনি তাঁর। তিনি কিছুটা তন্দ্রাভিভূত ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, ঘরের ছাদ ফাঁক হয়ে গিয়েছে এবং এ ফাঁক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন হযরত জিব্রাঈল (আ.)। তাঁর সঙ্গে রয়েছে আরো কতিপয়

---

১. সীরাতে মুস্তাফা, ১ম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ফিরিশ্তা। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) নবী (সা.)-কে ঘুম থেকে জাগিয়ে মাসজিদুল হারামে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাতীমে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত জিব্রাইল ও হযরত মীকাঈল (আ.)এসে তাঁকে পুনরায় জাগিয়ে যমযমের কাছে নিয়ে গেলেন। এর পর তাঁকে শুইয়ে তাঁর সীনা মুবারক চাক করলেন এবং তাঁর পবিত্র কলবকে যমযমের পানি দিয়ে ধুইয়ে ফেলেন। তারপর ঈমান ও হিকমতপূর্ণ স্বর্ণের একটি তস্তরী আনা হল। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) সে তস্তরী হতে ঈমান ও হিক্‌মতের খাজানা তুলে নিয়ে তাঁর সীনা মুবারকে রাখলেন এবং তা পূর্ববৎ করে দিলেন। অতঃপর উভয় স্কন্ধের মাঝে মুহরে নবূওয়াত লাগানো হল। বস্তুত এ ছিল তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়ার বাহ্যিক নিদর্শন।

এরপর গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর হতে ছোট সাদা রং এর লম্বা আকৃতি সম্পন্ন 'বুরাক' নামক একটি জানোয়ার আনা হল। এর গতি ছিল বিদ্যুৎসম। দৃষ্টির প্রান্ত সীমায় এর কদম যেয়ে পড়ত। মহানবী (সা.) বুরাকের উপর আরোহণ করলে বুরাক নাচতে আরম্ভ করল। এ দেখে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, হে বুরাক! এ কেমন আচরণ ? মহা নবী (সা.) অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ব্যক্তি তো আজ পর্যন্ত তোমার উপর আরোহণ করে নি। বুরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। এরপর বুরাক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সাথে রয়েছেন, হযরত জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল (আ.)।

হযরত সাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার সময় এমন ভূমির উপর দিয়েও আমি পথ অতিক্রম করেছি, যেখানে প্রচুর পরিমাণ খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। এ স্থানে পৌছার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বললেন, এ স্থানে নেমে দু'রাক'আত নফল আদায় করে নিন। আমি দু'রাক'আত নামায আদায় করে নিলাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আমাকে বললেন, এ স্থানটি আপনি কি চিনেন ? আমি বললাম, আমি তো চিনি না। তিনি বললেন, আপনি ইয়াস্‌রিব তথা মদীনাতে নামায আদায় করেছেন। হিজরত করে আপনি এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করবেন। অতঃপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)বললেন, এখানে অবতরণ করে নামায পড়ে নিন। আমি নামায পড়ে নিলাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, এ হল সিনাই উপত্যকা। এখানে একটি বৃক্ষ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) এ বৃক্ষের নিকটই আল্লাহ্‌র সাথে কালাম করেছিলেন। সফর চলতে থাকল। কিছুদূর যাওয়ার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) নবী (সা.) কে বললেন, বুরাক হতে অবতরণ করে এখানেও নামায আদায় করে নিন। নবীজী (সা.) বুরাক হতে অবতরণ করে নামায আদায় করে নিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, আপনি হযরত শু'আয়ব (আ.) -এর আবাস ভূমি মাদ্‌ইয়ান শহরে নামায আদায় করলেন। এখান থেকে রওনা হয়ে আরো কিছু দূর যাওয়ার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, আপনি বুরাক হতে অবতরণ করে এখানেও নামায আদায় করে নিন। নামায আদায়ের পর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আমাকে বললেন, এ জায়গাটির নাম হল 'বায়তুল লাহ্‌ম'। এখানেই হযরত ঈসা (আ.)

www.pathagar.com

জন্মগ্রহন করেছিলেন। এ সব ঘটনা আল্লামা যুরকানী (র.) 'শারহে মাওয়াহিব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১]

ভ্রমণ পথের বিস্ময়কর ঘটনাবলী

এ সফরে মহানবী (সা.) আলমে বারযাখের ঘটনাবলীও প্রত্যক্ষ করেছেন।

পর্যায়ক্রমে তা নিম্ন প্রদত্ত হল ঃ

১. নবী করীম (সা.) বুরাকের উপর আরোহণ করে চলছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক বৃদ্ধাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখলেন। সে নবী করীম (সা.) কে ডাক দিল। হুজুর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে জিব্রাঈল এটি কে ? তিনি বললেন, সামনে চলুন। কতদূর চলার পর তিনি এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন। সেও তাঁকে ডাক দিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ (সা.) এদিকে আসুন। এবারও হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, সামনে চলুন। আরো সামনে যাওয়ার পর তিনি এক দল লোক দেখতে পেলেন। তাঁরা নবী করীম (সা.) কে সালাম দিলেন ঃ

اَلسلاَم عَليكَ يَا أول، اَلسلام عَليك يَا اٰخِر، اَلسلاَم عَليك يَا حَاشِر ·

হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, তাঁদের সালামের জবাব দিন।

এর পর হযরত জিব্রাঈল (আ.)বললেন, রাস্তায় আপনি যে বৃদ্ধকে দেখে ছিলেন, তা ছিল দুনিয়া। এ বৃদ্ধার বয়সের ন্যায় দুনিয়ার বয়সও সামান্য অবশিষ্ট রয়েছে। আর যে বৃদ্ধ আপনাকে আহ্বান করেছিল সে ছিল ইব্লীস। যদি আপনি ইব্লীস এবং দুনিয়ার আহ্বানে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মাত দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিত। যারা আপনাকে সালাম করেছিলেন তাঁরা হলেন, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা (আ.)।

২. মুসলিম শরীফে এক হাদীসে হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি হযরত মূসা (আ.)-কে কবরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে দেখেছি। হযরত ইব্ন আব্বাস (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, মি'রাজের রাতে আমি হযরত মূসা (আ.), দাজ্জাল এবং জাহান্নামের প্রহরী মালিক দারোগাকে দেখেছি।

৩. পথিমধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাক্ষাৎ হল, যাদের নখগুলো ছিল তামার। তারা ঐ নখ দ্বারা নিজেদের বক্ষ এবং মুখমন্ডল ছিলে ফেলতে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর নিকট তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, তারা মানুষের গোশ্ত খেত। অর্থাৎ তারা মানুষের গীবত করত এবং দোষ বলে বেড়াত।

৪. রাস্তায় রাসূল (সা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, স্রোতস্বিনী নহরে সাঁতার কাটছে এবং পাথর ভক্ষণ করছে। মহানবী (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস

১. সীরাতে মুস্তাফা, ১ম খণ্ড, ২৯০-২৯১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

করলে তিনি বললেন, এ হল সুদখোর ব্যক্তি।

৫. প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মি'রাজের এ সফরে এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ লাভ করলেন যারা একই দিনে বীজ বপন করে ফসল কাটে। ফসল কাটার পর জমি আবার পূর্বের অবস্থা ধারণ করে। হুযুর (সা.) হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আবার কি ? তিনি জওয়াব দিলেন, তাঁরা হলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদ। তাঁদের নেকী সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আর তাঁরা যা খরচ করেন আল্লাহ্‌ তার উত্তম বিনিময় দান করেন। তিনি উত্তম রিযিকদাতা।

৬. এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, যাদের মাথা পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে এবং পুনরায় তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসছে। এ অবস্থা অব্যাহতভাবে চলছে। এ দেখে নবী করীম (সা.) হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি ? তিনি বললেন, এরা ফরয নামাযের ব্যাপারে অলসতা করত।

৭. তারপর এক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল, যাদের লজ্জাস্থান অগ্রে এবং পশ্চাতে বস্ত্র খণ্ড আবৃত ছিল। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বিচরণ করছিল এবং জাহান্নামের দারী ও যাক্কুম নামক কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষ ও জাহান্নামের পাথর ভক্ষণ করছিল। হুযূর (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকগুলো কারা? হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, তারা স্বীয় মালের যাকাত আদায় করত না।

৮. এরপর আরেক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল যাদের সামনে এক পাতিলে রান্নাকৃত গোশত এবং অপর পাতিলে কাঁচা গোশ্‌ত রয়েছে। তারা পচা গোশ্‌ত খাচ্ছে কিন্তু রান্না করা গোশ্‌ত খাচ্ছে না। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তারা আবার কি ধরনের লোক ? হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন,এরা আপনার উম্মাতের ঐসব লোক যাদের নিকট ছিল বৈধ স্ত্রী তবুও তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। অথবা তারা আপনার উম্মাতের ঐসব নারী যাদের বৈধ স্বামী ছিল, তবুও তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

৯. যাত্রাপথে নবী করীম (সা.) একটি কাষ্ঠখণ্ড দেখতে পেলেন। কাঠখণ্ডটি রাস্তার অগ্রভাগে স্থাপিত ছিল। কাপড় বা কোন কিছু এর নিকট দিয়ে যেতেই সে উহা ধরে ছিড়ে ফেলত। কাঠ খণ্ডের এ অদ্ভুত কাণ্ড দেখে মহানবী (সা.) হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এ কাঠ খণ্ডটি আপনার উম্মাতের ঐ সমস্ত লোকদের নমুনা যারা রাস্তার পাসে বসে ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি করতো।

১০. পথিমধ্যে এমন এক কাওমের সাথে নবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ হল, যারা এমন এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করল, যা উঠিয়ে নেয়ার শক্তি তাদের নেই। প্রিয় নবী (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা আবার কারা? হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) জবাব দিলেন, তারা আপনার উম্মাতের এমন লোক যাদের উপর মানুষের বহু অধিকার ও আমানত রয়েছে। তারা তা পরিশোধ করতে

www.pathagar.com

পারছে না। তদুপরি আরো আমানতের বোঝা নিজের উপর চাপিয়ে চলছে।

১১. এরপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন যাদের জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয় কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে এবং কর্তনের পর তা আবার পূর্বাস্থায় ফিরে আসছে। এ অবস্থা কোন সময় বন্ধ হয় না। প্রিয় নবী (সা.) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাস করলেন, এরা কারা ? হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মাতের ঐ সব ওয়ায়েয ও বক্তা যারা অন্যকে উপদেশ দেয় কিন্তু সে উপদেশ মত নিজেরা আমল করে না।[১]

১২. এরপর তিনি একটি ছোট পাথর দেখলেন। তা থেকে একটি বড় গরু সৃষ্টি হচ্ছে। সৃষ্টির পর গরুটি পাথরের ভিতর পুনরায় প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু তা আর তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ আশ্চর্যজনক বিষয়টি দেখে নবী করীম (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আবার কি ? হযরত জিব্রাঈল (আ.) জবাব দিলেন, এ হল ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে মুখে অনেক বড় কথা বলে কিন্তু পরে লজ্জিত হয়। কেননা একথা ফেরৎ নিতে সে অক্ষম।

১৩. এরপর তিনি এমন এক ময়দানে তাশরীফ নিলেন, যেখানে স্নিগ্ধ বাতাস এবং মৃগনাভীর সুগন্ধ রয়েছে। এখানে এসে তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিসের আওয়াজ ? হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এটা জান্নাতের আওয়াজ। জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমার সাথে যা ওয়াদা করেছেন তা আমাকে দান করুন। কেননা আমার সুউচ্চ ইমারত সমূহ; এর মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত, রেশমী পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনালী রুপালী পাত্র সমূহ, মূল্যবান কুরসী-কেদারা, বাহন সমূহ, মধু-পানি এবং অন্যান্য সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য অনেক বেশী জমা হয়ে আছে। তাই আমার প্রতিশ্রুত জান্নাত বাসীদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করুন। যেন তারা এ নি'আমত সমূহ উপভোগ করতে সক্ষম হয়। জান্নাতের এসব প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তোমার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, যে কোন মুসলিম নর-নারী আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আমি ভিন্ন অন্য কারো প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং আমকেই ভয় করবে, সে শান্তিতে বসবাস করবে, সে আমার কাছে চাইবে আমি তা তাকে দান করব। আর যে আমাকে ঋণ দিবে আমি তাকে উত্তম বিনিময় দান করব। আর যে আমার প্রতি ভরসা করবে আমিই তাঁর জন্য যথেষ্ট হব। আমি আল্লাহ্। আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। মু'মিনদের সাফল্য নিশ্চিত। জান্নাত বলল, আমি রাযি আছি।

১৪. অতঃপর তিনি অপর এক ময়দানে গমন করলেন। সেখান থেকে ভীষণ দূর্গন্ধ ভয়ংকর আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, এ কিসের আওয়াজ এবং কিসের দুর্গন্ধ ?হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন ঃ এটি জাহান্নামের আওয়াজ।

১. সীরাতে মুস্তাফা, ১ম খণ্ড, ২৯১-২৯৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

জাহান্নাম বলে, পরওয়ার দিগার! আমার সাথে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা পূর্ণ করুন। কেননা আমার জিঞ্জির সমূহ আমার বাঁধন সমূহ, আমার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আমার গরম পানি এবং অন্যান্য আযাব সমূহ অনেক মাত্রায় একত্রিত হয়ে আছে। আমার গর্ত অত্যন্ত গভীর এবং আমার তাপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। এসব প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কাফির ও মুশরিক নর-নারী, অহংকারীদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। একথা শুনে জাহান্নাম বল্ল, আমি রাযী আছি।

১৫. এ সফরে মহানবী (সা.) এমন সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন, যাদের ওষ্ঠ উটের ন্যায়। তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভক্ষণ করছে আর এগুলো মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করার পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এরা ঐ সমস্ত লোক যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করেছে।

বায়তুল মুকাদ্দাস গমন

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ অবলোকন করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাসজিদুল আক্সার বাবে মুহাম্মদ স্থানে পৌছলেন। বুরাক থেকে নামলেন এবং অন্যান্য নবীগণ যে স্থানে তাঁদের বাহন সমূহ বাঁধতেন তিনি সেখানেই তাঁর বুরাকটি বাঁধলেন।[১]

এরপর মহানবী (সা.) ও হযরত জিব্রাঈল (আ.) উভয়ে মাসজিদুল আক্সায় প্রবেশ করে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শুভাগমন উপলক্ষে অন্যান্য নবীগণ তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা মাসজিদুল আক্সায় এসে সমবেত হন। আরো সমবেত হন অসংখ্য ও অগণিত ফিরিশ্তা। তারপর আযান ও ইকামত হল। নবী করীম (সা.) বলেন, আমরা সকলেই কাতার বন্দী অবস্থায় অপেক্ষমান রইলাম যে, কে ইমাম হবেন ? এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার হাত ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমামতি করলাম। নামায সমাপনান্তে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে বললেন, আপনি কি জানেন, আপনার পেছনে কারা নামায পড়েছেন ? আমি বললাম না। তিনি বললেন, এ পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরীত হয়েছেন, সকলেই আপনার পেছনে নামায আদায় করেছেন।

আকাশ পরিভ্রমণ

এরপর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আসমানের পরিভ্রমণ শুরু করেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পূর্বের ন্যায় বুরাকে আরোহণ করেই আকাশের দিকে গমন করেছিলেন। আবার কোন কোন রিওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে তিনি মাসজিদুল আক্সা হতে বের হওয়ার পর সিঁড়ির মাধ্যমে আকাশের দিকে আরোহণ করেছিলেন। এভাবে হযরত জিব্রাঈল (আ.) -এর সাথে প্রথম আকাশে পৌছার পর রুদ্ধদ্বারে আঘাত করতেই ভেতর হতে প্রশ্ন আসল কে আপনি? জিব্রাঈল (আ.) উত্তর দিলেন, আমি জিব্রাঈল (আ.)।

১. নাশরুত্ তিব্ব ফী যিকরিল হাবীব (সা.)।

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে উনি কে ? জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, ইনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞাস করা হল, তাঁকে নিয়ে আসার জন্য পাঠান হয়েছি কি ? জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, হাঁ। দ্বাররক্ষী ফিরিশ্‌তা তখন দ্বার উন্মোচন করে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রথম আকাশে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি সম্মানিত এক ব্যক্তিকে দেখলেন। জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁর সাথে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা হযরত আদাম (আ.)। আপনি তাঁকে সালাম করুন। নবী করীর (সা.) তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, মারহাবা! সুসন্তান ও পূণ্যবান নবী। এরপর হযরত আদাম (আ.) নবী করীম (সা.) -এর জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করলেন। তখন নবী করীম (সা,) তাঁর ডানপার্শ্বে কতগুলো আকৃতি এবং বামপার্শ্বে কতগুলো আকৃতি দেখতে পেলেন। যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন। আর যখন বা দিকে তাকান তখন কাঁদেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর রহস্য সম্বন্ধে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করার পর জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, ডান দিকের আকৃতিগুলো তাঁর নেক্‌কার সন্তানদের আকৃতি। তারা জান্নাতী হবে। তাদের দেখে তিনি আনন্দিত হচ্ছেন। আর বা দিকের আকৃতিগুলো তাঁর বদ্‌কার সন্তানদের আকৃতি। তারা জাহান্নামী হবে। তাদের দেখে তিনি ক্রন্দন করছেন।

প্রতি আকাশের দ্বাররক্ষী ফিরিশ্‌তা হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-কে এই রকম জিজ্ঞাসা করলেন। দ্বিতীয় আকাশে তাঁর সাথে ইয়াহ্‌ইয়া এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন উভয়ে খালাত ভাই। তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে দেখা হল। যাঁকে অপরূপ সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। চতুর্থ আকাশ হযরত ইদ্‌রীস (আ.)-এর সাথে মুলাকাত হয়। তাঁর সম্বন্ধে আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আমি তাঁকে এক বুলন্দ মাকামে উঠিয়ে নিয়েছি'। পঞ্চম আকাশে তাঁরা হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে মিলিত হন এবং সকলেই তাঁকে পূণ্যবান পয়গাম্বার এবং পূণ্যবান ভ্রাতা বলে অভ্যর্থনা জানান। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে মুলাকাত হয়। মারহাবা, হে পূণ্যবান পয়গাম্বর এবং পূণ্যবান ভ্রাতা বলে, তিনি তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সামনে অগ্রসর হলেন তখন মূসা (আ.) কেঁদে উঠলেন, আওয়াজ আসল হে মূসা ! এ কান্নার কারণ কি? মূসা (আ.) বললেন, হে পরওয়ারদিগার! আমার পর এ যুবককে আপনি পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আমার উম্মাতের চেয়ে তাঁর উম্মাত অধিক সংখ্যক জান্নাতে যাবে। তারপর তিনি সপ্তম আকাশে প্রবেশ করলে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) মারহাবা হে পূণ্যবান পয়গাম্বর ও পূণ্যবান সন্তান বলে অভ্যর্থনা জানালেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, ইনি আপনার পিতা ইব্‌রাহীম। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তখন বায়তুল মা'মূরে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

বায়তুল মা'মূর হল, ফিরিশ্‌তাদের কিব্‌লা। কা'বা শরীফের বরাবর ঠিক উপরের দিকে বায়তুল মা'মূর অবস্থিত। প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা বায়তুল মা'মূর তাওয়াফ করে থাকে। একবার যে তাওয়াফ করে গেলে সে কখনো দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করার সুযোগ পায়

www.pathagar.com

না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন এরপর আমি বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করে- আমার সঙ্গীদের সহ নামায আদায় করলাম।

সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় গমন এবং জান্নাত পরিদর্শন

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার দিকে গমনের জন্য আহবান করা হয়। সিদ্‌রাতুন অর্থ হচ্ছে বরই বৃক্ষ। তাই 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' এর মানে সপ্তম আকাশ সীমার বরই বৃক্ষ। হাদীসে বর্ণিত আছে, এর এক একটি বরই হিজ্‌র নামক স্থানের মট্‌কার মত এবং পাতা গুলো হল হাতীর কানের মত। পৃথিবী থেকে যে সকল বিষয় উপরের দিকে যায় তা 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' পৌছে থেমে যায় এবং সেখান থেকে উপরে উত্থিত হয়। উর্দ্ধ জগত থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় তাও 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' পর্যন্ত এসে থেমে যায় এরপর সেখান থেকে সেগুলো নীচের দিকে নেমে আসে। এ কারণেই এর নাম 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা'।

এখানে উপস্থিত হওয়ার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) স্বীয় আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সামনে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' দেখার পর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে আমি মুক্তা নির্মিত গম্বুয দেখেছি। আর জান্নাতের মাটি হল মিশ্‌কের। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম (সা.) বলেন, জান্নাত ভ্রমণের পর আমার সম্মুখে জাহান্নাম উন্মুক্ত করা হয়। এতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের আযাব-গযব এবং প্রতিশোধ। যদি তাতে লোহা এবং পাথরও নিক্ষেপ করা হয় তবে তাও ভষ্মীভূত হয়ে যাবে।[১]

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আরো উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। যেতে যেতে তিনি এমন জায়গায় পৌছলেন যেখান থেকে 'সরীফুল আকলাম' অর্থাৎ লেখনীর শব্দ শুনা যাচ্ছিল ঐ স্থানে তাক্‌দীর লিপিকার ফিরিশ্‌তাগণ সর্বদা ভাগ্য লিখার কাজে নিয়োজিত আছেন এবং এখানে বসেই ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ 'লাওহে মাহ্‌ফূয' থেকে লিপিবদ্ধ করেন।

আল্লাহ্‌র দীদার ও কথোপকথন

সরীফুল আকলাম হতে আবার সফর শুরু হল। মহানবী (সা.) হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) সহ পর্দা পর্যন্ত গিয়ে পৌছলেন। তখন একজন ফিরিশ্‌তা পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, ঐ আল্লাহ্‌র শপথ যিনি আপনাকে সত্যদীন সহ প্রেরণ করেছেন, আমি পয়দা হওয়ার পর অদ্যাবধি কখনো এ ফিরিশ্‌তাকে দেখিনি। অথচ সৃষ্টির মধ্যে আমি মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত নৈকট্য লাভে ধন্য। রাসূল (সা.) বলেন, এরপর জিবরাঈল (আ.) থেমে গেলেন। আমি বললাম, হে জিব্‌রাঈল! এমন স্থানে এসে কোন বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? জিবরাঈল (আ.) বললেন, যদি আমি আর একটু অগ্রসর হই তবে আমার পাখাগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।

---

১. সীরাতুন্ নবী (সা.) ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী (র.), সীরাতে মুস্তাফা, নাশরুত্ তিব্ব ফী যিকরিল হাবীব (সা.)।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.) বলেন, এরপর আমাকে নূর দ্বারা শক্তিশালী করা হয় এবং আমাকে সত্তর হাজার পর্দা পার করানো হয়। তখন মানব ও ফিরিশ্তা কূলের সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। এ সময় এক ঘোষণাকারী আবূ বকরের কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেন থামুন, আপনার প্রভূ সালাতে মশগুল আছেন। নবী করীম (সা.) বলেন, এখানে পৌঁছে দু'টো বিষয়ে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। একটি আবূ বকরের আওয়াজ আর অপরটি হল আল্লাহ্‌র সালাতে মশগুল থাকা। তখন আওয়াজ এল, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র এ বাণীটি পাঠ করুন।

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝

"তিনি তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণ ও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনার জন্য এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সালাতের অর্থ হল তাঁর এবং উম্মাতের প্রতি রহমত বর্ষণ করা। আর আবূ বকরের কণ্ঠস্বরের মর্ম হল একজন ফিরিশ্তা আবূ বকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর অস্বস্তি দূরীভূত হয়।

'শিফাউস্ সুদূর' গ্রন্থের বিবরণে রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, পর্দাসমূহ উঠে যাবার পর একটি 'রফরফ" তথা সবুজ রং এর একটি মসনদ আমার জন্য আনা হয় এবং তাতে আমাকে আরোহণ করিয়ে উপরে উঠানো হয়। এমন কি আমি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র দীদার লাভে ধন্য হন। ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ۝

এরপর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাঁদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা এর চেয়ে ও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন (৫৩ ঃ ৮-১০)।

ইমাম তিবৃরানী ও হাকিম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মি'রাজ রজনীতে আমি এক বিশাল জ্যোতি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নূর প্রত্যক্ষ করেছি। তারপর আল্লাহ্ পাক স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে আমার সাথে কথোপকথন করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বলার সময় ইরশাদ করেছেন, 'আমি আপনাকে খলীল ও হাবীব (বিশেষ বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। আমি

www.pathagar.com

আপনার বক্ষ সম্প্রসারিত করেছি। আপনার বোঝা অপসারণ করেছি। আমি আপনার আলোচনাকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। আমার একাত্ববাদের ঘোষণার সাথে আপনার রাসূল ও বান্দা হওয়ার কথাটি সংযোজন করে দিয়েছি। আপনার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মাত বানিয়েছি। যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। আমি আপনার উম্মাতকে মধ্যপন্থী উম্মাত বানিয়েছি আমি আপনার উম্মাতকে মর্যাদার দিক থেকে প্রথম কাতারের এবং আবির্ভাবের দিক থেকে সর্বশেষ উম্মাত বানিয়েছি। আপনার উম্মাতের মধ্যে আমি এমন কতেক লোক সৃষ্টি করবো যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্‌র কালাম লিপিবদ্ধ থাকবে। অস্তিত্বের দিক থেকে আমি আপনাকে সর্বপ্রথম নবী এবং আবির্ভাবের দিক থেকে সর্বশেষ নবী বানিয়েছি। আপনাকে আমি "السبع المثانى" তথা সূরা ফাতিহা দান করেছি। যা ইতি পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। আমি আপনাকে আরশের নীচে রক্ষিত খাযানা হতে সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াত সমূহ দান করেছি যা আপনার পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলকে আমি তা প্রদান করি নি। আমি আপনাকে হাওযে কাওসার দান করেছি এবং আপনাকে আটটি জিনিষ আমি বিশেষভাবে প্রদান করেছি –

১. ইসলাম অর্থাৎ মুসলিম উপাধি, ২. হিযরত, ৩. জিহাদ, ৪. নামায, ৫. সাদাকা, ৬. রামাযানের রোযা, ৭. সৎকার্যের আদেশ ও অসৎ কার্যের নিষেধ, ৮. আমি আপনাকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ নবী বানিয়েছি।"

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সময় আল্লাহ্ পাক মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.) -কে তিনটি বিশেষ উপহার প্রদান করেছেন –

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায

২. সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াত সমূহ। এ আয়াতসমূহ আল্লাহ্ পাকের রহমত, অনুগ্রহ, সাহায্য সহায়তা, ক্ষমা প্রদর্শন এবং কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয় ও সাহায্য প্রদানের কথা উল্লেখ পূর্বক এ বিষয়ে দু'আ করার জন্য এ উম্মাতকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মদীকে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, সূরা বাকারার শেষাংশে যা উল্লেখ করা হয়েছে এ সব বিষয়ে তাঁরা যদি আমার নিকট দু'আ করে তাহলে আমি তাঁদের দু'আ কবূল করব।

৩. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ঘোষণা করা হয়, আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ্ তার কবীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

কথা হল, মি'রাজের এ সফরে মহান আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা.)-এর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা। মহানবী (সা.) উপরোক্ত পুরস্কার সমূহ নিয়ে উর্ধ্বলোক থেকে আসমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে হযরত

www.pathagar.com

মূসা (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত মূসা (আ.) তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ্ আপনাকে কি দান করেছেন ? তিনি বললেন, দিবা-রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। মূসা (আ.) বললেন, আমি বনী ইসরাইলের নবী ছিলাম। তাদের থেকে আমার এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা হাসিল হয়েছে। তাদের তুলনায় আপনার উম্মাত খুবই দুর্বল। সুতরাং তারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। আপনি পুণরায় স্বীয় প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং উম্মাতের জন্য এ আদেশকে সহজতর করার জন্য দরখাস্ত পেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফিরে গেলেন এবং এ সংখ্যা হ্রাস করার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দরখাস্ত পেশ করেন। আল্লাহ্ পাক পাঁচ ওয়াক্ত নামায হ্রাস করে দিলেন। এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আগমন করলে তিনি আবার অনুরূপ পরামর্শ দিলেন। নবী করীম (সা.) আবার ফিরে গেলেন। এভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর পরামর্শে বার বার ফিরে গিয়ে আবেদন করতে করতে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট রয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) নবী (সা.)-কে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আবারো গিয়ে সংখ্যা হ্রাস করার দরখাস্ত পেশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ পরামর্শের প্রেক্ষিতে নবী করীম (সা.) বলেছিলেন, আমি বারবার আবেদন করেছি। এখন আবার আবেদন জানাতে লজ্জাবোধ করছি। এ জবাব দিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হলে, অদৃশ্য হতে আওয়াজ এলো, পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয হিসাবে রয়ে গেল কিন্তু এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। অর্থাৎ কেউ যদি এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তবে সে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সাওয়াব পাবে। আমার এ নির্দেশ পরিবর্তিত হবে না।

সন্দেহ্ নিরসন

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ করেছিলেন কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যাঁরা বলেন,মহানবী (সা.) আল্লাহ্র দর্শন লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্ পাককে বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখেছেন না অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখেছেন ? জমহুর সাহাবী, তাবি'ঈগণের অভিমত হল, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে বাহ্যিক চক্ষু দ্বারাই অবলোকন করেছেন। মুহাদ্দিস এবং আলিমগণও এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এক বিশুদ্ধতম অভিমত বলে রায় প্রদান করেছেন। হাদীস সমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, মি'রাজ রজনীতে নবী করীম (সা.) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে দেখেছেন কিনা এ মর্মে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছেন, হ্যাঁ আমি আমার প্রতি পালককে দেখিছি। 'মুসনাদে আহ্মদ'গ্রন্থে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি আল্লাহ্ পাককে দেখিছি। ইমাম তিব্রানী, হাকিম, তিরমিযী (র.) হযরত আনাস (সা.) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ পাকের নূর দেখিছি। এরপর আল্লাহ্ পাক স্বীয় ইচ্ছা মুতাবিক আমার প্রতি ওহী নাযিল করেন। এবং আমার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রিওয়ায়েতের মাধ্যমে একথা বুঝা যায় যে, মি'রাজের রাত্রে রাসূল (সা.) বাহ্যিক ও অন্তর্চক্ষুর

www.pathagar.com

মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ করেছেন। আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদ্রতের মাধ্যমে দৈহিক চক্ষুর দৃষ্টি ও অন্তর্চক্ষুর দৃষ্টির মধ্যে এমন এক সংযোগ করে দেন যে, তাঁর দৈহিক চক্ষুর দর্শন ও অন্তর্চক্ষুর দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না।

পক্ষান্তরে যাঁরা বলেন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মি'রাজে সচক্ষে আল্লাহ্কে দেখেননি। মূলত এটা তাদের নিজস্ব অভিমত যার ভিত্তি হলো আল-কুরআনের এই আয়াত ঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ٥

তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত। কিন্তু সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্কে দেখার বিষয়টি যেহেতু প্রমাণিত। তাই এ আয়াতের মর্ম হল দৃষ্টি তাঁকে পূর্ণাঙ্গভাবে অবলোকন করতে সক্ষম নয়। অবশ্য দৃষ্টিকে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে অবলোকন করতে সক্ষম এবং অবলোকন করেন। কেননা 'رؤية' দেখা এবং 'إدراك' এক জিনিষ নয়। 'إدراك' বলা হল 'إحاطة' অর্থাৎ সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে অবলোকন ও অনুধাবন করা। তাই 'إدراك' তথা 'إحاطة' যদি না থাকে তবে দর্শন লাভ সম্ভব নয়, এ কথা বলা আদৌ ঠিক নয়। যেমন আমরা চাঁদ দেখি কিন্তু এর মৌলরূপ সম্বন্ধে আমরা অবগত নই; এরপরও আমরা বলি যে, আমরা চাঁদ দেখেছি। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে বসে আমরা আকাশ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমাদের এ দর্শন পূর্ণাঙ্গ দর্শন নয়। এরপরও আমরা বলি যে, আমরা আকাশ দেখেছি। বস্তুত আমাদের এ বক্তব্য যেমন সত্য ঠিক তেমনিভাবে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ পাককে দেখেছেন এবং এ চোখ দিয়েই দেখেছেন একথাও ধ্রুব সত্য। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন, ঘটনার বর্ণনা ও কাফিরদের প্রতিক্রিয়া

আকাশের উচ্চতর মাকাম, সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা, জান্নাত, জাহান্নাম পরিদর্শন ও আল্লাহ্ পাকের সাথে কথোপকথনের পর মহানবী (সা.) আকাশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বায়তুল মুকাদ্দাস অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে বুরাকে আরোহণ করে তিনি প্রভাত হওয়ার পূর্বেই পবিত্র মক্কায় পৌছেন।

হযরত উম্মে হানী (রা.) বলেন, ফজরের নামায আদায়ের পর মহানবী (সা.) ঘরের বাইরে যেতে উদ্যত হলে আমি তাঁর চাদর স্পর্শ করে বললাম হে আল্লাহ্র নবী! মানুষের নিকট এ ঘটনা প্রকাশ করবেন না। কেননা তাঁরা আপনার কথাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে এবং আপনাকে কষ্ট দিবে। তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্র শপথ! অবশ্যই আমি এ ঘটনা প্রকাশ করবো। হযরত উম্মে হানী (রা.) বলেন, এরপর আমি আমার এক হাবশী বাঁদীকে বললাম। তুমি তাঁর অনুসরণ করো এবং যা তিনি মানুষকে বলেন এবং মানুষ যা তাঁকে বলে তা শ্রবণ কর। প্রিয় নবী (সা.) বাইরে তাশরীফ নিয়ে যান এবং মি'রাজের ঘটনা কুরায়শদের সামনে বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে তারা অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে

www.pathagar.com

পড়ল। কেউ আবার তালি বাজাতে লাগল। আর কতিপয় পৌত্তলিক দ্রুত বেগে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট গিয়ে হাযির হল। তারা বলল, আপনার বন্ধুর খবর নিয়েছেন কি? তিনি বলছেন, আমাকে এ রাতেই বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি এমন কথা বলেন, লোকেরা বলল, হ্যাঁ ? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তিনি যদি বলে থাকেন, তাহলে ঠিকই বলেছেন। লোকেরা বলল, আপনি কি এ ব্যাপারে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, তিনি একই রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে ভোর হওয়ার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বললেন; হ্যাঁ আমি তা এর চেয়েও অনেক কঠিন ও ঝটিল বিষয়ে তাঁর সত্যতা স্বীকার করি। অর্থাৎ আসমানের খবরের বিষয় যা এক রাতের চেয়েও কম সময়ে তাঁর নিকট আসে আমি তাও বিশ্বাস করি। এজন্য তাঁকে 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

যারা বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে অবগত ছিল তারা নবী (সা.)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন নিদর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে লেগে গেল। আল্লাহ্ পাক বায়তুল মুকাদ্দাসকে নবী করীম (সা.)-এর সামনে এনে দিলেন। কাফিররা প্রশ্ন করেছিল আর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে দেখে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন। যখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেই তাঁকে আটকাতে পারল না তখন তারা বলল; ঠিক আছে, তাহলে ভ্রমন পথের ঘটনা বর্ণনা করুন এবং বলুন, আমাদের অমুক কাফিলা যা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, তারা এখন কোথায় আছে ? নবী করীম (সা.) বললেন, অমুক স্থানে আমি কুরায়শদের একটি বাণিজ্য দল দেখেছি। তারা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছে। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। পরে তারা উটটি পেয়েছে। ইনশা আল্লাহ্ তিনদিন পর তারা মক্কা পৌছবে। এ কাফিলার সর্বাগ্রের উটটি ধুসর বর্ণের। এর উপর রয়েছে দু'টি বোঝা। একটি সাদা রং এর কাপড় দ্বারা আবৃত; অপরটি আবৃত ধারীদার কাপড় দ্বারা। নবী করীম (সা.)-এর বর্ণনানুযায়ী তৃতীয় দিনে বাণিজ্য কাফেলাটি মক্কায় এসে পৌছল। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা হারিয়ে যাওয়া উটটির কথা স্বীকার করল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা নবী (সা.)-এর কথাগুলো শুনেছিল। নবীজীর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হওয়ায় কোন উপায় অন্তর না দেখে সে বলল, এটা যাদু ব্যতীত কিছুই নয়। অন্যান্য কুরায়শরা তার কথায় সায় দিয়ে বলল, ওয়ালীদ সত্য বলেছে ।

জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজ

সাহাবা, তাবিঈন তথা আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত হল, মহানবী (সা.) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজ শরীফ গমন করেছেন। এ ঘটনা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

পক্ষান্তরে কোন কোন লোক মি'রাজের ঘটনাকে স্বপ্নের ঘটনা বলে মনে করেন অর্থাৎ হুযুর (সা.)-কে এ সব কিছু স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। সশরীরে তিনি মি'রাজ গমন করেন নি এবং

www.pathagar.com

সচক্ষে তিনি আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করেন নি।

মি'রাজ সম্পর্কে তাদের ধারনার ভিত্তি হল -

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আয়াতটি। আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৭ ঃ ৬০)।

এ আয়াতে 'রুইয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'রুইয়া' শব্দের সাধারণ অর্থ হল, স্বপ্ন। কাজেই তারা মি'রাজ স্বপ্নযোগেই সংঘটিত হয়েছে বলেই অভিমত ব্যক্তি করেছেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। 'রুইয়া' শব্দটি যেমন স্বপ্নের জন্য ব্যবহৃত হয় অনুরূপ জাগ্রত অবস্থায় স্বচক্ষে দেখার জন্যও ব্যবহৃত হয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াতে "রুইয়া" শব্দ দ্বারা চাক্ষুষ দেখার অর্থই গ্রহণ করেছেন (বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর)।

আর যাঁরা বলেন মহানবী (সা.) -এর মি'রাজ আধ্যাত্মিকভাবে হাসিল হয়েছিল, তাঁদের এ বক্তব্যও ঠিক নয়। কেননা এ ঘটনা যদি আধ্যাত্মিকভাবে সংগঠিত হত তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। কারণ আধ্যাত্মিক উপায়ে অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে। তাতে কেউ কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করে না।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নবী করীম (সা.) জাগ্রত অবস্থাই সশরীরেই মি'রাজ গমন করেছিলেন। কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে একথাই প্রমাণিত। যেমন ঃ

১. ইস্রা ও মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা পূর্বক আল-কুরআনে সূরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন,

سُبْحَانَ الَّذِىٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى

পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'سُبْحَانَ' শব্দটি এদিকেই ইংগিত করে। কেননা বিস্ময়কর সংবাদ পরিবেশনের জন্য 'سُبْحَانَ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ ঘটনাটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বস্তুত মি'রাজের এ ঘটনা তখনই বিস্ময়কর বলে পরিগণিত হবে যদি এ ঘটনাকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মেনে নেওয়া হয়। অন্যথায় তা বিস্ময়কর ঘটনা বলে প্রতীয়মান হবে না, কেননা মি'রাজ যদি আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগে সংগটিত হত তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ? স্বপ্নে তো সমস্ত মুসলমান বরং প্রত্যেক মানুষই দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে এবং আবিশ্বাস্য বহু কাজ আঞ্জাম দিয়েছে।

www.pathagar.com

২. আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত "عَبْدٌ" শব্দটিও একই দিকে ইংগিত করে। অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরেই মহানবী (সা.) মি'রাজ গমন করেছিলেন। কেননা, শুধু আত্মাকে "عَبْدٌ" বলা হয় না। বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই "عَبْدٌ" বলা হয়। যেমন, আল-কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى তুমি কি তাকে দেখেছ যে বাধা দেয় এক বান্দাকে (মুহাম্মদ (সা.) কে) যখন সে সালাত আদায় করে (আলাক্ব ঃ ৯-১০)।

আরো ইরশাদ হয়েছে, "وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ" যখন আল্লাহ্‌র এক বান্দা মুহাম্মদ (সা.) তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালেন (৭২ ঃ ১৯)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে "عبد" বলে (মুহাম্মদ (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আত্মা ও দেহের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। শুধু আত্মাকে বুঝানো হয় নি। সমস্ত মুফাস্‌সির এ বিষয়ে একমত। সুতরাং মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে, একথাই প্রমাণিত হচ্ছে।

৩. "أسرى بعبده"-এর মর্ম সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়ই নবী করীম (সা.) মি'রাজ গমন করেছিলেন। কেননা "عَبْدٌ" শব্দের দ্বারা সাধারণত আত্মা ও দেহের সমষ্টি বুঝায়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী "فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا" তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে পড়। (৪৪ ঃ ২৩)।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াতে যেমনিভাবে "عِبَادِي" অর্থ আত্মা দেহের সমন্বিত সত্তা ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোকজনকে বুঝানো হয়েছে, অনুরূপ "أَسْرَى بِعَبْدِهِ" তে উল্লেখিত "عَبْدٌ" এর দ্বারা আত্মা ও দেহের সমন্বিত সত্তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

৪. আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" (তাঁকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখানোর জন্য) থেকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, ইস্‌রা ও মি'রাজের উদ্দেশ্য হল নবী করীম (সা.)-কে আল্লাহ্ পাকের কুদ্‌রত সমূহ সরাসরি প্রত্যক্ষ করানো। আর তা ছিল সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। আধ্যাত্মিক বা স্বপ্ন যোগে নয়। সূরা নাজমের আয়াত,

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি এবং তার দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয় নি। তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন (৫৩ ঃ ১৭-১৮)।

এ দিকেই ইংগিত করে যে, নবী করীম (সা.) তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে তিনি মি'রাজ গমন করেছিলেন।

৫. যদি নবী করীম (সা.) -এর এ মি'রাজ স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে হতো তবে কাফির

www.pathagar.com

মুশরিকদের নিকট মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর তারা যখন তা অস্বীকার করল এবং নবীজীকে তারা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস এর বিবরণ ও কাফিলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল তখন তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন কেন ? তিনি তো বলে দিতে পারতেন যে, এ ঘটনা আমার চোখের দেখা ঘটনা বলে তো আমি দাবী করি নি। আমি যদি তা দাবী করতাম তবে তোমরা আমাকে অস্বীকার করতে পারতে এবং আমাকে প্রশ্ন করতে পারতে। বস্তুত তিনি তা বলেন নি বরং তাদের জবাব দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতেছিলেন। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ পাক বায়তুল মুকাদ্দাসের ছবি তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। অমনি তিনি তা দেখে দেখে তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন।

৬. নবী করীম (সা.) সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ গমন করেছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো নিকট একথা প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে কাফিররা আপনার উপর আরো বেশী মিথ্যারোপ করবে। যদি ব্যাপরটি নিছক স্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক হত তবে মিথ্যারোপ করার কোন কারণ ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফিররা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। এতে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরেই মি'রাজ গমন করেছিলেন।

৭. নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁদের মাধ্যমে বহু অলৌকিক বিষয় প্রকাশ করেছেন। এগুলোকে শরী'আতের পরিভাষায় মু'জিযা বলা হয়। মি'রাজের ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবনে প্রকাশিত মু'জিযা সমূহের অন্যতম। এতেও এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা.) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরেই মি'রাজ গমন করেছিলেন।

শাফা'আত

হাশরের ময়দানের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কুরআন ও হাদীসে এর বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তখন সূর্য মানুষের অতি নিকটে চলে আসবে। সূর্যের তাপে কোন কোন লোক তার আমল অনুসারে নিজ ঘামে নিমজ্জিত হবে। মানুষ কষ্টে, দুঃশ্চিন্তায় ও পেরেশানীতে অস্থির হয়ে উঠবে। এমনি এক সংকট সময়ে রাহমাতুল লিল্ আ'লামীন, শাফীউল মুয্নিবীন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের শাফা'আতের জন্য এগিয়ে আসবেন। শাফা'আত শব্দটির ধাতু 'شفع' এর অর্থ জোড়া, জড়িত হওয়া, অন্যের সাথে মিলিত হওয়া এবং কারো জন্য সুপারিশ করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় মঙ্গল এবং ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে নবী রাসূল এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফা'আত বলা হয়।

বস্তুত শাফা'আত দু'প্রকার। শাফা'আতে কুব্রা ও শাফা'আত সুগ্রা। শাফা'আতে কুব্রা তথা হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা হতে নিস্কৃতি প্রদান এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্

www.pathagar.com

পাকের মহান দরবারে যে শাফা'আত করা হবে; এর অধিকার একমাত্র রাসূলে করীম (সা.) এরই থাকবে।

পবিত্র আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

عَسَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমূদে অর্থাৎ প্রশংসিত স্থানে (১৭ ঃ ৭৯)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ বলেছেন যে,'মাকামে মাহমুদ'দ্বারা এখানে 'শাফা'আতে কুব্‌রা' এর কথা বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য নবী, রাসূল, শহীদ, আলিম, হাফিয এবং নেককার মু'মিনগণকেও গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। একে শাফা'আতে সুগ্‌রা বলা হয়। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রা.) শাফা'আতের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করার পর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, এ তো সেই মাকামে মাহমূদ (প্রশংসিত স্থান) যেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা.) এর সাথে ওয়াদা করেছেন।[১]

হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন; কিয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নবীর উম্মাত নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে হে অমুক (নবী) আপনি সুপারিশ করুন, হে অমুক, (নবী) আপনি সুপরিশ করুন।

তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে রাযী হবেন না। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নবী করীম (সা.) গ্রহণ করবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করবেন। উক্ত হাদীস হতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) -কেই সর্বপ্রথম 'শাফা'আতকারীর' মর্যাদা দান করে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[২]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যে দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবূল করবেন। সকল নবী তাঁদের দু'আ করে ফেলেছেন। আর আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য রেখে দিয়েছি।[৩]

অপর এক হাদীসে রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর গৃহে কিছু গোশ্‌ত (হাদিয়া) আসল। সামনের রানের অংশটি তাঁর সামনে (আহারের উদ্দেশ্যে) পেশ করা হল। রানের গোশ্‌ত তাঁর নিকট খুবই পছন্দনীয় ছিল। তিনি তা থেকে এক টুক্‌রা মুখে নিলেন। অতঃপর বললেন, কিয়ামত দিবসে আমিই হবো সকল মানুষের সর্দার। তা কি ভাবে তোমরা জান ? কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহ্ তা'আলা শুরু

১. সীরাতুন্ নবী (সা.) ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী (র.), ৩য় খণ্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা।
২. বুখারী শরীফ, তাফসীর অধ্যায়, আয়াত 'عَسَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَكَ'।
৩. মুসলিম শরীফ, (বাংলা) ১ম খণ্ড ঃ ৩৮৬ নং হাদীস।

www.pathagar.com

থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একই মাঠে এমনভাবে জমায়েত করবেন যে, একজনের আহবান সকলে শুনতে পাবে, একজনের দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ, কষ্ট ও পেরেশানীতে নিঃপতিত হবে। পরস্পর বলাবলি করবে, কী দূর্দশায় তোমরা আছ দেখছ না? কী অবস্থায় তোমরা পৌছেছ উপলব্ধি করছ না ? এখন তোমাদের জন্য কে সুপারিশ করবে ? একজন আরেক জনকে বলবে, চল আদম (আ.) -এর নিকট যাই। অতঃপর তারা আদম (আ.) -এর নিকট আসবে এবং বলবে, হে আদম (আ.)। আপনি মানবকূলের পিতা। আল্লাহ্ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দেহে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনাকে সিজ্‌দা করার জন্য ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সিজ্‌দা করেছেন। আপনি দেখেছেন না, আমরা কি কষ্টে আছি ! আপনি দেখছেন না, আমরা কষ্টের কোন সীমায় পৌছেছি ? আদম (আ.) উত্তরে বলবেন, আজ পরওয়ারদিগার এত বেশী ক্রোধান্বিত, যা পূর্বে কখনো হন নি এবং পরেও কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আমি সে নিষেধ লংঘন করে ফেলেছি। নাফসী, নাফসী! তোমরা অন্য করো নিকট গিয়ে চেষ্টা কর। তোমরা নূহের নিকট যাও।

তখন তারা নূহ্ (আ.) -এর নিকট আসবে। বলবে, হে নূহ্ ! আপনি পৃথিবীর প্রথম রাসূল আল্লাহ্ আপনাকে 'চিরকৃতজ্ঞ বান্দা' বলে উপাধি দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন অবস্থায় আছি ! আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছেছে ? নূহ্ (আ.) বলবেন, আজ আমার পরওয়ারদিগার এত ক্রোধান্বিত, যে পূর্বেও কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। আমাকে তিনি একটি দু'আ কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন তা আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ফেলেছি। নাফসী, নাফসী! তোমরা ইব্‌রাহীম (আ.) এর নিকট যাও।

তখন তারা ইব্‌রাহীম (আ.)-এর নিকট আসবে। বললে, হে ইব্‌রাহীম! আপনি আল্লাহ্‌র নবী, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে আপনি আল্লাহ্‌র খলীল। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছেছে ! ইব্‌রাহীম (আ.) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ আজ এত ক্রোধান্বিত যে, পূর্বে কখনো এমন হননি আর পরেও কখনো এমন হবেন না। তিনি (তাঁর কিছু বাহ্যিক অসত্য কথনের বিষয় উল্লেখ করবেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলো মিথ্যা কথা নয়) বলবেন, নাফসী, নাফসী! আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমারা অন্য কারো নিকট যাও। মূসার নিকট যাও।

তারা মূসা (আ.) -এর নিকট আসবে। বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনাকে তিনি তাঁর রিসালাত কালাম দিয়ে মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছেছে ! মূসা (আ.) তাদের বলবেন, আজ আল্লাহ্ এতই ক্রোধান্বিত যে, পূর্বে এমন কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। আমি তাঁর

www.pathagar.com

হুকুমের পূর্বে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। নাফসী, নাফসী! আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান! তোমরা ঈসার নিকট যাও।

তারা ঈসা (আ.)-এর নিকট আসবে। বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, দোলনায় অবস্থানকালে আপনি মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেছেন। আপনি আল্লাহ্র দেওয়া বাণী যা তিনি মারইয়ামের গর্ভে ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি তাঁর দেওয়া রূহ্। সুতরাং আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন যে, আমরা কোন অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছেছে। ঈসা (আ.) বললেন, আজ আল্লাহ্ তা'আলা এতই ক্রোধান্বিত যে, এরূপ না পূর্বে কখনো হয়েছেন আর না পরে কখনো হবেন। উল্লেখ্য তিনি কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, নাসফী। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট যাও।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তখন তারা আমার নিকট আসবে। বলবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, শেষ নবী, আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না আমরা কি অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কি পর্যায়ে পৌছেছে! তখন আমি সুপারিশের জন্য যাব এবং আরশের নীচে এসে পরওয়ারদিগারের উদ্দেশ্যে সিজ্দাবনত হব। আল্লাহ্ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করে দিবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হামদ জ্ঞাপনের ইলহাম করবেন যা ইতিপূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন করুন। দু'আ করুন আপনার দু'আ কবূল করা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এরপর আমি মাথা তুলব। বলব, হে পরওয়ারদিগার! উম্মাতী, উম্মাতী! এদের মুক্তি দান করুন। আল্লাহ্ বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যাদের উপর কোন হিসাব নেই তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। অবশ্য অন্য দরজা দিয়েও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে তারা প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, শপথ সে সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! জান্নাতের দু'চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্ব মত। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ও বস্রার দূরত্বের সমান।[১]

অবশ্য এ সম্বন্ধে হযরত মাওলানা শাহ্ রফী উদ্দীন (র.) তৎপ্রণীত 'কিয়ামত নামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সর্বশেষ লোকজন নিরুপায় হয়ে নবী কারীম (সা.) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করলে তিনি বললেন, হাঁ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ কাজের উপযুক্ত বানিয়েছেন এবং তাহাদের জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশ করার একমাত্র অধিকার আমারই। এ বলেই তিনি আল্লাহ্র দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ হবেন। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে একটি বুরাক নিয়ে হাশরের ময়দানে যাওয়ার জন্য হুকুম করবেন। তিনি বুরাক নিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বুরাকে আরোহণ করে উর্ধ্বলোকে

১. মুসলিম শরীফ, (বাংলা) ১ম খণ্ড ঃ ৩৭৯-৩৮১ প্রষ্ঠা।

www.pathagar.com

গমন করবেন। লোকজন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। সেখানে থেকে তারা আসমানে একটি নূরানী ঘর দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ ঘরে প্রবেশ করবেন। এরই নাম হল 'মাকামে মাহমূদ'। এখান থেকেই নবী (সা.) আরশের উপর আল্লাহ্র নূরানী তাজাল্লী দেখতে পাবেন। তখন তিনি সাতদিন সিজ্দায় পড়ে থাকবেন। উম্মাতের কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাথা উত্তোলন করবেন না। তখন ইরশাদ হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন করুন। যা দু'আ করবেন কবূল করা হবে। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এমন প্রশংসা করবেন যা ভবিষ্যতেও আর কেউ করবে না। এরপর নবী করীম (সা.) বলবেন, হে আমার রব! আপনি জিব্রাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে আমার সাথে এ অঙ্গীকার করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আমি যা প্রার্থনা করব আপনি আমাকে তা প্রদান করবেন। এরপর মানুষ জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে কি ফয়সালা প্রদান করেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করবেন, যমীনে আল্লাহ্ তা'আলার শুভাগমন হবে। তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের ময়দানে শুভাগমনের পর মানুষের হিসাব নিকাসের কাজ শুরু হবে। হিসাব গ্রহণ সমাপ্ত হবার পর আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে নবী রাসূলগণও নিজ নিজ উম্মাতসহ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জান্নাতে প্রবেশের পর জানতে পারবেন যে, তাঁর বহু সংখ্যক উম্মাত জাহান্নামে রয়েছে। একথা শুনে তিনি পেরেশান হয়ে সাত দিন পর্যন্ত আল্লাহ্র দরবারে সিজ্দা রত থাকবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান থাকে তাকে আপনি জাহান্নাম থেকে বের করে আনুন। এরপর বলবেন, আজ সে ওয়াদা পূরণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, জিব্রাঈল মারফত আপনার নিকট যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে তা সবই সত্য। আজ আপনাকে আমি অবশ্যই খুশী করব এবং আপনার সুপারিশ গ্রহণ করবো। সুতরাং পৃথিবীতে যান। আমিও আসছি, বান্দাদের আমলের হিসাব নিয়ে আমি তাদেরকে কর্মফল যথাযথভাবে প্রদান করব। এ কথার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পুনরায় বুরাকে আরোহণ করে পৃথিবীতে আসবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফিরিশ্তা ও স্বীয় উম্মাতসহ জাহান্নামের নিকট গমন করে লোকজনকে নির্দেশ দান করবেন, তোমারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন পরিচিত জনকে স্মরণ করে তাদের কোন বিশেষ নিদর্শনের কথা উল্লেখ কর যাতে করে ফিরিশ্তাগণ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনতে পারে। সুতরাং তাই করা হবে। উপরন্তু শহীদগণ সত্তর জনের জন্য। হাফিযগণ দশ জনের জন্য ও আলিমগণকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী শাফা'আত করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে।

মু'জিযা

মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল পঠিয়েছেন। তাঁরা এ জগতে এসে বিশ্ব মানবকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এ দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে এমন এক জগত রয়েছে যা এ

www.pathagar.com

জগত অপেক্ষা অনেক বিস্তৃর্ণ ও উত্তম। যা চিরস্থায়ী ও বহু বিস্ময়কর বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ। এ সব এমন এক সত্তার সৃষ্টি, যিনি সকলের উর্ধ্বে। এ জগতের প্রতিটি কণার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব তাঁরই করায়ত্বে। এ বিস্ময়কর বাণী প্রচারের সাথে সাথে তাঁরা এ কথাও দাবী করেছেন যে, তারা ঐ সর্ব্বোচ্চ সত্তারই মনোনীত পয়গাম্বর এবং ইহজগত ও পরজগতের সাফল্য ও কল্যাণ তাঁদের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত।

নবী রাসূলগণের দাবীর যথার্থতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে কখনো কখনো এমন কিছু বিষয় সংঘটিত করেছেন যা মানুষের শক্তির অতীত। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্য অগ্নি শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাওয়া, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি বিরাট অজগরে পরিণত হওয়া, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা বিহীন জন্মগ্রহণ করা এবং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একই রাতে মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আক্সা ও সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা হয়ে আরশ আযীম পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে পুনরায় পবিত্র মক্কায় ফিরে আসা ইত্যাদি।

এসব ঘটনার মধ্যে মহা পরাক্রমাশালী আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতের প্রমাণ সুস্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। তাই নবী রাসূলগণেরর মাধ্যমে সংঘটিত এসব অলৌকিক ঘটনাবলী দেখে মানুষ তাঁদের দাবী সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তাঁরা যে মহান আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত রাসূল এ বিষয়েও সত্যসন্ধানী মানুষের মনে থাকে নি কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের আবিলতা। নবী রাসূলগণের মাধ্যমে সংঘটিত এসব অলৌকিক ঘটনাকেই মু'জিযা বলে।

পবিত্র কুরআনে এসব ঘটনাবলীকে আয়াত ও বারাহীন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়া (র.) তাঁর একাধিক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মু'জিযার বিশুদ্ধ শিরোনাম হচ্ছে 'আয়াত' ও 'বারাহীন'।

'আয়াত' শব্দের অর্থ নিদর্শন ও আলামাত। একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক বস্তুকে সনাক্ত করার জন্য যেমন বিশেষ কিছু আলামাত থাকে, যদ্দারা সে বস্তুকে সহজে চিনা যায়। তেমনি পয়গাম্বরগণের সাথেও কিছু নিদর্শন থাকে যা দেখে জানা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গাম্বর। এরই নাম "আয়াতে নবূওয়াত" তথা নবূওয়াতের নিদর্শনাবলী। এ সব নিদর্শন দ্বারা পয়গাম্বরগণ যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় বিধায় আল-কুরআনে এ গুলোকে 'বুরহান' বলা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কে লাঠি ও উজ্জ্বল হাত এ দুটি মু'জিযা দান করে বলা হয়েছে "فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ" এ দু'টি তোমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণ স্বরূপ। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ সব বিষয়কে "দালাইলে নবূওয়াত" বলে অভিহিত করেছেন। আর মুতাকাল্লিম এসব ঘটনাকে মু'জিযা নামে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত মু'জিযা (معجزة) শব্দটি আরবী ع-ج-ز হতে কর্তৃপদ। শব্দগত অর্থ অভিভূতকারী ও পরাভূতকারী।

আল্লামা তাফতাযানী (র.) মু'জিযার পারিভাষিক অর্থ এ ভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

www.pathagar.com

وَهِىَ أُمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرين عند الإتيان مثله ·

মু'জিযা প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিষয় যা নবূওয়াতের দাবীদারগণের দ্বারা প্রকাশিত হয়। নবূওয়াত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় মহান আল্লাহ্ পাক নবীগণের দ্বারা এ কাজ সংঘঠিত করেন। বিষয়টির প্রকৃতি এমন যে, এর মুকাবিলা করা অবিশ্বাসী এবং অস্বীকারকারী লোকদের পক্ষে অসম্ভব।[১]

অলৌকিক কোন বিষয় মু'জিযার অন্তর্ভূক্ত হতে হলে এর শর্ত নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ্‌র কাজ হতে হবে। ২. প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে হবে। ৩. অনুরূপ কার্যের সম্পাদন অন্যের পক্ষে অসম্ভব হতে হবে। ৪. এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হতে হবে যিনি নিজকে নবী বলে দাবী করেন। যা তাঁর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশ পায়। ৫. তাঁর ঘোষণার সমর্থন ব্যাপক হবে। ৬. মু'জিযা তাঁর দাবীর পরিপন্থী হবে না। ৭. দাবীর পরে সংঘটিত হতে হবে।

একটি ভ্রান্তির অপনোদন

মু'জিযা হল, আল্লাহ্‌র অপরিসীম কুদ্‌রতের অন্যতম নিদর্শন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক যেমনি-ভাবে স্বীয় কুদ্‌রতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন অনুরূপভাবে নবী ও রাসূলগণের নবূওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ পেশ করেছেন তিনি এর মাধ্যমে। মু'জিযা এক চিরসত্য বিষয়। অথচ কিছু কিছু লোক মু'জিযার হাকীকত উপলব্ধি করতে না পেরে একে অবাস্তব বলে অস্বীকার করে যা তাদের ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা বৈ কিছুই নয়।

তাদের যুক্তি বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই এর মূলে রয়েছে একটি শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে সবই একটি নির্দিষ্ট নিয়মেই ঘটেছে। কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। কোথাও কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। প্রতিদিন নিয়মতভাবে পূর্বদিক হতে সূর্য উদয় হচ্ছে এবং অস্তমিত হচ্ছে পশ্চিম দিকে। দিনের পর রাত আসছে. আর রাতের পর দিন সর্বত্রই এ নিয়ম বিরাজমান। আল্লাহ্‌র এই নিয়ম-নীতির নামই হচ্ছে স্বভাব বা প্রকৃতি। তাদের দৃষ্টিতে যেহেতু এ চিরন্তন নিয়ম থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার তাই তারা মু'জিযার বাস্তবতা স্বীকার করে না।

পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার তারা বলে এ সব কিছু আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। তাঁর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তিনিই এ অস্তিত্বহীন পৃথিবীকে অস্তিত্ব দান করেছেন, পিতা-মাতা ছাড়াই আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বাদিকের পাঁজর হতে হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছেন, হযরত ইদ্‌রীস (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর

১. শারহুল আকাইদ আন্-নাসাফিয়া, ১২৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

জন্য অগ্নিকে শীতল ও আরামদায়ক করে দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য সাগরে রাস্তা করে দিয়েছিলেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এবং কোন যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে একই রাতে সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ করিয়ে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়েছিলেন। কোন কিছুই তাঁর অসম্ভব নয়। তিনি তো সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

কোন কোন লোক স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার উপর ভিত্তি করে মু'জিযার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। বস্তুত তাদের এ অস্বীকার আদৌ ঠিক নয়। কেননা কোন কিছুর সাধারণ 'স্বভাব'ই তার চূড়ান্ত স্বভাব নয়। বরং গবেষক আলিমদের মতে 'স্বভাব' দু' প্রকার ঃ

১. বিশেষ স্বভাব (عادت خاصة),২. সাধারণ স্বভাব (عادت عامة)। দুনিয়াতে প্রচলিত যে নিয়ম কানূন বিদ্যমান রয়েছে তা সাধারণ স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এ সাধারণ স্বভাবের উর্ধ্বে আরেক ধরণের স্বভাব রয়েছে যাকে বিশেষ স্বভাব বলা হয়। নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশেষ স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এরূপ সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ ধরণের বিষয়ের প্রকাশ মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন মু'মিন খুবই নম্র, ভদ্র, কারো সাথে কখনো রাগ করে না এবং মাথা তুলে কখনো কথাও বলে না। কিন্তু তার সামনে যদি কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতি বেয়াদবীমূলক অশোভন উক্তি করে তবে অবশ্যই সে তার প্রতি রাগান্বিত হবে। বস্তুত কারো প্রতি রাগান্বিত হওয়া তার সাধারণ স্বভাব নয়। বরং এটা হল তার বিশেষ স্বভাব।

এতে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, স্বভাব দু প্রকার; সাধারণ স্বভাব ও বিশেষ স্বভাব। মু'জিযা প্রচলিত স্বভাবের বিপরীত হলেও বিশেষ স্বভাবের বিপরীত কিছু নয়। অতএব মু'জিযাকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয় বলে উপেক্ষা করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বলা হয়। যা স্বাভাবিকতার উর্ধ্বে একেই অতি স্বাভাবিক বলা হয়। বস্তুত কোন কিছু অতিস্বাভাবিক হলেই তা অস্বাভাবিক হয় না। কাজেই অস্বাভাবিকতার আওয়াজ তুলে মু'জিযার হাকীকতকে অস্বীকার করা আদৌ ঠিক নয়।

মু'জিযার সংখ্যা

নবী করীম (সা.)-এর মু'জিযা এবং অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা অগণিত। তবে যেগুলো অত্যন্ত প্রকাশ্য ও দেদীপ্যমান সে গুলোর সংখ্যাও দশ সহস্রাধিক। যেমন আল-কুরআনের ৬ হাজার ৬শ ৬৬ আয়াতের মধ্যে প্রিয় নবী করীম (সা.)-এর মু'জিযা হল সাত হাজার সাতশ' এ সম্পর্কে আল্লামা কাযী ইয়ায (র.) বলেছেন, আল-কুরআনের 'সূরা কাউসার' -এর সমান কালাম এক একটি মু'জিযা। এ সূরায় রয়েছে দশটি কালাম। এ হিসাবে যদি আল কুরআনের আয়াতগুলোকে দশ দ্বারা ভাগ দেয়া হয় তবে মু'জিযার সংখ্যা হবে সাত হাজার, সাতশ'।

www.pathagar.com

সুতরাং পবিত্র কুরআনের মু'জিযার সংখ্যা হল সাত হাজার, সাতশ'। এতদ্ভিন্ন মুহাদ্দিস এবং ইতিহাসবেত্তগণও নবী করীম (সা.) এর মু'জিযা সমূহ গণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী (র.) এর মতে মহানবী (সা.)-এর মু'জিযার সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার। ইমাম নববী (র.)-এর মতে মু'জিযার সংখ্যা এক হাজার দু'শ'। কোন কোন আলিমের মতে মহা নবী (সা.)-এর মু'জিযার সংখ্যা তিন হাজার। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তৎপ্রণীত 'খাসায়েসে কুব্‌রা' গ্রন্থে এক হাজার মু'জিযার বিররণ পেশ করেছেন।

মুদ্দাকথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসংখ্য এবং অগণিত মু'জিযা রয়েছে। এ বিষয়ের উপর আলিমগণ বহু কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে ইমাম বায়হাকী (র.) এবং ইমাম আবূ নু'আঈম (র.)-এর 'দালাইলে নবূওয়াত' এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর 'খাসায়েসে কুব্‌রা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

মু'জিযার প্রকারভেদ

এ মহাবিশ্বে যত জগত রয়েছে সমস্ত জগতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মু'জিযা বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে আলম 'عَالَم' প্রথমত দু' প্রকার -

১. আলমে মা'আনী (عَالَم مَعَانى) অর্থাৎ এমন আলম যা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বরং অন্যের উপর নির্ভরশীল। একে'আরয' (عَرض) ও বলা হয়। যেমন – ইল্‌ম, কথাবার্তা, রং ও ঘ্রাণ ইত্যাদি।

২. আলমে 'আয়ান (عَالَم اَعيَان) অর্থাৎ এমন আলম যা স্বয়ং সম্পূর্ণ। একে জাওহার (جَوهر) ও বলা হয়। যেমন, যমীন, আসমান, মানুষ, গাছ ইত্যাদি।

আলমে 'আয়ান দু' প্রকার,

১. আলমে যাবীউল উকূল (عَالَم ذَوِى العُقول) অর্থাৎ জ্ঞানবানদের আলম। যেমন ফিরিশ্‌তা, মানুষ ও জিন্ন।

আলমে গায়রে যাবীউল উকূল (عَالَم غَير ذَوِى العُقول) অর্থাৎ যারা জ্ঞান সম্পন্ন নয়।

আলমে যাবীউল উকূল তিন প্রকার ঃ

১. ফিরিশ্‌তা জগত, (عَالَم ملئكة)

২. মানব জগত (عَالَم إنسان)

৩. জিন্ন জগত (عَالَم جِن)

আলেম গায়রে যাবীউল উকূল দু' প্রকার ঃ

১. উর্ধ্ব জগত (عَالَم عُلوى) যেমন আকাশ, নক্ষত্র ইত্যাদি।

---

১. নাশরুত তিব্ব ফী যিক্‌রিন্ নাবিয়্যিল হাবীব, ২০৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২. নিম্ন জগত (عَالم سُفلى) যেমন - সমস্ত জড় বস্তু যা আকাশের নীচে অবস্থিত।

নিম্ন জগত (عَالم سُفلى) আবার দু' প্রকার ঃ

১. আলমে বাসাইত (عَالم بَسائط) যেমন আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস।

২. আলমে মুরাক্কাবাত (عَالم مركبات)

আলমে মুরাক্কাবাত আবার তিন প্রকার ঃ

১. জড়জগত (جَمَادات) ২. উদ্ভীদ জগত (نبَاتَات) ৩. প্রাণী জগত (حَيوَانَات)

এতএব বিশ্বজগত সর্বমোট নয় প্রকার ঃ

১. আলমে মা'আনী, ২. ফিরিশ্তা জগত, ৩. মানব জগত, ৪. জিন্ন জগত, ৫. উর্ধ্ব জগত (আসমান গ্রহ ও নক্ষত্র), ৬. বাসাইত (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস), ৭. জড় জগত, ৮. উদ্ভিদ জগত এবং ৯. প্রাণী জগত।

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (র.)-এর মতে আরেক প্রকার আলম রয়েছে, যাকে 'কাইনাতুল জাও' (كَائِنَاتُ الجَوّ) বলা হয়। যেমন, মেঘ ইত্যাদি। এ হিসাবে আলমের সংখ্যা সর্বমোট দশটি। উপরোক্ত সকল আলমেই মহানবী (সা.) -এর মু'জিযা বিদ্যমান আছে।

মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল আল-কুরআনুল কারীম। পূর্ববর্তী কোন নবী রাসূলকেই এরূপ মু'জিযা প্রদান করা হয় নি। তাঁদের মু'জিযা সমূহ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার তা খতম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আল-কুরআন হল নবী করীম (সা.) -এর চিরন্তন মু'জিযা। নবীজীর যুগে তা যেমন সংরক্ষিত ছিল চৌদ্দশ' বছর পরও তা ঐ ভাবেই সংরক্ষিত আছে। কোন প্রকার বিকৃতিই উহাকে স্পর্শ করতে পারে নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, ইন্শা আল্লাহ্।

পবিত্র কুরআন এক বে-মিসাল ও বে-নযীর কিতাব। এর মিসাল পেশ করতে কোন মানুষ সক্ষম নয়। যারাই এর মুকাবিলা করার চেষ্টা করেছে তারাই সম্পূর্ণ অপারগ ও ব্যর্থ হয়েছে। তাই সকলেই এক বাক্যে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এ এক 'মু'জিয' (معجز) কিতাব এর মুকাবিলা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আলিমগণ পবিত্র কুরআন 'মু'জিয' (معجز) হওয়ার বহুবিধ কারণ বর্ণনা করেছেন।

পবিত্র কুরআন বালাগত, ফাসাহাত তথা শিল্প, সাহিত্য, বর্ণনাশৈলী,বাস্তবানুগ অর্থ ও মর্ম এবং আয়াত ও সূরা সমূহের পরস্পর বিন্যাস ও সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক নযীরবিহীন কিতাব। তাই তো বারবার চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষে অনুরূপ কোন কিতাব, একটি সূরা এমন কি একটি বাক্যও রচনা করে উক্ত চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করা

www.pathagar.com

সম্ভব হয় নি।

কুরআন উলূম ও মা'রিফাতের এক জা'মি (ব্যাপক) গ্রন্থ। জীবনের এমন কোন দিক নেই যা আল-কুরআনে আলোচিত হয় নি। সৃষ্টির আদি হতে আরম্ভ করে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, আধ্যাত্মিক জীবনসহ মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে, মীযানে, পুলসিরাতে, জান্নাতে, জাহান্নামে এবং এর পরে কি হবে ? এ সবের বিবরণও এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা বিষয়বস্তুর দিকে থেকেও কুরআন এক নযীরবিহীন কিতাব। সর্বকালের, সর্বযুগের, সকল শ্রেণীর, সকল পেশার, সকল বর্ণের, সকল গোত্রের মানুষের জন্য রয়েছে এর মধ্যে সার্বিক, সঠিক ও যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং রাহ্নুমায়ী। কুরআনের এ জামি'ইয়্যাত এবং ব্যাপকতার কারণেও মানুষ এর মুকাবিলা করতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। এতে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল-কুরআন মানব রচিত কিতাব নয়। বরং এ হচ্ছে এক অপূর্ব অদ্বিতীয় ও চিরন্তন কিতাব,যা নাযিল করেছেন স্বয়ং বিশ্ব জগৎ সমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

আল-কুরআনের পর মহানবী (সা.) -এর দ্বিতীয় ইলমী মু'জিযা হল, তাঁর হাদীস। কুরআন যেমন ব্যাপক, মহানবী (সা.) -এর হাদীসও অনুরূপ ব্যাপক। জীবনের এমন কোন দিক নেই যা হাদীসের মধ্যে আলোচিত হয় নি। একজন উম্মী নবী কেমন করে এরূপ ব্যাপক দিক- নির্দেশনা জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরলেন তা অবশ্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। চিন্তাশীল গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আল-কুরআনের মুকাবিলা করতে যেমনিভাবে অক্ষম হয়েছে অনুরূপভাবে হাদীসের মুকাবিলা করতেও তাঁরা অক্ষম। বিষয়বস্তুর জামি'ইয়্যাত ও ব্যাপকতার দিক থেকে এর মধ্যে যেমনিভাবে 'মু'জিযানা শান' রয়েছে অনুরূপভাবে এর হিফাযতে সাহাবা, তাবিঈন, তাবে' তাবিঈন, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণ যে ভূমিকা পালন করেছেন, এতেও রয়েছে বিরাট 'মু'জিযানা কারনামা'। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতিটি কথা, কাজ এবং সমর্থনকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে মুহাদ্দিসগণ হাজার হাজার পৃষ্ঠার কিতাব প্রনয়ণ করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন এতে লক্ষাধিক ব্যক্তির জীবনী। এমনকি এ খিদমত আন্জাম দিতে গিয়ে عِلم الجَرح و التعدِيل এবং عِلم أسماء الرجَال، عِلم الإسناد، علم أصول الحَديث– নামে স্বতন্ত্র কয়েকটি বিষয় আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা এ মহান কাজে অত্যন্ত সর্তকতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন নযীর নেই। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, আল-কুরআনের মত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস ভাণ্ডারও তাঁর অন্যতম মু'জিযা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর বাণী মু'জিযার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, ভবিষ্যত এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। যেমন হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে মুতার যুদ্ধের খবর মদীনায় আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় উপস্থিত সাহাবীগণের নিকট হযরত যায়িদ, হযরত জাফর এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) -এর শাহাদাতের সংবাদ শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়িদ ইসলামের পতাকা হাতে

www.pathagar.com

নেয়ার পর সে শহীদ হয়েছে। অতঃপর জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে সেও শহীদ হয়েছে। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইসলামের পতাকা হস্তে ধারণ করেছেন এবং তিনি জয়লাভ করেছেন। কিছুদিন পর অনুরূপ সংবাদই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর নিকট এসে পৌছল।১

যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য

পয়গাম্বগণের মু'জিযা ও ওলীগণের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায় যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যাদুকরদের সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার। আলিমগণের মতে যাদু ও মু'জিযার মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

১. কোন মাধ্যম প্রয়োগ করে যাদু প্রদর্শন করা হয়। পক্ষান্তরে কোন কিছুর মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শন করা যায় না। বরং আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখনই নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

২. যাদুবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা যায়। কিন্তু মু'জিযা শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা যায় না। বরং আল্লাহ্ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নিজ ইচ্ছায়ই এর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

৩. যাদুর মুকাবিলা করা সম্ভব। তাই এক যাদুকর অন্য যাদুকরের যাদুকে নিজ যাদু দ্বারা নস্যাত করে দিতে পারে এবং পারে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিতে। পক্ষান্তরে মু'জিযার মুকাবিলা করা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই তো হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযার সামনে ফির'আউনের পক্ষের বিপুল সংখ্যক যাদুকর ব্যর্থ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা এ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ। আমরা ঈমান আনলাম জগত সমূহের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা এবং হারূনের প্রতিপালক (৭ : ১২১ - ১২২)।

৪. যাদুকরদের যাদুর মধ্যে পরস্পর বৈপরিত্য থাকতে পারে। কিন্তু নবীগণের মু'জিযার মধ্যে কোন বৈপরিত্য ছিল না এবং হতে পারে না।

৫. যাদু স্থান ও কালের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু মু'জিযা স্থান ও কালের সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন আল-কুরআন সর্বকালের সর্বস্থানের মানুষের জন্য একখানা অলৌকিক কিতাব।

৬. যাদু প্রদর্শন করা হয় পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আর মু'জিযার প্রকাশ ঘটানো হয়েছিল ধর্মীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য।

৭. সাধারণত মূর্খ ও নির্বোধ ধরনের লোকদের মধ্যেই যাদু প্রদর্শিত হয়ে থাকে এবং

১. ইলমুল কালাম : মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী (র), ১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তারাই এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। পক্ষান্তরে মু'জিযা প্রদর্শিত হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষের সামনে। এরপর বুদ্ধিমান লোকেরাই এর থেকে হিদায়েত গ্রহণ করেছে।

৮. প্রথমত মু'জিযা এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহ্ ভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সকলের দৃষ্টিতে প্রশংসিত হয় এবং স্বীকৃতি লাভ করে এবং যারা নবূওয়াতের দাবী নিয়ে লোকের সামনে উপস্থিত হন। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদত থেকে দূরে থাকে। এ সব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও যাদুর পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়।

কারামাত

নবী-রাসূল ব্যতীত আল্লাহ্র আরো কতিপয় খাস্ বান্দা রয়েছেন যাঁরা আল্লাহ্র হুকুম এবং নবী করীম (সা.)-এর তরীকা মোতাবেক চলেন, নাফরমানী করেন না, আর যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকেই স্বীয় কর্মের অভিভাবক মনে করেন। শরয়ী পরিভাষায় তাঁদেরকে ওলী বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ওলীগণের থেকে কারামত (অলৌকিক ঘটনা) এর বহিঃপ্রকাশ করেন। অবশ্য ওলী হওয়ার জন্য কারামাত শর্ত নয়।

বস্তুত কারামাত এর আভিধানিক অর্থ হল, সম্মানিত হওয়া। শরয়ী পরিভাষায় কারামাত বলা হয়, "ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة" নবীর দাবীদার নন এমন কোন ব্যক্তির থেকে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম কোন কাজ সংঘটিত হওয়াকে কারামাত বলা হয়। আল-কুরআনেও কারামাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বদ্ধ কামরায় হযরত মারইয়াম (আ.) -এর নিকট অলৌকিক উপায়ে খাদ্য আসা এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উযীর আসিফ ইব্ন বারখিয়া কর্তৃক মুহূর্তে ইয়ামান হতে বিল্কীসের সিংহাসন স্থানান্তরের ঘটনা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা মারইয়াম (আ.) বা হযরত সুলায়মান (আ.) এর সহচর উভয়ের কেউই নবী ছিলেন না, তাই এগুলো পয়গাম্বরীর প্রমাণজ্ঞাপক অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) হতে পারে না। বরং এ ঘটনা হচ্ছে কারামতের অন্তর্ভূক্ত।

ওলী দরবেশগণের জীবনের অসংখ্য ঘটনায় কারামাতের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। কারামাত হক, বাস্তব; একথা সব মুসলমান স্বীকার করেন। অবশ্য ভ্রান্ত মুতাযিলা সম্প্রদায়ই কেবল এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছে।১

মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে পার্থক্য

মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান।

১. মু'জিযার উদ্দেশ্য হল, নবূওয়াত অস্বীকারকারী লোকদের নিকট নবীর সত্যতা প্রমাণ করা। আর কারামাতের উদ্দেশ্য হল, ওলীকে সম্মানিত করা।

---

১. শারহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়্যা,১৩২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২. মু'জিযা পয়গাম্বরের সাথে খাস। অর্থাৎ নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো থেকে মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না। পক্ষান্তরে কারামাত হচ্ছে 'আম' অর্থাৎ পয়গাম্বর এবং ওলী দরবেশ সকলের থেকেই কারামাত নিষ্পন্ন হতে পারে।

৩. ওলী তাঁর অলৌকিক বিষয় গোপন রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু পয়গাম্বরের দায়িত্ব হল, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করে দেওয়া।

৪. ওলী নিজ কারামাত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নাও হতে পারেন। কিন্তু পয়গাম্বর তাঁর মু'জিযা সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিফহাল থাকেন।[১]

ইস্‌তিদ্‌রাজ

'ইস্‌তিদ্‌রাজ' শব্দটি আরবী। উহা যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন এর আভিধানিক অর্থ হল, কাউকে টেনে নিকটে আনা। এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়া, কাউকে ধোঁকা দেয়া ইত্যাদি। শরয়ী পরিভাষায় কোন মুলহিদ, অমুসলিম ব্যক্তি হতে প্রকাশিত অস্বাভাবিক ঘটনাকে 'ইস্‌তিদ্‌রাজ' বলা হয়।

কোন অলৌকিক, অস্বাভাবিক ঘটনা ঈমানদার পরহেযগার লোকদের দ্বারা প্রকাশিত হলে তাকে কারামত বলে। আর এরূপ ঘটনা বে-ঈমান, কাফির, মুলহিদ দ্বারা প্রকাশিত হলে তাকে ইস্‌তিদ্‌রাজ বলে।[২]

যাদুকর, বাজীকররা যাদু, ম্যাসমেরিজম, হিপটনিজম ইত্যাদি দ্বারা অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপার প্রদর্শন করে থাকে, তা কারামত নয়, ইসতিদরাজ। কারামত সত্য আর ইসতিদরাজ বাতিল।

১. ইলমুল কালাম ঃ মাওলানা ইদ্‌রীস কান্দলবী, ১৯৭ পৃষ্ঠা।
২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান

একজন মু'মিনকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা, সকল নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, পরকাল, তাক্‌দীর প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়, অনুরূপ ফিরিশ্‌তাদের প্রতিও ঈমান ও বিশ্বাস রাখতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি ফিরিশ্‌তাগণকে অবিশ্বাস করে তবে অন্যান্য সবকিছু বিশ্বাস করা সত্ত্বেও সে মু'মিন্ বলে গণ্য হবে না। ঈমানে মুফাস্‌সালে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের পরেই ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমানের কথা বলা হয়েছে।

ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্ পাকের সম্মানিত বিশেষ এক মাখলূক (সৃষ্টি)। তাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক নূর (জ্যোতি-আলো) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা অত্যন্ত জ্যোর্তিময় সূক্ষ্মদেহের অধিকারী। তাঁদের নিজস্ব আকৃতি রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতাও তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পুরুষও নন, মহিলাও নন। তাঁদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।

ফিরিশ্‌তাগণের সংখ্যা যে কত আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। তাঁদের প্রধান কাজ হল আল্লাহ্ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা নিয়োজিত থাকা। তাঁদের মধ্যে এমনও অনেক আছেন যাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে সৃষ্টি জগতে বিভিন্ন খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই মা'সূম বা নিষ্পাপ। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করেন না। বরং যাঁকে যে কাজে বা দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয় তিনি যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁদের প্রকৃতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۝

রাসূল ঈমান এনেছেন যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর প্রতি এবং মু'মিনগণও। তাঁরা সকলেই আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণে, তাঁর কিতাব সমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছেন (২ ঃ ২৮৫)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ

عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাঁতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাঁর প্রতি ঈমান আন এবং কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্‌তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং পরকালকে প্রত্যাখান করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে (৪ ঃ ১৩৬)।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ لَا
يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝

তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান, তারা (ফিরিশ্‌তাগণ) তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যে যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত (২১ ঃ ২৬-২৮)।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং মর্তবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জেনে রেখ আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৪২ঃ ৫)।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً
وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চার পাশ ঘিরে আছে তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর

www.pathagar.com

এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর (৪০ ঃ ৭)।

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَ
اللّٰهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ. يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ○

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই। তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশে তাঁর ইবাদত করা থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিন রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তারা শৈথিল্য করে না (২১ ঃ ১৯-২০)।

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ. وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ. وَاِنَّا لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُوْنَ ○

ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্যে নির্ধারিত স্থান রয়েছে আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী (৩৭ ঃ ১৬৪-১৬৬)।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ذَالِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ○

ফিরিশ্‌তারা বলেন, আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না : যা আমাদের সামনে ও পেছনে আছে এবং যা এই দু-এর অন্তর্বর্তী তা তাঁরই আর তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন (১৯ ঃ ৬৪)।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্যে তত্ত্বাবধায়কগণ, সন্মানিত লিপিকারবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর (৮২ ঃ ১০-১২)।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

স্থায়ী জান্নাত,এতে তাঁরা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হবে

www.pathagar.com

প্রত্যেক দ্বার দিয়া এবং বলবে তোমরা ধৈর্য্যধারণ করেছ বলে তোমাদিগের প্রতি শান্তি। কত ভাল এই পরিণাম (১৩ ঃ ২৩-২৪)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ - اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥

প্রশংসা আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই-যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশ্‌তাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন,অথবা চার চার পাঁখা বিশিষ্ট। তিনি তার সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৩৫ ঃ ১)।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ٥

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জ সহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্য সেই দিন হবে কঠিন (২৫ঃ ২৫-২৬)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآئَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا - يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ٥

আর যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে। যেদিন তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে রক্ষা কর, রক্ষা কর (২৫ ঃ ২১-২২)।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ٥

যে কেউ আল্লাহ্‌র, তার ফিরিশ্‌তাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিব্‌রাঈল ও মীকাঈলের

www.pathagar.com

শত্রু -সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু (২ ঃ ৯৮)।

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে। যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশ্তাগণ। তারা অমান্য করে না, আল্লাহ্ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে (৬৬ ঃ ৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কিছু সংখ্যক ফিরিশ্তার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন জাহান্নামের জিম্মাদার ফিরিশ্তার নাম 'মালিক'। কুরআনে বলা হয়েছে, জাহান্নামীগণ চিৎকার করে বলবে হে মালিক! তোমার প্রভূ যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন। তিনি বলবেন তোমরা তো এ অবস্থায়ই থাকবে (৪৩ ঃ ৭৭)।

এছাড়া সূরা বাকারায় জিব্রাঈল, মিকাঈল, হারূত, মারূত (আ.) ফিরিশ্তাগণের নাম এবং সূরা ইন্ফিতারে কিরামুন, কাতিবীন ফিরিশ্তাদ্বয়ের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

ফিরিশ্তাগণের আলোচনা প্রসংগে কুরআন পাকে অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলিতে তাঁদের ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্য, তাঁদের শক্তি, আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) -কে সিজ্দা করার ঘটনা কুরআন পাকের অনেক আয়াতে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত লূত (আ.) -এর মেহমান হিসাবে যে সব ফিরিশ্তা এসেছিলেন, তাদের ঘটনাও কুরআন পাকের কয়েক স্থানে বিদৃত হয়েছে। হযরত জিব্রাঈল (আ.) -এর অবস্থা কুরআন কারীমের সূরা 'নাজ্ম' ও সূরা'তাক্ভীরে'বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে কুরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন ফিরিশ্তা সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'আল্-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' কিতাবের প্রথম খণ্ডে উল্লেখিত রয়েছে। ফিরিশ্তাদের সম্পর্কে হাদীস যে সব বর্ণনা রয়েছে তা থেকে কিছু সংখ্যক হাদীস এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

হযরত জিব্রাঈল (আ.) বিভিন্ন আকৃতিতে নবী করীম (সা.) এর দরবারে হাযির হতেন। অধিকাংশ সময় তিনি হযরত দাহ্ইয়া কলবী (রা.) -এর আকৃতিতে আসতো।হাদীসে জীব্রীল নামে প্রসিদ্ধ হাদীসে তিনি পল্লী গ্রামের একজন সাধারণ লোকের বেশে আগমন করেছিলেন

www.pathagar.com

বলে উল্লেখ রয়েছে।

নবী করীম (সা.) হযরত জিব্রীল (আ.) -কে তার প্রকৃত আকৃতিতে দু'বার অবলোকন করেছেন। প্রারম্ভিক কালে মক্কার এক পাহাড়ের উপত্যকায়। আর দ্বিতীয় বার অবলোকন করেছিলেন মি'রাজের সফরে সিদ্রাতুল-মুনতাহা নামক স্থানে। তখন তার ছয় শ' ডানা বিশিষ্ট বৃহদাকার আকৃতিতে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মি'রাজ রজনীতে নবী করীম (সা.) বায়তুল মামূর পরিদর্শন করেছিলেন। দৈনিক সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। যাঁরা-ই একদিন সেখানে ইবাদত করে যান – কিয়ামতের পূর্বে তাঁরা পূণরায় সেখানে এসে ইবাদত করার সুযোগ পান না। এখানে ফিরিশ্তাগণ পালাক্রমে ইবাদত করে থাকেন। নবী করীম (সা.) বলেছেন, সাত আসমানের মধ্যে অর্দ্ধহাত? কিম্বা এক পা পরিমাণ স্থানও এমন নেই যেখানে কোন ফিরিশ্তা ইবাদতে রত না আছেন। কেউ দাঁড়ানো অবস্থায়, কেউ রুকূ' অবস্থায়, কেউ বা সিজ্দা রত অবস্থায়। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন তাঁরা বলবেন হে আল্লাহ্! আমরা তোমার যথাযোগ্য ইবাদত করতে পারি নি। তবে শির্ক করি নি।

এ মর্মে আরো হাদীসে রয়েছে যেগুলিতে বলা হয়েছে যে, সাত আসমানের সর্বত্র ফিরিশ্তাগণ ইবাদতে রত আছেন। সামান্য অর্দ্ধহাত পরিমাণ জায়গাও এ থেকে খালি নেই।

ফিরিশ্তাগণ বিভিন্ন পর্যায়ের মর্যাদার অধিকারী। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে– (ফিরিশ্তাগণ বলেন) "আমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে নির্ধারিত স্থান। আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী" (৩৭ ঃ ১৬৪–১৬৬)।

নবী করীম (সা.) একদা সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা কি সেভাবে সারিবদ্ধ হবে না যেভাবে ফিরিশ্তাগণ তাঁদের রব (প্রভূ) এর সামনে সারিবদ্ধ হয়। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! ফিরিশ্তাগণ কিভাবে সারিবদ্ধ হন? তখন নবী করীম (সা.) বললেন, তাঁরা প্রথম সফ (কাতার) পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় সফ আরম্ভ করে এবং তাঁদের সফ খুবই সোজা হয়, আঁকাবাঁকা থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা চারজন ফিরিশ্তাকে ফিরিশ্তাকূলের প্রধান বানিয়েছেন। তাঁরা হলেন –

১. হযরত জিব্রীল (আ.)। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ পাকের বাণীসমূহ নবী রাসূলগণের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া আল্লাহ্ যখন নির্দেশ প্রদান করেন তা কর্তব্যরত ফিরিশ্তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া।

২. হযরত ইস্রাফীল (আ.)। তাঁর দায়িত্ব হলো কিয়ামতের পূর্বক্ষণে আল্লাহ্র নির্দেশে

www.pathagar.com

সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া। তিনি মোট তিবার সিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন।

৩. হযরত মিকাঈল (আ.)। তাঁর দায়িত্ব হলো সৃষ্টি জগতের খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করা।

৪. হযরত আযরাঈল (আ.)। মানুষের রূহ্ কবয করা তাঁর দায়িত্ব। আযরাঈল নামটি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে আসারে সাহাবার মধ্যে রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে তাঁকে 'মালাকুল মাউত' বলা হয়েছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত আযরাঈল (আ.) -কে রূহ্ কবয করা সময় কারো নিকট আগমন করতে হয় না। বরং সারা পৃথিবী একটি গ্লোবের ন্যায় তাঁর সামনে অবস্থিত। যার আয়ূষ্কাল শেষ হয়ে যায় ঐখানে বসেই তিনি তার রূহ্ কবয করে নেন। অবশ্য রূহ্ কবয করার সময় অন্য ফিরিশ্তারা তার নিকট এসে থাকেন।

মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে তাঁর নিকট রহমতের ফিরিশ্তা আসেন আর বদ্কার হলে তার নিকট গযবের ফিরিশ্তা আসেন এবং তারা মৃতব্যক্তির রূহ্ নিয়ে যান।

হাদীস শরীফে মুনকার ও নাকীর নামে দুইজন ফিরিশ্তার উল্লেখ রয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তাঁরা তার কবরে এসে সওয়াল জওয়াবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নবী করীম (সা.) নির্যাতিত হয়ে যখন তায়িফ হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তাঁর সারা দেহ ছিল রক্তে রঞ্জিত। তখন হযরত জিব্‌রীল (আ.) এসে হাযির হলেন এবং বললেন– আল্লাহ্ পাক তায়িফবাসীর কথাবার্তা শুনেছেন, তাদের আচার-আচরণ দেখেছেন। মালাকুল জিবাল (পাহাড়-পর্বতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশ্তা) হাযির, তাঁকে আপনি যে নির্দেশ করবেন তা সে পালন করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

একদল ফিরিশ্তা আছেন যাঁদেরকে 'হামলাতুল আরশ্' (আরশ ধারণকারী) বলা হয়। আরশের আশে-পাশে আরেকদল ফিরিশ্তা আছেন যাঁদেরকে মুকাররাবূন (নৈকট্য প্রাপ্ত) বলা হয়।

'ال‍ح‍ور' আরেকদল ফিরিশ্তা আছেন,যাঁরা সাত আসমানে অবস্থান করেন। তাঁদের কাজ হলো দিনরাত তথা সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের তাসবীহ্, তাহ্‌লীল, ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকা। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– তাঁরা দিনরাত তাসবীহ্ পাঠ করে তাঁরা ক্লান্ত হয় না। জান্নাতের কর্মকর্তা ফিরিশ্তাকে 'রিয্ওয়ান' বলা হয়েছে। 'মালিক' ব্যতীত জাহান্নামের দায়িত্বে অন্য যে সব ফিরিশ্তা রয়েছেন তাদেরকে "সাবানিয়্যা" বলা হয়েছে।

মানব জাতির হিফাযত ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে একদল ফিরিশ্তা নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদেরকে 'মুয়াক্কালূন' বলা হয়েছে। আরেকদল ফিরিশ্তা আছেন যাঁরা মানবকূলের

www.pathagar.com

কাজ-কর্ম, ইবাদত–বন্দেগী ইত্যাদি সংরক্ষণ করেন। যাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা ক্বাফ এবং সূরা ইনফিতারে উল্লেখ করা হয়েছে। হয়রত ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে দু'জন ক্বারীন (চিরসাথী) নিয়োগ করা হয়েছে। একজন জীন্ন থেকে যে মন্দকাজের আদেশ করে। আরেকজন ফিরিশ্তা থেকে যে ভাল কাজের উপদেশ দেন (মুসলিম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, জুমু'আর দিনে মসজিদের প্রত্যেকটি দরজায় ফিরিশ্তাগণ উপস্থিত থাকেন। তাঁরা মুসল্লীদের মধ্যে একের পর এক আগমনকারীর নাম লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম যখন খুত্বা প্রদানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহন করেন তখন তাঁরা ফাইল পত্র গুটিয়ে নেন এবং যিকর শ্রবণ করেন (বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তির একাধিক নামায হতে জামা'আতের সাথে আদায়কৃত নামায পঁচিশগুণ অধিক সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ফজরের নামাযের সময় রাত দিনের ফিরিশ্তাগণ একত্রিত হয়ে যান (বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তার শয্যায় আসার জন্য ডাকে অথচ স্ত্রী আসে না। আর স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তবে ফিরিশ্তাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকেন (বুখারী)।

নবী করীম (সা.) আরো বলেন, ইমাম (নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠান্তে) যখন 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও (মুক্তাদিগণ) 'আমীন' বলবে। কেননা যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তার সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

নবী করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একদল ফিরিশ্তা নিয়োগ করে রেখেছেন যাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তাঁরা যখন কোথাও কোন জামা'আতকে আল্লাহ্ তা'লার যিকিরে রত পান তখন তাঁরা সকলে সেখানে একত্রিত হয়ে যান এবং তাঁদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এর পরে উক্ত ফিরিশ্তাগণ যখন আকাশে চলে যান তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের নিকট বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান (আল-হাদীস)।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

ইসলামের পরিভাষায় 'কিতাব' বলতে বুঝায় এমন গ্রন্থকে যা মানুষের পথ নির্দেশের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রাসূলগণের প্রতি অবতরণ করা হয়। 'কিতাব' বলতে এখানে কিতাবুল্লাহ্ বা আসমানী কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে। আসমানী কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের মৌলিক অংগ বা ফরয। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

যখন তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হতে কোন হেদায়েতের বাণী আসবে তখন যারা আমার সে হেদায়েত অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত ও হবে না। (২ ঃ ৩৮)

আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকী লোকদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

(মুত্তাকী তারাই) যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখে। (২ ঃ ৪)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ

রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনয়ণ করেছে এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলেই আল্লাহে,তাঁর ফিরিশ্‌তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে। (২ঃ ২৮৫)

অনুরূপ আরো বহু আয়াতে এ কথা বিবৃত হয়েছে যে, সত্যিকার মু'মিন হতে হলে কুরআন মজীদ এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয। প্রকৃতপক্ষে আসমানী কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনয়ন করার তাৎপর্য হল, ঐ কিতাব সমূহে যে সকল বিধি-বিধান রয়েছে এর সত্যতা মনে প্রাণে মেনে নেওয়া এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন-যুগে রাসূলগণের উপর এ কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আল-কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করার মর্ম হচ্ছে, এর মধ্যে যত হুকুম-আহ্‌কাম, বিধি-বিধান রয়েছে তা

www.pathagar.com

মনে প্রাণে স্বীকার করা, আমলে রূপায়িত করা এবং একথা বিশ্বাস করা যে, এই কিতাব আল্লাহ্র পক্ষ হতে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। আখিরী কিতাব-সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এ কিতাব নাসিখ-(রহিতকারী) আর এর পূর্বে নাযিলকৃত বাকী সবগুলো হচ্ছে মানসূখ ও রহিত।

আল্লাহ্র প্রেরিত আসমানী কিতাবের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে চারখানা বিখ্যাত -

১. তাওরাত ঃ হযরত মূসা (আঃ) -এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

২. যাবূর ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ।

৩. ইনজীল ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ।

৪. কুরআন ঃ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ। (তাফসীরে কাবীর)

কুরআন শরীফে প্রথমত তিনখানা কিতাবের বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাওরাত সম্বন্ধে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ

আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, এতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো। (৫ঃ ৪৪)

হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর এ কিতাব নাযিল হয়। এটি 'বাইবেল বা ওল্ড টেষ্টামেন্ট' নামে পরিচিত। ইয়াহুদীরা এই কিতাবের নির্দেশ পালন করে। তারা এই কিতাবকে'তাওরাত' বলে প্রচার করে থাকে।

যাবুর সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ۚ

এবং আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম। (৪ঃ ১৬৩)

ইন্জীল সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে,

وَ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ ۝

আমি মারইয়াম তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পেছনে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম ইন্জীল, এতে ছিল পথের দিশা ও আলো। (৫ ঃ ৪৬)

এটিও 'বাইবেল বা নিউ টেষ্টমেন্ট' নামে খ্যাত। খৃষ্টান সম্প্রদায় এ কিতাবে বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করার দাবী করে থাকে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত তিন কিতাব ব্যতীত আল-কুরআনে দু'টি সহীফার কথাও উল্লেখ রয়েছে। যেমন ১. সহীফায়ে ইব্‌রাহীম ২. সহীফায়ে মূসা।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

এতো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে, ইব্‌রাহীম ও মূসার গ্রন্থে। (৮৭ ঃ ১৮-১৯)

এ ছাড়াও আল-কুরআনের আরো দুই স্থানে পূর্ববর্তী সহীফা সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে এগুলোর নাম উল্লেখ করা হয় নি। ইরশাদ হয়েছে,

أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْأُولَىٰ

তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূববর্তী গ্রন্থসমূহে। (২০ ঃ ১৩৩)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

পূববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। (২৬ ঃ ১৯৬)

আল-কুরআনের আগে যে সব আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলো মনসূখ-রহিত হওয়ার পাশাপাশি অনির্ভরযোগ্য এবং বিকৃতও বটে। কেননা বর্তমান বাইবেলের মধ্যে রয়েছে তাওরাত, যাবুর ও ইন্‌জীল; এই তিনটি কিতাব। উক্ত কিতাবত্রয়ের সমন্বয়ে 'বাইবেল' নামে যে কিতাব সংকলন করা হয়েছে তাতে দু'টি অংশ রয়েছে। একটি অংশ 'ওল্‌ড টেষ্টামেন্ট' নামে পরিচিত। আর অপর অংশটি 'নিউ টেষ্টামেন্ট' নামে পরিচিত। আটত্রিশ খণ্ডে সংকলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ওলড্ টেষ্টামেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত। তাওরাত সম্বন্ধে গবেষকদের অভিমত এই যে, বাবেল সম্রাট "বখতে নসর" বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করে হাজার হাজার নারী-পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং বন্দী করে নিয়ে যায় তাদের অসংখ্য লোকদেরকে। এ সময় তারা আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদুল আক্‌সায় হামলা করে, সুলায়মান (আঃ)-এর প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ করে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাত সহ যাবতীয় গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে দেয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এ ঘটনার দীর্ঘ দিন পর তাওরাতের একটি কপি তাঁদের হস্তগত হয়। এরপর পুনঃ পুনঃ তারা রোমী এবং গ্রীকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এতে তাওরাতের শেষ কপিটিও জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।[১]

তখন থেকে বাইবেল পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জনকথা তথা মানুষের স্মৃতি নির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র। লোক মুখে প্রচলিত কাহিনী নয়শ' বছরেরও বেশী সময় লাগিয়ে তা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বাইবেলের পুস্তক সমূহ বহুবার লিখন, সম্পাদনা, সংশোধনের পর তা চড়ান্ত রূপ লাভ করে।

১. আন-নাবিয়্যুউল খাতাম ঃ মাওলানা মানাযিরে আহ্‌সান গীলানী; কুরআন সে বাইবেল তক (উর্দূ)ঃ মাওলানা তকী উসমানী।

www.pathagar.com

পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কিতাবটিকে মূল ভাষায় লিপিবদ্ধ না করে লেখকগণ এর অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে তাঁরা তাহরীফ বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বিপুলভাবে। কুরআন মজীদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তাঁরা মূল হতে কিছু অংশ বাদ দিয়ে, মূলের সাথে নূতন কিছু সংযোজন করে, মূলের অংশ বিশেষের স্থলে নিজেরা কিছু লিখে, উচ্চারণের বিকৃতি যোগে ভুল বুঝিয়ে এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তারা তাহরীফ সাধন করে। ড. মরিস বুকাইলী বলেন, এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বাইবেলের এ সব গ্রন্থে বিভিন্ন পয়গম্বর কর্তৃক প্রাপ্ত ওহী বা প্রত্যাদেশের সংমিশ্রন অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এ সব প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বাণীর ভিত্তিতে সেকালের লেখকরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে সব রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন তা আমরা 'ওলড্ টেষ্টামেন্ট' বা 'তাওরাত' নামে পাচ্ছি। সেকালের লেখকরা বিভিন্ন নবীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বাণীর মধ্যে পরিবর্তন তো করেছেনই, অধিকন্তু তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে নিজস্ব যুগের এবং পরিবেশের প্রয়োজনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক অদল-বদল, এমনকি সংযোজন ঘটাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত সমস্ত বাইবেলেই এ ধরণের বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড বিদ্যমান। বাইবেলের অন্তর্ভূক্ত সব পুস্তকই বেশ কয়েকবার সংশোধন ও সম্পাদনা করা হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্জিত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওই সব বাড়তি বিষয় সম্ভবতঃ পরবর্তী সময়ের সংযোজন। বস্তুতঃ বাইবেলের কোথাও রয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তি, কোথাও পুনঃরাবৃত্তির দোষ, কোথাও কাহিনীগত গরমিল এবং কোথাও রচনাগত তারতম্য। এক কথায় ইয়াহুদীদের গির্জার যেমন বিভিন্নতা রয়েছে তেমনি গির্জা ভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক-পৃথক বাইবেল। কেননা বাইবেল সম্পর্কে একেক গির্জার ধারণা একক রকম। আর পারস্পরিক ভিন্ন ধারণার কারণেই অন্য ভাষায় 'বাইবেল' তরজমা করতে গিয়েও তাঁদের পক্ষে ঐক্যমতে পৌছা সম্ভব হয় নি। এই পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত রয়েছে।[১]

ওলড্ টেষ্টামেন্টের অন্তর্ভূক্ত যাবুর সম্বন্ধে মাওলানা রহমত উল্লাহ্ কিরানভী (র.) বলেন, এ কিতাবটি কে সংকলন করেছেন এবং কখন সংকলন করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট কোন সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ বলেন, এটি হযরত দাঊদ (আঃ)-এর যমানায়ই সংকলন করা হয়েছে। কেউ বলেন, পরবর্তীকালে তাঁর সহচরগণ সংকলন করেছেন। আবার কারো কারো মতে, বিভিন্ন সময়ে তা সংকলন করা হয়েছে। এবং বিভিন্ন লেখক সংকলনের এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরাও বিকৃতির আশ্রয় করেছেন। এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ বলেন, বাইবেলের গীতসংহীতা। যাবুর কিতাবেরই বিকৃতরূপ মাত্র।[২]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ ওলড্ টেষ্টামেন্ট-এ এছাড়াও বিভিন্ন নবীর শিক্ষা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি কিতাব এবং আরো কিছু ঐতিহাসিক পুস্তক স্থান লাভ করেছে। এগুলোর অবস্থাও তাওরাত ও যবুরের অনুরূপ।[৩]

১. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান ঃ ড. মরিস বুকাইলী। ২. কুরআন সে বাইবেল তক (উর্দু) ঃ মাওলানা তকী উসমানী
৩. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান ঃ ড. মরিস বুকাইলি।

www.pathagar.com

বাইবেলের অপর অংশকে'নিউ টেষ্টামেন্ট'(নতূন নিয়ম) বলা হয়। এটি ইন্জীল শরীফ হিসাবে পরিচিত। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার ৭০ বছর পর নিউ টেষ্টামেন্টের সুসমাচার সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঐশী বাণীসমূহ জনকথা তথা মানুষের স্মৃতি নির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র। নিউ টেষ্টামেন্টর এ সুসমাচার সমূহ কিভাবে লিপিবদ্ধ হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে 'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল'-এর অনুবাদকগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের তাগিদে, ধর্ম প্রচারকগণ যেসব কাহিনী ও বিবরণ পেশ করতেন, তাই লোকমুখে প্রচারিত হত। আবার লোকমুখের এ সব কাহিনী সংকলিত করে নিয়ে ধর্ম প্রচাররের উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হত। বাইবেলের নতূন নিয়মের সুসমাচারগুলো এমন ধরণেরই সংকলন। এইভাবে অসংখ্য ধর্মপ্রচারকগণ অসংখ্য বাইবেল সংকলন করে নেন। এগুলোর কোনটি বিশুদ্ধতা নিরুপনের জন্য পূর্ব রোমের ফীলস শহরে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে পাদ্রীদের এক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিন শতাধিক পাদ্রী অংশ গ্রহণ করেন। প্রাদীগণ এ যাবত যত সুসমাচার লেখা হয়েছে তা একত্রিত করে একটি স্তুপ দেয়। অতঃপর সর্বজনমান্য একজন পাদ্রী সিজ্দাবনত অবস্থায় এ বলে মন্ত্র আওড়াতে থাকে যে, "যেটি অসত্য তা যেন পড়ে যায়, যেটি অসত্য তা যে পড়ে যায়"।[১]

এভাবে বলতে বলতে চারটি সুসমাচার ব্যতীত বাকি সব কটি মাটিতে পড়ে যায়। আর এ চারটি হল। মার্ক, মথি, লুক ও যোহনের সুসমাচার। অভিজ্ঞ লেখকদের মতে এই চারটি সুসমাচার প্রমাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে ১৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে।

বস্তুতঃ এ সব সুসমাচার হচ্ছে সে সব রচনার সমাহার যে সব রচনার দ্বারা বিভিন্ন মহলকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে, গির্জার প্রয়োজন মিটানো হয়েছে, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ধর্মীয় ভুলত্রুটি সমূহ সংশোধন করা হয়েছে। এবং এমনটি প্রয়োজনে বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের উত্থাপিত নানা অভিযোগের দাতভাঙ্গা জওয়াব দেওয়া হয়েছে। সুসমাচারের লেখকগণ স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লোক কাহিনী হিসাবে যে সব রচনা হাতের কাছে পেয়েছেন তা থেকে উপাদান নিয়ে নিজ নিজ পুস্তক সংকলন ও প্রনয়ণ করেছেন।

এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এসব সুসমাচার হচ্ছে বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমোলা এক সাহিত্যকর্ম তো বটেই, সে সাথে এগুলো অতুলনীয় বৈপরিত্যেরও সমাহার। এ মন্তব্য আমাদের নয়। এ মন্তব্য করেছেন, 'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল' এর শতাধিক বিজ্ঞ ভাষ্যকার।[২]

তাঁরা বলেন, যে সব প্রাচীন নিউ টেষ্টামেন্ট (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ঃ ইন্জীল) আমাদের হাতে এসেছে, এর সবগুলোর রচনা ও বক্তব্য এক নয়। বরং একটির সাথে আরেকটি পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাপ্ত বিভিন্ন বাইবেলের মধ্যে এই যে তফাৎ তাও বিভিন্ন ধরণের। সংখ্যার দিক থেকেও সে পার্থক্য কম নয়। বরং প্রচুর কোন কোন বাইবেলের মধ্যে ব্যাকরণ সংক্রান্ত

১. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান ঃ ড. মরিস বুকাইলি। ২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শব্দচয়নে কিম্বা শব্দের অবস্থানের ভিন্নতাও কম নয়। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এমন ধরণের পার্থক্যও বিদ্যমান যার ফলে দু'টি বাইবেলের গোটা একটা অনুচেছদের অর্থ পুরোপুরি ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায়। এতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, বাইবেলের সুসমাচারসমূহ মূলতঃ মানুষের রচনা। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নাযিলকৃত ঐশী বাণী নয় এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী সমূহের হুবহু বর্ণনাও নয়।[১]

জ্বিন্ন ও মানুষের হিদায়েতের জন্য সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরআন নাযিল হয়েছে আখিরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি। ইরশাদ হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ ۔

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর এ (কুরআন)ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (নাযিলকৃত) সত্য (গ্রন্থ)। তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৪৭ ঃ ২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۔

এবং আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। (১৬ ঃ ৪৪)

এ আয়াতে "আয্ যিক্র" বলে কুরআন কেই বুঝানো হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

এটা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১২ ঃ ২)

বস্তুতঃ কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র এক শাশ্বত ও চিরন্তন কিতাব। ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব। এরপর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কারণ কুরআনে মানব জাতিকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়ে ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এই কিতাবের হিফাযতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

---

১. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান ঃ ড. মরিস বুকাইলি।

www.pathagar.com

এ যিক্‌র (কুরআন) আমরাই নাযিল করেছি আর আমরাই-এর সংরক্ষণকারী। (১৫ ঃ ৯)

তাই সকল প্রকার তাহ্‌রীফ, মানুষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও মরিমার্জন থেকে তা মুক্ত ও সংরক্ষিত; কুরআন শরীফ যেমনটি নাযিল হয়েছিল তেমনটিই রয়েছে এবং চিরকালই থাকবে। এর একটি শব্দ বা বর্ণও রদ-বদল হয়নি, কখনো হবে না। দুনিয়াতে দাঁড়িকমা, সেমিকোলনসহ যেভাবে অসংখ্য হাফিয আন্তরিকতার সাথে কুরআন শরীফের প্রতিটি আয়াত হুবহু মুখস্থ রাখে এবং রাখবে তেমন আর কোন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে বলা চলেনা। যে কোন গ্রন্থের লিখিত অবস্থায় দূর-দুরান্ত গমনাগমনে ধ্বনি, উচ্চারণ, ভাষাও ব্যাকরণ পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কুরআন সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নয়। লিখিত না থাকলেও বহু হাফিযে কুরআন হৃদয়ে উচ্চারণ, ভাষা ও ব্যাকরণের প্রতিটি খুটিনাটি সহ মুখস্থ রাখেন এবং এ ধারা চলতেই থাকবে। এ-ও কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম মু'জিযা। কুরআনই অপরিবর্তিত ধর্ম গ্রন্থরূপে চিরকাল বলবৎ থাকবে। এর মধ্যে বিধৃত আদর্শ, নীতি ও আইন-কানূন সব কালের সব দেশের সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। বস্তুতঃ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মহান রাব্বুল আলামীন জিন্ন ও মানুষের হিদায়েতের জন্য লাওহে মাহফূয থেকে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ওহীযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতকালে বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন সমস্যা উপলক্ষে এ কিতাব নাযিল করেছেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর মতে কুরাআনে যে সব ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং উপদেশপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে তা পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়

১. ইলমুল আহ্‌কাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কিত ইল্‌ম ঃ অর্থাৎ ইবাদত, কায়কারবার, ঘর-সংসার, রাজনীতি কিম্বা অর্থনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওয়াজিব (অবশ্যকরণীয়), সুন্দর (প্রশংসনীয়), মুবাহ্ (বৈধ), মাকরূহ (অপসন্দনীয়) এবং হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পর্কিত ইল্‌ম।

২. ইলমুল মুখাসামা বা ন্যায়শাস্ত্র ঃ অর্থাৎ ইয়াহুদী, খৃস্টান, মুশরিক ও মুনাফিক এই চারটি পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্কে পারদর্শিতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ইল্‌ম।

৩. ইলমুত্ তাযকীর বি আলা-ইল্লাহ্ বা স্রষ্টাতত্ত্ব ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিদর্শন সম্পর্কিত ইল্‌ম। এতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত অভিজ্ঞান এবং সৃষ্টিকর্তার সর্ববিধ গুণাবলীর পরিচয় সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো এতে রয়েছে।

৪. ইল্‌মুত্ তায্‌কীর বি-আইয়ামিল্লাহ্ বা সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিবস্তুর অবস্থা অনুগতদের পুরস্কার ও অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত বর্ণনা এতে উল্লেখ রয়েছে।

৫. ইল্‌মুত্ তাযকীর বিল মাউত ওয়া বিমা বা'দাল মাউতঃ অর্থাৎ মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালের অবস্থায় সম্পর্কিত ইল্‌ম। এতে পুণরুত্থান, একত্রীকরণ, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত বর্ণনা সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হল, মানব সভ্যতার উৎকর্ষ বিধান, বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদার মূলোৎপাটন এবং কুসংস্কার ও কুকার্য সমূহ খতম করে নববী আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠণ করা।[১]

কুরআন নিযামে হায়াত বা একটি জীবন পদ্ধতি। কুরআন প্রদর্শিত জীবনই শ্রেষ্ট জীবন। এখানে অসুন্দরের কোন স্থান নেই। কুরআনের পথ ধরেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে নিজের ও অপরের, ইহ্-পরকালের শান্তির পথ সুগম করতে পারে এবং পৌছতে পারে অভিষ্ট লক্ষ্যে-সিরাতে মুস্তাকীমে; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মূলতঃ এ জীবনই কাম্য। এ জীবন যাপন করতে পারলেই মানব জীবন শ্রেষ্ঠ জীবনে পরিণত হয়। তখনই মাটির মানুষ ফিরিশ্‌তার চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন হতে সক্ষম হয়। মানুষকে এমন গৌরবের আসনে তুলে ধরতে এবং উন্নত জীবন বোধে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করতে অন্য কোন জীবন পদ্ধতিই এমনভাবে সক্ষম হয় নি, যেমনটি পেরেছে আল-কুরআন।[২]

আল-কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে ৮২টি মাক্কী, ২০টি মাদানী ১২টিতে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এ ১২টি মাক্কী সূরা, কারো মতে মাদানী। সাধারণতঃ মাক্কী সূরাগুলোতে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ ও আকীদা সম্পর্কে এবং মাদানী সূরাগুলোতে ইবাদত আচার-ব্যবহার হালাল-হারাম, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচন করা হয়েছে। সমগ্র কুরআনের ১১৪টি সূরায় আয়াত-সংখ্যা মোট ৬৬৬৬টি।[৩]

কুরআন শরীফ ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড বা অংশকে জুয বা পারা বলা হয়। সাতদিনে খতম খরার সুবিধার্থে উক্ত সূরাগুলোকে সাতভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একে মঞ্জিল বলা হয়। যেমন ঃ

১. সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত,
২. সূরা মায়িদা থেকে সূরা তাওবা পর্যন্ত;
৩. সূরা ইউনুস থেকে সূরা নাহ্‌ল পর্যন্ত;
৪. সূরা বণী ইসরাঈল থেকে সূরা ফুরকান পর্যন্ত;
৫. সূরা শু'আরা থেকে সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত;
৬. সূরা সাফ্‌ফাত থেকে সূরা হুজুরাত পর্যন্ত;
৭. সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

আল-কুরআনে ৫৫৪টি রুকু* এবং ১৪টি সিজ্‌দা চিহ্নিত রয়েছে। আল-কুরআনের শব্দ সংখ্যা ৮৬,৪,৩০, হরফ সংখ্যা ৩,২২,৬,৭১,০০০, যবর সংখ্যা ৫৩,২৩৪, যের সংখ্যা ৩৯,৫৮২, পেশ সংখ্যা ৮,৮০৪। তাশদীদ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, ১২৫৩ বার এবং মদ ব্যবহৃত

১. আল-ফাউযুল কবীর ঃ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (র.) ২. মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন ঃ মান্নাউল কাত্তান ও কামালাইন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম ৩. কামালাইন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম।

www.pathagar.com

হয়েছে ১৭৭১ বার। আল-কুরআনে নকুতা রয়েছে ১০,৫৬৮২ টি।[১]

কুরআন মজিদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআন কালামুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র বাণী, কালামে কাদীম বা চিরন্তন বাণী। কুরআন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। এর মধ্যে একটি শব্দ বা অক্ষরও কোন সৃষ্টির পক্ষ হতে সংযোজত হয় নি। পবিত্র কুরআন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি নাযিল করেছেন।

কুরআন আসমানী কিতাব সমূহের সর্বশেষ কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কিতাব নাযিল করা হবে না। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের জন্য নাসিখ (রহিতকারী) তবে তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারীও বটে। কুরআন মজীদ নবী করীম (সঃ)-এর সর্বোত্তম ও সর্বপ্রধান মু'জিযা, কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ নেই।

যে সব বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি নির্ভরশীল, কুরআন হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ও সংকলন। যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে সে আল্লাহ্; তাঁর ফিরিশ্তা; তাঁর কিতাব; তাঁর নবী ও রাসূল এবং আখিরাত তথা পরকালের প্রতিও ঈমান এনেছে। কারণ এ গোটা ঈমানিয়্যাতের বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ কুরআনেই বিদ্যমান রয়েছে। আর ঈমান বিল-কুরআন – কুরআনের প্রতি ঈমানের নিশ্চিত সুফল হলো পরিপূর্ণ ঈমান লাভ। তদুপরি যেহেতু কুরআন মজীদে ইসলামী শরীয়াতের সকল মূলনীতি ও মৌল বিধানও উল্লেখিত রয়েছে; সেহেতু প্রকৃত মুসলিম ও মু'মিন হতে হলে কুরআনের উপর ঈমান আনতেই হবে।ইসলামী শরীয়াত মতে পবিত্র কুরআন অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হবে।

১. কামালাইন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাক্‌দীরের প্রতি ঈমান

তাক্‌দীর-এর সংজ্ঞা

তাক্‌দীর শব্দটি "قَدْرٌ" (কাদ্‌রুন) "قَدَرٌ" (কাদারুন) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। 'কাদারুন' -এর অর্থ হল, পরিমাণ নির্ধারণ, যথাযথ হওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। যেমন - পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ۝

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথার্থ অনুপাতে (২৫ ঃ ২)।

পরিভাষায় তাক্‌দীর -এর সংজ্ঞা হল ঃ

"تحديد كل مخلوق بحده"

অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যাবতীয় বিষয় পরিমিত ও নির্ধারণ করা। এর ব্যাখ্যা হল, সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারণ। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের মধ্যে কার কি আকৃতি, কার কি প্রকৃতি, কার কি কর্ম, কার কি দায়িত্ব, কার কি গুণাগুণ, কার কি বৈশিষ্ট্য হবে। কার জন্ম, মৃত্যু কোথায় কখন কিভাবে হবে, ইত্যাদি বিষয় স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে সৃষ্টির কোন ইখ্‌তিয়ার নেই। আল্লাহ্‌র এ নির্ধারণকে 'তাক্‌দীর' বলে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা মাখলূকের ভালমন্দ সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ইল্‌মের বাইরে কিছুই ঘটে না ও ঘটতে পারে না। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝা যায় যে কাযা ও কাদ্‌র শব্দদ্বয় সম-অর্থবোধক।

তবে কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য করেন। যেমন

اَلْقضاء هُوَ اَحكام إجمالية أزلية وَالقدر تَفصِيلهَا

অনাদিকাল থেকে আল্লাহ্‌ পাকের জ্ঞানের মধ্যে যে সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা বিদ্যমান ছিল তাকে 'কাযা' বলে। আর সেই সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত রূপের নাম হল 'কাদ্‌র'।[১]

---

১. আত্‌ তালিকুস্‌ সাবীহ্‌, ১ম খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তাক্‌দীরের উপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা

মু'মিন হওয়ার জন্য তাক্‌দীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। কারণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের ন্যায় তাক্‌দীরের উপর বিশ্বাস করাও ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। বহু সহীহ্ হাদীসে তাক্‌দীরে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বিদ্যমান। যেমন হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে ঈমানের মৌল বিষয়গুলির সম্পর্কে বলা হয়েছে, "وان تؤمن بالقدر خيره وشره" অর্থাৎ তাক্‌দীরের ভালমন্দ সকল কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। (মুসলিম)

তাছাড়া তাক্‌দীরের উপর অবিশ্বাস করা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌মে আযালী-চিরন্তন জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর। এ অবিশ্বাস ব্যক্তিকে অগ্নিপূজা করার ন্যায় দুই স্রষ্টায় (ভাল কর্মের স্রষ্টা ও মন্দ কর্মের স্রষ্টা) বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয়। সাহাবী ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, "القدرية مجوس هذه الامة" তাক্‌দীর অস্বীকারকারী ফিরকা যেন এ উম্মাতের অগ্নীপূজক ফের্কা (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ) অর্থাৎ অগ্নীপূজক ফের্কা যেমন, ইয়াজদান ও আহরামান নামে দুই স্রষ্টা বিশ্বাস করে, যারা তাক্‌দীরে বিশ্বাস করে না তাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, তাক্‌দীরে বিশ্বাস কেবল আল্লাহ্‌র ইল্‌মে আযালীকে মেনে নেয়ার প্রয়োজনেই নয় বরং স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সম্পর্ক (ربط الحوادث بالقديم) স্থাপিত হওয়ার জন্যও তাক্‌দীরে আস্থা স্থাপন করা আবশ্যক। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এ বিশ্বাস ব্যতিরেকে স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সম্পর্ক গড়ে উঠে না। এমতাবস্থায় যারা তাক্‌দীরে বিশ্বাস করে না তারা নিজকে স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করে কিম্বা স্রষ্টাকে এমন এক পর্যায়ে জ্ঞান করে যেখানে তাকে স্রষ্টা বলে মানা বা না মানার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। একখানা হাদীস থেকেও উপরোক্ত মতামতের সমর্থন মেলে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাক্‌দীরে বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন,

إيمان بالقدر نِظَام التوحيد فمن امن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد

তাক্‌দীরের উপর ঈমান আনাই হল তৌহিদী ব্যবস্থা। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে অথচ তাক্‌দীরে বিশ্বাস করে না সে বস্তুত তাওহীদ বিশ্বাসকে ছিন্ন করে দিল।১

তাক্‌দীরকে অস্বীকার কারীদের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে কতিপয় হাদীস বিধ্যমান রয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, তাক্‌দীরে অস্বীকারকারীরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তবুও যতক্ষণ না তারা তাক্‌দীরে বিশ্বাস করছে আল্লাহ্ তাদের দান কবূল করবেন না। (সহীহ্ মুসলীম, কিতাবুল ঈমান)

---

১. কিতাবুস্ সুন্নাহ্ ঃ ইমাম আহ্‌মাদ, পৃষ্ঠা-১২৩ ও তরজমানুস সুন্নাহ্ ঃ মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩)।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

لاَتُجَالِسُوا اَهْلَ الْقدر ولاَ تُفَاتحوهم

তাক্‌দীরে অবিশ্বাসীদের সাথে উঠা বসা করবে না আর তাদের সাথে সালাম কালামও হবে না (আবূ দাউদ)।

তাক্‌দীর সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত

তাক্‌দীরের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে তিনটি দলের উদ্ভব হয়। যথা - কাদারিয়া, জাবারিয়া ও আশ'আয়িরা। এর মধ্যে আশ'আরিয়াদের বক্তব্য 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' কর্তৃক সমর্থন লাভ করে। কাদরিয়াদের মতে মানুষের ইচ্ছা ও কাজ আল্লাহ্‌র কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং মানুষ নিজ ইচ্ছা ও নিজ কর্ম সম্পাদনে সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তির অধিকারী। কারণ মানুষের এ শক্তি স্বীকৃত না হলে তাকে ভাল বা মন্দ কাজের জন্য দায়ী করা যুক্তযুক্ত হয় না। অনুরূপভাবে সে যদি গ্রহন বর্জনের স্বাধীনতা না পায় তা হলে তার কাছে আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা এবং রাসূলদের প্রেরণের কোন সার্থকতা থাকে না। অনিবার্য কারণে মানুষের সকল কাজ কর্ম ও ইচ্ছার স্রষ্টা মানুষ নিজেই আল্লাহ্‌ নন। তারা বলে মানুষের ভালমন্দ সকল কাজের স্রষ্টা হিসাবে যদি আল্লাহ্‌কে জ্ঞান করা হয় তাহলে মন্দ কর্মও দুষ্কৃতির সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দিকে করতে হয়। অথচ এটি সমর্থনযোগ্য নয়।

জাবারিয়াদের মতে মানুষের ইচ্ছা ও কাজে নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে সে সম্পপূর্ণরূপে বন্দী। একান্ত একটি যন্ত্রের মত সে কাজ করে থাকে। তার নিজের কাজের জন্য সে দায়ী নয়। কারণ ইচ্ছা ও কাজের সকল কিছু পূর্ব থেকেই তার জন্য সুনির্ধারিত হয়ে আছে।

আশায়েরা তথা আহলে হকের মতে উপরোক্ত উভয় দলের বক্তব্য প্রান্তিকতার দোষে দুষ্ট। বাস্তব সত্য হল উভয় অভিমতের মাঝামাঝি। এ কারণ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন,

إن التكليف أمر بين البين لاَجَبر ولاَ تَفويض ولاَ إكراه ولاَ تسليط

মানুষকে শরীয়াতের মুকাল্লাফ বানানোর ব্যাপারটি মাঝামাঝি ধরণের একটি বিষয়। এখানে যেমন জবর সম্পূর্ণ ইখ্‌তিয়ার বিলুপ্তি নেই। তেমনি তাফবীয বা নিরংকুশ ইখ্‌তিয়ার ও নেই এখানে যেমন জবরদস্তি নেই তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতাও নেই। (তানযীমুল আশ্‌তাত)

আহলে হকের মতে মানুষকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইচ্ছা ও কর্মের এমন একটি শক্তি প্রদান করা হয়েছে যা খালক তথা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না তবে কাসব অর্থাৎ ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। পরিভাষায় এ শক্তিকে 'কুদরতে গায়রে মুস্তাকিল্লাহ্‌' (القدرة الغير المستقلة) বা কাসব বলা হয়। কাজেই মানুষের মধ্যে এই 'কুদরতে গায়রে মুস্তাকিল্লাহ্‌' বিদ্যামান আছে বলেই ভাল মন্দের জন্য তাকে দায়ী করা হয়। আবার কুদরতটি স্বয়ং সম্পূর্ণ না হওয়ার দরুন মানুষকে নিজ

www.pathagar.com

ইচ্ছা ও কর্মের খালিক বলে অভিহিতও করা হয় না। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে এ শক্তি আছে বিধায় তাকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন জড় পদার্থ বলে জ্ঞান করারও কোন অবকাশ নেই।

কাদারিয়াদের অভিমত খণ্ডন করে আহলে হক বলেন, কাদারিয়া মতবাদ মানষকে নিজ কর্মের স্রষ্টা বলে স্বীকার করতে হয়। অথচ স্রষ্টা হলেন একমাত্র আল্লাহ্। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন। ইরশাদ হচ্ছে خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা। কাজেই কাদরিয়্যা মতবাদ উক্ত আয়াতের বিরোধী বলে পরিত্যায্য। দ্বিতীয়ত মানুষকে যদি নিজ কর্মের স্রষ্টা বলা হয় তা হলে জগতে অসংখ্য স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নিতে হয় যা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। বস্তুত মানুষের দ্বারা কোন কাজ সম্পাদিত হওয়ার অনেকগুলি উপকরণ আছে। যেমন তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা শক্তি, কল্পনা, প্রয়োজনীয় উপাদান ইত্যাদি। এ সকল উপকরণ ও আয়োজনের স্রষ্টা সর্বসম্মতিক্রমে হলেন আল্লাহ্। তাতে কারুর দ্বিমত নেই। এমতাবস্থায় সম্পাদিত কর্মটির স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে না মেনে বান্দাহ্‌কে মানা হাস্যস্পদ বৈ কিছুই নয় ! কাদারিয়াগণ আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ এর নিসবত করতে সংকোচবোধ করে। আহলে হক বলেন, মন্দ জিনিষের সৃষ্টি করা দোষের কথা নয়। তবে মন্দ কাজ সম্পাদন দোষের বিষয়। ইব্‌লীস সকল মন্দ কাজের আধার। অথচ এই ইবলীসকে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন, তাতে কারুর কোন দ্বিমত নেই।

পক্ষান্তরে জাবরিয়াদের অভিমতের জবাব আহলে হক বলেন, মানুষকে সম্পূর্ণ শক্তি ও স্বাধীনতাহীন জ্ঞান করা হলে তাকে শরী'আতের মুকাল্লাফ বানানোর কোন অর্থ হতে পারে না। এ বিশ্বাস لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ সে ভালো যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই (২ ঃ ২৮৬) এবং "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ (৭৪ ঃ ৩৮) ইত্যাদি আয়াতে ঘোষিত মর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তা ছাড়া তাদের এ দর্শন অনুসারে মানুষ ও ইট পাথরের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না।

মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের প্রকৃতি

এ কথায় কারুর কোন দ্বিমত নেই যে, মানুষের মধ্যে একটি ইচ্ছা শক্তি ও একটি কর্ম সম্পাদন শক্তি বিদ্যমান আছে। তবে সে শক্তি প্রকৃতি কোন ধরণের তা নিয়েই মতপার্থক্য। কাদারিয়াদের মতে এ শক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং জাবারিয়াদের মতে সম্পূর্ণ অধীন। আর আহলে হকের মতে, এ শক্তি উভয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ের। কাদারিয়া দর্শনে মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলার মূল উদ্দেশ্যে হল আল্লাহ্‌র সত্তাকে মন্দ কর্মের নিসবত থেকে মুক্তি প্রদান করা। তারা বলেন, মানুষ ভালমন্দ সব ধরনের কাজের ইচ্ছা করে এবং সম্পাদন করে। যদি তার এ সকল কাজ কর্মের মূল কর্তা ও স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ্‌কে মানা হয় তা হলে পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজেই মন্দ কর্মের সম্পাদনকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছেন। অথচ তাঁর সত্তা সর্বপ্রকার দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সম্পর্কে এ ধারণা বজায় রাখার স্বার্থে কতিপয় পূর্ববর্তী কাদরিয়া মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের বিশ্লেষণ করে বলেন "ان لا قدر وان الأمر انف" তাক্দীর বলতে কিছুই নেই ; মানুষ যা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে করে। তার ভাল মন্দ কোন কাজের সহিত আল্লাহ্র কোনই সম্পর্ক নেই। এমনকি তিনি মানুষের কাজ সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে তা সম্পর্কে অবহিতও থাকেন না। কাজেই আল্লাহ্র সত্তা মন্দ কাজ করা বা না করার সহিত বিশেষিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বস্তুত পূর্ববর্তী কাদারিয়াদের এই অভিমতের কারণে আল্লাহ্র দোষমুক্ত করা গেল। কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে এখানে আল্লাহ্র সত্তার ব্যাপারে এ কথাও মেনে নিতে হল যে, তিনি তার সৃষ্টির কাজ কর্মের ব্যাপারে পূর্ব থেকে কিছুই জানেন না। বলা বাহুল্য মন্দ কাজের নিসবত অপেক্ষা জাহালত তথা অজ্ঞতার নিসবত অধিকতর নিকৃষ্ট। এ কারণে পরবর্তী কাদারিয়াগণ উপরোক্ত অভিমত বর্জন করে বলেন। আল্লাহ্র ইল্‌ম (জ্ঞান) হল, علم قديم، علم محيط চিরন্তন ও সর্বব্যাপী জ্ঞান। তিনি সৃষ্ট জগতের ঘটিত ও ঘটিতব্য সকল কিছু পূর্ব থেকেই সবিস্তারে জানেন। স্রষ্টা হিসাবে এ জ্ঞান তাঁর জন্য অনিবার্য। তবে তিনি সৃষ্টির ইচ্ছা ও কর্মের স্রষ্টা নন। মানুষ নিজেরা নিজেদের ইচ্ছা ও কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ্ শুধু মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের আয়োজন ও উপদানসমূহ সৃষ্টি করে দেন। তারপর মানুষ স্বেচ্ছায় সে আয়োজন ভাল কিংবা মন্দ কাজে ব্যবহার করে। যেহেতু মানুষ নিজ কর্মের স্রষ্টা নিজেই সেহেতু মন্দ কর্মের নিসবত আল্লাহ্র দিকে আর হল না। কাজেই আল্লাহ্ যাবতীয় মন্দের সম্পর্ক থেকে মুক্ত।

মুতাকাল্লিমীনের এ অভিমত ইচ্ছা ও কর্মের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট এ কথা মানার পর বান্দাকে নিজ কাজের খালিক তথা স্রষ্টা মনে করার কোন অবকাশ থাকে না। আর যদি বান্দাকে তার কাজের স্রষ্টা বলে মেনে নেওয়া হয়। তাতেও কাদারিয়াদের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না। কারণ তাদের লক্ষ্য হল আল্লাহ্র সত্তাকে দোষমুক্ত প্রমাণ করা। দোষের কাজ সৃষ্টি করা যদি অন্যায় হয় তবে দোষের কাজে সাহায্য করা কিংবা আয়োজন করে দেওয়া বা উপাদান যুগিয়ে দেওয়াও অবশ্যই অন্যায় হবে। এতএব মন্দ কাজের স্রষ্টা আল্লাহ্ না হলেও মন্দ কাজটির যাবতীয় উপাদন যুগিয়ে বক্তব্যকে কাদারিয়াদের মতবাদের অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে জাবারিয়া ধারণা মতে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। তাদের এ অভিমত অনুসারে আল্লাহ্র সর্বময় কর্তৃত্ব প্রমাণিত হচ্ছে বটে কিন্তু পাশাপাশি জাগতিক সকল ব্যবস্থাপনা মানুষের মধ্যে মু'মিন ও কাফিরের ব্যবধান করা রাসূল প্রেরণ, কিতাব অবতীর্ণ করা, আমলের হিসাব-নিকাশ, বেহেশ্‌ত, দোযখ সব কিছুই একটি সাজানো বিষয় ব্যতীত কিছুই থাকে না। এ মতবাদ অনুসারে জগতে মানুষকে শরী'আতের মুকাল্লাফ তথা দায়িত্ব বহনকারী বানানো যেমন অর্থহীন তেমনি নবী-রাসূলগণের সকল শ্রম সাধনা ও সম্পূর্ণ বেকার খাটুনী বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ এমন কথা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। এ ছাড়া যাবতীয় কাজে ওকর্মে মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ এটি সম্পূর্ণ বাতিল ও অবাস্তব। একথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, মানুষের কাজ কর্মগুলো যেমন হরকত

www.pathagar.com

দু'ধরনের হয়, ইচ্ছাধীন কাজ যা মানুষ নিজ ইখ্তিয়ারে করে থাকে। যেমন হাতের কলম। অপরটি হল অনিচ্ছাকৃত কাজ যা মানুষের ইখ্তিয়ারের বাইরে সংঘটিত হয়, যেমন- শীতের কারণে শরীর কেপে উঠে। এ দু'টি কাজের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাজেই দু'টিকে এক পর্যায়েই মনে করা এবং কাজ ও কর্মে মানুষের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা একটি সার্বজনীন সত্যের অস্বীকারের নামান্তর। মুতাকাল্লিমীন বলেন, শুধু মানুষই নয় সব জীবজন্তু ও ইচ্ছাধীন। কাজ ও ইচ্ছাধীন কাজের মধ্যে তারতম্য করতে পারে। যেমন কুকুরকে ঢিল ছোড়া হলে কুকুর ঢিলটির প্রতি তাকায় না বরং যে লোকটি ঢিল ছুড়েছে তার দিকে তাকায়। কারণ কুকুর জানে যে যদিও তার শরীরকে ঢিলটি স্পর্শ করেছে তবুও ঢিলের এ স্পর্শ করা নিজের ইচ্ছায় নয় বরং নিক্ষেপকারী লোকটির ইচ্ছায়। ফলে কুকুর নিক্ষেপকারীর গতিবিধিই লক্ষ্য করে অথচ ঢিলটি তার নিকটে নিরাপদে পড়ে থাকে। এতে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, কাজের ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দখল আছে। বাস্তবতার অনুভূতি মানুষ কেন জীবজন্তুর মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। কেবলমাত্র জাবরিয়াদের ধারণা তা স্বীকার করা হয়নি। এ থেকে জাবারিয়া মতবাদের অসারতাও ফুটে উঠে।

কাদারিয়া ও জাবরিয়া উভয়ের মাঝামাঝি অভিমত হল আহলে হকের। তাঁরা বলেন, মানুষের সকল কাজ কর্মের স্রষ্টা হলেন, মহান আল্লাহ্। তবে মানুষ নিজ কর্মের কাসিব অর্থাৎ সম্পাদকারী হওয়ার কারণেই তাকে নিজ কর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। তবে মানুষের এ কাসব শক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার ইরাদা ও কুদরতের অধীন। বস্তুত মানুষের কাজ কখনো কখনো এই অসম্পূর্ণ শক্তি (قدرت غير مستقلة) এর মাধ্যম ব্যতিরেকে ঘটে, তখন আমরা এটিকে অনিচ্ছাকৃত কাজ বলি। যেমন - শীতের কম্পন। আবার কখনো কখনো কাজটি সেই অসম্পূর্ণ শক্তির মাধ্যম ঘটে যেমন, হাত দিয়ে লিখা। তখন এটিকে ইচ্ছাধীন কাজ বলি। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই কাজটির মূল স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্। পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, প্রথমটি হলো তার সরাসরিভাবে সৃষ্টিকৃত আর দ্বিতীয়টি হল মানুষের অসম্পূর্ণ শক্তির মাধ্যম হয়ে কৃত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দিনের বেলায় সূর্যের রশ্মির ও রাতের বেলায় চন্দ্রের কিরণ উভয় একই উৎস থেকে নির্গত। পার্থক্য মানুষ অবলম্বন করাও না করার। দিনে এ আলো সূর্য থেকে সরাসরি বিচ্ছুরিত হয় বলে তাকে সূর্য রশ্মি বলে। উভয়ের নাম ছাড়া গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় আলোর উৎস যেমন সূর্য, তেমনি উভয় প্রকার কাজের স্রষ্টা ও আল্লাহ্। আবার চন্দ্রের মাধ্যমে আলোটি বিচ্ছুরিত হওয়ার দরুন যেমন নামের ক্ষেত্রে বরং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়ে থাকে। তেমনী আল্লাহ্র কুদরাতে মুস্তাকিল্লাহর মাধ্যম হয়ে প্রকাশ লাভ করে তখন কাজটির মানও গুণগত পার্থক্য এসে যায়। মানুষের এতটুকু সংযুক্তির কারণেই তাকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত আর মন্দ কাজের জন্য দন্ডিত করা হয়। বলা বাহুল্য আহলে হকের উপরোক্ত বক্তব্য হল সঠিক যথার্থ।

www.pathagar.com

মানব জীবনের তাক্‌দীরে বিশ্বাসের সুফল

তাক্‌দীরের উপর ঈমান আনার ব্যাপারটি কেবল দর্শনগত প্রয়োজনেই নয় বরং নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রেও এ বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিশ্বাস মানুষকে তার মানবীয় বহু দুর্বলতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং মানুষের নৈতিকতা ও মননশক্তির উন্নতি সাধনে অদ্ভুত শক্তি যুগিয়ে দেয়। যেমন -

ক. হর্ষোৎফুল্ল কিম্বা বিমর্ষিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা

মানুষের প্রকৃতি হল এমন যে, সে কোন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে নিজের ইচ্ছা ও শক্তির প্রয়োগ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে তার এ ইচ্ছা শক্তি আদৌ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও শক্তির অধীন। অথচ এ অসম্পূর্ণ ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োগের পর সফলতা অর্জিত হলে সে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠে আবার কখনো ব্যর্থতা দেখলে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মানব চরিত্রের এ দু'টি অবস্থাকে নীতি বিজ্ঞানীগণ নৈতিক দুর্বলতা এবং ত্রুটি বলে চিহ্নিত করেছেন। তাক্‌দীরে বিশ্বাস মানুষকে উভয় প্রকারের দুর্বলতা থেকে হিফাযত করে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষে এটি খবই সহজ কাজ। তা এ জন্য যে তোমার যা হারিয়েছে তাতে যেন তোমার বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তার কারণে হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে পসন্দ করেন না (৫৭ ঃ ২২-২৩)।

খ. কঠিন বিপদে মানসিক দুর্জেয় শক্তি লাভ

তাক্‌দীরে বিশ্বাসী মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর কোন বিপদে পড়ে গিয়েও কখনো মনোবল হারায় না। অধিকন্তু এ বিশ্বাস চরম বিপদেও মননশক্তিকে অধিকতর দৃঢ় করে তোলে। মু'মিন ব্যক্তি কোন বিপদে পতিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাক্‌দীরে বিশ্বাসের কথা স্বরণ করিয়ে দেন। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

www.pathagar.com

বল, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনি আমাদের কর্ম বিদায়ক আর আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত (৯ঃ ৫১)।

অপর এক আয়াতে এদিকে ইঙ্গীত করে আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشّٰكِرِيْنَ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرًا فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারু মৃত্যু হতে পারে না। কারণ মৃত্যুর মিয়াদ অবধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই। আর কেউ পরকালীন পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই। এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে আমি পুরস্কৃত করব। অনেক নবী যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে অনেক আল্লাহ্‌ওয়ালাও ছিলেন। আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা কখনো হীনবল হন নি, দুর্বল এবং নতও হন নি। আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদেরকে ভালবাসেন (৩ঃ ১৪৫-১৪৬)।

বলা বাহুল্য ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ ক্ষুদ্র শক্তির অবলম্বনে বিশ্বজোড়া বিজয় লাভ করেছিলেন সে বিজয়ের মূল উৎস ছিল এই আস্থাশীলতা ও মননশক্তি।

গ. গায়রুল্লাহ্‌র উপর নির্ভর না করে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা অর্জন

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল। তাই তুচ্ছ কোন বিপদের সময়েও কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা বোধ করলে সে দিকে সে সাহায্য পাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। অথচ জগতের সকল ভাল মন্দের মালিক হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষের এ দুর্বলতাই তাকে ধীরে ধীরে গায়রুল্লাহ্‌র দিকে নিয়ে যায়। তাক্‌দীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন মানুষকে তার এ দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল করে দেয়। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা.) -এর পিছনে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, সব সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখবে তা হলে তিনি তোমার তত্ত্বাবধান করবেন। আল্লাহ্‌কে স্মরণ রেখ যদি সকল মানুষ মিলেও তোমরা কোন কল্যাণ করতে ইচ্ছা কর, সে ক্ষেত্রে তোমরা তা করতে সক্ষম না। আর সকলে মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায় সে ক্ষেত্রেও তোমার তাক্‌দীরে নির্ধারিত জিনিসের বাইরে তারা কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। সব কিছুর লিখা শেষ করে তাক্‌দীরের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। লিখিত কাগজের কালিত শুকিয়ে গেছে।[1]

১. তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মাদ ও তরজমানু সুন্নাহ্, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯।

www.pathagar.com

তাক্দীরের সঙ্গে তাদ্বীরের কোন সংঘাত নেই

কার্য সম্পাদনের জন্য আসবাব তথা উপায় উপকরণ ইত্যাদির অবলম্বন করাকে পরিভাষায় তাদ্বীর বলে। এ তাদ্বীরের সঙ্গে তাক্দীরের কোন সংঘাত নেই। কার্য সম্পাদনের আসবাব গ্রহণ করা তাক্দীরে বিশ্বাস -এর পরিপন্থিও নয় আর অনাদিকালে লিপিবদ্ধ তাক্দীরে এ আসবাব অবলম্বন করার কথা লিখিত আছে। তাক্দীরে আস্থা রেখে আসবাবের অবলম্বন প্রসঙ্গে একবার সাহাবীগণ নবী করীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অসুস্থতার সময় ঔষধ ব্যবহার কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা ঢাল এর ব্যবহার তাক্দীরের লিখনকে খন্ডন করতে পারে কি ? উত্তরে নবী (সা.) ইরশাদ করেন, আসবাবের অবলম্বন করার বিষয়টিও তাক্দীরে লিপিবদ্ধের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ যেখানে এ কথা লেখা আছে যে, মানুষ ঔষধ ব্যবহার করে উপশম লাভ করবে কিম্বা ঢাল ব্যবহার দ্বারা শত্রুর আঘাত থেকে বেঁচে যাবে। কাজেই বুঝা যায় আসবাব গ্রহন তথা তাদ্বীরের ব্যাপারটিও তাক্দীরের অর্ন্তভূক্ত।[১]

হযরত শাহ্ ওয়ালী মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে তাক্দীর ও তাদ্বীরের মধ্যে বাস্তবে কোন সংঘাত নেই। সংঘাত তখন দেখা দিত যখন তাদ্বীরের বিষয়টি তাক্দীরের আওতা বহির্ভূত হত কিম্বা তাক্দীরের ব্যাপারটি অলিখিত থাকতো। তবে আপত নযরে উভয়ের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা যায়। এ বৈপরিত্যের সুন্দর সমন্বয় আমরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর কর্মপদ্ধতির মাঝে দেখতে পাই। তিনি নিজ সন্তানদেরকে মিসর অভিমুখে পাঠানোর সময় আপাত নযরে যে সংকট অনুভব করেছিলেন, তা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ইরশাদ করে ছিলেন,

يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ○

হে আমার পুত্রগণ ! তোমরা এক দ্বার দিয়ে মিসরে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে। সন্তানের প্রতি স্নেহ ভালবাসা ও তাদের প্রতি অন্যদের কুদৃষ্টি এড়ানোর লক্ষ্যে তিনি এ তাদ্বীর অবলম্বন করেন। অথচ পাশাপাশি তাক্দীর সম্পর্কেও অবহিত করে বলেন,

وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ○

(আমার এ তাদ্বীর অবলম্বন শুধু আত্ম প্রশান্তির জন্য নতুবা) আমি আল্লাহ্র বিধানের বিপরীতে তোমাদের জন্য কোন কিছুর করার শক্তি রাখি না। বিধান একমাত্র আল্লাহ্রই (১২ : ৬৭)।

তাক্দীরের লিপিবদ্ধতা

আহলে হকের আকীদা হল তাক্দীরের সকল বিষয় সৃষ্টির পূর্বেই স্থির অবস্থায় আছে। কারণ একখানা হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, সর্বাগ্রে আল্লাহ্ পাক কলমকে সৃষ্টি

১. তরমানুস্ সুন্নাহ্, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯।

www.pathagar.com

করেন। এর পর তাকে নির্দেশ দেন যে 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ্ বললেন, কাদ্রকে লেখ। তখন কলম যা ঘটেছে এবং যা ঘটবে সবকিছু লিখে নিল।[১]

তবে এখানে প্রশ্ন উঠে যে সব কিছু পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ থাকেন পবিত্র কুরআনের বাণী كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَـأْنٍ প্রত্যেহ তিনি নতুন ভূমিকায় আছেন (৫৫ ঃ ২৯) এ আয়াতের তাৎপর্য কি হবে? উত্তরে বলা হয় যে আয়াতটির অর্থ হল شئون يبديها لا شئون يبديها আল্লাহ্ পাক প্রত্যহ নতুন নতুন ভূমিকা অবলম্বন করেন তা নয় বরং স্থিরকৃত বিষয়গুলির তিনি প্রত্যহ নতুনভাবে প্রকাশ করেন।[২]

তাক্দীরের লিপিবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কবে সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মহান আল্লাহ্ সমুদয় সৃষ্টির যাবতীয় তাক্দীর লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর আরশ পানির উপর ছিল।[৩]

এটি হল, প্রথমবার লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা। নতুবা পরে অনুরূপ লিপিবদ্ধ হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। হাফিয ইব্নুল কায়্যিম (র.) তাক্দীর সর্বমোট পাঁচ বার লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমবারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল আসমান যমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার পূর্বে। দ্বিতীয়বার লিপিবদ্ধ হয় আসামন যমীন সৃষ্টির পর আওলাদে আদম সৃষ্টির পূর্বে। হাদীসে মীসাক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তৃতীয়বার লিপিবদ্ধ হয় প্রত্যেক মানুষের জন্য তার মাতৃগর্ভ অবস্থান কালে। আর চতুর্থবার লেখা হয় প্রতি বছর একবার করে 'লাইলাতুল কাদ্রে'। পঞ্চমবারে লিপিবদ্ধ করা হয় দৈনিক একবার করে। বলা বাহুল্য আল্লাহ্র বাণী كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ কথাটির দ্বারা পঞ্চমবারের কথা বুঝানো হয়েছে।[৪]

উল্লেখ্য যে বারবার লেখার দ্বারা মূল বিষয়ে কোন পরিবর্তন আনা হয় না। তবে প্রত্যেক পরবর্তী বারে পূর্ববর্তী বার অপেক্ষা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

তাক্দীর দ্বারা ওযর পেশ করা যায় না তবে পানাহ্ গ্রহণ করা যায়

নাফরমানী অবলম্বনের জন্য তাক্দীরকে ওযর হিসাবে পেশ করা যাবে না। কারণ পৃথিবীতে মানুষকে নিজ ইচ্ছা ও নিজ কর্ম সম্পাদনে ইখ্তিয়ার দেওয়া আছে। এখানে সে ভাল মন্দ উপকারী অপকারী সব ধরণের কাজের কাস্ব করার শক্তি রাখে। ইচ্ছার প্রয়োগ ও সাধ্য ব্যয়ের পূর্বে এখানে তার অক্ষমতা প্রকাশ পায় না। এই নিরিখেই মানুষকে শরী'আতের মুকাল্লাফ বানানো হয়েছে। কাজেই এখানে তাক্দীরের ওযর পেশ করে কোন প্রকার অবাধ্যতা অবলম্বন বস্তুত নিজকে জাবারিয়াদের মত অক্ষম ও মজবূর বলে দাবী করারই নামান্তর। অবাধ্যতার কাজে তাক্দীরকে ওযর হিসাব পেশ করা অবৈধ হওয়ার বিষয়টি একটি হাদীস

১. তরজমানুস্ সুন্নাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪। ২. ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৬। ৩. মুসলিম ও তরজমানুস্ সুন্নাহ্, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬। ৪. শিফাউল আলীল, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

থেকেও বুঝা যায়। যেমন হযরত আলী (রা.) বলেন, একদা রাত্রি কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে আগমন করে বললেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ নামায পড় না। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের প্রাণগুলি তো আল্লাহ্ তা'আলারই হাতের মুঠোয়। তিনি যখন আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠাতে চাহেন তখন উঠাবেন। এ শুনে নবী (সা.) ফিরে চললেন। আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। ফেরার সময় আমি দেখলাম, তিনি নিজি উরুতে হাত মেরে এ কথা বলছেন وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا আর মানুষের প্রকৃতি হল যে, সে বড়ই ঝগড়াটে। (رواه البخاري والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات)[১]

সারকথা হল, নবী (আ.) হযরত আলী (রা.) -এর উত্থাপিত এ ওযরকে পসন্দ করেন নি।

পক্ষান্তরে মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ ও সম্পূর্ণ চেষ্টার পর ব্যর্থ হলে কিম্বা কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে তখন তাক্দীরের আশ্রয় গ্রহণ করা জায়িয। কারণ এ মুহূর্তে তাক্দীরে আশ্রয় অবলম্বন করার অর্থ হল, 'রিযা বিল কাযা' অর্থাৎ আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া। বিপদ কিম্বা জটিল কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাক্দীরের আশ্রয় গ্রহন করাকে কতিপয় আলিম সুন্নাতে আদম (আ.) বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, একবার আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হযরত আদম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে বিতর্ক হল। এ বির্তকে হযরত আদম (আ.) হযরত মূসার (আ.) উপর জয়ী হন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি তো সেই আদম যাঁকে মহান আল্লাহ্ নিজের পবিত্র হাতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর নিজের পক্ষ থেকে আপনার মধ্যে আত্মা ফুঁকিয়ে দেন। আপনার সম্মানার্থে নিজের ফিরিশ্তাদেরকে সিজ্দাবনত করান। আপনাকে নিজের তৈরী বেহেশ্তে অবস্থান করতে দেন। অথচ আপনি নিজের একটি ভুলের কারণে গোটা মানব জাতিকে যমীনে নামিয়ে দিলেন। কথাগুলো শুনে হযরত আদম (আ.) বললেন, আচ্ছা তুমিও কি সেই মূসা যাকে মহান আল্লাহ্ নিজের রিসালাত দ্বারা ভূষিত করেছেন। নিজের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য দান করেছেন। তুমি কী সেই মূসা যাকে আল্লাহ্ তাওরাত দান করেছেন, যেখানে সকল কথা সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে? আবার তোমাকে তাঁর সঙ্গে চুপিসারে কথা বলারও সুযোগ দিয়েছেন? তা হলে আমাকে বল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সেই তাওরাত আমাকে সৃষ্টির কতদিন পূর্বে লিখেছিলেন? মূসা (আ.) বললেন, চল্লিশ বছর পূর্বে। আদম (আ.) বললেন, তবে কি তুমি সেখানে এ কথাটি পেয়েছে وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ আদম তাঁর রবের নির্দেশ অমান্য করবেন। ফলে তিনি ভ্রমে পতিত হলেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ। হযরত আদম বললেন, তবে কি তুমি আমাকে এমন একটি কাজের দায়ে তিরস্কার করছ যে কাজটি আমি করব বলে আল্লাহ্ পাক আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বেই লিখে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এ কথায় হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-র উপর জয়ী হয়ে যান (মুসলিম)।

---

১. তরজমানুস্ সুন্নাহ্, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮।

www.pathagar.com

তাক্‌দীর সম্পর্কীয় বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সকলের জন্য নিরাপদ নয়

তাক্‌দীর তথা 'কাযা ও কাদ্‌র' বিষয়ে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান কিম্বা বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সকলের জন্য নিরাপদ নয়। কারণ এটি মানবীয় বিবেক শক্তির একটি বিষয়। কাজেই এ ব্যাপারে শুধু ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে এ বিতর্ক মানুষকে গোমরাহী এক কুফর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিকট আগমন করেন। এ সময় আমরা তাক্‌দীর সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এতে তিনি এমন রাগন্বিত হলেন যে, তাঁর মুবারক মুখমণ্ডল লাল হয়ে গিয়েছিল যেন ডালিমের রশ মেখে দেওয়া হয়েছে। তারপর বললেন, তোমাদের কি এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথবা আমাকে এ বিষয় তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে ? মনে রেখ,পূর্ববর্তী জাতিগুলো তখনই ধ্বংস হয়েছিল যখন তারা এসব বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল! কাজেই তোমাদেরকে আমি কঠোরভাবে বলছি, এ ব্যাপারে তোমরা আলোচনা পর্যালোচনা কিম্বা বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না (তিরমিযী)।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিয়ামত ও আখিরাতের উপর ঈমান

কিয়ামত ও আখিরাতের অর্থ

কিয়ামত শব্দটি 'قوم' ধাতু থেকে গঠিত। 'قيام' শব্দমূলের অর্থ হল,উঠে দাঁড়ানো সোজা হয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি। 'কিয়ামত' শব্দটি 'ইয়াওম' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। 'ইয়াওমুল কিয়ামা'-এর অর্থ হল,পুনরুত্থানের দিন। তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের অর্থ পুনরুত্থানের দিন, যে দীন সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে (লিসানুল আরব, ১২ খণ্ড, পৃ-৫০৬)।

ইমাম রাগিব ইস্‌ফাহানীর 'আল মুফরাদাত' গ্রন্থের ৪১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার নাম 'কিয়ামত'। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে 'وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ'(যে দিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে)। পরিভাষায় জগতের প্রলয়ের জন্য প্রথমবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া থেকে জান্নাতবাসীগণের জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নামীদের জাহান্নামে গিয়ে স্থির হওয়া পর্যন্ত সময়কে 'ইয়ামুল কিয়ামত' বা কিয়ামত দিবস বলে। কুরআন ও হাদীসের মর্মে এ দিনটি পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হবে বলে জানা যায়। যেহেতু এ দিবসে সিঙ্গার ফুৎকার, মহা প্রলয় ঘটানো, কবর থেকে উত্থান, আল্লাহ্‌র সম্মুখে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, আমল নামা গ্রহণ, পুলসিরাত অতিক্রম করা ইত্যাদি অনেক কাজ সংগঠিত হবে। সে জন্য এদিন টিকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন-'ইয়াওমুদ্দীন'(কর্মফল দিবস),'ইয়াওমুল হাক্কাহ্'(অবশ্যম্ভাবী দিবস),'ইয়ামুল কারীয়া'(আঘাতকারী দিবস),'ইয়াওমুল হিসাব'(হিসাব দিবস),'ইয়াওমুল বা'স'(পুনরুত্থান দিবস),'ইয়াওমুল আখিরাত'(শেষ দিবস), ইত্যাদি। এধরণের বহু নাম ব্যাবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে দিবসটির ভয়াবহতা ও বিভিন্ন অবস্থার চিত্র তুলে ধরা।[১]

'আখিরাত' শব্দের অর্থ হল পরকাল। এটি সাধারণত 'আল-হায়াত' কিম্বা 'আদ্দার'-এর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ (পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন) (২৯ ঃ ৬৪)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ তবে কি তোমরা পরজীবনের পরিবর্তে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়েছে (৯ ঃ ৩৮)।

---

১. সীরাতুন্নবী (সা.) ঃ শিবলী নোমানী, ৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৬)।

www.pathagar.com

আবার কখনো 'موصوف' উল্লেখ ব্যতিরেকে ব্যবহার হয়। যেমন ঃ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ আর পারকালের উপর যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী (২ ঃ ৪)।

পরিভাষায় 'আখিরাত' বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকালের দীর্ঘ সময়কে বুঝায়। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মহাপ্রলয়, সিঙ্গায় ফুৎকার, পুনরুত্থান হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম সবকিছুই অর্ন্তভূক্ত। ফলে অনেক সময় 'কিয়ামত' বলে আখিরাত আবার 'আখিরাত' বলে কিয়ামতের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কিয়ামত অপেক্ষা আখিরাত শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। কারণ জান্নাত কিম্বা জাহান্নামে প্রবেশের পরবর্তী জীবন আখিরাতের অর্ন্তভূক্ত। কিন্তু আখিরাত ইয়াওমুল কিয়ামার অর্ন্তভূক্ত নয়।

আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখার অপরিহার্যতা

আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখা ইসলামের মৌখিক আকীদা সমূহের এ অন্যতম। এ আকীদা ব্যতিরেকে ঈমান বিশুদ্ধ হয় না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ আর যারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে (২ ঃ ৪)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ ○

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পূণ্য নেই কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরিশ্তাগণ, কিতাব সমূহে এবং নীবগণের উপর ঈমান আনয়ন করাতে (২ ঃ ১৭৭)।

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○

আর কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তা কিতাব তাঁর রাসূল এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করলে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে (৪ ঃ ১৩৬)।

তাছাড়া ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও আদর্শের উপর নিজকে সুদৃঢ় রাখার জন্যও আখিরাতের উপর ঈমান রাখা অপরিহার্য। কারণ মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন শুরু হবে এবং সে জীবনে পুরস্কার কিম্বা তিরস্কার, সফলতা কিম্বা ব্যর্থতা কাজ কর্মের উপর নির্ভরশীল। এ

www.pathagar.com

কথার বিশ্বাসই মানুষকে ইহলোকে সত্যকে বিশ্বাস করা ও সত্যের অনুসরণ করার প্রেরণা যোগায়। কাজেই তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস ও অনুসরণ যথার্থ রাখার প্রয়োজনেও আখিরাতের প্রতি ঈমান একান্ত আবশ্যক। আখিরাতের প্রতি ঈমান মানব মনে সত্যের প্রতি আনুগত্য ও অসত্যের প্রতি বিরাগ জন্ম দেয়।

নিম্নোক্ত আয়াতে এ প্রসংগে ইরশাদ হয়েছে,

اِلٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْـنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْـكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

এক ইলাহ্ তিনিই তোমাদেরই ইলাহ্। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী (১৬ঃ ২২)।

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট বলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন ব্যতিরেকে কেউ মু'মিন হতে পারে না।

আখিরাত ও পরকাল সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মে পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এ সকল ধর্মমত অনুসারে পরকালের স্বরূপ বর্ণনায় বিভিন্নতা থাকলেও একমাত্র গ্রীক দর্শন ও আধুনিক প্রকৃতিবাদীগণ ব্যতীত কেউ পরকালকে অস্বীকার করে না। গ্রীক দার্শনিকগণ বলেন, পরকাল তথা মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান অসম্ভব। কারণ মানুষকে পুনরুত্থিত করতে হলে তার বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুনরুজ্জীবিত করা আবশ্যক। আর বিলুপ্ত (مَعْدُوْم) বস্তুর পুনঃ সৃষ্টি অসম্ভব। কাজেই মানুষকে পুনরুত্থিত করার বিষয়টিও সম্ভব নয়।

গ্রীক দার্শনিকদের জবাবে বলা হয় যে, পুনরুত্থানকে অস্বীকারের জন্য উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়। বস্তুত ইসলামের বক্তব্যের সঙ্গে দার্শনিকদের উপরোক্ত বক্তব্যের কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা এখানে সশরীরে পুনরুত্থিত হওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ্ মানুষকে তার শরীরের মূল অংশগুলিকে (اجزائه الأصلية) একত্রিত করবেন এবং তাতে আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটাবেন। এটা দার্শনিকদের বক্তব্যে উল্লেখিত বিলুপ্তির পর সৃষ্টি (إعادة المعدوم) নয়।[১]

পুনরুত্থান ও আখিরাত বিশ্বাসকে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও বহু হাদীসে এ কথার প্রমাণ বিদ্যমান।

ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

তারপর তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত করা হবে (২৩ঃ ২৬)।

---

১. শরহে আকাইদে নাসাফী, পৃ.৯৬-৯৭।

www.pathagar.com

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ٥

যে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় আর বলে মানব অস্থি পচে গলে নিঃশেষ হওয়ার পর কে তাতে প্রাণের সঞ্চার করবে? আপনি বলুন, তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করবেন সেই মহান সত্তা যিনি একে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত (৩৬ : ৭৮-৭৯)।

পরকালের সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণাদী

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পুনরুত্থান ও পরকালের সম্ভাবনা এবং পারলৌকিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত কুরআন অবতীর্ণ কালীন আরবের লোকেরা পরকাল সম্পর্কে অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল বলে বিষয়টির সম্ভাবনা ও বাস্তবতার কথা বিভিন্ন-ভাবে উপস্থাপিত হয়। জাহেলী আরবদের উক্তি ছিল নিম্নরূপ :

يحدثنا النبى بان يحى * وكيف حياة اصداء وهام

এ নবী আমাদেরকে বলেন যে আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা হবে। অথচ অস্থিমজ্জা পচে গলে নিঃশেষ হওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কি করে সম্ভব।[১]

পবিত্র কুরআনের ও তাদের উক্তি উল্লেখ আছে যে,

وَقَالُوْٓا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ٥

তারা বলে আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার পরেও নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবে (১৭ : ৪৯)।

পরকাল অনস্বীকার্য। কেননা, পরকালকে স্বীকার না করা হলে মানুষের গোটা জীবনটাই অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। কারণ জীবন প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ ভালমন্দ অনেক কাজ করে। এ সকল কাজের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর পরও যুগ যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতএব মানুষকে যদি এ সকল কাজ কর্মের ফলাফল ভোগ করতে না হয় অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মানব জীবন একেবারেই খেলো ও আসার হয়ে পড়ে। মানব জীবনের যাবতীয় কাজের চূড়ান্ত ফলাফল প্রদান ইহলোকে সম্ভব নয়। কারণ ইহলোকের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে স্বাধীনভাবেও স্বেচ্ছায় কাজ-কর্ম করার শক্তি রাখে। কাজেই সুষ্ঠু বিবেকের দাবী হল, মানুষের জন্য এ জগতের বাইরে আরেকটি জীবন থাকতে হবে যে জীবনে তাকে পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ও ইনসাফের সাথে

১. সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, বাবুল হিজরত, পৃ ৫৫৮।

www.pathagar.com

ভালমন্দের বিচার ও সমুচিৎ প্রতিদান প্রদান করা হবে। সুষ্ঠু বিবেক সমর্থিত সেই জীবনকেই ইসলাম পরকাল বা আখিরাত বলে। পবিত্র কুরআনে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে,

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ ٥

তোমরা কি মনে করে যে আমি তোমাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না (২৩ ঃ ১১৫)।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ وَمَاخَلَقْنَا هُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ٥

আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। আমি এ গুলিকে অযথা সৃষ্টি করি নি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস (৪৪ ঃ ৩৮-৪০)।

নীতি শাস্ত্রের দাবী অনুসারেও পালৌকিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। কারণ ন্যায়-অন্যায় এবং ভাল-মন্দের পরিণতি কখনো অভিন্ন বলে মেনে নেওয়া যায় না। মৃত্যুর পর মানুষকে আরেকটি জীবনের সত্যতা স্বীকার না করা হলে ন্যায়নীতি উপেক্ষিত হতে বাধ্য।

পবিত্র কুরআনে আছে,

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ٥

দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে আমি তাদেরকে সে সকল মানুষের সমান গণ্য করব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। দেখ, তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (৪৫ ঃ ২১)।

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা কিম্বা কবরে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর পুণরায় জীবন লাভ করাকে অসম্ভব বলে কল্পনা করাও যুক্তিহীন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط

তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন এরপর তিনিই একে সৃষ্টি করবেন পুণর্বার। এটি তাঁর পক্ষে অতি সহজ (৩০-২৭)।

ইরশাদ হচ্ছে,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ.....(الاٰية)

www.pathagar.com

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ন হও, তবে অনুধাবন কর যে, আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি সামান্য মাটি থেকে। তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাকা হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি কিম্বা অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌ত পিন্ড হতে..... তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি যেন পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারুর মৃত্যু ঘটানো হয় আবার কাউকে পরিণত করা হয় হীনতম বয়সে। ..... তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা শষ্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এসব হল এ কথা বোঝানোর জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন। এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ্ নিশ্চই পুনরুত্থিত করবেন (২২ঃ ৫-৭)।

নবী করীম (সা.) কিয়ামতের কতিপয় পূর্ব লক্ষণের কথা বলে গিয়েছেন। ইসলামের পরিভাষায় এগুলিকে 'আশরাতুস্ সা'আ' কিম্বা আলামতে কিয়ামত বলা হয়।

আলামত দু'প্রকারের ঃ

সুগ্‌রা তথা ছোট আলামত ও কুব্‌রা তথা বড় আলামত।

আলামতে সুগ্‌রা

যেমন-হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ হচ্ছে ইল্‌মে দীনের চর্চা হ্রাস পাবে, দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যভিচারের সংখ্যা বেড়ে যাবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে মহিলাদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি হবে যে প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য মাত্র একজন পুরুষ থাকবে (বুখারী ও মুসলিম)।

অপর একখানা হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, যখন লোকেরা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিকে নিজের সম্পদে পরিণত করবে, আমানতের মালকে গনীমত বলে মনে করবে, যাকাত প্রদানকে জরিমানা মনে করবে, দীনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইল্‌ম হাসিল করা হবে, স্বামী তার স্ত্রীর তাবেদারী করবে এবং নিজ জননীর অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধকে ঘনিষ্ঠ করে নিবে, আর পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদের মধ্যে শোরগোল প্রকাশ পাবে, সমাজের ফাসিক লোকজন সমাজের নেতৃত্ব দিবে, নিকৃষ্ট লোক দেশের কর্ণধার হবে। অনিষ্টতার আশংকায় মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে ব্যাপকতর হবে, মদ্যপান ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং এ উম্মাতের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের নিন্দায় মুখরিত হবে। তখন তোমরা প্রতীক্ষায় থাকবে অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমিধস, আকৃতি পরিবর্তন, প্রস্তর বৃষ্টি এবং ক্রমাগত ভয়াবহ আলামত সমূহের।যেমন,মালার সূতা ছিড়ে গেলে একের পর এই তার দানা পড়তে থাকে (তিরমিযী ও মিশ্‌কাত)।

আলামাতে কুব্‌রা

দশটি বিষয়কে আলামাতে কুব্‌রা তথা কিয়ামতের বড় বড় পূর্ব লক্ষণ মনে করা হয়। হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন উসাইদ গিফারী (রা.) বর্ণিত হাদীসে বিষয়গুলি একসঙ্গে উল্লেখিত আছে। তিনি বলেন, একদা আমরা কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় নবী করীম (সা.) আমাদের সম্মুখে তাশরীফ আনলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি বিষয়ে কথাবার্তা বলছ? আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে। তিনি বললেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি পূর্ব লক্ষণ দেখতে পাবে। এরপর তিনি লক্ষণগুলি উল্লেখ করেন যে, এগুলি হল দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম গগনে সূর্যোদয়, হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণ, ইয়াজূয মাজূয এর বহিঃপ্রকাশ, তিনটি ভুমিধস একটি প্রাচ্যে একটি পাশ্চাত্যে এবং একটি অবশেষে আরব দেশে। অবশেষে ইয়ামান থেকে উত্থিত একটি অগ্নি যা তাদের সমবেত হওয়ার স্থানে যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ফিতান) অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যখন 'আল্লাহ্' বলার মত কোন লোক থাকবে না অর্থাৎ ঈমানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে (মুসলিম)।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রসঙ্গ

আরবী ভাষায় 'আল-মাহ্‌দী' শব্দের অর্থ হল 'পথ প্রদর্শিত ব্যক্তি'। এখানে 'মাহ্‌দী' বলে কিয়ামতের প্রাক্কালে হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণ ও দাজ্জালের প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে মুসলিম নেতৃত্বের জন্য যে সংস্কারক মনীষীর অবির্ভাবের কথা আছে তাঁকেই বুঝানো হয়েছে। মুহাক্কিক আলিমগণের মতে কিয়ামতের প্রাক্কালে ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব সত্য। বহু সহীহ্ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ আরবের আধিপত্য এমন এ ব্যক্তির (মাহ্‌দী) আবির্ভাব না ঘটবে যে আমারই বংশের একজন এবং আমার নামে হবে তাঁর নাম (তিরমিযী শরীফ)।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) আরো বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মাতের শেষকালে মাহ্‌দীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর শাসনামলে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ভুমি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তিনি সকলের মধ্যে প্রয়োজনীয় রসদ সমানভাবে বন্টন করে দিবেন। পশু সম্পদের বৃদ্ধি ঘটবে। পৃথিবীতে এ উম্মাত তখন অতি সম্মানের অধিকারী হবে। সাত আট বছর পর্যন্ত এভাবে চলবে।[১]

অপর একখানা হাদীসে হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.) যখন অবতরণ করবেন তখন ইমাম মাহ্‌দী দেখতে পাবেন যেন তাঁর মাথার চুল থেকে পানি ঝরছে। মাহ্‌দী তখন তাঁকে বলবেন, আসুন এবং নামাযের

১. হাকিম, তরজমানুস সুন্নাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ- ৩৯১)।

www.pathagar.com

ইমামত করুন। হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, আপনি নামায পড়াবেন বলে ইকামত হয়ে গেছে কাজেই আপনিই নামায পড়ান। নবী করীম (সা.) বলেন, এ কথা বলে হযরত ঈসা (আ.)তখন আমার পরবর্তী বংশধরের একজনের পেছনে নামায আদায় করবেন।[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, সে কালে তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে হযরত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.) অবতরণ করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন তোমাদের ইমাম হবেন।[২]

এভাবে বহু সহীহ্ হাদীসে কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমণের কথা উল্লেখ আছে। 'শরহে আকীদায়ে সাকারীনী' কিতাবে ইমাম মাহদী বিষয়ক হাদীসগুলিকে মুতাওয়াতির মানুবী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উপরন্তু এ আকীদা পোষণ করাকে আহলে সুন্নাত আল-জামা'আতের পরিচায়ক বলে গণ্য করেছেন। (পৃষ্ঠা ৭৯-৮০)।

ইমাম মাহ্দীর পরিচয়

ইমাম মাহদীর পরিচয় কি এ ব্যাপারে ইস্‌না আশারীয়া, শী'আ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ইস্‌না আশারীয়া শী'আদের মতে হাদীসে বর্ণিত মাহদী হলেন তাদের দ্বাদশতম ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান আল-আসকারী। তিনি ২০৬ হিজরী সন থেকে শত্রুদের ভয়ে ভূগর্ভস্ত একটি গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। কিয়ামতে পূর্ব মুহূর্তে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এবং পৃথিবীতে ইনসাফের শাসন কায়েম করবেন (নিবরাস, পৃ ৩১৪)।

শী'আদের মতে বর্ণিত মাহদী আন্যান্য ইমামদের মত নিষ্পাপ ও সর্বপ্রকার ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষিত হবেন।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মতে মাহদী শী'আদের বর্ণিত পরিচয় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ সহীহ্ হাদীসে ইমাম মাহদীর নাম, পিতার নাম, দৈহিক গঠন, আকৃতি, কাজ-কর্ম ইত্যাদির যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কথিত শী'আ ইমামের আদৌ কোন মিল নেই। যেমন শী'আ ইমামের নাম হল মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান। আর হাদীসে বলা হয়েছে মাহদীর নাম হবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। আরো বলা হয়েছে, তিনি কিয়ামতের প্রাক্কালে হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ ও দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় আসবেন অথচ শী'আদের দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান আসকারী হিজরী তৃতীয় শতকেই জন্মগ্রহণ করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের সমূহকে ইমাম মাহদীর পরিচয় সম্বন্ধে নিম্মোক্ত অভিমত পোষণ করে থাকেন। যথা তিনি সাইয়িদ বংশ হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বংশ থেকে হবেন। শরীরিক গঠন সামান্য লম্বা বিশিষ্ট দেহ উজ্জ্বল বর্ণের হবে। চেহারার আকৃতি নবী (সা.) -এর আকৃতির মত হবে। নাম মুহাম্মদ ও পিতার নাম হবে

১. তরজমানুস্ সুন্নাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৯৯।
২. বুখারী, মুসলিম ও তরজমানুস্ সুন্নাহ্ , ৩খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৮)।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্। মাতার নাম হবে আমিনা। তবে সাইয়িদ বরঞ্জী তাঁর 'আল-ইশাআত' পুস্তিকায় বলেন; ইমাম মাহদীর মাতার নাম সম্পর্কে সরাসরি কোন হাদীস পাওয়া যায়নি। তার মুখে মৃদু জড়তা থাকবে। সে কারণে মাঝে মাঝে মনক্ষুন্ন হয়ে উরুর উপর হাত মারবেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি ইল্মে লাদূনী প্রাপ্ত হবেন।[১]

শাহ রফী উদ্দিন (র.) আরো বলেন মুসলমানদের বাদশাহ শহীদ হওয়ার পর সিরিয়া খৃষ্টানদের কাতারে চলে যাবে এবং খৃস্টান বিবাদমান দু'দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে। অবশিষ্ট মুসলমানরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। খৃস্টানদের আধিপত্য খাইবার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এ সময় মুসলামনগণ ইমাম মাহদীর সন্ধান করতে থাকবে। যেন তাঁর নেতৃত্বে আপাতত সমস্যা থেকে মুক্তি ও শত্রুদের হাত থেকে রেহাই লাভ করতে পারে।

এ অবস্থা চলাকালীন সময় ইমাম মাহদী মদীনাতেই অবস্থানরত থাকবেন। কিন্তু তিনি যিম্মাদারী অর্পিত হওয়ার আশংকায় মক্কা শরীফ চলে যাবেন। সেখানেও তৎকালের অলী আবদালগণ ইমাম মাহদীর সন্ধান চালাতে থাকবে। ইত্যবসরে কতিপয় ব্যক্তি নিজেদেরকে মাহদী বলে মিথ্যা দাবী করতে থাকবে। ইতিমধ্যে একদিন রুকন ও মাকামে ইব্রাহীমের সাথে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফের মুহূর্তে লোকজন তাঁকে চিনে ফেলবে এবং তাঁর হাতে বাই'আতের জন্য তাঁকে বাধ্য করবে। এ ঘটনার সত্য হওয়ার একটি চিহ্ন হবে এমন যে যার পূর্বকার রামাযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে এবং বায়'আতের মুহূর্তে অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসবে যে,

هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِى فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْهُ.

আওয়াজটি সেখান থেকে সকলেই শুনতে পাবে। বাই'আতের সময় ইমাম মাহদীর বয়স হবে চল্লিশ বছর। তাঁর খিলাফত গ্রহণের সংবাদ মদীনায় পৌছলে মদীনার সৈন্যগণ মক্কায় ছুটে আসবে। সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামেনের বুযর্গানে দীন তাঁর সান্নিধ্যে এসে একত্রিত হবেন। তাঁদেরকে নিয়ে তিনি অসংখ্য সেনাবাহিনীর একটি দল গঠন করবেন এবং কা'বা শরীফের মাটির নীচে রক্ষিত ভাণ্ডার তুলে এনে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।[২]

সুন্নী মতে বর্ণিত উপরোক্ত মাহদীর জীবনের সঙ্গে শী'আদের দ্বাদশতম ইমামের জীবনের কোন মিল নেই। শী'আরা অবশ্য তাদের ইমামদের সুদীর্ঘ জীবন কালের কথা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তৃতীয় শতকে জন্ম নিলেও কিয়ামত পূর্বকাল পর্যন্ত বেঁচে আছেন। বলা বাহুল্য এ সকল উক্তি প্রমাণহীন এবং সত্যের অপলাপ বৈ কিছুই নয়।[৩]

---

১. আলামতে কিয়ামত, শাহ্ রফী উদ্দীন ও তরজমানুস্ সুন্নাহ্, ৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২।
২. আলামাতে কিয়ামত, শাহ রফী উদ্দীন, তরজমানুস্ সুন্নাহ্, ৪খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৭২।
৩. শরহে আকাইদ, পৃষ্ঠা-১৪।

www.pathagar.com

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ কিয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম আলামত। দাজ্জাল মাসীহ্ এবং কায্যাব নামও করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'দাজ্জাল' শব্দটি 'دجل' প্রতারণা করা থেকে গৃহীত। সে মতে এর অর্থ হল প্রতারক, মহা প্রবঞ্চক। দাজ্জাল সত্য এবং মিথ্যা, হক এবং বাতিলের মধ্যে চরম প্রতারণা করবে বলেই তাকে দাজ্জাল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থগুলোতে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) 'আত্ তাযাকিরা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) থেকে দাজ্জাল সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে,। যেমন দাজ্জালের প্রকৃত পরিচয়, আত্মপ্রকাশের কারণ, আত্মপ্রকাশের জায়গা, চেহারার গঠন আকৃতি, চরিত্র, যাদুকরী কার্যকলাপ, খোদায়ীত্বের দাবী, তার হত্যাকারীর পরিচয়, হত্যার স্থান, কাল ইত্যাদি সবই নবী (সা.) -এর হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। এমন কি দাজ্জাল কি ইব্ন সাইয়াদ নামক লোকটি ছিল না অন্য কেউ তাও পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১]

পবিত্র হাদীসে দাজ্জাল আকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, তার দেহ স্থুল, বর্ণ লোহিত, কেশ কুঞ্চিত ও বাম চোখ কানা হবে। কানা চোখটি একটি ফুলে উঠা আঙ্গুলের মত দেখাবে (বুখারী)।

দাজ্জালের কপালে আরবী ভাষায় 'কাফির' শব্দটি লিখিত থাকবে এবং তা কেবল মু'মিনগণই দেখতে পাবে। (বুখারী) দাজ্জাল খুরাসান থেকে বের হবে (ইব্ন মাজা)।

তার বের হওয়ার পূর্বে একাধারে তিন বছর ফসল উৎপাদিত না হওয়ার কারণে ভীষণ দুর্ভিক্ষ থাকবে (আহ্মাদ)।

দাজ্জালের কোন সন্তান সন্ততি হবে না (মুসলিম)।

তার অনুসারীরা হবে ইয়াহূদী। (মুসলিম) মুনাফিকরাও তার অনুসরণ করবে (আহ্মাদ)।

দাজ্জালের দৌরাত্ম

দাজ্জাল প্রথমত নিজেকে নবী এবং পরে খোদা বলে দাবী করবে। তারপর পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা ঘুরে ঘুরে লোকজনকে এ দাবী সমর্থন করতে বাধ্য করবে। পবিত্র হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, দাজ্জাল যখন পথে বের হবে তখন তার সাথে আগুন ও পানি থাকবে। লোকেরা বাহ্যত যে বস্তুটিকে আগুন দেখবে প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে শীতল পানি আর যে বস্তুটিকে পানি দেখবে সেটা হবে প্রকৃতপক্ষে আগুন (বুখারী)।

কোন মুসলিম তাকে রব বলে অস্বীকার করলে সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি মহা শান্তি স্থলে পৌছে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে রব বলে স্বীকার করবে দাজ্জাল তাকে পানির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। প্রকৃতপক্ষে এটি হবে জ্বলন্ত আগুন। আল্লাহ্

১. ফাত্হুল বারী শরহে বুখারী।

www.pathagar.com

তা'আলা দাজ্জালকে এতখানি শক্তি দান করবেন যে, সে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার পর পুনরায় তাকে জীবিত করতে সক্ষম হবে। তবে এক বারের বেশী নয়। কেউ এক বার পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না (বুখারী)।

সে মক্কা ও মদীনা ব্যতিরেকে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। মদীনায় প্রবেশের জন্য মদীনার নিকটস্থ প্রস্তরময় ভূখণ্ডে অবতরণ করবে। এ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে। কিন্তু দাজ্জাল তন্মধ্যে কোন দ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। অবশেষে ফিরে চলে যাবে (বুখারী)।

তার দূরত্বকাল হবে ৪০ বছর কিম্বা ৪০ দিন। এরপর হযরত ঈসা (আ.)কর্তৃক দাজ্জাল নিহত হবে (মুসলিম)।[১]

হযরত ঈসা (আ.) -এর পৃথিবীতে অবতরণ

হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণ প্রসঙ্গে মাওলানা শাহ রফী উদ্দীন (র.) লিখেন, দাজ্জাল দামেশ্‌ক পৌঁছবার পূর্বেই ইমাম মাহদী (আ.)সেখানে পৌঁছে যাবেন। তিনি দাজ্জালে সাথে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবেন। এ অবস্থায় একদিন আসরের নামাযের আযান হলে লোকজন নামাযের প্রস্তুতি নিতে থাকবে। এমন সময় হযরত ঈসা (আ.) দু'জন ফিরিশ্‌তার কাঁধে ভর করে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং জামি' মসজিদের পূর্ব মিনারে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দেওয়ার জন্য ডাকতে থাকবেন। তথা সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হবে। তিনি নীচে আরহণ করে ইমাম মাহদীর (আ.)সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ইমাম মাহদী (আ.) অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে তাঁকে নামাযের ইমামত করতে অনুরোধ জানাবেন। তখন হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, না ইমামত আপনাকেই করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্মান শুধু এই উম্মাতকেই দান করেছেন। তারপর ইমাম মাহদী (আ.) নামায পড়াবেন। আর হযরত ঈসা (আ.) একজন মুক্তাদী হিসাবে তাঁর পেছনে নামায আদায় করবেন। নামায শেষে ইমাম মাহদী (আ.) হযরত ঈসাকে বলবেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! সৈন্য পরিচালনার ভার আপনার উপর অর্পিত থাকল। আপনি নিজ ইচ্ছামতে সমাধা করুন। তিনি বলবেন, সেনাবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব আপনাদেরকেই পালন করতে হবে। আমি শুধু দাজ্জালকে নিপাত করতেই এসেছি। কারণ তার মৃত্যু আমার হাতেই নির্ধারিত (আলামাতে কিয়ামত)।

মুসনাদে আহ্‌মাদ গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ.) -কে চেনার কিছু নিদর্শনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি মধ্যমাকৃতির ও গৌর বর্ণের হবে। শরীরে লালচে দু'টি চাদর জড়ানো থাকবে। দেখতে তাঁকে এমন দেখাবে যেন তিনি এইমাত্র গোসল করে বের হলো।

হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে জীবিত আছেন

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও অন্যতম উলূল আযম পয়গাম্বর। আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী পিতা বিহীন জন্ম। পৃথিবীতে তিনি নির্ধারিত সময়

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬১)।

www.pathagar.com

অবস্থান করেন। এরপর তাঁকে জীবিতাবস্থায় সশরীরে আসমানে তুলে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু হয় নি। কিয়ামতের প্রাক্কালে উম্মাতে মুহাম্মদী হিসাবে পুনরায় তিনি আগমন করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করা, রাষ্ট্র পরিচালনা সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্তিকাল করবেন। পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ অভিমত সুস্পষ্ট। কিন্তু ইয়াহূদী ও খৃস্টান সমাজে এ বিষয়ে চরম ভ্রান্তি বিদ্যমান। ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে খুবই হীন ধারণা পোষণ করবে। তাঁর নবী হওয়া এবং প্রতিশ্রুত মাসীহ্ হওয়াকে ইয়াহূদীরা বিশ্বাস করে না। তিনি বনী ইসরাইল সমাজে সংস্কার কাজ শুরু করলে ইয়াহূদী স্বার্থবাদী শ্রেণী তাঁকে অস্বীকার করে। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَـٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗٓ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۝

হে কিতাবীগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ী করো না এবং আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। নিঃসন্দেহে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম হলেন (প্রতিশ্রুত) মাসীহ্। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর বাণী। যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আন (৪ঃ ১৭১)।

ইয়াহূদীদের স্বার্থান্বেষী দলটি তখন হযরত ঈসা (আ.) -এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে এবং রোমের গভর্ণরের সাহায্য নিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে তুলে নেন। কিন্তু ইয়াহূদীদের দাবী হল, তারা ঈসা (আ.) -কে হত্যা করেছে। তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ ط

ইয়াহূদীরা তাঁকে হত্যা করে নি ক্রুশবিদ্ধও করে নি কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার ব্যাপারে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা

www.pathagar.com

করে নি; বরঞ্চ আল্লাহ্ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন (৪ঃ ১৫৭)।

তবে ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা সত্যপরায়ণ ও সত্যপ্রিয় ছিল তারা হযরত ঈসা (আ.) উপর ঈমান আনে এবং তাকে সকল কাজে আন্তরিকভাবে সাহায্য করে। পবিত্র কুরআনে তাঁদেরকে 'হাওয়ারী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র ও হযরত ঈসা (আ.) -এর আসমানে চলে যাওয়ার পর এ দলটি ও নানা রকম ভ্রান্ত আকীদার শিকার হয়। কালক্রমে তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্ত আকীদার উদ্ভব ঘটে। তারা হযরত ঈসা (আ.) -কে মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শণপূর্বক তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র এবং তিন জনের তৃতীয় খোদা ইত্যাকার ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত হয়। বস্তুত হযরত ঈসা (আ.) এহেন শিরকী আকীদার শিক্ষা দেন নি। এটি তাঁর উপর এক মহা অপবাদ বৈ কিছুই নয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ أَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىْ اِلٰهَانِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ

আল্লাহ্ যখন বলবেন, হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে এ কথা বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ কর। সে তখন উত্তর দিবে, তুমিই মহিমান্বিত! আমার যা বলার অধিকার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয় (৫ ঃ ১১৬)।

পরবর্তীকালের খৃস্টানরা ইয়াহূদীদের মিথ্যাচারিতায় প্রভাবিত হয় এবং তারাও হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। বর্তমান প্রচলিত ইয়াহূদীদের এই অমূলক বিশ্বাসকেই প্রচার করা হচ্ছে।

ইতিহাস বিজ্ঞানীদের মতে প্রচলিত ইঞ্জীল ও ইঞ্জীল সমুহের প্রচারিত ইতিহাস আদৌ ঠিক নয়। কারণ এ গুলো হযরত ঈসা (আ.) -এর উপস্থিতিতে রচিত হয়নি। ঈসা (আ.)-কে আসমানে তুলে নেয়ার সত্তর বছর পর থেকে এগুলোর রচনা শুরু হয়। তখন একই সময়ে পরস্পর বিপরীতমুখী বক্তব্য সম্বলিত অসংখ্য ইঞ্জীল গ্রন্থের সমাবেশ ঘটে। তন্মধ্যে অধিকাংশ খৃষ্টান মাত্র চারটিকে স্বীকৃতি দেয়। আবার এ চারটির মধ্যে কোন একটির লেখকও হযরত ঈসাকে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন কেউ নেই। তারা এইগুলি কার মুখ থেকে শুনে লিখেছেন এ কথাও জানা যায় নি। বরং যে চার ব্যক্তির সাথে ঐ চারটি কিতাবকে সম্পর্কিত করা হয় তাদের সঙ্গে বস্তুত কিতাবগুলির সম্পর্ক সঠিক কি না বর্তমানে এ বিষয়েও সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। ঐ কিতাবগুলি প্রথমে কোন ভাষায় কোন আমলে লেখা হয়েছিল আজ অবধি সে প্রমাণও সুস্পষ্ট হয়নি। কাজেই এত দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত ইঞ্জিলের বক্তব্য কোনক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না।

www.pathagar.com

বিশেষত পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ও কাত্য়ী বক্তব্য ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

এ কথা সুনিশ্চিত যে ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি বরং আল্লাহ্ তাকে তুলে নিয়ে গেছেন।

অকাট্ট্য এ বাণীর মোকাবিলায় প্রচলিত ইঞ্জিলের অসত্যতাই প্রমাণীত হয়। বারনাবাস রচিত বাইবেলে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে ইতিহাস লিখিত আছে সেটি কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসের অনেকটা কাছাকাছি। বারনাবাস লিখেছেন, আর সৈন্যগণ যিহুদা-এর সহিত ইয়াসূ (যিশু) যেখানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে যখন পৌছাল তখন ইয়াসূ একটি বিরাট দলের নিকটবর্তী হওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে চলে গেলেন। তাঁর এগার জন শাগরিদ তখন নিদ্রিত ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর প্রিয় বান্দার বিপদ দেখলেন তখন নিজ দূত জিব্রীল, মীকাইল, রিফাঈন ও আওরীলকে হুকুম দিলেন ইয়াসূকে দুনিয়া থেকে তুলিয়া লওয়ার জন্য। তখন পবিত্র ফিরিশ্তাগণ আগমন করেন এবং দক্ষিণের জানালা দিয়ে ইয়াসূকে উপরে তুলে নিয়ে গেলেন। এরপর তাকে তৃতীয় আসমানে ফিরিশ্তাদের সাহচর্যে রেখে দিলেন।[১]

অবতরণের পর হযরত ঈসা (আ.)-এর কাজ-কর্ম ও ওফাত

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, পৃথিবীতে অবতরণের পর হযরত ঈসা (আ.) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন (আবূ দাউদ, মুসনাদে ইমাম আহ্মাদ)।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদীসে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর সম্পর্কেও জানা যায়। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হতে পারে আমি আপনার পরেও জীবিত থাকব। কাজেই আপনি আমাকে অনুমতি দিন যেন আপনার পাশেই আমার কবর হয়। নবী (সা.) ইরশাদ করেন যে, এটি কেমন করে হবে? এখানে তো আমার কবর, আবূ বকর ও উমরের কবর এবং হযরত ঈসা (আ.) -এর কবর।[২]

তাছাড়া আরো অন্যান্য হাদীসে হযরত ঈসা (আ.)-এর চল্লিশ বছর কালীন সুশাসনের বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। হযরত শাহ রফী উদ্দীন (র.) তাঁর 'আলামতে কিয়ামত' গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন আসমান থেকে অবতরণের পর ইমাম মাহদী (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জাল বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবেন। ভীষণ ও ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। অবশেষে 'লুদ্দা' নামক স্থানে হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক দাজ্জাল নিহত হবে। দাজ্জালের সমর্থক ইয়াহূদীরা তখন মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সকল চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে। এমন কি ইয়াহূদীরা রাতে কোন বৃক্ষ কিম্বা পাথরের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করলে সে

১. বারনাবাসের ইঞ্জিল, ২১৫ ঃ ১-৫, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ খ. পৃষ্ঠা-৫০৭। ২. তরজমানুস্ সুন্নাহ্, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৩।

www.pathagar.com

জড়বস্তুও উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে ইয়াহূদীকে ধরিয়ে দিবে। দাজ্জালের দৌরাত্ম খতম হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী (আ.) বিভিন্ন অত্যাচার কবলিত এলাকা ভ্রমন করবেন এবং লোকজনকে আখিরাতের উন্নতি সফলতা ও সাওয়াবের সুসংবাদ দিবেন। ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে অবস্থার উন্নতি সাধন করবেন। হযরত ঈসা (আ.) শুকর বধ করবেন এবং ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তিনি কাফিরদের কাছ থেকে কোন কর গ্রহণ করবেন না। ইমাম মাহদী (আ.) কয়েক বছর পর ইন্তিকাল করলে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর জানাযা পড়াবেন এবং দাফনের কাজ সমাধা করবেন।

ইত্যবসরে পৃথিবীতে ইয়াজূয মাজূযের প্রকাশ ঘটবে। তারা সেকান্দরী প্রাচীর ভেদ করে পঙ্গ-পালের মত বিরাট বাহিনী নিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তখন হযরত ঈসার দু'আর কারণে কুদ্রতীভাবে তাদের ধংস করবেন। এভাবে চল্লিশ বছর পরে হযরত ঈসা (আ.) স্বাভাবিক অবস্থায় ওফাত লাভ করবেন।

ইয়াজূয ও মাজূযের বহিঃপ্রকাশ

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অপর একটি বড় আলামত হল পৃথিবীতে 'ইয়াজূয মাজূয' নামক দু'টি চরম অত্যাচারী গোত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পর এ জাতিদ্বয়ের প্রকাশ ঘটবে। ইংরেজী বাইবেলে তাদেরকে 'গগ ও ম্যাগগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, ইয়াজূয মাজূয আকৃতিতে মানুষের মতই হবে এবং হযরত নূহ্ (আ.) -এর পুত্র ইয়াকা এর বংশধর থেকে হবে।[১]

তারা পৃথিবীর উত্তর পূর্ববাঞ্চলে বাসিন্দা হবে। তাফসীরে তাবারী গ্রন্থে বর্তমানের আরমেনিয়া ও আযার-বাইজানের পর্বতমালার পাশাত বাগ তাদের আবাসস্থল উল্লেখ করা হয় (তাবারী, ১৬-২)।

হযরত যুলকারনাইন কর্তৃক তাদের আগমন পথে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়ার কারণে তারা সাধারণ লোকালয় পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয় না। কিয়ামতের পূর্বে উক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে। ফলে তারা স্রোতের ন্যায় বেরিয়ে এসে লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

ইরশাদ হচ্ছে,

حَتّٰى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ○

এমন কি ইয়াজূয মাজূযকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা অতি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে (২১ ঃ ৯৬)।

পূর্বে তারা লোকালয়ে এসে মানুষের উপর নির্যাতন চালাত ও লুটতরাজ করতো। যুলকারনাইন বাদ্শাহ্ প্রাচীর নির্মাণ করে তাদের আগমনী পথ বন্ধ করে দেন।

---

১. ফাত্হুল বারী, ৬ খণ্ড, পৃ-২৯৭)।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকে রয়েছে,

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝

তারা বলল, হে যুলকারনাইন ইয়াজূয মাজূয পৃথিবীতে আশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। আমরা কি তোমাকে এ শর্তে কর দিতে পারি যে, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর গড়ে দিবে। যুলকারনাইন বলল, আমার প্রভূ আমাকে যতখানি ক্ষমতা দান করেছেন সেটিই উৎকৃষ্ট ও উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে কেবল শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ড সমুহ আনয়ন কর। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লোহা স্তূপ স্থাপন দু'পর্বতের সমানে গিয়ে পৌছল। তখন তিনি বললেন, তোমরা হাপরে দম দিতে থাক। এভাবে এটি আগুনের মত উত্তপ্ত হলে তিনি বললেন, তোমরা গলিত তাম্র আন আমি তা এর উপরে ঢেলে দিচ্ছি। এরপর থেকে ইয়াজূয মাজূয আর সে প্রাচীর অতিক্রম কিম্বা ভেদ করতে সক্ষম হল না। যূলকারনাইন বললেন যে, এটি হল আমার প্রভূর সাময়িক অনুগ্রহ মাত্র। যা তার এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি এটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আর প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহ্ বলেন যে, সে দিন আমি তাদেরকে এমতাবস্থায় ছেড়ে দিব যে, একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব (১৮ ঃ ৯৪-৯৯)।

ইয়াজূয মাজূযের দৌরাত্ম চরম পর্যায়ে পৌছলে হযরত ঈসা (আ.) মুসলামানদেরকে নিয়ে দু'আ করবেন। ফলে ব্যাপক মহামারীর আকারে এ অত্যাচারী সম্প্রদায় ধ্বংস হবে।

ভূমিধসে পড়া ও পৃথিবী ধোয়াচ্ছন্ন হওয়া

হযরত ঈসা (আ.)এর ওফাতের পর কিয়ামতের পর্যন্ত পৃথিবীতে তিনটি ভয়ানক ভূমিধস

www.pathagar.com

হবে। একটি পূর্বাঞ্চলে একটি এলাকা সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে এটি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বায়দা মরুঅঞ্চলে ঘটবে (নিবরাস, পৃষ্ঠা-৩৫২)।

ইতিমধ্যে একটি ধোঁয়া সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ফলে মুসলমান গণ স্নায়ু দুর্বলতা ও সর্দিতে আক্রান্ত হবে আর মুনাফিক ও কাফিররা সঙ্গাহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে। এ অবস্থা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তারপর পৃথিবীর ধুঁয়ামুক্ত হবে (আলামাতে কিয়ামত)।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে 'দাব্বাতুল আরদ' প্রকাশে কিছু পূর্বে কিম্বা তারপর পরই সিঙ্গায় ফুৎকারের আগে পশ্চিম দিকে থেকে সূর্য উদয়ের ঘটনা ঘটবে। এ অস্বাভাবিক ঘটনার পর থেকে কোন কাফিরের ঈমান কিম্বা ফাসিকের তাওবা কবুল হবে না। ফলে ঈমানদারগণ সতর্কিত হয়ে রাতভর আল্লাহ্ দরবারে কান্নাকাটি করবেন। এই রাতের পর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়ে আবার পশ্চিম দিকেই অস্তমিত হবে। পরের দিন থেকে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে পূর্ব দিক থেকেই সূর্যোদয় হতে থাকবে। এর কিছু দিন পরেই কিয়ামত সংঘটিত হবে (নিবরাস, পৃষ্ঠা-৩৫২)।

দাব্বাতুল আরদ

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে আগে বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্বদিকে অবস্থিত সাফা পর্বত ভূমিকম্পে ফেটে যাবে এবং সেখান থেকে বিচিত্র আকৃতি এক অদ্ভুত জন্তু বের হয়ে আসবে। এই অদ্ভুত জন্তুটির মুখমণ্ডলের আকৃতি মানুষের ন্যায়, পা উটের, ঘাড় ঘোড়ার ন্যায়, লেজ চিলের ন্যায়, নিতম্ব হরিণের নিতম্বের ন্যায়, শিং বহুশাখা বিশিষ্ট হরিণের শিং এর ন্যায়, হাত বানরের হাতের ন্যায় হবে। উক্ত জন্তুটি অত্যন্ত বাকপটু হবে এবং উচ্চমানের ভাষায় কথা বলবে। ইহা সমস্ত শহরে এত দ্রুত গতিতে বিচরণ করবে যে কেউ তার নাগাল পাবে না। অথচ কোন নাগালের বাইরেও থাকতে পারবে না। তার নিকট হযরত সুলায়মান (আ.) -এর আংটি ও হযরত মুসা (আ.) -এর লাঠি থাকবে। সেই লাঠির দ্বারা সে মু'মিনদের স্পর্শ করবে। এতে তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং সকলেই তাদেরকে মু'মিন বলে চিনতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে আংটির দ্বারা কাফিরদের নাকের উপর 'কাফির' শব্দ শীল করে দেবে। ফলে সকলেই তাদেরকে কাফির বলে চিনতে পারবে (আলামাতে কিয়ামত, পৃষ্ঠা-৩৫২)।

পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে,

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মাটিগর্ভ থেকে এক অদ্ভুত জন্তু

নির্গত করব। এ জন্তু মানুষের সহিত কথা বলবে। বস্তুত তারা আমার নিদর্শনে ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী (২৭ : ২৮)।

দক্ষিণের বায়ু ও অগ্নিশিখা

'দাব্বাতুল আরদ' অদৃশ্য হওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হবে। এই বায়ুর প্রভাবে মু'মিনগণ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়বেন এবং এরপর থেকে তারা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকবেন। তারপর পৃথিবীতে নিগ্রো দলের আধিপত্য কায়েম হবে। তারা কা'বা শরীফ ধ্বংস করবে এবং হজ্জ পালন বন্ধ করে দিবে। মানুষের জীবন থেকে লজ্জা সম্ভ্রম সম্পূর্ণ বিদায় নিবে। রাস্তায় ঘাটে প্রকাশ্যে যিনা ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের মধ্যে হানাহানি মারামারি মাত্রাধিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হত্যা, লুণ্ঠন একের পর এক হতে থাকবে। পৃথিবীতে 'আল্লাহ্' শব্দ বলার মত কেউই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সে সময় দক্ষিণ দিক থেকে একটি মহা অগ্নিশিখা প্রকাশিত হয়ে মানুষকে ধাওয়া করতে শুরু করবে। লোকজন অগ্নিশিখার ভয়ে ক্রমে উত্তর দিকে গিয়ে জড়ো হবে। কিয়ামত অতি নিকটবর্তী হওয়ার এটিই হল সর্বশেষ সূচনা।

সিঙ্গায় ফুৎকার ও মহা প্রলয়ের সূচনা

চরম পাপাচার ও অশান্ত অবস্থায় পৃথিবী কিছুকাল এভাবে চলবে। অবশেষে একদা একটি আওয়াজ শোনা যাবে এই আওয়াজ ক্রমে মৃদু থেকে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ডতর হতে থাকবে। এবং সর্বত্র একই রকম শোনা যাবে এটিই সে শিঙ্গার ফুৎকার। আওয়াজটি কোথা থেকে আসছে তা নির্ণয় করা যাবে না। কিন্তু তার কর্কশ ও রূঢ়তা ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করলে মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে মাঠের দিকে ছুটবে। আওয়াজের ভীতিকর অবস্থা বনবাদাড়ের জীব জন্তুদেরকেও মাঠের দিকে নিয়ে আসবে। মু'মিন প্রকম্পিত হবে। সমুদ্র স্ফীত হয়ে নিকটবর্তী স্থান সমূহ নিমজ্জিত করে দিবে। পাহাড়গুলি বাতাসের সঙ্গে ধূনিত তূলোর ন্যায় উড়তে থাকবে। এদিকে সিঙ্গার আওয়াজও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তখন আকাশ ফেটে যাবে। গ্রহ নক্ষত্রগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক পড়তে থাকবে। এ আবহাওয়া ছয়মাস চলবে। আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, সাগর, মহাসাগর সবকিছু সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে ফিরিশ্তাদেরও মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ পাকের আরশ, কুরসি, লাওহ্-কলম, জান্নাত-জাহান্নাম, সিঙ্গা ও রুহ্ সমূহ ব্যতীরিকে সকল কিছু ধ্বংস হবে। ইরশাদ হয়েছে -

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ○

মহাপ্রলয় কি ? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান ? সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। আর পর্বতগুলি হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত (১০১ : ৫)।

www.pathagar.com

আরো বলা হয়েছে,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

এবং সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে ফলে আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ব্যতিরিকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সকল মুর্ছিত হয়ে পড়বে (৩৯ ঃ ৬৮)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে -

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটিই তার করণীয়। পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে ও পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে সব বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শুন্যগর্ভ হবে। এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে আর এটিই তার করণীয় (৮৪ঃ ১-৫)।

এভাবে আরো বহু আয়াতে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার কথা বর্ণিত আছে। এ অবস্থার মধ্যে সকল সৃষ্টি জগতের ধ্বংস সাধিত হবে। তাফসীরে 'মা'আলিমুত্ তানযীল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সবকিছুর ধ্বংস সাধিত হওয়ার পর আল্লাহ্ পাক বলবেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ আজ কর্তৃত্ব কার? কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ থাকবে না।

তখন নিজেই জবাবে বলবেন, لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্-ই।

তার নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হলে সকল মানুষ জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে দিকে ছুটতে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে,

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

অতঃপর আবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সাথেসাথেই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পর ঘটিতব্য বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান

ইসলামে মানব জীবনের চারটি স্তর বা আলমের ধারণা পাওয়া যায়।

প্রথম স্তর ঃ আলমে আরওয়াহ্-আত্মার জগত।

দ্বিতীয় স্তর ঃ আলমে আজসাম-স্থূল বা বস্তু জগত।

তৃতীয় স্তর ঃ আলমে বারযাখ-মৃত্যুর পরবর্তী অদৃশ্য জগত।

চতুর্থ স্তর ঃ আলমে আখিরাত-পরকাল বা পুনরুত্থান ও তারপরের অনন্ত জগত।

মানব জাতি পৃথিবীতে আগমনের বহু পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহ্ বা আত্মা সৃষ্টি করেছেন। এ সবের সাময়িক অবস্থানের জায়গা 'আলমে আরওয়াহ্' বা আত্মার জগত। এরপর যখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের আগমনের ধারবাহিকতা শুরু হয় তখন থেকে সেই সূক্ষ্মআত্মা আলমে আরওয়াহ্ হতে বস্তু জগতে আসতে থাকে। মাতৃগর্ভে সন্তানের পূর্ণ আকৃতি গঠিত হওয়ার পর রূহ্ আলমে আরওয়াহ্ বা আত্মিক জগত থেকে মাতৃগর্ভস্থ মানব দেহে প্রবেশ করে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে নির্দিষ্ট সময়ে ভূমিষ্ট হয় এবং পৃথিবীতে আগমন করে। পৃথিবী পরকালের পাথেয় সংগ্রহের স্থান। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও পাথের সংগ্রহের পর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে একদিন রূহ্ দেহ ত্যাগ করে স্থূল জগত থেকে আলমে বারযাখে স্থানান্তরিত হয়। পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত রূহ্ আলমে বারযাখেই অবস্থান করে। পুনরুত্থানের পর শুরু হবে আলমে আখিরাত বা পরকালীন জীবন (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-২৪২)।

আলমে বারযাখ

মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় রূহ্ যে স্থানে অবস্থান করে তাকে 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। মৃত্যুর পর থেকেই মানুষের বারযাখী জীবন শুরু হয়। হযরত ইস্রাফীল (আ.) এর তৃতীয়বার সিংগায় ফুৎকারের মাধ্যমে আলমে বারযাখ বা বারযাখী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপরই শুরু হবে আলমে আখিরাত বা পরকালীন জীবন (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-৬৪২)।

'বারযাখ' শব্দের অর্থ যবনিকা বা পর্দা। আলমে বারযাখ পর্দাস্বরূপ এক অদৃশ্য জগত। এ

www.pathagar.com

জগত, বস্তু জগত ও পরকালের মধ্যে বিরাট যবনিকা হয়ে রয়েছে (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-৬৪৩)।

মৃত্যুর পর মানুষ বারযাখের অধিকারী হয়ে যায়। সেখান থেকে এ দুনিয়ায় ফিরে আসার আর কোন অবকাশ নেই। সব মানুষকেই মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। সেটা এমন এক অদৃশ্য জগতে যে, সেখানে কে কি অবস্থায় আছে তার খোঁজ-খবর নেয়া এবং হাল-হাকীকাত জানা দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

আলমে বারযাখ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ٥

যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি; যা আমি পূর্বে করি নি। না, এ হবার নয়; এতো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে বারযাখ (প্রতিবন্ধক, পর্দা) থাকবে, পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত (২৩ ঃ ৯৯-১০০)।

মৃত্যু

মানব দেহে একটি সুক্ষ্ম ও অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা মানুষকে সচল, সজিব ও সক্রিয় রাখে। এ শক্তি মানব দেহের সাথে যতদিন সংযুক্ত থাকে ততদিন মানুষ জীবিত থাকে। এ শক্তিকে মানবাত্মা বা রূহ্ বলা হয়। একটি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলার নিদের্শে হযরত আযরাঈল (আ.) মানব দেহ থেকে রূহ্ কবয করে নেন আর তখনই মানুষ মারা যায়। মানুষের মৃত্যু অনিবার্য এবং হায়াতও নির্ধারিত। হায়াত শেষ না হওয়ার এক মুহূর্ত পূর্বেও কোন মানুষের মৃত্যু হবে না। এবং হায়াত শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তও মৃত্যু বিলম্বিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে (হায়াত শেষ হয়ে যাবে) তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারবে না এবং (হায়াত শেষ হওয়ার) এক মুহূর্ত পূর্বেও মরতে পারবে না (১০ ঃ ৪৯)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও (৪ঃ৭৮)।

সব মানুষের রূহ্ একইভাবে কবয করা হয় না। কাফির, যালিম ও পাপী লোকদের রূহ্ অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং নেক্‌কার বান্দাদের রূহ্ সহজ ও আরামের সাথে কব্‌য করা হয়।

পাপীদের মৃত্যুযন্ত্রণা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ইরশাদ করেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

তুমি যদি দেখতে পেতে যখন ফিরিশ্‌তাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর (৮ ঃ ৫০)।

তিনি আরো বলেন,

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

ফিরিশ্‌তারা যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে! এ এজন্য যে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে, তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন (৪৭ ঃ ২৭-২৮)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملٰئكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من اللّٰه وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الشعور من الصفوف المبلول.

www.pathagar.com

কোন কাফির ব্যক্তি যখন ইহ্কালীন জীবনের শেষে ও পরকালীন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে। তখন আসমান থেকে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্তা একটি মোটা খসখসে কাপড় সাথে নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হন এবং দৃষ্টির শেষপ্রান্তে এসে বসেন। এরপর জান কব্যকারী ফিরিশ্তা এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন, হে অপবিত্র আত্মা! আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও গযবের দিকে বেরিয়ে এস। নবী (সা.) বলেন, তখন রূহ্ তার দেহে ছুটাছুটি করতে থাকবে। এমতাবস্থায় ভিজা কম্বল থেকে পশম যে ভাবে টেনে বের করা হয় সে ভাবে তার রূহ্ কবয করা হবে (ফাতহুর রাব্বানী, ৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭)।

মু'মিন বান্দাগণের সহজ মৃত্যু

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

ফিরিশ্তাগণ যাদের রূহ্ কব্য করেন পাক পবিত্র থাকা অবস্থায়। তাঁরা বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর (১৬ ঃ ৩২)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملئكة من السماء بيض الوجه كان وجوههم الشمس ومعه كفن من اكفان الجنة و حنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ويجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء.

মু'মিন বান্দা যখন তাঁর ইহ্কালীন জীবনের শেষ পরকালীন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে তখন আসমান থেকে ফিরিশ্তাগণ তার নিকট অবতীর্ণ হন, তাঁদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র ও সূর্যের ন্যায় আলোক উজ্জ্বল। তাঁদের সাথে থাকবে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি। তাঁরা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বসবেন। আর জান কব্যকারী ফিরিশ্তা এসে তাঁর শিয়রে বসে বলবেন, হে পবিত্র আত্মা! তুমি তোমার রবের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এস। তিনি বলেন, (একথা শোনার পর) পাত্রের মুখ দিয়ে পানি যেমনি সহজভাবে বেরিয়ে আসে তাঁর রূহ্ তেমনি আসানীর সাথে বেরিয়ে আসবে (মুসনাদে আহ্মাদ, সূত্র ঃ ফাতুহুর রাব্বানী, ৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪)।

www.pathagar.com

কবরে সাওয়াল-জাওয়াব

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা এই যে, বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন মানুষ মারা যাওয়ার পর সে কবরে থাকুক কিম্বা অন্য কোথাও থাকুক তাকে প্রশ্ন করা হবে (আল-আকীদাতুল ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা-২৩৭)।

জমহুর আলিম ও ইমামগণের মতে প্রশ্ন কেবল রূহের উপরই হবে না বরং মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর মৃতদেহে রূহ্ প্রত্যাবর্তন করিয়ে প্রশ্ন করা হবে (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-২৩৯)।

কবরে প্রশ্ন করার অর্থ হলো, আলমে বারযাখে প্রশ্ন করা। অধিকাংশ মানুষ কবরস্থ হয় বলে কবরে প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-৬৪৬)।

হাদীস শরীফের বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ কোন বালিগ মানুষ মারা যাওয়ার পর যখন তাকে কবরে রাখা হয় তখন নীলচক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কালো বর্ণের ফিরিশ্তা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন। ফিরিশ্তাদ্বয়ের একজনকে বলা হয় মুন্‌কার এবং অপর জনকে বলা হয় নাকীর। তাঁরা তিনটি প্রশ্ন করে থাকেন –

এক ঃ তোমার রব কে ?

দুই ঃ তোমার দীন কি ?

তিন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দিকে ইশারা করে বলেন ইনি কে ?

মু'মিন বান্দা প্রশ্নগুলোর জবাব এ ভাবে দিবেন -

১. আমার রব আল্লাহ্।

২. আমার দীন ইসলাম।

৩. ইনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

এরপর তাঁর কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করা হবে এবং বলা হবে তুমি ঘুমিয়ে থাক যেমনিভাবে বর ঘুমিয়ে থাকে।

আর কাফির ও মুনাফিক ব্যক্তি এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে বলবে, হায় হায় আমি কিছুই জানি না ! তখন তার কবরকে জাহান্নামের গুহায় পরিণত করা হবে এবং সে কবরে থেকেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ, সূত্রঃ আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা- ৬৪৪-৪৫)।

মুন্‌কার ও নাকীরের প্রশ্ন করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো ইরশাদ করেন ঃ

ان العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل

www.pathagar.com

لمحمد ؟ فاما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول لا أدرى، كنت أقول ما يقول الناس فيقال له : لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين .

কোন বান্দাকে কবরে রেখে যখন তার সাথীগণ এতটুকু দূরত্ব চলে যায় যে, তখনও তাদের পদশব্দ সে শুনতে পায়। তখন তার নিকট দু'জন ফিরিশ্তা এসে তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর মুহাম্মদ (সা.)-এর দিকে ইশারা করে তাকে জিজ্ঞাস করেন, তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে ? মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে এই দেখ জাহান্নামে তোমার জন্য কিরূপ স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আল্লাহ্ তোমার এ স্থানকে বেহেশ্তের স্থানের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখবে। কিন্তু মুনাফিক ও কাফিরকে উক্ত প্রশ্ন করা হবে সে তার জবাবে বলবে, আমি বলতে পারি না। মানুষ যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি তোমার বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা বুঝতে চেষ্টা কর নি এবং আল্লাহ্র পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেও জানতে চাওনি। এরপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করা হবে। সে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। সে চিৎকার ও আর্তনাদ মানুষ ও জিন্ন ব্যতীত আশপাশের সকল জীবই শুনতে পাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

এ প্রসঙ্গে অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেন,

المسلم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله فذالك قوله تعالى: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِىْ الْاٰخِرَةِ، وفى رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نزلت فى عذاب القبر، يقال له : من ربك؟ فيقول ربى الله ، ونبى محمد صلى الله عليه وسلم.

www.pathagar.com

কবরে মুসলিম ব্যক্তিকে যখন প্রশ্ন করা হয় তখন সে এ সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল। এটা আল্লাহ্র বাণী যে ঃ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ইহজীবনে ও পরজীবনে (বারযাখে) 'কাওলে সাবিত' (প্রতিষ্ঠিত কথার) এর উপর অটল রাখবেন। অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

এ আয়াত কবর আযাব সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে ? উত্তরে বলবে, আমার রব আল্লাহ্ এবং আমার নবী, মুহাম্মদ (সা.) (বুখারী ও মুসলিম)।

কবরের আযাব ও নিয়ামত

অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত দীর্ঘ সময় মানুষ কবরে অবস্থান করবে এবং সেখানে নিয়ামত ও আযাব ভোগ করবে। কাজেই কবরের নিয়ামত ও আযাবের প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। তবে এর ধরন বা কাইফিয়াত কেমন হবে তা পরিজ্ঞাত নয়। কারণ, কবরের আযাব ও নিয়ামত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য জগতের বিষয় যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধারনার অতীত (শারহু আল-আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা-৩৯০)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত অভিমত যে, কবরের আযাব ও নিয়ামত মানুষের দেহ ও রূহ্ উভয়ের উপরই হবে। রূহ্ যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে তখন আযাব ও নিয়ামত শুধু রূহের উপর হবে। আর যখন রূহ্ দেহের সাথে মিলিতভাবে থাকবে তখন আযাব অথবা নিয়ামত দেহ ও রূহ্ উভয়ের উপরই হবে।

কবরের জীবনে দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনের ন্যায় হবে না। বরং তখনকার সম্পর্ক হবে ভিন্নতর। দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক পাঁচ প্রকার –

এক ঃ মাতৃগর্ভে দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক।

দুই ঃ দুনিয়ার জীবনের সম্পর্ক।

তিনঃ নিদ্রাকালীন সম্পর্ক। এ সময় এক হিসাবে দেহের সাথে রূহের সংযুক্ত থাকে এবং অন্য হিসাবে রূহ্ বিচ্ছিন্ন থাকে।

চার ঃ আলমে বারযাখে দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক। আলমে বারযাখে দেহ থেকে রূহ্ বিচ্ছিন্ন হলেও সেটা এমন নয় যে আর কখনো সংযুক্ত হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর লোকেরা যখন চলে যেতে থাকে তখন মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। কবরবাসীদের প্রতি প্রদত্ত সালামের

www.pathagar.com

জবাব তারা দিয়ে থাকে। দেহের সাথে এ সম্পর্ক একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। এর মাধ্যমে দেহ জীবিত হয়ে যায় না।

পাঁচ ঃ পুনরুত্থান দিবসের সম্পর্ক। এদিন দেহের সাথে রূহের পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এ সম্পর্কের পর কখনো মানুষের মৃত্যু হবে না এবং নিদ্রাও আসবে না। দেহের সাথে রূহের এরূপ সম্পর্ক ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। (শারহু আল-আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা, ৩৯০-৯১)

কবরের আযাব ও নিয়ামতের অর্থ আলমে বারযাখের আযাব ও নিয়ামত। অধিকাংশ মানুষ কবরস্থ হয় বলে কবরের আযাব ও নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। আলমে বারযাখে অবশ্যই পাপী লোকদের শাস্তি হবে। চাই তারা কবরস্থ হোক কিংবা বন্য জন্তুর উদরস্থ হোক,আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হোক অথবা পানিতে পড়ে জলজন্তুর আহারে পরিণত হোক; কবরবাসীদের যেরূপ আযাব হবে তাদেরও অনুরূপ আযাব হবে এবং কবরবাসীদের ন্যায় তাদেরকেও মুনকার ও নাকীরের সাওয়াল-জাওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে। কবর বা আল-মে বারযাখের আযাব ও নিয়ামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, কোন প্রকার কম-বেশী না করে তার প্রতি সেভাবেই ঈমান আনা ফরয (শারহু আল-আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা-৩৯১)।

দুনিয়া, বারযাখ ও আখিরাত এর বিধি-বিধান এক হবে না বরং প্রত্যেক জগতের বিধি-বিধান হবে ভিন্ন ভিন্ন। দুনিয়ার বিধি-বিধান ও আইন-কানূন সরাসরি মানব দেহের সাথে সম্পৃক্ত, রূহের সাথে প্রাসঙ্গিক। আখিরাতের জীবনের বিধি-বিধান (আযাব ও নিয়ামত) সরাসরি দেহ ও রূহ্ উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং উভয়েই উপর একই সাথে তা কার্যকর হবে।

কবরের আগুন ও নিয়ামত দুনিয়ার আগুন ও নিয়ামতের মত নয়। কবরের উপর ও নীচের মাটি ও পাথর এমনভাবে উত্তপ্ত করা হবে যার তাপ দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হবে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তা স্পর্শ করলে তাদের নিকট তাপ অনুভূত হবে না। এমনকি পাশাপাশি ও নিকটতম দু'জন কবরবাসীর একজনের কবর হতে পারে জাহান্নামের গর্ত এবং অপরজনের কবর হতে পারে জান্নাতের বাগিচা, কিন্তু এ অবস্থায় একে অপরের আযাব ও নিয়ামতের কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলার এ অসীম কুদরতের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয (শারহু আল-আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা-৩৯২)।

কবরের আযাব দু'প্রকার

এক ঃ স্থায়ী আযাব যা কখনো বন্ধ হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

www.pathagar.com

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ٥

সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যে দিন কিয়ামত ঘটবে সে দিন বলা হবে, ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে (৪০ ঃ ৪৬)।

কাফিরদের কবর আযাব সম্পর্কে হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

ثم يفتح له باب النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة.

তারপর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে, তখন সে জাহান্নামে তার স্থান দেখবে। এভাবে অবশেষে কিয়ামত সংঘটিত হবে (মুসনাদে আহ্মাদ)।

দুই ঃ একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আযাব দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর আযাব বন্ধ করে দেওয়া হবে। গুনাহগার মু'মিন বান্দাদের বেলায় এরূপ করা হবে, যাদের গুনাহ কম ও হাল্কা। গুনাহ অনুপাতে আযাব দেওয়ার পর আযাব বন্ধ করে দেওয়া হবে। মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত যে জায়গায় অবস্থান করবে তাকে আলমে বরযাখ বলা হয়। কবর আলমে বারযাখের অংশ বিশেষ। কাজেই কবরের আযাব ও নিয়ামত আলিমে বারযাখের আযাবও নিয়ামতেরই নামান্তর।

কবরের আযাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ، اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ٥

এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফির'আউন সম্প্রদায়কে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যে দিন কিয়ামত ঘটবে, সে দিন বলা হবে, ফিরা'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে (৪০ ঃ ৪৫-৪৬)।

আলমে বারযাখে পাপীদেরকে যে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে উপরের আয়াতটি তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টরূপে দু'পর্যায়ের আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত লঘু আযাব ফির'আউন ও তার দলপ্রতিদের দেওয়া হচ্ছে। তা হল তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের আগুনের সামনে হাযির করা হচ্ছে, যাতে তাদের মধ্যে এ ত্রাস সৃষ্টি হয় যে, অবশেষে এ জাহান্নামের আগুনেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর কিয়ামত সংঘটিত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হবে যা তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। অর্থাৎ সে জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় কেবল ফির'আউন ও তার অনুসারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয় বরং মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক পাপীদের চোখের সামনে সে ভয়াবহ পরিণাম তুলে ধরা হবে যা অবশেষে তাকে ভোগ করতেই হবে। অপর দিকে মু'মিন বান্দাদেরকে অফুরন্ত নিয়ামত ভরা সে জান্নাতের দৃশ্য দেখানো হতে থাকবে যা তাদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে।

বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আহ্‌মাদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

ان احدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة.

তোমাদের যে কেউ যখন মারা যায়, তখন কবরে সকাল-সন্ধ্যায় তার ভবিষ্যত বাসস্থান তার সামনে হাযির করা হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাতীদের স্থান, আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের স্থান (তার সামনে হাযির করা হয়) আর বলা হয়, এটাই তোমার স্থায়ী বাসস্থান। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এখানে পাঠাবেন।

কবর আযাব সম্পর্কে যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر ستة او خمسة، فقال من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؟ قال رجل انا قال فمتى ماتوا ؟ قال فى الشرك، فقال ان هذه الامة تبتلى فى قبورها، فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذى اسمع منه، ثم اقبل علينا بوجهه، فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، قال : تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ومابطن، قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن، قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال .

www.pathagar.com

একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাজ্জার গোত্রের (প্রাচীর ঘেরা) একটি বাগানে খচ্চরের পিঠে সাওয়ার ছিলেন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল। এতে তিনি মাটিতে পড়ার উপক্রম হলেন। দেখা গেল, সেখানে পাঁচ ছয়টি কবর রয়েছে। নবী করীম (সা.)বললেন ঃ তোমরা কেউ কি এ কবরব বাসীদেরকে চিন ? (আমাদের মধ্যে) একজন বলে উঠল, আমি চিনি। নবী করীম (সা.)বললেন ঃ এরা কবে মারা গেছে ? সে ব্যক্তি বলল, এরা মারা গেছে শিরকের যামানায়। নবী করীম (সা.) বললেন ঃ এ উম্মাত তথা মানবজাতি কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং শাস্তি ভোগ করে। যদি আমার এ ভয় না হতো যে তোমরা মানুষকে কবর দেওয়া বন্ধ করে দেবে তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি। এরপর নবী করীম (সা.) আমাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও। তাঁরা বললেন, আমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। নবী করীম (সা.) বললেন ঃ তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাও। তাঁরা বললেন, আমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাই। নবী করীম (সা.) বললেন ঃ তোমরা সকল গোপন ও প্রকাশ্য ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও। তাঁরা বললেন, আমরা সকল গোপন ও প্রকাশ্য ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। নবী করীম (সা.) বললেন ঃ তোমরা দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও। তাঁরা বললেন, আমার দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই (মুসলিম)।

কবরের আযাব ও নিয়ামত সম্পর্কে বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন,

يأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك ؟ فيقول ربى الله، فيقولان له ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ، فيقول : هو رسول الله، فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فذالك قوله يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الاٰية، قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة، فيفتح له، قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره.

www.pathagar.com

وأما الكافر فذكر موته قال : ويعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا ادرى، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدرى، فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى، فينادى مناد من السماء : ان كذب فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه اضلاعه، ثم يقيض له اعمى اصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة فيصيح صيحة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح.

কবরে মু'মিন বান্দার নিকট দু'জন ফিরিশ্‌তা এসে তাকে উঠিয়ে বসাবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার রব কে ? উত্তরে সে বলবে, আমার রব আল্লাহ্। এরপর জিজ্ঞাসা করবেন, তোমান দীন কি ? সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। এরপর জিজ্ঞাসা করবেন, ইনি কে, যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন ? উত্তরে সে বলবে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাকে বলবেন, তুমি তা কি ভাবে বুঝতে ? উত্তরে সে বলবে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।

নবী করীম (সা.) বলেন, এটাই আল্লাহ্‌র বাণীর মর্ম –

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ه

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত বাণীর উপর অটল রাখেন। নবী করীম (সা.) বলেন, এরপর আকাশ হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। কাজেই তাকে জান্নাতের ফরাশ বিছিয়ে দাও এবং জান্নাতের লেবাস পরিয়ে দাও। আর তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার জন্য একটা দরজা খোলা হবে। নবী করীম (সা.) বলেন, এতে তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধ হাওয়া ও সুগন্ধি আসতে থাকবে এবং ঐ দরজা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।

এরপর নবী করীম (সা.) কাফিরের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তার রূহ্ দেহে ফিরিয়ে

www.pathagar.com

আনা হবে এবং দু'জন ফিরিশ্‌তা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার রব কে ? সে বলবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। এরপর জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার দীন কি ? সে বলবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ইনি কে, যিনি তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন ? প্রতি উত্তরে সে বলবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। এরপর আকাশ হতে একজন ঘোষাণকারী ঘোষণা করবেন, সে মিথ্যা বলেছে। (দুনিয়ায় ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)এর নবূওয়াতের কথা প্রচারিত হয়েছিল, সে তা জানে না একি বলছে!) সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের লেবাস পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তা খুলে দেওয়া হবে। (রাসূল (সা.) বলেন, এতে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া আসতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, এ ছাড়া তার কবরকে এতো সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, এতে তার এক দিকের পাজর অপর পাজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। তারপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করা হবে যার সাথে একটা লোহার হাতুড়ী থাকবে, যদি সে হাতুড়ী দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করা হত তাহলে পাহাড় ধূলা হয়ে যেত। এ হাতুড়ী দ্বারা ঐ ফিরিশ্‌তা তাকে সজোরে আঘাত করতে থাকবেন। এতে সে এমন বিকট চিৎকার করবে যা মানুষ ও জিন্ন ব্যতীত মাশরিক হতে মাগরিব পর্যন্ত সব মাখলূকই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশে যাবে। এরপর পুনরায় তাতে রূহ্ ফেরত দেওয়া হবে (এভাবে বারবার চলতে থাকবে)। (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও আবূ দাঊদ)।

কবর আযাব সম্পর্কে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ليسلط على الكافر فى قبره تِسعة وتِسعون تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، لو ان تنينا منها نفخ فى الأرض ما أنبتت خضرا.

কাফিরের জন্য তার কবরে নিরানব্বইটা সাপ নির্ধারন করে দেওয়া হবে। এগুলি তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। যদি সে সব সাপের একটা পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলে তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে কখনো কোন উদ্ভিদ গজাত না (দারেমী)।

মৃত্যুর পর রূহের অবস্থান

পূর্বেই বলা হয়েছে, মৃতদেহ কবরে রাখার পর রূহ্ দেহে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সাওয়াল জওয়াব হয়। উলামায়ে কিরামের মতে আলমে বারযাখে রূহের মধ্যে তারতম্য থাকবে। আম্বিয়া কিরামের (আ.) রূহ্ উর্দ্ধ জগতের ইল্লীনে সুউচ্চ অবস্থানে থাকবে। সেখানেও তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী রূহের অবস্থান তারতম্য থাকবে। শহীদগণের রূহ্ সবুজ পাখির আকৃতিতে

স্বাধীনভাবে জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে। জান্নাতের নহর সমূহে অবতরণ করবে, তার ফল-ফলাদি আহার করবে। এবং আরশের ছায়ায় স্বর্ণের ঝাড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

মুসনাদে আহ্‌মাদে বর্ণিত আছে,

عن عبد الله بن جحش أن رجلا جَاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله مَاذا لى ان قتلت فى سبيل الله؟ قال الجنة، فلما تولى قال إلا الدين سارنى جبريل عليه السلام أنفا.

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) -এর দরবারে এসে আরয করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হই তাহলে আমার কি হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি জান্নাত লাভ করবে। লোকটি চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন ঃ তবে ঋণ জান্নাতের প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হবে। জিব্‌রাঈল (আ.) এইমাত্র গোপনে আমাকে বলে গেলেন (মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেন,

رَأيت صَاحبكم مَحبوسًا على بَاب الجنة (مسند أحمد)

তোমাদের (কিছু) সাথীকে আমি জান্নাতের দরজায় রুদ্ধ দেখলাম (মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

এ থেকে কে বুঝা যায় যে, ঋণগ্রস্ত শহীদের রূহ্ বারযাখী যিন্দেগীতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে জান্নাতের দরজায় রুদ্ধ করে রাখা হবে। এছাড়া কিছু সংখ্যক রূহ্ মাটিতে থাকবে। কতক রূহ্ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীদের চুল্লীর মধ্যে অবস্থান করবে। কিছু সংখ্যক রূহ্ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে এবং পাথর গলাধঃকরণ করবে (শারহ্ আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা- ৪৫৫; ১৫৭-৫৮, আল-আকাইদুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ২৪০-৪১)।

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) এর বারযাখী জীবন

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবর বা বারযাখী জীবন শহীদদের বারযাখী জীবন অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। নবী করীম (সা.)বলেন,

ان الأنبيَاء أحيَاءٌ فِى قبُورِهم

আম্বিয়া (আ.) তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন (নাইলুল আওতার, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)।

বারযাখী জীবনে নবীগণের রূহ্ তাঁদের দেহের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

لَيس من عبد يصلى على إلا بلغنى صلواته قلنا وبعد وفاتك ؟

www.pathagar.com

قال وبعد وفاتى إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

কোন লোক আমার প্রতি দরূদ পাঠ করলে তা আমার নিকট পৌঁছে। আমরা (সাহাবীগণ) বললাম, আপনার ইন্তিকালের পর ? তিনি বললেন, আমার মৃত্যুর পরও। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের দেহ্ ভক্ষণ করা যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন (তিবরানী)।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ কোন লোক আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দিয়ে থাকি (আবূ দাঊদ ও বায়হাকী)।

وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه قال مررت بموسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره (مسلم)

মুসলিম শরীফে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে আমি মূসা (আ.) এর পাশ দিয়ে লালটিলা অতিক্রম করছিলাম, তখন দেখলাম যে, তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন (মুসলিম)।

শহীদগণের বারযাখী জীবন

যাঁরা আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার নিমিত্তে আল্লাহ্র পথে নিহত হয় অথবা যাঁদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তাঁরা শহীদ। আলমে বারযাখে তাঁরা জীবিত থাকেন। তাঁরা জান্নাতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন এবং রিয্ক হিসাবে জান্নাতের ফল আহার করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ٥

যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বোঝ না (২ ঃ ১৫৪)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ٥

www.pathagar.com

যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত (৩ ঃ ১৬৯)।

সহীহ্ মুসলিমে মাসরূক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

سألنا عبد الله عن عن هذه الأية « وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتاً بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ » فقال إما انا قد سألنا عن ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أُرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك قناديل، فاطلع عليهم ربهم إطلاعة، فقال : تشتهون شيئا ؟ فقالوا أى شئ تشتهى ونحن نسرح فى الجنة حيث شئنا ففعل ذالك ثلث مرات، فلما رأوا انهم لن يقولوا من ان يسألوا قالوا يا رب ان ترد ارواحنا فى اجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة اخرى فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا (مسلم)

আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) কে এ আয়াত - "যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রিয্‌ক পেয়ে থাকে" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তাঁদের রূহ্‌সমূহ সবুজ বর্ণের পাখীর মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র আরশের সঙ্গে ঝাড় লটকানো রয়েছে। তাঁরা জান্নাতে যথেচ্ছা বিচরণ করেন। এরপর তাঁরা (আবার) ঝাড়ের দিকে ফিরে আসেন। তাঁদের রব তাঁদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি কোন কিছুর আকাংখা আছে ? তাঁরা বলেন, আমরা আর কিসের আকাংখা করব ? আমরা তো জান্নাতের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাদেরকে এ প্রশ্ন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না - তখন তাঁরা বলেন, হে আমাদের রব! আমরা চাই যে, আমাদের আত্মাগুলোকে পুনরায় আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক যেন আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত লাভ করতে পারি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন দেখবেন তাদের আর কোন কিছুর আকাংখা নেই তখন তাদের সংগে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করেন। (মুসলিম)

www.pathagar.com

পুনরুত্থান

পূর্বেই বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি জগতের সবকিছুই একদিন বিলীন করে দিবেন। এরপর একটি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের সবাইকে তিনি পুনর্জীবিত করে তাদের মৃত্যুর স্থান অথবা কবর থেকে উত্থিত করবেন, এর নাম 'পুনরুত্থান'। আর তখন থেকেই তাদের আখিরাতের জীবন শুরু হবে। আখিরাতের জীবন ও দেহ-রূহ্ সমন্বিত হবে। তবে সে জীবন হবে দুনিয়ার জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের (আল-আকীদাতুল ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা-২৬৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? দয়াময় আল্লাহ্ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন (৩৬ ঃ ৫২)।

মৃত্যুর পর মানব দেহ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। তবে দেহের মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে 'আজাবুজ জানাব্' নামে একটি ক্ষুদ্র হাড় রয়েছে, তা নিশ্চিহ্ন হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ হাড় থেকে মানব দেহ পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)বলেন,

يبلى كل شئ من الإنسان الا عجب الذنب فيه يركب الخلق

মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের 'আজাবুজ জানাব্' নামক একটি হাড় ব্যতীত মানব দেহের সব কিছুই বিলীন হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন সে হাড় থেকেই গোটা দেহের পুর্ণগঠন করা হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল 'আজাবুজ জানাব্' কি ? তিনি বললেন, সরিষার দানার মত (মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি ক্ষুদ্র হাড়)। (হাকিম)।

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষের কোন কিছু অবশিষ্ট না রেখেও দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেননা, কোন প্রকার নমুনা ছাড়া যিনি মানুষ সৃষ্টি করতে পারলেন। তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন নয়। এ সত্ত্বেও মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র হাড়ের ক্ষুদ্রাংশ থেকে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা কিংবা মানুষকে পুণর্গঠিত করার ক্ষেত্রে যে কি রহস্য নিহিত রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন (ফাতহুল বারী, ৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫২ ও আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ, পৃষ্ঠা-২১০)।

কুরআন কারীমে পুনরুত্থানের বহু দলীল রয়েছে এবং তাতে প্রথমবার সৃষ্টি করাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা

www.pathagar.com

সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। অতএব পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যাপারে তিনি অপারগ নন। এবং তাঁর অসীম ইল্‌ম থেকে কিছু বিস্মৃতও হন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ
قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَأَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝

সে আমার সম্পর্কে উপমা উত্থাপন করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলুন, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন সেগুলো পঁচে যাবে? এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত (৩৬ঃ ৭৮-৭৯)।

মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা ও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার পরিবর্তন এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর গাছপালা, বৃক্ষলতা, ইত্যাদি সৃষ্টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যিনি এমন সৃষ্টি নৈপুন্য ও অসীম জ্ঞান ক্ষমতার অধিকারী, তিনি অবশ্যই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ সক্ষম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ، ذٰلِكَ بِاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَّاَنَّ السَّاعَةَ
اٰتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

হে লোক সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর 'আলাকা'[১] হতে এরপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌ত পিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য; আমি যা

১. আলাকা ঃ সংযেওক্ত, ঝুলন্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি

www.pathagar.com

ইচ্ছা করি তা এক নিদিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমার পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের জন্য কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে, তারা যা কিছু জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, এরপর এতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্যশ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সব রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন (২২ ঃ ৫-৬)।

তিনি আরো বলেন,

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে পুনঃ সৃষ্টির ব্যপারে তারা সন্দেহ পোষণ করবে (৫০ ঃ ১৫)?

আসমান যমীন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা, বৃক্ষলতা, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর, মানব-দানব, পশু-পাখী ইত্যাদীর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এরপর পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার কোনই অর্থ থাকতে পারে না (আল-আকাইদুল ইসলামিয়া,পৃষ্ঠা- ২৭১)।

হাউযে কাউসার

'কাউসার' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল আধিক্য। শরী'আতের পরিভাষায় এ শব্দের অর্থ অধিক কল্যাণ, যা নবী করীম (সা.) কে প্রদান করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে নবী করীম (সা.) কে তাঁর উম্মাতের পানি পান করানোর জন্য অতি বরকতময় জান্নাতের যে নহরটি প্রদান করা হবে তাকে 'হাউযে কাউসার' বলা হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি (১০৮ ঃ ১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে দান করেছেন। বিখ্যাত মুফাস্‌সির মুজাহিদ (র.) কাউসারের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার নহরও অন্তর্ভূক্ত।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর তন্দ্রার ভাব দেখা দিল। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে

www.pathagar.com

আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ সহ সূরা কাউসার তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা জান কাউসার কি ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার প্রতিপালক আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ রয়েছে এবং এই হাউযে কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত পানি পান করতে যাবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্যই একটা হাউয থাকবে যে হাউয থেকে নবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে পানি পান করাবেন; পানি পান করার জন্য কার নিকট কত বেশী লোক আসবে তা নিয়ে সব নবীই গর্ববোধ করবেন। আমি আশাবাদী যে, পানি পান করার জন্য সবচেয়ে বেশী লোক আমার নিকটই আসবে (তিরমীযী)।

আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট আমার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার আরয করলাম। তিনি বলেছেন, হাঁ করব। আমি বললাম, বিশাল হাশর ময়দানে আমি আপনাকে কোথায় খুঁজব ? তিনি বললেন, প্রথমে আমাকে পুলসিরাতে খুঁজবে। আমি আরয করলাম, সেখানে যদি আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ না হয় তাহলে কোথায় খুঁজব? তিনি বললেন, যেখানে নেকী বদীর ওযন হয় সেখানে। আমি আরয করলাম, সেখানেও যদিও না পাই তা হলে কোথায় ? তিনি বললেন ঃ তাহলে হাউযে কাউসারে। এই জায়গার কোন এক জায়গায় অবশ্যই আমাকে পাবে (তিরমিযী)।

হাউযে কাউসারের বৈশিষ্ট্য

নবী করীম (সা.) হাউযে কাউসারের যে বিবরণ দিয়েছেন তা সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ ও মুসনাদে আহ্‌মাদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যার মূল বক্তব্য হল, হাউযে কাউসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা, বরফের চেয়ে ঠান্ডা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং হাউযের নীচের মাটি মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধ যুক্ত হবে। হাউযটির দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান হবে। এবং এত দীর্ঘ হবে যে এর এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত যেতে একমাস সময় লাগবে। আর এটিই হবে সর্ববৃহৎ আকাশের তারকারাজির সমান বা তার চেয়ে বেশী হবে তার পানপাত্র। যে ব্যক্তি একবার এ হাউয থেকে পানি পান করবে তার কখনো পিপাসা লাগবে না । আর যে ব্যক্তি তা হতে বঞ্চিত হবে তার পিপাসা কখনই নিবৃত্ত হবে না।

হাউযে কাউসার হাশর ময়দানে হবে। মানুষ কবর থেকে হাশর ময়দানে উঠবে তখনই তাদের পিপাসা লাগবে। সূর্যের প্রখর তাপে তা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। হাউযে কাউসারের পানি পান করার পর সম্পূর্ণ পিপাসা মিটে যাবে। আর কখনো পিপাসা লাগবে না। যারা আল্লাহ্‌র দীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে তাদেরকে হাউযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে ব্যর্থ হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

www.pathagar.com

إنى فرطكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى ثم يحال بينى وبينهم فأقول أنهم منى فيقال إنك لا تدرى مَا أُحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدى.

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পানি পান করাবার জন্য আমি তোমাদের আগেই হাউযে কাউসারে গিয়ে পৌছবো। যে আমার নিকট আসবে সে হাউযে কাউসারের পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি হাউযে কাউসারের পানি পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। পানি পান করার জন্য এমন কিছু লোক আমার নিকট আসবে, যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে, কিন্তু তাদরকে আমার নিকট আসতে দেয়া হবে না বরং আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে এবং তাদেরকে পানি পান করা থেকে বঞ্চিত করা হবে। এরপর আমি বলব, এরা তো আমার উম্মাত, এদেরকে আসতে দাও। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পর (দীনের মধ্যে) এরা নতুন নতুন কি কি আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক দূর হোক; যারা আমার পরে আমার দীনকে বিকৃত করে দিয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

হাশ্‌র

'হাশ্‌র' শব্দের অর্থ একত্রিত করা। শরী'আতের পরিভাষায় কিয়ামতের দিন সমতল এক বিশাল ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য সকল প্রাণীকে একত্রিত করাকে 'হাশ্‌র' বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে কিয়ামত সংঘটিত করার জন্য তিনবার সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে।

প্রথমটিকে বলা হয় 'نفخة الفزع' অর্থাৎ বিভিষিকা সৃষ্টিকারী ফুঁক। এ ফুৎকার সকল সৃষ্টিকে কাঁপিয়ে তুলবে ও ভীত সন্ত্রস্ত করবে। দ্বিতীয় ফুৎকার 'نفخة الصعق' প্রচণ্ড বিপর্যয়কারী ফুৎকার। এর বিকট আওয়াজ শোনামাত্র সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র মহাপরাক্রমাশালী আল্লাহ্ তা'আলা এবং তিনি যা চান তা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তৃতীয়বার আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে তখনই সকল ধ্বংস প্রাণী উঠে দাঁড়াবে। এটাকে 'نفخة القيام لرب العالمين' বা রবের জন্য উঠে দাঁড়াবার ফুঁক বলা হয় (মুখ্‌তাসার তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪৩)।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হিসাব-নিকাশ ও বিচার-ফায়সালার জন্য হাশ্‌র ময়দানে প্রাণীদেরকে একত্রিত করা হবে।

হাশ্‌র দিনের কয়েকটি অবস্থা এখানে পেশ করা হল ঃ

www.pathagar.com

হাশরের দিন ভূপৃষ্ঠকে সমতল করা হবে। পাহাড় পর্বত নদী-নালা ও বন-জংগল কিছুই থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ٥

স্মরণ করুন! যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না (১৮ : ৪৭)।

কিয়ামতের দিন যমীনকে এমনভাবে সমতল করা হবে যে তাতে কোন বক্রতা বা উঁচু-নীচু কিছুই থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ٥

এরপর তিনি যমীনকে পরিণত করবেন মসৃন সমতল ময়দানে, যাতে তুমি কোন বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না (২০ : ১০৬)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد.

সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : কিয়ামতের দিন লোকদেরকে মিহি আটার তৈরী রুটির মত সমতল শুভ্র ধুসর ময়দানে একত্রিত করা হবে যাতে কারো ঘর বাড়ীর কোন চিহ্ন থাকবে না (বুখারী ও মুসলিম)।

তৃতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর যমীন বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মানুষ যমীন থেকে বেরিয়ে হাশর ময়দানের দিকে ছুটে আসবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ٥

যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে, এই সমবেত সমাবেশ করান আমার জন্য সহজ (৫০ : ৪৪)।

মানুষ জিন্ন ফিরিশ্তা ও পশু-পাখী সবই হাশর ময়দানে পুনরুত্থিত হবে। মানুষ এবং

www.pathagar.com

জিন্নকে দুনিয়ার কাজ কর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য হাশর ময়দানে উঠানো হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ

হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেন নি যাঁরা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সর্তক করত? তারা বলবে হাঁ, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল আর তারা যে কাফির ছিল তাও তারা স্বীকার করবে (৬ : ১৩০)।

আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে ফিরিশ্তাগণ তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য হাশ্র ময়দানে উঠবেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

ফিরিশ্তাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০ : ৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সে আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশ্তাগণ। আল্লাহ্ তা'আলা যা আদেশ করেন তা তারা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তারা তাই করে (৬৬ : ৬)।

জীব-জন্তুকে হাশ্র ময়দানে উঠানো হবে।[১]

১. আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্, পৃষ্ঠা-২০২।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যারা তোমাদের মত উম্মাত নয়, কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দিইনি; এরপর তাদের সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে (৬ ঃ ৩৮)।

এসব জীব-জন্তুর একটি অপরটির উপর পৃথিবীতে কোন প্রকার যুলুম করে থাকলে হাশরের ময়দানে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها.

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই হক্দারের হক্ আদায় করতে হবে। এমনকি শিং বিহীন ছাগল শিং বিশিষ্ট ছাগলকে গুতিয়ে প্রতিশোধ গ্রহন করবে (মুসলিম, তিরমিযী ও মাসনাদে আহ্মাদ)।

দুনিয়ায় মানুষের যে সব কাজকর্ম জীব-জন্তুরা প্রত্যক্ষ করেছে কিয়ামতের দিন তারা সাক্ষ্য দেবে। মানুষ কোন জীব-জন্তুর উপর কোন প্রকার অবিচার করে থাকলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে তারও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। আর সে শাস্তি তারা অবলোকন করবে।

এভাবে তাদেরকে হাশ্র ময়দানে উপস্থিত করার প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্র নির্দেশে তারা মাটি হয়ে যাবে (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ৬৫৪-৫৫)।

কিয়ামতের দিন অপরাধীদের মুখে ভর করে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে হাশ্র ময়দানে সমবেত করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ط

আল্লাহ্ তা'আলা যাকে পথপ্রদর্শন করেন সেই তো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে পথ-ভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য আপনি আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব;তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে (১৭ ঃ ৯৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞাস করা হল, হাশর ময়দানে কি ভাবে মুখের উপর ভর করে উঠানো হবে? তিনি বলেন,

اُلذى اُمشاهم على اُرجلهم قَادر على ان يمشيهم على وجوههم

যিনি তাদেরকে পায়ে হাঁটাতে পারেন তিনি তাদেরকে মুখের উপর ভর করে চালাতেও সক্ষম (বুখারী ও মুসলিম)।

হাশরের ময়দানে অপরাধীদেরকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, সে দিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে আতঙ্কে তাদের চক্ষু নীল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ه

যে দিন সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায় (২০ ঃ ১০২)।

হাশরের ময়দানে লোকদেরকে খালি পায়ে ও উলঙ্গরূপে উঠানো হবে অর্থাৎ জন্মকালে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ه

যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে আমি তার পুনরাবৃত্তি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই (২১ ঃ ১০৪)।

عَن عائشة قَالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يَوم القيامة حفاة عراة غرلاً قلت يَا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قَال يا عَائشة الأمر أشد من أن ينظر إلى بعض.

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন লোকদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নারী পুরুষ সবই কি একত্রে একজন আরেকজনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে ? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারো প্রতি তাকাবার অবকাশই পাবে না (বুখারী ও মুসলিম)।

হাশর ময়দানে সূর্য মাথার উপর থাকবে

হিসাব ও বিচারের জন্য যেদিন লোকদেরকে হাশর ময়দানে একত্রিত করা হবে সেদিন সূর্য অতি নিকটবর্তী করা হবে।

www.pathagar.com

হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ

تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل فتكون الناس على قدر أعمالهم من العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمهم العرق الجاما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.

কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকূলের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। এমনকি তা প্রায় এক মিলের[১] ব্যবধান এসে যাবে। তখন সূর্যের তাপে মানুষ নিজ নিজ আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। করো কারো ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে। করো হাঁটু পর্যন্ত হবে কারো কোমর পর্যন্ত, আবার কারো ঘাম তার নিজের জন্য লাগাম হয়ে যাবে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় হাত মুবারক দ্বারা নিজের মুখের দিকে ইশারা করলেন। (অর্থাৎ কারো ঘাম তার মুখ পর্যন্ত হবে (মুসলিম)।

হাশর ময়দানে সূর্য যমীনের অতি নিকটবর্তী হওয়াতে সূর্যের তাপ এত প্রখর এত প্রচণ্ড হবে যে যমীন পুড়ে তামা হয়ে যাবে। যমীনে পা রাখার কোন উপায় থাকবে না এবং আশ্রয় নেওয়ার মত কোন জায়গাও থাকবে না। মানুষ ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে। হাশর ময়দানের এ কঠিন ও ভয়াবহ দিনটির পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কিন্তু এ দীর্ঘ সময় ঈমানদার লোকদের নিকট স্বল্পতম মনে হবে। এ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما طول هذا اليوم فقال والذى نفسى بيده أنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلواة المكتوبة يصليها فى الدنيا.

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ঐ দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সাহাবায়ে কিরাম এতে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কতই না দীর্ঘ হবে সে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ!

১. মিল ঃ মিল শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে যেমন, সুরমা শলাকা, ক্ষত পরিমাপক যন্ত্র, মাইল পোষ্ট, দৃষ্টিসীমা, দু'হাজার গজের দূরত্ব ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মু'মিনদের জন্য সে দিনটিকে খুবই সহজ করা হবে। এমনকি দুনিয়াতে এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করার সময় অপেক্ষাও সহজ হবে (বায়হাকী)।

মহান আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিতি ও জিজ্ঞাসাবাদ

হাশর ময়দানে লোকদের সমবেত করার পর বিচারের জন্য মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাযির করা হবে। এবং পার্থিব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ٥

এবং তাদেরকে তোমার রবের সামনে উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে তোমাদেরকে প্রথমবার যে ভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুতক্ষণ আমি উপস্থিত করব না (১৮ ঃ ৪৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥

অতএব এ আপনার প্রতিপালকের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব (১৫ ঃ ৯২-৯৩)।

হাদীসে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন,

عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ان المرأ يسئل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه عن فتات الطينة باصبعه.

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ হে মু'আয ! কিয়ামতের দিন মানুষকে তার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনকি চোখে সুরমা দেওয়া মাটির টুক্রা হাতে নেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (ইব্ন আবূ হাতিম, সূত্র ঃ মুখ্তাসার তাফসীরে ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২০)।

মীযান ও নেকী বদীর ওযন

'মীযান' শব্দের অর্থ দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক যন্ত্র। শরী'আতের পরিভাষায় 'মীযান' বলা হয়ে সেই পরিমাপক যন্ত্রকে যা দ্বারা শেষ বিচারের দিন নেকী বদী ও ভাল-মন্দ পরিমাপ করা হবে।

www.pathagar.com

শেষ বিচারের দিন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। তাতে মানুষের নেকী-বদীর পরিমাপ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ۞

আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট (২১ ঃ ৪৭)।

ওযনের দ্বারা আমলের পরিমাণ নির্ধারিত হবে এবং আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও প্রতিফল দেওয়া হবে (শারহ্ আল-আকীদাহ্ আত্-তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা ৪১০)।

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে আমল পরিমাপ যন্ত্রের দু'টো পাল্লা থাকবে এবং তা প্রকাশ্যভাবে পরিদৃষ্ট হবে।

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له اتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمتك كتابى الحافظون ؟ قال : لا يارب، قال : ألك عذر اوحسن فيبهت الرجل، فيقول لا يارب، فيقول : بلى ان لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك ، فتخرج له بطاقة فيها اشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضرو ذالك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول انك لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة، قال : فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة ولا يثقل مع بسم الله شئ.

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল মাখলূকের সামনে আমার একজন উম্মাতকে আলাদাভাবে উপস্থিত করবেন এবং তার আমলনামার নিরানব্বইটি রেকর্ড বই প্রকাশ করবেন। তার প্রত্যেকটি চোখের দৃষ্টিসীমা পরিমাণ বিস্তৃত। এরপর তিনি তাকে বলবেন, এর কোনটিকে তুমি

www.pathagar.com

কি অস্বীকার করবে? আমল সংরক্ষণকারী লেখকগণ কি তোমার প্রতি যুলুম করেছে ? লোকটি বলবে না, হে আমার রব! তিনি বলবেন, তোমার কি কোন ওযর আছে অথবা কোন উত্তম আমল আছে ? লোকটি নির্বাক হয়ে যাবে, এরপর বলবে, হে আমার রব! আমার কোন ওযর বা আমল নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার একটি নেকী আমার কাছে আছে। আজ তোমার প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। এরপর তার জন্য একটা কাগজের টুকরা বের করা হবে যাতে লিখা থাকবে أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, এসো তুমি তোমার ওযন দেখে নাও। তখন লোকটি বলবে, এত সব দলীল দস্তাবেজের সাথে এ কাগজ টুক্‌রার কী তুলনা হতে পারে ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তখন খাতা পত্রগুলি এক পাল্লায় এবং কাগজের টুক্‌রাটি অপর পাল্লায় রাখা হবে। তিনি বলেন, এতে খাতা পত্রের পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে এবং কাগজের টুক্‌রাটির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। কোন কিছুর ওযন আল্লাহ্ নামের চেয়ে বেশী ওযন হতে পারে না (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, সূত্র ঃ শারহু আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা-৪১০)।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষের আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন। সুতরাং তাঁর ইল্‌মের ভিত্তিতে মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে এবং কোন প্রকার ইনসাফেরও খেলাপ নয়। তবুও হাশর ময়দানে শেষ বিচার দিনে এরূপ করা হবে না। বরং মানুষের সামনেই তাদের আমলনামা পেশ করা হবে এবং ওযন করা হবে। যখন অপরাধ অস্বীকার করবে তখন সাক্ষী ও দলীল প্রমাণ দ্বারা অপরাধ সাব্যস্ত করে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। যাতে তারা বলতে না পারে যে তাদেরকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝

সেদিন যথার্থই ওযন করা হবে; এরপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত (৭ ঃ ৮-৯)।

তিনি আরও বলেন,

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

www.pathagar.com

তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে। কিন্তু যার পাল্লা হাল্‌কা হবে তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়া'। আপনি জানেন তা কি ? তা অতি উত্তপ্ত আগুন (১০১ ঃ ৬-১১)।

কোন কোন আলিমের মতে মানুষের আমল আকৃতিহীন হলেও শেষ বিচারের দিন আমলের আকৃতি প্রদান করে তা পাল্লায় ওযন করা হবে। হাদীস থেকে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসে আছে, শেষ বিচারের দিন মানুষ তাদের নেক আমল সমূহ বড় বড় পাহাড়ের আকৃতিতে দেখতে পাবে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অনেক পরিমাপক যন্ত্র আবিস্কার করেছে। যার ফলে পূর্বে মানুষ যে সব জিনিস পরিমাপ করতে পারত না এমন অনেক কিছুই পরিমাপ করতে সক্ষম হচ্ছে। যেমন, থার্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা, ল্যাক্টোমিটার দ্বারা পদার্থের ঘনত্ব, ব্যেরো-মিটার দ্বারা বায়ূচাপ ইত্যাদি পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। মানুষের কথা যা মানুষের মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ইথারে বিলীন হয়ে যায়, বিজ্ঞানের বদৌলতে বর্তমান যুগে মানুষের সে কথাকেও চিত্র সহকারে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। মানুষের আমল বা নেক-বদী অপদার্থ এবং আকার-আকৃতি ও ওযনহীন হলেও মহাপরাক্রমাশীল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে তা পরিমাপ করা কিংবা নেকী-বদীর আকৃতি প্রদান করে তা দাঁড়িপাল্লায় ওযন করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও তা সহজবোধ্য হয়ে যাচ্ছে।

বিচার

পরকালীন জীবনে পুরস্কার ও শাস্তির যে ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন, হিসাব নিকাশ ও বিচার ফয়সালার পর থেকেই তা চূড়ান্তভাবে শুরু হবে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা নিরূপন ও ভাল মন্দ পার্থক্য করার জন্য বিচার করা হবে (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-৬২৭)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

আমার নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে, এরপর তাদের হিসাব গ্রহণ আমারই দায়িত্ব।

শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَآ أَدْرَاكَ يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ٥

আপনি জানেন, সে বিচারের দিনটি কি ? আবার বলি আপনি জানেন কি সে বিচারের দিনটি কী ? যে দিন একের জন্য অপরের কিছু করবার সামর্থ থাকবে না। এবং সে দিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্ তা'আলার (৮২ ঃ ১৭-১৯)।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ○

যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে। সেদিন তার কোন সামর্থ থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না (৮৬ ঃ ৯-১০)।

গোপন বিষয়াদি বলতে মানুষের সেই সব কার্যকলাপকেও বুঝানো হয়েছে যা দুনিয়াতে গুপ্ত ছিল এবং সেই সব ব্যাপারগুলোকেও বুঝান হয়েছে যার বাহ্যিকরূপ মানুষের সামনে সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু তার পিছনে যে মনোভাব ও সংকল্প যে স্বার্থ প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও যে কামণা বাসনা সক্রিয় ছিল। তার প্রকৃত অবস্থা মানুষের কাছে গুপ্ত থেকে গিয়েছিল। এ সবই যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে (তরজমা কুরআন মাজীদ, সূরা আত্-তারিক, টিকা - ৩)।

সে দিন সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে। কারো প্রতি সামান্যতম যুলুমও করা হবে না। ছোট বড় সব আমলই বিচার হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

(বলা হবে) আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর (৪০ ঃ ১৭)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ○

এবং আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসূস! এ কেমন আমলনামা, এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি যুলুম করবেন না (১৮ ঃ ৪৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে (৯৯ ঃ ৭-৮)।

www.pathagar.com

অপরাধ প্রমাণ করার প্রদ্ধতি

ক. অপরাধ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী হিসাবে আমলনামা পেশ করা হবে যাতে মানুষের পার্থিব জীবনের কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যে সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ আমলনামা লিখার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরাও সাক্ষী দিবেন। দুনিয়াতে মানুষ ভালমন্দ যাই করুক না কেন সবই সম্মানিত ফিরিশ্তার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কৃতকর্মের সংরক্ষিত কপি বা আমলনামা পড়তে দেয়া হবে। এবং সেই আমলনামা অনুসারে বিচার করা হবে। এ ব্যাপারে কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। যারা ডানপন্থী, দুনিয়াতে যারা আমলে সালিহ্ করেছে তাঁদের আলমনামা তাঁদের ডান হাতে দেওয়া হবে। আর যারা দুনিয়ায় বেঈমান ছিল তাদের আলমনামা পেছন দিক থেকে তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-৬৫৮)।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاۤؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْۤـًٔا بِمَاۤ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ، وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝

তখন যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, লও, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে সুখী জীবন যাপন করবে; সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলসমূহ নাগালের মধ্যে অবনমিত থাকবে। তাদেরকে বলা হবে বিগত দিনে যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা পানাহার কর তৃপ্তির সাথে। কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! যদি আমার আমলনামা আমাকে নাই দেওয়া হতো এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! (৬৯ ঃ ১৯-২৬)।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا، وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا، وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا، وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

www.pathagar.com

যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে। এবং সে তার পরিবার পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে এবং যার তার আমলনামা তার পিঠের পশ্চাৎ দিক থেকে দেওয়া হবে সে অবশ্য তার ধ্বংস আহবান করবে এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে (৮৪ ঃ ৭-১২)।

খ. আল্লাহ্ তা'আলা যদিও সর্বজ্ঞ তবুও সেদিন প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন ফয়সালা করবেন না। সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন অপরাধী নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করবে। অপরাধী তার অপরাধ অস্বীকার করলে তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে। এবং তার অংগ-প্রতংগকে কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হবে। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥

আজ আমি তাদের মুখ মোহর করে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৩৬ ঃ ৬৫)।

আরও ইরশাদ হয়েছে,

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥

পরিশেষে যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন ? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ্ যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (৪১ ঃ ২০-২১)।

গ. শেষ বিচারের দিন যমীন মানুষের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ٥

সে দিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (৯৯ ঃ ৪)।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ

قرأ رسول الله صلى عليه وسلم "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا " فقال : أتدرون ما أخبارها ؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فان أخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها، ان تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها .

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াত " يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا " তিলাওয়াত করে বলেন, যমীন কিসের খবর দিবে, তা কি তোমরা জান ? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। তিনি বললেন, সকল নারী পুরুষ যমীনের উপর যা কিছু করছে যমীন তার সাক্ষ্য দেবে। যমীন বলবে, উমুক ব্যক্তি উমুক দিন এই কাজ করেছে। তিনি বললেন, এটাই যমীনের খরব দেওয়া (মুসনাদে আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই হিসাব গ্রহণ করবেন

কোন মাধ্যম ছাড়া মহান আল্লাহ্ নিজেই সমস্ত মানুষের হিসাব গ্রহণ করবেন। আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন,

مَامنكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حِجَاب يحجبه فينظر ايمن منه فلا يرى إلا ماقدم من عمله وينظر اشأم منه فلا يرى الا مَا قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة.

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব কথা বলবেন না। তার ও তার রবের মাঝে কোন দোভাষী এবং এমন কোন পর্দা থাকবে না যা তাকে আড়াল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে তখন পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। বামে তাকাবে তখনও পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সামনের দিকে তাকালে দোযখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না যা একেবারে সামনে অবস্থিত। অতএব খেজুরের একটি টুকরার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করা (বুখারী ও মুসলিম)।

আলী (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্ তা'আলা একই সাথে সমস্ত মানুষের হিসাব কিতাব গ্রহণ করবেন, তিনি বললেন, যে ভাবে তিনি একই সময়ে সমস্ত মানুষকে রিযক প্রদান করেন সে ভাবেই তিনি সমস্ত মানুষকে একই সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

www.pathagar.com

হিসাব-নিকাশে কঠোরতা

কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে করা হবে। মানুষের ক্ষুদ্রতম কোন আমলও হিসাব নিকাশ থেকে বাদ পড়বে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার যাবতীয় ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান ও প্রতিফল লাভ করবে। এমন কি কোন নেক কাজের নিয়্যাত করলে তারও প্রতিফল দেওয়া হবে (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ২৮৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ٥

কেউ অণু পরিমাণ সব কাজ করে থাকলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে (৯৯ ঃ ৭-৮)।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন,

ليس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك فقلت يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذالك العرض وليس أحد يناقش الحساب يهلك.

কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। (আয়িশা (রা.) বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি "যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে অচিরেই তার নিকট থেকে হিসাব নেওয়া হবে সহজভাবে।" তখন রাসূলাল্লাহ (সা.) বললেন ঃ সেটা তো শুধু পেশ করা মাত্র। যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

মু'মিন বান্দার হিসাব

আল্লাহ্ তা'আলা খাটি মু'মিনদের হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করবেন এ সম্পর্কে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أى رب حتى قرره بذنوبه ورأى فى نفس أنه قد هلك قال سترتها عليك فى الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين.

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনকে নিজের নিকটবর্তী করবেন এবং তাঁর নিজ বাজু তার উপর রেখে তাকে ডেকে নেবেন। এরপর তিনি সে বান্দাকে বলবেন, তুমি এ গুনাহ সম্পর্কে কিছু জান কি ? এ গুনাহ সম্পর্কে আবগত আছে কি ? সে বলবে, হাঁ। হে আমার রব! আমি অবগত আছি। শেষ নাগাদ একটা একটা করে সমস্ত গুনাহর স্বীকৃতি আদায় করবেন। এতে সে বান্দা নিশ্চিত মনে করবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এ সমস্ত গুনাহ ঢেকে রেখেছিলাম। আজ আমি তা মাফ করে দেব। এরপর তাকে তার নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে সকল সৃষ্টির সামনে আনা হবে এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা দেওয়া হবে এরা তারাই যারা আপন রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করত। জেন রাখ! এসমস্ত যালিমদের উপর আল্লাহ্র লানত (বুখারী ও মুস-লিম)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেন,

يحشر الناس فى صعيد واحد يوم القيامة فينادى مناد فيقول أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر لسائر الناس إلى الحساب.

কিয়ামতের দিন মানব মণ্ডলিকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায় যাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক থাকত। তখন অল্প কিছু সংখক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং তারা বিনা হিসাবে জন্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর অবশিষ্ট সব মানুষ হতে হিসাব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে (বায়হাকী)।

নূর বন্টন ও পুলসিরাত পার

হাশর ময়দানে কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পুলসিরাত পার হওয়ার পালা শুরু হবে। হাশর ময়দান জাহান্নাম দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। জাহান্নাম পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য জাহান্নামের উপর একটা সেতু থাকবে যাকে 'পুলসিরাত' বলা হয়। এটি হবে তরবারীর চেয়ে ধারালো, পশমের চেয়ে সরু এবং অত্যন্ত পিচ্ছিল। সব মানুষকে তা অতিক্রম করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তখন মানুষ পুলসিরাতের নিকটে অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকবে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الارض والسموات فقال : هم فى الظلمة دون الجسر.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয় সে দিন মানুষ কোথায় থাকবে যে দিন পরিবর্তিত করা হবে যমীনকে অন্য যমীনে। তিনি বলেন, তখন মানুষ পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারে থাকবে (মুসলিম)।

www.pathagar.com

পুলসিরাত হবে অন্ধকারময় আর তা পার হওয়ার জন্য আলোর ভীষণ প্রয়োজন হবে। কিন্তু সেদিন ঈমান ও নেক-আমলের নূর ব্যতীত আর কোন আলো থাকবে না। নূর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে এবং তা মু'মিনগণকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমল অনুসারেই নূর দেওয়া হবে। কাউকে পর্বত সমান নূর দেওয়া হবে কাউকে দেওয়া হবে এর চেয়ে কম। আবার কাউকে দেওয়া হবে খেজুর গাছের সমান নূর, কাউকে দেওয়া হবে তার চেয়ে কম। সব চেয়ে কম নূর যাকে দেওয়া হবে তার নূর তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর দেওয়া হবে এবং তা মিট মিট করে জ্বলবে। কখনো তা নিভে যাবে আবার কখনো জ্বলে উঠবে। যখন জ্বলে উঠবে তখন সে অগ্রসর হবে আর যখন নিভে যাবে তখন ধমকে দাঁড়িয়ে যাবে (শারহু আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা- ৪৭৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

সে দিন আপনি দেখবেন, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে তাদের সামনে ও ডানে তাদের নূর প্রধাবিত হবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহা সাফল্য (৫৭ ঃ ১২)।

নূর পেয়ে মু'মিন নারী পুরুষ পুলসিরাত অতিক্রম করা শুরু করবে এবং তাঁদের নূরের অলোতে মুনাফিক নারী পুরুষও তাদের পিছে পিছে চলতে থাকবে। মু'মিনগণ অনেক দুর চলে গেলে মুনাফিকরা তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, তোমাদের আলোর সাহায্যে আমরাও যেতে পারবো। এর জবাবে ঈমানদার লোকেরা বলবে, এখানে নিজের নূরেই চলতে হবে, অন্যের নূরে চলার নিয়ম নেই। যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল তোমরা সেখানে গিয়েই নূর সংগ্রহ কর। নূর সংগ্রহ করার জন্য মুনাফিকরা ফিরে গিয়ে সেখানে কিছুই পাবে না। অবশেষে তারা নিরুপায় হয়ে মু'মিনদের পিছনে ছুটতে থাকবে। তখন তাদের ও মু'মিনদের মাঝে একটা প্রাচীর স্থাপিত হয়ে যাবে। তখন তারা আর অগ্রসর হতে পারবে না। প্রাচীরের ভেতরে থাকবে আল্লাহ্‌র রহমত আর বাইরে থাকবে শাস্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ○

www.pathagar.com

যে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম। যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং নূর সংগ্রহ কর। এরপর উভয় দলের মাঝে একটা প্রাচীর স্থাপিত হবে। যাতে থাকবে একটা দরজা এর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত। আর বাহিরে থাকবে আযাব (৫৭ : ১৩)।

মুনাফিক মহা বিপদেপতিত হয়ে ভীষণ পেরেশান হয়ে পড়বে এবং করুণ সুরে মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম। তোমাদের সাথে নামায পড়েছি ও রোযা রেখেছি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

মুনাফিকরা মু'মিগণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না। তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু তোমারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করছে। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহ্র হুকুম না আসা পর্যন্ত। আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্র সম্পর্কে (৫৭ : ১৪)।

পুলসিরাত অতিক্রম

পুলসিরাত অতিক্রম করা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۝

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই পুলসিরাত অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব (১৯ : ৭১-৭২)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

يضرب الصراط على ظهر جهنم فأكون انا وامتى أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم.

www.pathagar.com

জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। সর্বপ্রথম আমি ও আমার উম্মাত তা অতিক্রম করব। সে দিন নবী রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউই কোন কথা বলতে পারবে না আর তাঁরাও শুধু বলবেন, হে আল্লাহ্ ! নিরাপদ রাখুন, নিরাপদ রাখুন (মুসলিম)।

জাহান্নামের উপর দিয়ে হাশর ময়দান থেকে জান্নাত পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য সব মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হবে। ঈমানদার লোকেরা নিজ নিজ ঈমান ও আমল অনুসারে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। প্রথম শ্রেণীর জান্নাতী লোকেরা বিজলীর গতিতে পুলসিরাত পার হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা পার হবে বায়ুর গতিতে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা পার হবে দ্রুতগামি ঘোড়ার গতিতে, চুতর্থ শ্রেণীর লোকেরা পার হবে উট চলার গতিতে, কেউ দৌড়ায়ে এবং কেউ হাঁটার গতিতে পুলসিরাত পার হবে। যাদের নূর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে মিটমিট করে জ্বলতে থাকবে তাদের পুলসিরাত পার হতে খুবই কষ্ট হবে। এক হাত পিছলে যাবে অন্য হাত আঁকড়ে ধরবে, আবার এক পা পিছলে যাবে অন্য পা দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। এভাবে বহু কষ্টে তারা পার হবে। তাদের একপাশ আগুনে ঝলসে যাবে। লৌহ অংকুশের আঘাতে তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। এভাবে পার হয়ে তারা আল্লাহ্র প্রশংসা করে বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে আগুন দেখাবার পর তা থেকে নাজাত দিলেন (শারহু আকীদাতিত্ তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা-৪০৮)।

পুলসিরাত পার হওয়ার সময় এক প্রকার লৌহ অংকুশ জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে এবং মানুষকে তাতে আটকিয়ে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সে গুলি জাহান্নামীদেরকে আটকিয়ে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে। জান্নাতীরা এর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে নিরাপদে পুলসিরাত পার হতে যাবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য ও বাস্তব, অস্তিত্বশীল কাল্পনিক নয়

একথা অনস্বীকার্য যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বাস্তব সত্য এবং এর অস্তিত্ব রয়েছে। এটা ধারনা বা কল্পনা প্রসূত নয়। কুরআনে কারীমে জান্নাত ও জাহান্নামের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও জাহান্নামের শাস্তি নিছক কল্পনা প্রসূত কোন জিনিস নয় বরং তা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً، فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ، فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ، وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ

অনেক মুখমণ্ডল সে দিন হবে আনন্দোজ্জ্বল। নিজেদের কর্ম সাফল্যে পরিতৃপ্ত, সুমহান জান্নাতে। সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না। সেখানে বহমান প্রস্রবণ। উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন

www.pathagar.com

শয্যা। প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র। সারি সারি উপাধান এবং বিছানা গালিচা (৮৮ ঃ ৮-১৬)।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ لَهُمْ مَا يَشَآؤُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ٥

আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের-কোন দূরত্ব থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল - প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমূখী হিফাযতকারীর জন্য, যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে এবং বিনীতচিত্তে উপস্থিত হয়; তাদেরকে বলা হবে, শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর, এ হচেছ অনন্ত জীবনের দিন। সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক (৫০ ঃ ৩১- ৩৪)।

অনুরূপভাবে জাহান্নাম বাস্তব সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ٥

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত; তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। তাদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে; কাঁটাযুক্ত শুষ্কগুল্ম ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। এটা তাদেরকে পুষ্টও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্তি করবে না (৮৮ ঃ ২-৭)।

তিনি আরো বলেন,

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ، لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرَةٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ، فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ، فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ، هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ٥

এরপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কূম বৃক্ষ থেকে। এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে; তারপর তোমরা পান করবে উত্তপ্ত পানি - পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন (৫৬ ঃ ৫১-৫৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করবে অচিরেই আমি তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেব যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমাশীল ও প্রজ্ঞাময় (৪ ঃ ৫৬)।

এ ছাড়াও কুরআনের আরো অনেক আয়াত ও রাসূল (সা.) এর বহু হাদীস রয়েছে যাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য (আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ, ২২৭-২২৮, পৃষ্ঠা)।

জান্নাতের বৈশিষ্ট্য ও নিয়ামত সামগ্রী

কুরআন মজীদের বহু আয়াত ও বহু সংখ্যক হাদীসে জান্নাতের বৈশিষ্ট ও নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। এখানে তাঁর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও কিছু নিয়ামতের আলোচনা করা হল।

জান্নাতের প্রশস্ততা

জান্নাত এত বিস্তত যে, এর প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের ন্যায়। আসমান ও যমীনের চেয়ে অধিক বিস্তৃত কোন জিনিস মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রশস্ততাকে আসমান ও যমীনের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত (মা'আরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা-২০৫)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥

আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমান ও যমীনের ন্যায় যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য (৩ ঃ ১৩৩)।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

وفى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسئلوه الفردوس •

জান্নাতের স্তর হবে একশ'টি। প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের পরিমাণ। জান্নাতুল ফিরদাউসের স্তর হবে সর্বোপরি। তা থেকে প্রবাহিত হয় চারটি ঝর্ণাধারা এবং তার উপরেই রয়েছে মহান রবের আরশ। সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসেরই প্রর্থনা করবে (তিরমিযী)।

www.pathagar.com

জান্নাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাবে না, অসার ও অনর্থক কথাবার্তা শোনা যাবে না

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ وَلاَ تَعْرٰى، وَاَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَ تَضْحٰى

তোমার জন্য স্থির হলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না, বস্ত্রহীনও হবে না; সেখানে তুমি পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না (২০ ঃ ১১৮-১১৯)।

لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلاَّ سَلاَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য রিযক থাকবে। এটা সে জান্নাত যার অধিকারী করব আমার মুত্তাকী বান্দাগণকে (১৯ ঃ ৬২-৬৩)।

জান্নাতের পরিবেশ

জান্নাতে শীত গ্রীষ্ম কিছুই থাকবে না। সেখানে চির বসন্ত বিরাজমান। সেখানে থাকবে ফুল ও ফলের অপূর্ব সমাহার। তার সবুজ শ্যামলিমা ও সৌন্দর্য কখনো ম্লান হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلاَ زَمْهَرِيْرًا ۝

তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না (৭৬ ঃ ১৩)।

পৃথিবীতে সুখ শান্তি ও ভোগ বিলাসের উপকরণ যতই অর্জিত হোক না কেন, সম্পূর্ণ সুখী হওয়া সম্ভব নয়; যে কোন দুঃখ বা অশান্তি থাকবেই। কিন্তু জান্নাতে কোনই দুঃখ থাকবে না। সাধারণ জান্নাতীদেরও কোন আক্ষেপ অনুতাপ থাকবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لاَ يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝

সেখানে তাদের কোন অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না (১৫ ঃ ৪৮)।

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

اَلَّذِىْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لاَيَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ۝

www.pathagar.com

যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে চিরন্তন অবাসস্থান দান করেছেন, যেখানে কষ্টই আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না (৩৫ ঃ ৩৫)।

নবী করীম (সা.) বলেন,

من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه

যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা প্রাচুর্যময় অবস্থায় থাকবে। দারিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। এদের পোষাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না (মুসলিম)।

জান্নাতবাসীদের কখনও মৃত্যু হবে না

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ٥

প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন (৪৪ ঃ ৫৬)।

নবী করীম (সা.) বলেন,

ينادى مناد إن لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبدًا وإن لكم ان تحيوا فلا تموتوا أبدًا وان لكم ان تشبّوا فلا تهرموا أبدًا وان لكم ان تَنعم لا تبأسوا أبدًا.

জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না; তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে; কখনো মরবে না; তোমরা সর্বদা যুবক থাকবে; কখনো বৃদ্ধ হবে না এবং তোমরা সর্বদা আরাম আয়েশে থাকবে, কখনো হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না (মুসলিম)।

জান্নাতীগণ যা পেতে ইচ্ছা করবেন তাই পাবেন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ٥

সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা চাইবে (৪১ ঃ ৩১)।

সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাকে জান্নাতে যে অট্টালিকা দেওয়া হবে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তার জন্য জান্নাতে একটা অট্টালিকা খুলে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

সে অট্টালিকাটি হবে এমন একটি মুক্তা, যার অভ্যন্তর ভাগ থাকবে উন্মুক্ত। তার তালাচাবী জানালা ছাদ সবই মুক্তা দ্বারা নির্মিত। তার সামনের অংশে মূল্যবান সবুজ পাথর খচিত থাকবে। প্রতিটি পাথরের প্রান্তভাগ অন্য রঙের আরেকটি পাথরের সাথে মিলিত থাকবে এবং প্রতিটি পাথরের মধ্যে তার জন্য থাকবে খাট, পালংক, স্ত্রী ও খাদেম ও খাদেমা। যার মধ্যে সর্বনিম্ন স্ত্রী হবে ডাগর চোখ বিশিষ্ট। তাদের গায়ে সত্তরটি কাপড়ের পর্দা থাকবে, এসব পর্দা ভেদ করেও তাদের পায়ের হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। এসব স্ত্রীদের বক্ষদেশ তার জন্য এবং তার বক্ষদেশ স্ত্রীদের জন্য আয়না স্বরূপ হবে। তাদের দিকে দৃষ্টি ফিরানো মাত্র তার চোখ তাদের সৌন্দর্য সত্তর গুণ বেড়ে যাবে। তখন তাকে দেখতে বলা হবে অতঃপর সে দেখবে। আর তাকে বলা হবে, একশ' বছরের রাস্তা পর্যন্ত তোমার সাম্রাজ্য বিস্তৃত, যা তোমার দৃষ্টির আওতাধীন।

জান্নাতের বালাখানা ও প্রাসাদ

জান্নাতে হীরা কাঞ্চন মণীমুক্তা ও মূল্যবান পাথর এবং সোনা রূপার তৈরী অসংখ্য সুউচ্চ মনোরম শান-শওকত পূর্ণ প্রাসাদ থাকবে। সর্বশেষ যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাকে যে প্রাসাদ দেওয়া হবে বর্ণনা করতে গিয়ে, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

وهو درة مجوفة أسقافها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير لون الأخرى فى كل جوهرة سرر، وأزواج ووصائق أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرأته وكبده مرأتها، إذا أعرض منها اعراضة ازدادت فى عينيه سبعين ضعفا.

সে প্রাসাদ হবে গর্ভশুন্য একটা মুক্তা, যার ছাদ, দরজা, তালা, চাবী সবকিছুই হবে মুক্তার তৈরী। প্রাসাদের সম্মুখভাগে থাকবে হীরা, কাঞ্চন, মণীমুক্তা, ইয়াকূত প্রভৃতি মূল্যবান পাথর। এসব পাথরের আভ্যন্তরীন অংশ বিভিন্ন রং বেরং এর পাথরে সজ্জিত থাকবে। প্রত্যেকটি পাথরের মধ্যে থাকবে খাট, পালংক, স্ত্রী ও সেবিকাবৃন্দ। এদের মধ্যে নিম্নপর্যায়ের যারা হবে তারা হবে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট। তাদের পরণে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। এই পোষাক ভেদ করে তাদের পায়ের নলার মজ্জা পরিদৃষ্ট হবে। স্ত্রীর বক্ষদেশ হবে স্বামী জন্য আয়না এবং স্বামীর বক্ষদেশ হবে স্ত্রীর জন্য আয়না। একবার তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় তাকালে তাদের সৌন্দর্য সত্তর গুণ বেড়ে যাবে (হাকিম ও তাবরানী)।

www.pathagar.com

আরেক হাদীসে আছে,

عن أبى هريرة قال قلت يا رسول الله مم خلق الخلق قال من الماء قلنا الجنة ما بناءها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الاذفر وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم.

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মাখলূককে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন ? তিনি বললেন, পানি দ্বারা। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, জান্নাত নির্মাণ করেছেন কিসের দ্বারা ? তিনি বললেন, একখানা স্বর্ণের এবং একখানা ইট রৌপ্যের; তার মসলা সুগন্ধময় কস্তুরী এবং তার কংকর মণিমুক্তা আর মাটি হল জাফরানের। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকবে; কখনো হতাশ বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে হবে তারা চিরস্থায়ী। কখনো মরবে না, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ কখনো ময়লা পুরান হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না (আহ্মাদ ও তিরমিযী)।

জান্নাতের গাছপালা ও পাখ-পাখালী

জান্নাতে হুর-গিলমান বালাখানা, বাজার ইত্যাদির ন্যায়, গাছপালা ও পাখে-পাখালীও থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ولقاب قوس أحدكم فى الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أوتغرب

জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যদি কোন সাওয়ারী সে বৃক্ষের ছায়ায় একশ' বছরও পরিশ্রম করে তবুও তার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ জায়গাও এর চেয়েও উত্তম যার উপর সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী হতে (বুখারী ও মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب.

www.pathagar.com

জান্নাতের সকল গাছেরই কাণ্ড হবে স্বর্ণের (তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان طير الجنة كامثال البخت ترعى فى شجرة الجنة، فقال أبوبكر ان هذه لطير ناعمة فقال اكلتها انعم منها قالها ثلاثا وانى لأرجو أن تكون ممن يأكل منها ياأبابكر.

জান্নাতের সকল পাখীগুলি হবে উটের ন্যায়। জান্নাতের গাছপালায় তারা বিচরণ করবে। আবূ বকর (রা.) বললেন, এ পাখীগুলি নিশ্চয়ই খুব হৃষ্টপুষ্ট হবে। রাসূল (সা.) বললেন ঃ এসব পাখী ভক্ষণকারীগণ তার চেয়ে অধিক হৃষ্টপুষ্ট হবে। একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। (তারপর বললেন) হে আবূ বকর! আমি আশা করি যারা এগুলো ভক্ষণ করবে তুমিও হবে তাঁদের একজন (তিরমিযী)।

জান্নাতের বাজার

জান্নাতের একটি বাজার আছে। কিন্তু বেচাকেনা থাকবে না। জান্নাতীগণ প্রতি শুক্রবার ভ্রমণও চিত্তবিনোদনের জন্য সেখানে যাবে।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى أهليهم وقد أزدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.

জান্নাতে একটি বাজার আছে। জান্নাতীগণ প্রতি জুমু'আর দিন সেখানে উপস্থিত হবেন। তখন উত্তরে বায়ু প্রবাহিত হবে এবং তাদের মুখমণ্ডলগুলোও কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের রূপ লাবণ্য আরো অধিক বৃদ্ধি পাবে। এরপর যখন তারা বর্দ্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য মন্ডিত হয়ে নিজেদের স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসবেন, তখন তাদের স্ত্রীগণ বলবেন, আল্লাহ্র কসম! তোমারা আমাদের অগোচরে রূপে ও লাবণ্যে আরোও সুন্দর হয়েছ। এর উত্তরে তারা বলবেন, আল্লাহ্র কসম! আমাদের অগোচরে তোমাদের রূপ লাবণ্যও বর্দ্ধিত হয়েছে (মুসলিম)।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان فى الجنة لسوقا ما فيها شرى ولا بيع الا الصور من الرجال والنساء فاذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها.

জান্নাতের একটি বাজার আছে। সেখানে ক্রয়-বিক্রয় নেই বরং তাতে নারী-পুরুষের বিভিন্ন ধরনের ছবি থাকবে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কোন ছবি পসন্দ করে তার আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করবে, তখনই সে ঐ আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে (তিরমিযী)।

জান্নাতের নহর

জান্নাতের বাগ-বাগিচা, গাছপালাও প্রাসাদ সমূহের নীচ দিয়ে অনেক নহর প্রবাহমান রয়েছে। এসব নহরে রয়েছে পানি, দুধ, শরাব ও মধু ইত্যাদি সুস্বাধু পানীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط

মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, আছে অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুধের নহর, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং আছে পরিশোধিত মধুর নহর (৪৭ ঃ ১৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان فى الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار.

জান্নাতে রয়েছে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং শরাবের সমুদ্র। জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর সেখানে আরো বহু নহর প্রবাহিত হবে (তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে 'কাউসার' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন,

ذَالك نهر اُعطانيه الله تعالى فِى الجنة اُشد بياضا من اللبن وأُحلىٰ من العسل فيه طير اعناقها كاعناق الجرز قال عمر ان هذه

www.pathagar.com

لنا عمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلتها أنعم منها.

তা এমন একটি নহর যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। এটা জান্নাতে অবস্থিত। এর পানি দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্টি। সেখানে এমন কিছু পাখী থাকবে যাদের গর্দান উটের গদানের ন্যায় লম্বা। উমর (রা.) বললেন, এ পাখীগুলি খুব নাদুশ-নুদুশ হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সে সব পাখী ভক্ষণকারীগণ তার চেয়েও অধিক নাদুশ-নুদুশ হবে।

জান্নাতের বিছানা

জান্নাতে অন্যান্য নিয়ামতের ন্যায় সুউচ্চ বিছানাও থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাতে শয়ন করবেন এবং হেলান দিয়ে বসবেন। সে বিছানার অভ্যন্তরীন আস্তর হবে রেশমের এবং বর্হিভাগে থাকবে নূর। কেউ কেউ বলেন, রহমত (আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ, পৃষ্ঠা-২৩৪)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَّجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝

তারা তথায় পুরু রেশমের আস্তর-বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, উভয় উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী (৫৫ ঃ ৫৪)।

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন, وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ তারা থাকবে সমুন্নত শয্যায় (৫৬ ঃ ৩৪)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنِ النبى صلى الله عليه وسلم فى قول تعالى وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ

قال ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة خمسين مأة سنة .

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ"এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেন, ঐ সমস্ত বিছানার উচ্চতা হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ব্যবধানের সমান অর্থাৎ পাঁচ শ' বছরের পথ (তিরমিযী)।

জান্নাতবাসীগণের স্ত্রী ও হূর গিলমান

যে সব মহিলাগণ নেক আমল করেছেন তাঁরা জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। জান্নাতে তাঁদেরকে তাঁদের স্বামীদের সংগে মিলিয়ে দেওয়া হবে যদি তাদের স্বামীগণও জান্নাতবাসী হন। তাঁদের কারো স্বামী চির জাহান্নামী হলে জান্নাতবাসী কোন পুরুষের সংগে তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হবে। অনুরূপ জান্নাতী কোন পুরুষের স্ত্রী চির জাহান্নামী হলে তাঁকে

www.pathagar.com

এমন এক জান্নাতী মহিলার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে যার স্বামী চির জাহান্নামী। জান্নাতবাসী মহিলাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত সুশ্রী, সুন্দরী ও চিরকুমারী করে সৃষ্টি করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّا اَنْشَأْنٰهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا

আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে করেছি চির কুমারী সোহাগিনী সমবয়স্কা (৫৬ ঃ ৩৫-৩৭)।

দুনিয়ার স্ত্রী ছাড়াও জান্নাতবাসীগণকে হুর দেয়া হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مُتَّكِـئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَّزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ٥

তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হুরের সংগে (৫২ ঃ ২০)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٥

তাদের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ ও জিন্ন স্পর্শ করে নি (৫৫ ঃ ৫৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ٥

জান্নাতের স্ত্রীগণ যেন প্রবাল পদ্মরাগ হীরা ও মুক্তা (৫৫ ঃ ৫৮)।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ٥

তাদের (জান্নাতীগণের) জন্য থাকবে আয়াতলোচনা হূর, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ (৫৬ ঃ ২২-২৩)।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدينا وما فيها ولو ان امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدينا وما فيها.

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথে এক সকাল এবং এক সন্ধ্যা চলাচল করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতবাসী কোন নারী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দেয় তাহলে সে সমগ্র পৃথিবী উজ্জ্বল করে দিবে। এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান সমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। এমনকি তাদের মাথার ওড়নাও হবে গোটা দুনিয়া এবং তার সম্পদরাশি অপেক্ষা উত্তম (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان فى الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا يبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا كنا له.

জান্নাতের হূরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে বুলন্দ আওয়াজের এমন সুন্দর লহরীতে গাইবে, সৃষ্টিজীব সে ধরণের লহরী কখনো শুনতে পায়নি। তারা বলবে, আমি চিরদিন থাকবো কখনো ধ্বংস হবো না। আমরা হামেশা সুখে সানন্দে থাকবো, কখনো দুঃখ চিন্তায় পতিত হবো না। আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ যার জন্য হবো আমরা এবং আমাদের জন্য হবেন যিনি (তিরমিযী)।

জান্নাত বাসীগণের খাদেম

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝

সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে (৫২ ঃ ২৪)।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۝

তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণীমুক্তা (৭৬ ঃ ১৯)।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝

তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে চির কিশোররা; পানপাত্র, কূঁজা ও প্রস্রবণ - নিঃসৃত ও খাটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা লয়ে (৫৬ ঃ ১৭-১৮)।

www.pathagar.com

জান্নাতবাসীগণের পোষাক ও আসবাবপত্র

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ٥

তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছেদ হবে রেশমের (৩৫ ঃ ৩৩)।

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ٥

তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পদদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান কর এবং সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল (১৮ ঃ ৩১)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ٥

তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে (৫৫ ঃ ৭৬)।

জান্নাতবাসীগণের আসবাব পত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا، قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ٥

তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে এবং কাঁচের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে, রজতশুভ্র স্ফটিক-পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে (৭৬ ঃ ১৫-১৬)।

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ٥

www.pathagar.com

স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র লয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী (৪৩ঃ ৭১)।

জান্নাতবাসীগণের খাদ্য ও পানীয়

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ النَّعِيْمِ فَاكِهِيْنَ بِمَآ اٰتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥

মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাতে ও ভোগ বিলাসে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি থেকে। তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তৃপ্তির সাথে তোমরা পানাহার করতে থাক (৫২ ঃ ১৭-১৯)।

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٥

এরপর সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুমহান জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে পানাহার কর তৃপ্তি সাথে, তোমরা অতীতের দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে (৬৯ ঃ ২১-২৪)।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَاَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ٥

আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কন্টকহীন কূলবৃক্ষ, কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না। (৫৬ ঃ ২৭-৩৩)।

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ

وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط

মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুত দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা (৪৭ -১৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا، عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ○

তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে আদ্রক মিশ্রিত পানীয় জান্নাতের এমন এক প্রশ্রবণের যার নাম সালসাবীল (৭৬ ঃ ১৭-১৮)।

জান্নাতের নিয়ামত অতুলনীয়

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط

যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বেই জীবিকা হিসেবে যা দেওয়া হত এটা তাই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে (২ ঃ ২৫)।

এ আয়াতে তাফসীরে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,জান্নাতের নিয়ামতের সাথে দুনিয়ার ফলমূল ও দ্রব্য সামগ্রীর কোনই তুলনা হয় না। কেবল নাম ও আকৃতিগত কিছু মিল থাকবে। স্বাদ গন্ধ ইত্যাদিতে হবে সম্পূর্ণ উন্নত ও ভিন্ন (আল-আকীদাতুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা-৩০৪)।

জান্নাতে পেশাব পায়খানার বেগ হবে না

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا

www.pathagar.com

يتفطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس.

জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে আহার করবে, পান করবে কিন্তু সেখানে থুথু ফেলবে না, মলমূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মা ঝরবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তাদের খাদ্যের পরিণতি কি হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ঢিকুরের মাধ্যমে মেশ্‌কের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত ঘাম এর দ্বারা তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের অন্তরে তাসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ এমনিভাবে সহজ স্বাভাবিক করে দেওয়া হবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ সহজ স্বাভাবিক করে দেওয়া হবে (মুসলিম)।

জান্নাতে এত বিপুল পরিমাণে নিয়ামত সামগ্রী পাওয়া যাবে এবং তার স্বাদ গন্ধ ও মান এতই উন্নত হবে যা মানুষ কখনো দেখেনি শোনেনি এবং কল্পনাও করেনি। নবী করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

আমি আমার নেক্‌কার বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরী করে রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার। (অর্থাৎ) তাদের চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সব নিয়ামত সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে। কোন প্রাণীরই তার খবর নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

জান্নাতের সর্বোচ্চ নিয়ামত হল আল্লাহ্‌র দীদার

কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে স্বচেক্ষ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। তখন তাঁরা অন্যান্য নিয়ামত সমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এক নাগাড়ে আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই চেয়ে থাকবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা নিজের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে (৭৫ ঃ ২২-২৩)।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

انكم ستَرون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون فى رؤيته.

তোমরা অচিরে তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁর দীদারে তোমরা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হবে না (বুখারী ও মুসলীম)।

নবী করীম (সা.) বলেন,

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما اعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.

জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের লক্ষ্য করে বলবেন : তোমরা কি অতিরিক্ত আরো কিছু চাও, যা আমি তোমাদের প্রদান করব ? তাঁরা বলবেন, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করেন নি ? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি ? এবং আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন নি ? (আপনার এত বড় নিয়ামতের পর আর কি অবশিষ্ট রয়েছে যা আমরা চাইব?) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা (তাঁর ও জান্নাতীগণের মধ্যে হতে) পর্দা তুলে ফেলবেন। তখন তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বস্তু এ যাবত তাদের দেওয়া হয় নি। এরপর হুযুর (সা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন (অর্থাৎ) যারা উত্তম কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আরও অধিক অর্থাৎ আল্লাহ্র দীদার (মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

بينا أهل الجنة فى نعيمهم اذا سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فاذا الرب قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذالك قوله تعالى سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شئ من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره.

জান্নাতবাসীগণ আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকবে, এমন সময় তাদের উপর একটি আলো

www.pathagar.com

চমকিত হবে। তখন তারা মাথা তুলবে এবং দেখতে পাবে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন উপর হতে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে আছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসীগণ আস্সালামু আলাইকুম। আল্লাহ্র কালামে ঃ سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ দ্বারা এসময়ের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীগণের দিকে এবং জান্নাতীগণ আল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ফলে তারা আল্লাহ্র তা'আলার দর্শন হতে চোখ ফিরিয়ে অন্য কোন নিয়ামতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন এবং নূর অবশিষ্ট থাকবে (ইব্ন্ মাজা)।

মুতাযিলা সম্প্রদায় আখিরাতে-হাশরের ময়দান বা জান্নাতে কোথাও আল্লাহ্র দীদার হবে না বলে মত পোষণ করেছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার দীদার সরাসরি অস্বীকার করে। আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হল আখিরাতে মু'মিন বান্দাগণ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত। প্রায় ত্রিশ জন সাহাবী থেকে জামি' মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এতএব দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, জান্নাতে মু'মিনগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবেন (আকীদাতু আহ্লুস্ সুন্নাস ওয়াল জামা'আহ, পৃষ্ঠা- ২৩৮)।

জাহান্নাম

যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের উপরে ঈমান আনা অপরিহার্য জাহান্নাম তার অর্ন্তভূক্ত। জাহান্নাম নানা প্রকার কঠিন ও পীড়াদায়ক শাস্তির বিশাল বিভিষিকাময় স্থান। তাতে রয়েছে প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা, বিষধর সাপ, সীমাহীন হীম ঠাণ্ডা ও নানা রকম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ্ তাঁর নাফরমান বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিবরণ ব্যতীত জাহান্নাম সম্পর্কে জানার অন্য কোন উপায় নেই।

জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۚ

আপনি কি জানেন জাহান্নাম কি ? তা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না এবং মৃতাবস্থায় ও ছেড়ে দিবে না। এ তো দগ্ধিত করে বীভৎস করে দেবে দেহের আকৃতি। এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী ফিরিশ্তা (৭৪ ঃ ২৭-৩০)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ

নিশ্চয় জাহান্নাম একটি ঘাটি। আল্লাহদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে (৭৮ : ২১-২৩)।

জাহান্নামের গভীরতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمة ارسلت من السماء إلى الارض وهى مسيرة خمس مأة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها ارسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها او قعرها.

যদি এরূপ একখণ্ড সীসা একথা বলে তিনি মাথার খুলির প্রতি ইংগিত করেছেন- আসমান হতে যমীনের দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন সেটা রাত হওয়ার পূর্বে যমীনে পৌছে যাবে। আর আসমান হতে যমীনের দূরত্ব পাঁচশ' বছরের পথ। কিন্তু যদি এটাকে জাহান্নামের শিকলের উপরিভাগ হতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত দিনে রাতে চলতে থাকে তবুও তার মূলে অথবা তলদেশে পৌছাতে পারবে না (তিরমিযী)।

এ থেকে জাহান্নামের গভীরতা সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা করা যায়।

জাহান্নামের দরজা ও স্তর

পরকালে যেমন সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতে অফুরন্ত নিয়ামত ও সীমাহীন সুখ শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি নাফরমানদের জন্য রয়েছে জাহান্নামে নানা রকম কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা। একটা বিশাল ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জাহান্নাম অবস্থিত। সেখানে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন স্তর নির্ধারিত রয়েছে। এর একেক স্তরের শাস্তির ধরন হবে একেক রকম। অপরাধ অনুসারে যে যে স্তরের উপযোগী হবে তাকে সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। কুরআনে করীমে জাহান্নামের যে সব নাম বর্ণিত হয়েছে সেগুলি মূলত এর দরজা বা স্তরের নাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝

শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক বলছেন, বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না; অবশ্যই তোমার

www.pathagar.com

অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম; এর সাতটি দরজা আছে প্রত্যেক দরজার জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক দল (১৫ ঃ ৪২-৪৪)।

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে এবং এর প্রত্যেক স্তরের পৃথক পৃথক নাম রয়েছে

এক ঃ জাহান্নাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَجِيْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى

সে দিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু এ উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে ? (৮৯ ঃ২৩)।

দুই ঃ লাযা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كَلَّآ اِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى

না, কখনই নয়, এটা তো লাযা (লেলিহান আগুন), যা দেহ থেকে খসিয়ে দেবে চামড়া। 'লাযা' সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল (৭০ ঃ ১৫-১৭)।

তিন ঃ হুতামা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝

কখনও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে 'হুতামায়' (পিষ্টকারীর)। আপনি জানেন 'হুতামা' কী? এটা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত আগুন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে (১০৪ ঃ ৪-৭)।

চার ঃ সায়ীর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝

কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি 'সায়ীর' (আগুন) (২৫ ঃ ১১)।

www.pathagar.com

পাঁচ ঃ সাকার।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ وَمَآ اَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ

আমি তাকে 'সাকারে' (আগুনে) নিক্ষেপ করব। আপনি কি জানেন 'সাকার' কী ? তা তাদেরকে জীবিতাবস্থায়ও রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না। এতো দগ্ধিত করে ভীবৎস করে ফেলে দেহের আকৃতি (৭৪ ঃ ২৬-২৯)।

ছয় ঃ জাহীম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ ٥

এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহীম (২৬ ঃ ৯১)।

সাত ঃ হাবিয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَآ اَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ ٥

তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়া'। আপনি জানেন তা কী ? (তা হচ্ছে) উত্তপ্ত আগুন (১০১ঃ ৯-১১; সূত্র ঃ আল-আকাইদুল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ২৯১-৯২; আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ্, পৃষ্ঠা-২৩৯)।

জাহান্নামের আগুনের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে যে আগুন তৈরী রেখেছেন তা দুনিয়ার আগুনের মত নয়। বরং দুনিয়ার আগুনের চেয়ে বহুগুণ বেশী উত্তপ্ত ও দাহিকা শক্তিসম্পন্ন এবং ভীষণ কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ আগুন ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এর লেলিহান শিখা অত্যন্ত ভয়ংকর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ناركم جزء من سبعين من نار جهنم قيل يارسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسعة جزء كلهن مثل حرها.

তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হয় ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! জাহান্নামীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, জাহান্নামের আগুনকে উনসত্তর গুণ তাপ বিশিষ্ট করা হয়েছে তার এক ভাগের তাপ হচ্ছে দুনিয়ার আগুনের সমান (বুখারী ও মুসলিম)।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেন,

اوقد على النار الف سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها الف سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليه الف سنة حتى اسودت فهى سوداء مظلمة.

জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয় এতে তা লাল হয়ে যায়। এর পর এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করা হয় ফলে তা সাদা হয়ে যায়। এরপর এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করা হয় এতে তা কালো হয়ে যায়। এখন তা কালো ঘোর অন্ধকার অবস্থায় রয়েছে (তিরমিযী)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ٥

(জাহান্নামীদের বলা হবে) চলো তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নি শিখা হতে, তা উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা তূল্য বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ, তা পীতবর্ণ উষ্ট্র-শ্রেণী সদৃশ (৭৭ ঃ ৩০-৩৩)।

জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আযাব

জাহান্নামীদেরকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর তাদেরকে বলা হবে, এ তো সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। তাদেরকে আরো বলা হবে, তোমাদের নিকট কি কোন সর্তককারী, কোন রাসূল পৌছেন নি ? যাঁরা তোমাদেরকে রবের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সর্তক করতেন। এভাবে প্রথমে তাদেরকে মানসিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও পর্যুদস্ত করা হবে এবং পরে বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাব হতে থাকবে (আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ্, পৃষ্ঠা-২৪১)।

জাহান্নামের আযাবের কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হল ঃ

খাদ্যের মাধ্যমে আযাব

জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর জাহান্নামীদেরকে ভীষণ ক্ষুধায় পতিত করা হবে। জাহান্নামে দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার যাতনায় তারা অস্থির হয়ে পড়বে এবং খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করতে থাকবে। তখন তাদেরকে এমন খাবার দেওয়া হবে যাতে তারা পরিতৃপ্ত হবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবে না বরং তা তাদের গলায় আটকে যাবে। ফলে

www.pathagar.com

তারা আরো কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত হবে। মূলত অধিক শাস্তি দেওয়ার জন্যই এরূপ জাহান্নামীদের ক্ষুধা ও খাবার দেওয়া হবে।

জাহান্নামে যে খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে তার কয়েকটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

এক ঃ যাক্কুম। (زَقُّوم)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِــُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

আপ্যায়নের জন্য এটাই কি শ্রেয় না যাক্কূম বৃক্ষ ? আমি যালিমদের জন্য ইহা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এ বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা। কাফিররা এ থেকে ভক্ষণ করবে এবং এ দ্বারা উদর পূর্ণ করবে (৩৭ ঃ ৬২-৬৬)।

যাক্কূম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لا فسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه.

যদি যাক্কুম-এর এককোটা এ দুনিয়াতে পড়ে তাহলে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবন ধারণের উপকরণ সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব ঐ সব লোকদের কি দুর্দশা হবে যাদের খাদ্য হবে যাক্কূম? (তিরমিযী)

দুই ঃ গিস্লীন (غِسْلِيْن)

গিস্লীন হলো জাহান্নামীদের শরীর হতে বিগলিত রক্ত ও পূঁজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ لَا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخٰطِــُٔوْنَ

অতএব এদিন তার কোন সুহৃদ থাকবে না এবং ক্ষত নিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত কোন খাদ্যও থাকবে না। যা গুনাহ্গার ব্যতীত কেউ খাবে না। (৬৯ ঃ৩৫-৩৮)

www.pathagar.com

তিন ঃ দারী' (ضَرِيْع)

দারী এক প্রকার কাটাযুক্ত দুর্গন্ধময় শুকনা ঘাস। ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হয়ে জাহান্নামীরা এটা খাবে। কিন্তু গলধঃকরন করতে পারবে না। শুকনা ও কাঁটাযুক্ত হওয়ার কারণে গলায় আটকে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ٥

কন্টকপূর্ণ গুল্ম (দারী) ব্যতীত তাদের জন্য কোন খাবার থাকবে না, যা তাদেরকে পুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না (৮৮ ঃ ৬-৮)।

খাদ্যের মাধ্যমে জাহান্নামীদেরকে যেরূপ শাস্তি দেওয়া হবে অনুরূপ পানীয় দ্বারাও তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। জাহান্নামে যা পান করানো হবে তাতে জাহান্নামীদের পিপাসা দূর হবে না এবং তাদের পিপাসা নিবারণের জন্যও পান করানো হবে না। বরং শাস্তি বৃদ্ধির জন্য তা পান করানো হবে (আকীদাতু আহলিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ, পৃষ্ঠা-২৪২)।

গলায় খাবার আটকে যাবার পর তাদের দুনিয়ার কথা মনে পড়বে যে, গলায় খাবার আটকে গেলে পানি পান করে তা নামানো হত। তাই তারা পানির জন্য ফরিয়াদ শুরু করবে । তখন গরম পানি লোহার কড়া দ্বারা উঠিয়ে তাদের কাছে ধরা হবে। আর যখন তা তাদের নিকটবর্তী করা হবে তখন তাদের মুখের গোশত বিদগ্ধ হয়ে যাবে। সাথে সাথে পানি তাদের পেটের ভিতর ঢুকবে এবং পেটের মধ্যে যা কিছু আছে সবই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে (তিরমিযী)।

জাহান্নামে যা পান করান হবে

এক ঃ হামীম- حَمِيْمٌ (গরম পানি)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ

আর তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি। যা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে (৪৭ ঃ ১৫)।

পবিত্র কুরআনে আরও উল্লেখ রয়েছে যে,

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُبِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ
وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا
فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ٥

www.pathagar.com

তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। যা দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী। তারা যখনই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করা (২২ ঃ ১৯-২২)।

দুই ঃ كَالْمُهْلِ - যায়তুন তেলের গদের ন্যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٥

তারা পানীয় চাইলে তাদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে ; তা হলো নিকৃষ্ট পানীয় আর আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয় ! (১৮ ঃ ২৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

فى قوله كالمهل أى كعكر الزيت فاذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه.

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'كالمهل' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এটা যায়তুনের তেলের ন্যায়। যখন তা মুখমণ্ডলের নিকটবর্তী করা হবে তখন (গরমের তাপে) তার মুখের চামড়া এর মধ্যে খসে পড়বে (তিরমিযী)।

তিন ঃ "مَاءٌ صَدِيْدٌ" (গলিত পূঁজ)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مِنْ وَّرَائِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ٥

তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পূঁজ, যা সে অতি কষ্টে গলধঃ করণ করবে এবং তা গলধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সকল দিক থেকে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা। কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে (১৪ ঃ ১৬-১৭)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে ঃ

www.pathagar.com

عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى يسقى من ماء صديد يتجرعه قال : يقرب إلى فيه فيكرهه فاذا ادنى شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله تعالى وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ وَيَقُوْلُ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

মহান আল্লাহ্‌র বাণী 'يُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ' এর ব্যাখ্যায় নবী করীম (সা.) বলেছেন, উক্ত পানীয় জাহান্নামবাসীর মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন সে তা অপসন্দ করবে। আর তখন তার মুখের নিকটে আনা হবে তখন তা তার চেহারা দগ্ধ করে দেওয়া হবে। এবং তার মাথার চামড়া ঘসে পড়বে। আর তখন সে তা পান করবে তখন তা তার নাড়িভূঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। অবশেষে তা তার মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, জাহান্নামীদেরকে ভীষণ গরম পানি পান করানো হবে তখনই তা তার নাড়িভূড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, জাহান্নামীরা যখন পানি চাইবে তখন তেলের গাদের ন্যায় এমন (গরম) পানি দেওয়া হবে যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। এটা অতীব মন্দ পানীয়। আর আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয়। তিরমিযী)।

চার ঃ غَسَّاقٌ (গাস্‌সাক) পুঁজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ، هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ ۝

আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম-জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে আর তা কত নিকৃষ্টতম বিশ্রামস্থল। এটা হলো সীমালংঘন কারীদের জন্য। তাই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পূঁজ। আরো রয়েছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি (৩৮ ঃ ৫৫-৫৮)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

لَوْ أَنَّ دلوا من غساق يهراق فى الدنيا لا نتن أهل الدنيا

www.pathagar.com

জাহান্নামীদের খাদ্য কদর্য পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে গোটা দুনিয়া দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে যাবে (তিরমিযী)।

পাঁচ ঃ مَاءنَهرالغُوطَة

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

من مات مدمن الخمر سقاه الله عز وجل وعلا من نهر الغوطة،

قيل وما نهر الغوطة ؟ قال : نهر يجرى من فروج المومسات.

যে ব্যক্তি মদ পান করা অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে গুতা নামক নহর থেকে পান করাবেন। জিজ্ঞাসা করা হল, গুতা নহর কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, গুতা এমন একটি নহর যা প্রবাহিত হবে ব্যভিচারীনীদের লজ্জাস্থান থেকে (মুসনাদে আহ্মাদ)।

ছয় ঃ সাপ বিচ্ছুর দংশন

জাহান্নামে বহু বিষধর সাপ ও বিচ্ছু রয়েছে। এরা জাহান্নামীদের দংশন করতে থাকবে। এসব সাপ ও বিচ্ছু এতই বিষাক্ত যে, একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর তার বিষক্রিয়া থাকে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ان فى النار حيات كأمثال البخت تلسع أحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وإن فى النار عقارب كامثال البغال المؤكفة تلسع احداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا (رواه احمد)

জাহান্নামে খোরাসানী উটের মত বিরাট সাপ রয়েছে, তার কোন সাপ একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিষক্রিয়া থাকবে। আর জাহান্নামে এমন সব বিচ্ছু আছে যা পালান বাঁধা খচ্চরের মত। এর কোন একটি একবার দংশন করলে তার বিষক্রিয়াও চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে (মুসনাদে আহ্মাদ)।

সাত ঃ জাহান্নামীদের আকৃতির বিকৃতি ও বিভৎস রূপ

জাহান্নামীদের অধিক শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের দেহ বিস্তৃত ও বিকটাকৃতির করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، مَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا، اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ٥

www.pathagar.com

যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে; আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা স্থায়ী হবে (১০ ঃ ২৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ٥

আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায় (২৩ ঃ ১০৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

وهم فيها كالحون قال لشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه ويسترخى شفته السفلى حتى تضرب سرته

মহান আল্লাহ্র বাণী 'وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ' এর ব্যাখ্যায় নবী (সা.) বলেন, জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীকে এমনভাবে ভাজা পোড়া করবে যে তার উপরের ঠোঁট মাথার মধ্যস্থলে পৌঁছে যাবে। আর নীচের ঠোঁট এমনভাবে ঝুলে পড়বে যে, তা নাভীর সাথে এসে লেগে যাবে (তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেন,

ان الكافر ليسحب لسانه والفرسخين يتوطأه الناس.

জাহান্নামে কাফির ব্যক্তি তার জিহ্বা এক ক্রোশ দুই ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁছড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা তা মাড়িয়ে যাবে (তিরমিযী)।

জাহান্নামীদের দেহ বিস্তৃত করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

مابين منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلثة ايام للراكب المسرع، وفى رواية ضرس الكافر مثل احد وغلظ جلده مسيرة ثلث.

জাহান্নামের কাফিরের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী অশ্বরোহীর তিন দিনের সফরের সমান। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, কাফিরের মাড়ি তিন দিনের সফরের সমান।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, কাফেরের মাড়ির দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া মোটা ও পুরু হবে তিন দিনের সফরের সমান দূরত্ব পরিমাণ (মুসলিম)।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

ضرس الكافر يوم مثل احد فخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلث مثل الربذة.

কিয়ামতের দিন কাফিরের চুয়ালের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের ন্যায়, রান হবে বায়দা পাহাড়ের মত মোটা এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত। যেমন (মদীনা হতে) রাবয়ার দূরত্ব (তিরমিযী)।

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন,

لو أن رجلا من أهل النار اخرج إلى الدنيا لمات أهلها وحشة منظرة ونتن ريحه، قال ثم بكى عبد الله بكاء شديدا.

জাহান্নাম থেকে কোন ব্যক্তিকে যদি বের করে দুনিয়াতে আনা হতো তাহলে তার বীভৎস আকৃতি ও দুর্গন্ধে দুনিয়াবাসী মারা যেত। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) খুব কাঁদলেন (আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব)।

আট ঃ শিকল ও বেড়ি পারানো

জাহান্নামীদের শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে শিকল ও বেড়ি পরানো হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

انَّا اَعْتَدْنَا سَلَاسِلَا وَّاَغْلَالًا وَّسَعِيْرًا ০

আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন (৭৬ ঃ ৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

اِذِ الْاَغْلَالُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ০

যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, এরপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে (৪০ ঃ ৭১-৭২)।

নয় ঃ জাহান্নামীদেরকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করা।

সাউদ নামে জাহান্নামে একটি বিরাট পাহাড় আছে। জাহান্নামীদেরকে সে পাহাড়ে উঠিয়ে সেখানে থেকে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

الصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفا ويهوى به كذالك فيه أبدا.

www.pathagar.com

জাহান্নামে সাউদ নামে একটি পাহাড় রয়েছে। (জাহান্নামীকে) সত্তর বছরে তার উপরে উঠানো হবে এবং সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থায় সব সময় অব্যাহত থাকবে (তিরমিযী)।

এছাড়া জাহান্নামে বিভিন্ন ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে যা অপরাধীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রস্তুত রেখেছেন।

কান্নাকাটি, ফরিয়াদ আর্তচিৎকার ও মৃত্যু কামনা

শাস্তি হ্রাস করার জন্য জাহান্নামীরা ফরিয়াদ করতে থাকবে কিন্তু তাদের এ ফরিয়াদ শোনা হবে না। তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে এবং মৃত্যু দাও মৃত্যু দাও বলে তারা চিৎকার করতে থাকবে। কিন্তু তাদের এ চিৎকারের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করা হবে না বরং ঘোষণা দেয়া হবে আর কারো মৃত্যু হবে না। এখন থেকে যে যেখানে আছে সে সেখানেই থাকবে।

অবশেষে জাহান্নামীরা সব দিক থেকে নিরাস হয়ে হা হুতাশ ও আর্ত চিৎকার করতে থাকবে এবং সেভাবে তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। সেখান থেকে তারা আর পরিত্রাণ পাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ۝

সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে হে, আমাদের রব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন। আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না (৩৫ ঃ ৩৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝

আর যখন তাদেরকে শিকলে বাধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেখানে তারা ধ্বংস কামনা করবে (২৫ ঃ ১৩)।

জাহান্নামে কে যাবে এবং কেন যাবে ?

জাহান্নামে কে যাবে এবং কেন যাবে ? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

لَايدخل النار الا شقى قيل يا رسول الله ومن الشقى قال : من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له بمعصية.

হতভাগা ছাড়া কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হতভাগা কে ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নেক-আমল করে না এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন গুনাহ্ পরিত্যাগ করে না (ইব্ন মাজা)।

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঈমানের শাখা প্রশাখা

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করলেই দেখতে পাই যে, যে কোন বিষয় বা বস্তুর মধ্যেই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশ রয়েছে। যার মধ্যে একটি হলো তার মূল বা প্রধান অংশ আর অপরগুলো হলো তার শাখা-প্রশাখা। যেমন একটি বৃক্ষের কাণ্ড হলো তার মূল বা প্রধান অংশ আর অপরগুলো যেমন লতা-পাতা, ডাল-পালা ইত্যাদি হলো তার শাখা-প্রশাখা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ; ঈমানের মূল হলো কালেমায়ে তাইয়্যেবা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এ বাক্যটির মর্ম মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম -ই হলো ঈমান। এটাই মুতাকাল্লিমীন - ইসলামী আকাইদ শাস্ত্র বিশারাদগণ -এর অভিমত। তবে মুহাদ্দিসীন ও অধিকাংশ ইমামদের মতে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ের নাম হলো ঈমান।

১. অন্তরের বিশ্বাস (تَصْدِيق بِالْجِنَان)
২. মুখের স্বীকারোক্তি (إِقْرَار بِاللِّسَان)
৩. ইসলামের রুকনসমূহ পালন করা (اَلْعَمَل بِالْأَرْكَان)

হানাফী মাযহাবের ইমাম, হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাস (اَلتَّصْدِيق بِالْجِنَان) কে-ই ঈমান বলা হয়। তিনি তাঁর এ অভিমতের সপক্ষে বিভিন্ন দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন -

ক. মহান আল্লাহ্র বাণী اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ এ বাক্যের মর্মার্থ-ই হল, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

খ. ঈমানের স্থান হলো 'কালব' (অন্তঃকরণ) যেমন- মহান আল্লাহ্ বলেন,

أُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ

তাদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান (৫৮ : ২২)।

www.pathagar.com

অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ،

তারা মুখে বলে ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না (৫ ঃ ৪১)।

এ ছাড়া আরো অনেক আক্লী ও নক্লী প্রমাণ দ্বারা তার সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করা হয়।

কিন্তু অধিকাংশ আয়িম্মায়ে কিরামের মতে উপরে আলোচিত তিনও প্রকারের সমষ্টিকেই ঈমান বলা হয়। তাঁরাও বিভিন্ন আক্লী ও নক্লী দলীল দ্বারা মতের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। পূর্ব অধ্যায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এ স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল। মূলতঃ এ অভিমতদ্বয়ের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। কারণ হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমতটি হল-মূল ঈমান সম্পর্কে, আর অন্যান্যদের অভিমতটি হল কামিল (পূর্ণাঙ্গ) ঈমান সম্পর্কে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, ঈমানের শাখা-প্রশাখা। তাই এর পক্ষে প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, ঈমানের শাখা-প্রশাখা আছে কি-না ? পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে কি অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর জানতে হবে যে, ঈমানের শাখা-প্রশাখা কয়টি ও কি কি ? তাই এ প্রসঙ্গে নিম্নে বিশদ আলোচনা করা হলো।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের শাখা-প্রশাখা

একথা অনস্বীকার্য যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনে শরী'আতের নির্ধারিত নিয়ামানুযায়ী অনেক আচার - অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কলাপ সমাধা করতে হয়। যাতে প্রকাশ পায় যে, ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষের ন্যায় ঈমানের মূল বিষয়বস্তু ছাড়া তার রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফের সংকলকগণ তাঁদের কিতাবে ঈমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় সংযোজন করেছেন। যেমন বুখারী শরীফে রয়েছে, (بَاب أُمُور الإِيمَان) ঈমানের বিষয়সমূহ।

অনুরূপ মুসলিম শরীফে রয়েছে, (بَاب بَيَان عدد شعب الإِيمَان وأَفضلها وأدناها) (ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা এবং তার উচ্চতম ও নিম্নতম বিষয়ের বর্ণনা)।

ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা

ঈমানের শাখা-প্রশাখার সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যার বর্ণনা নেই। তবে এ প্রসঙ্গে সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে,

www.pathagar.com

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة.

ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা সত্তর -এর কিছু অধিক অথবা ষাট এর কিছু অধিক। তদ্রূপ হযরত সোহাইল (র.) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে ষাটের অধিক না সত্তরের অধিক এ ব্যাপারে উভয় রাবীর বর্ণনায় সন্দেহ বিদ্যমান। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) তাঁর কিতাবে "بضع و ستون" (ষাটের অধিক) বলে বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য যে 'বিদ্‌উন' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন "بضع" শব্দের দ্বারা তিন থেকে নয় পর্যন্ত, কেউ বলেন, তিন থেকে দশ পর্যন্ত। কেউ বলেন, দু' থেকে দশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যাকে বুঝায়। ইমাম খলীলের বর্ণনা মতে "البضع السبع" বিদ্‌উন হলো সাত। আর হাদীসের অপর শব্দ "شُعبة" এর অর্থ "القطعة من الشئ" যে কোন বস্তুর একটি অংশ। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের অর্থ হবে "بضع وسبعون أوستون" ঈমানের ষাট অথবা সত্তর থেকে কিছু বেশী আমল বা শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ইমাম আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান (র.) -এর শাখা সমূহ তাঁর প্রণীত ' وصف الإيمان وشعبة ' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হাতিম(র.) আরো উল্লেখ করেছেন যে, "بضع وسَبعون" এর রিওয়ায়েতটি যেমন সহীহ্; তদ্রূপ "بضع وسبعون" এর রিওয়ায়েতটিও সহীহ্। কারণ আরবী পরিভাষায় কোন বিষয়ের আধিক্য বুঝাতে 'বিদউন ওয়া সিত্তুন' অথবা 'বিদউন ওয়া সাবউন' ব্যবহৃত হয়।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে ঈমানের শাখা-প্রশাখার সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হিসাবে "لا إله إلا الله" এর উল্লেখ রয়েছে। এদ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের শাখাগুলোর মধ্যে এর মর্যাদা হলো সর্বোচ্চ। আর সর্বনিম্ন হলো "إماطة الاذى عن الطريق" অর্থাৎ কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ঈমানের অন্যান্য শাখাগুলো এ দুই স্তরের মধ্যে রয়েছে। একদল হাদীস বিশারদ ঈমানের শাখা-প্রশাখার সম্পর্কে সবিস্তার বিভিন্ন রচনা করেছেন। যেমন আবূ আবদুল্লাহ্ হালীমী (র.) "فوائد المنهاج" ইমাম বায়হাকী (র.) "شُعب الإيمان" শায়খ আবদুল জলীল (র.) "النصائح" এবং ইমাম আবূ হাতেম (র.) "وصف الايمان وشعبة" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

ঈমানের শাখাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা

ঈমানের শাখাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত ।

১. ঈমানের ঐ সকল শাখা যেগুলোর সম্পর্কে ইতি'কাদ ও অন্তরের আমলের সাথে।

২. ঐ সকল শাখা যেগুলোর সম্পর্কে মৌলিক স্বীকৃতির সাথে।

৩. ঐ সকল শাখা যেগুলোর সম্পর্কে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে ।

www.pathagar.com

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথম প্রকার

ইতি'কাদ ও অন্তরের আমলের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখার সংখ্যা হলো ৩০টি। যথা –

১. এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁর সত্তা (ذات) ও সকল সিফাতসহ (গুণাবলী) বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

২. মহান আল্লাহ্ একমাত্র শ্রেষ্ঠ জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি।

৩. ফিরিশ্তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ফিরিশ্তাগণ মহান আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব। আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাগণকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন।

৪. সকল আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যা আল্লাহ্ তা'আল্লার পক্ষ থেকে মানব জাতির হিদায়েতের জন্য নবী রাসূলগণের নিকট আগমন করেছেন।

৫. সকল নবীর প্রতি প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। নবী রাসূলগণ মহান আল্লাহ্র মনোনীত ও পসন্দনীয় ব্যক্তি। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ও পবিত্র।

৬. তাক্দীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ তাক্দীরের ভালমন্দ সব কিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়।

৭. কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যার মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর পর কবর থেকে আরম্ভ করে হিসাব নিকাশ পর্যন্ত সব কিছুর প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমন, কবরের মধ্যে ফিরিশ্তা কর্তৃক প্রশ্ন করা এবং তার জওয়াব প্রদান করা। কবরের আযাবকে বিশ্বাস করা। মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার জন্য; পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা। ময়দানে হাশরে হিসাব প্রদানের জন্য বিশেষ এক সময় পর্যন্ত অবস্থান করা। সেখানে জাগতিক সকল আমলের হিসাব-নিকাশ প্রদানে বিশ্বাস রাখা; আমলকে ওযন দেওয়া, পুলসিরাত অতিক্রম করা ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত।

৮. জান্নাতের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এ প্রসঙ্গে আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জান্নাত হলো সর্বময় সুখ-শান্তি পূর্ণ স্থান। ঈমানদার বান্দাগণ চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতের মধ্যে সকল প্রকার নাজ- ও নিয়ামত ভোগ করে পরম সুখ শান্তিতে থাকবেন।

৯. জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এর সাথে আনো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জাহান্নামের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কঠিন কঠিন শাস্তি রয়েছে, যা সকল বে-দীন, মুশরিক ও কাফিরদেরকে চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতিরেকে এক মুহূর্তের জন্যও কেউ নিস্তার লাভ করতে পারবে না। আর ঈমানদার বান্দাদের মধ্যে যারা গুনাহগার তাদেরকে ক্ষমা করা না হলে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

www.pathagar.com

১০. মহান আল্লাহ্‌র সাথে মুহব্বত রাখা। এর তাৎপর্য হলো, সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্ তা'আলার সকল আদেশ নিষেধকে মেনে নেওয়া এবং সে অনুসারে আমল করা।

১১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রতি মুহব্বত রাখা। এর তাৎপর্য হলো, সর্বাবস্থায় তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে নেওয়া এবং তাঁর সুন্নাত সমূহ ও তরীকাগুলো অনুসরণ করে চলা। তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া এবং তাঁর তা'যীম করা। আর মুহব্বতের সাথে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা ও সালাম পেশ করা এবং সকল প্রকার বিদ্'আত বর্জন করা ।

১২. মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কারো সাথে মুহব্বত রাখা অথবা কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। ঈমানদার বান্দাদের সাথে বিশেষত সাহাবায়ে কিরাম, আহলে বায়েত, মুহাজিরীন, আনসার, আয়িম্মায়ে দীন, আওলিয়ায়ে ইযাম ও হাক্কানী উলামায়ে কেরাম এর সাথে মুহব্বত রাখা। আর যারা আল্লাহ্‌র নাফরমান ফাসিক বান্দা বে-দীন ও মুশরিক তাদের প্রতি অন্তরের সাথে ঘৃণা পোষণ করা।

১৩. ইখ্‌লাস এর সাথে শরীয়াত নির্দেশিত সকল আমল (কাজ কর্ম) সমাধা করা। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল (কাজকর্ম) না করা আর মুনাফেকী থেকে দূরে থাকা।

১৪. মহান প্রভূর দরবারে তাওবা করা, অর্থাৎ স্বীয় কৃত গুনাহের জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে নিজকে লজ্জিত মনে করা এবং ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ থেকে নিজকে বিরত থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা করা।

১৫. শরী'আত বর্জ্জিত সকল কাজে অন্তরের সাথে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা।

১৬. সকল কাজে মহান আল্লাহ্‌র রহমতের আশা পোষণ করা।

১৭. যে কোন বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। অর্থাৎ এরূপ মনোভাব পোষণ না করা যে, আমি যে গুনাহ করেছি, মহান আল্লাহ্ হয়ত তা ক্ষমা করবেন না।

১৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র শুকরগুযার করা।

১৯. ওয়াদা অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করা।

২০. সবর করা অর্থাৎ যে কোন বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

২১. বিণয় প্রকাশ করা। যার মধ্যে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও শামিল।

২২. স্নেহ-মমতা করা; যার মধ্যে ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মমত্ববোধ দেখানোও শামিল।

২৩. মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সকল ভাল ও মন্দের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

২৪. যে কোন কাজে মহান আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করা বা ভরসা রাখা।

২৫. অহমিকা ও আত্মগরীমা ছেড়ে দিয়ে ইসলাহে নফ্‌স বা আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করা।

www.pathagar.com

২৬. হিংসা বিদ্বেষ না করা। যার মধ্যে হাসাদ, অপরের মন্দ কামনা বা পরশ্রীকাতরতাও শামিল।

২৭. লজ্জা শরম বোধ করা।

২৮. অতিরিক্ত গোস্বা না করা। অর্থাৎ কোন কাজে কর্মে এমনভাবে রাগান্বিত না হওয়া যাতে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়।

২৯. কাউকে কোন প্রকার ধোঁকা না দেওয়া। বা কারো জন্য অমঙ্গল কামনা না করা।

৩০. দুনিয়ার মুহব্বত অন্তর থেকে দূর করে দেওয়া। যার মধ্যে দুনিয়াবী ধন-সম্পদের লোভ এবং সম্মান ও মর্যাদার মোহও অন্তর্ভূক্ত। সুবিখ্যাত ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ আল্লামা আইনী (র.) বলেন, উল্লিখিত ধারাগুলোর মধ্যে অন্তরের সকল আমল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যদিও দৃশ্যত কোন কোন কাজ বাহ্যিক মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা ভাবনা করলেই বুঝা যাবে যে, তা অন্তরেরই আমল।

দ্বিতীয় প্রকার

মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখা সমূহের সংখ্যা হলো সাতটি।

১. কালেমায়ে তাইয়্যেবা – মৌখিকভাবে স্বীকার করা।

২. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা।

৩. দীনী ইল্ম নিজে শিক্ষা করা।

৪. দীনী ইল্ম অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

৫. মহান আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করা।

৬. আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করা।

৭. অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।

তৃতীয় প্রকার

দেহের অংগ প্রতঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখা সমূহের সংখ্যা হলো চল্লিশটি। ঈমানের এই শাখা গুলো তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ, যা বান্দার নিজের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট

এরূপ আমল ১৬টি যথা -

১. পবিত্রতা অর্জন করা- যার মধ্যে শারীরিক পবিত্রতা বলতে অযূ করা, গোসল করা। মহিলাদের হায়িয নিফাস থেকে পবিত্রতা অর্জন করা বোঝান হয়েছে।

২. যথাযথভাবে নামায আদায় করা এবং তার পাবন্দি করা। ফরয,ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল যাবা সব নামাযই এর অন্তর্ভূক্ত।

www.pathagar.com

৩. দান-সাদাকা করা। যাকাত, ফিত্‌রা, দান-সাদাকা ইত্যাদি- এর শামিল। এমন কি অপরের কিছু বখশিস্ করা, মেহমানকে আহার করানো, মেহমানের সম্মান করা, গোলাম আযাদ করা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. রোযা পালন করা। ফরয, ওয়াজিব এবং নফল সব রকমের রোযা -এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. হজ্জ আদায় করা ও উভয় প্রকার হজ্জ এবং ওমরা এর অন্তর্ভূক্ত।

৬. ই'তিকাফ করা।

৭. দীনের হিফাযতের উদ্দেশ্যে হিজরত করা।

৮. যে কোন প্রকার মান্নত করলে তা পূরণ করা।

৯. কাফ্‌ফারা আদায় করা।

১০. কসম করলে তা পূরণ করা।

১১. সতর ঢাকা। নামাযের মধ্যে কিংবা বাইরে পুরুষ মহিলার উভয়ের জন্য শরী'আত নির্ধারিত সতর ঢেকে রাখা।

১২. কুরবানী করা।

১৩. মৃত ব্যক্তির গোসল কাফন, জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করা।

১৪. ঋণ পরিশোধ করা।

১৫. সকল প্রকারের লেন-দেন সঠিকভাবে করা এবং সুদের ক্রিয়া কলাপ থেকে বিরত থাকা।

১৬. সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা এবং সে ক্ষেত্রে সত্য ঘটনা গোপন না করা।

দ্বিতীয় ভাগ, যা অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট

এরূপ আমলের সংখ্যা ৬টি ঃ

১. বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যিনা ও ব্যভিচার থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা।

২. সন্তান-সন্ততির অধিকারের প্রতি সচেতন হওয়া এবং যথাযথভাবে তা আদায় করা। সাথে সাথে অধিনস্তদের অধিকারের প্রতিও যত্নবান থাকা ।

৩. পিতামাতার অধিকারের প্রতি সচেতন হওয়া। তাঁদের সাথে সর্বদা বিনয় ও নম্র ব্যবহার করা। তাঁদের কথা মান্য করা ইত্যাদি।

৪। সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা করা। শরী'আতের প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা দেওয়া।

৫. আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ করা। তাদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া।

৬. বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করা।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ, যা সর্ব সাধারণের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট

এরূপ আমল ১৮টি ঃ

১. ন্যায়-বিচারের সাথে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করা।

২. আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শ অনুসরণ করা।

৩. রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য (যদি তিনি শরী'আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ না দেন)

৪. পারস্পরিক ক্রিয়া কর্মে সৃষ্ট মতবিরোধের সঠিক ফয়সালা প্রদান করা। বিভ্রান্ত ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধ করা।

৫. ন্যায় ও ভাল কাজে পরস্পরে সাহায্য সহযোগীতা করা।

৬. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা।

৭. আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

৮. প্রয়োজনে জিহাদ করা।

৯. যথা নিয়মে আমানত আদায় করা।

১০. অপরকে ঋণ প্রদান করা এবং যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করা।

১১. প্রতিবেশীর হক আদায় করা এবং তাদের সর্বপ্রকার ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা।

১২. পারস্পরিক লেন-দেন, কথাবার্তা ও ক্রিয়া-কর্ম ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা।

১৩. অর্থ-সম্পদ যথাযথভাবে ব্যয় করা। অপব্যয় ও কৃপণতা থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা।

১৪. পরস্পর সালাম-কালাম করা এবং কেউ সালাম করলে তার জওয়াব দেওয়া।

১৫. হাঁচি প্রদান কারীর "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" (আল-হামদুলিল্লাহ্) বলার জওয়াবে "يَرْحَمُكَ اللّٰهُ" (ইয়ার হামুকাল্লাহ্) বলা।

১৬. দুনিয়া সকল জীব জন্তুর ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকা।

১৭. শরীয়াত নিষিদ্ধ খেলা-ধূলা বর্জন করা।

১৮ রাস্তা অথবা চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।

উপরে ঈমানের সর্বমোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি শাখার আলোচনা করা হলো। তবে কোন মুহাদ্দিস অন্যান্য হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ঈমানের শাখা আরও অধিক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আবার উল্লেখিত ৭৭টি সংখ্যার মধ্যে একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঈমানের শাখা উল্লিখিত সংখ্যার থেকে হ্রাস পেতে পারে। মূলত এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ উভয় প্রকার সংখ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের শাখা-প্রশাখার আধিক্য ব্যক্ত করা। ১

১. আইনী ঃ শারহে বুখারী; ফাতহুল বারী; মিরকাত ঃ শারহে মিশকাত।

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ

ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস

ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে উলামায়ে উম্মাতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে :

এক. ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এ মতটি-জমহুরে মুহাদ্দিসীন অবলম্বন করেছেন। ফিরকায়ে বাতিলার মধ্যে মুতাযিলা ও খারেজীরাও অনুরূপ মতামত পোষণ করে থাকে।

দুই. ঈমানে কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এ মতটি হলো, জমহুরে ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমীনের। হানাফী মাযহারের সাধারণ গ্রন্থাবলীতে এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র) -এর মত বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরে আসছে। বস্তুত ঈমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসংগে মতভেদের কারণ বর্ণনা করে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, এ মতভেদ মূলত ঈমান সম্পর্কে উভয় দলের মৌল ধারনা থেকে উত্থিত। কেননা, মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমান 'মুরাক্কাব' অর্থাৎ অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও শরীআতের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী আমল করা এর সমষ্টির নাম হলো ঈমান। তাঁদের মতানুসারে আমল ঈমানের অংশ বিশেষ। কাজেই মূল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কম বেশী হওয়ার অবকাশ না থাকলেও আমলের ক্ষেত্রে যেহেতু কমবেশী হতে পারে তাই মুহাদ্দিসীন ঈমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে মুতাকাল্লিমীনের মতে যেহেতু ঈমান 'বাসীত' তথা কেবল অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকেই ঈমান বলে। এ বিশ্বাসকে বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করা কিম্বা ধরে রাখার জন্য আমল-বিল-আরকান জরুরী। তবে আমল মূল ঈমানের অঙ্গ বা অংশ নয়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কম বেশী ঘটার প্রশ্ন অবান্তর বিধায় তাঁরা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১]

উপরোক্ত মতভেদের পর্যায়

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) তাঁর 'ফায়যুল বারী' গ্রন্থে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত সকল অভিমত বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে, আহলে সুন্নাতের উলামা তথা মুহাদ্দিসীন ও মুতাকাল্লিমীনের মধ্যে মতামতের যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা প্রকৃত অর্থে কোন বিভিন্নতা নয় বরং প্রকৃত অর্থে বিভিন্নতা হল বাতিল ফিরকা সমূহের মতামতের সঙ্গে। আহলে হকের মধ্যে যে ভিন্নতা পাওয়া যায় তা কেবল 'তাবীর' (تعبير) -এর পার্থক্য ও

১. ফায়যুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬০।

www.pathagar.com

আক্ষরিক মতভিন্নতা (نزاع لفظى) মাত্র। কারণ মুহাদ্দিসীন যদিও ঈমান তিন বিষয়ের সমষ্টিকে বলে থাকেন, তবে আমল তাঁদের মতে ঈমানের প্রকৃত অংশ (جزء حقيقى) নয় বরং আমল হল ঈমানের পূর্ণতাদানকারী অংশ (جزء كمالى)। এই জুযয়ে কামালী বস্তুর অনিবার্য অংশ নয়। কারণ এটি ব্যতিরেকেও বস্তু অস্তিত্ব অর্জন করতে পারে। বুঝা গেল তাঁদের মতানুসারেও ঈমানের মৌল বিষয় হল, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। আর এটিই হচ্ছে মুকাল্লিমীনের অভিমত। কাজেই প্রমাণিত হল যে, মুহাদ্দিসীন ও মুতাকাল্লিমীন পারস্পরিক মতভেদ বস্তুত প্রকৃত অর্থের বিরোধ নয় বরং তা হচ্ছে আক্ষরিক মতভেদ। উভয় দলের দৃষ্টিতেই হাকীকতে ঈমান এক ও অভিন্ন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির মতপার্থক্য আমলকে ঈমানের অংশ গণ্য করা বা না করার অনিবার্য ফলশ্রুতি। কাজেই আমল ঈমানের অংশ হওয়ার মতবিরোধ যেহেতু আক্ষরিক মতবিরোধ সেহেতু ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাসের মতবিরোধও আক্ষরিক মতবিরোধ হিসাবে গন্য, প্রকৃত মতবিরোধ নয়।[১]

তবে এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ্‌র সাথে ফিরকায়ে বাতিলা তথা মুতাযিলা, খারিজী ও মুরজিয়া দলের যে বিরোধ বিদ্যমান সেটি কোন আক্ষরিক মতবিরোধ নয়, বরং প্রকৃত অর্থের মতবিরোধ। কারণ মুতাযিলা ও খারিজীর মতে ঈমান তিন বিষয়ের সমষ্টি এবং যার মধ্যে আমল ঈমানের অনিবার্য অংশ (جزء حقيقى)। কাজেই আমল ব্যতিরেকে ঈমান অস্তিত্ব লাভ করে না। আবার আমলের কম-বেশীর কারণে প্রকৃতভাবেই ঈমানের হ্রাস ঘটে। অনুরূপভাবে মুতাকাল্লিমীনের ন্যায় মুরজিয়া দলের লোকেরাও ঈমান শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসকে বলে থাকে। তবে আমল সম্পর্কে মুতাকাল্লিমীনের ধারনা ও তাঁদের ধারনা এক রকমের নয়। মুতাকাল্লিমীন আমলের গুরুত্ব আবশ্যই স্বীকার করেন এবং আমলের দ্বারা ঈমানের শক্তিশালী কিম্বা দুর্বল হওয়ার অভিমত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আমলের কোন গুরুত্ব দেয় না। তাদের মতে ঈমান গ্রহণের পর আমল করা বা না করার মধ্যে কোন তফাতই নেই। বুঝা গেল যে, আহলে সুন্নাতের সাথে এ সকল ফিরকায়ে বাতিলার যে বিরোধ সেটি আক্ষরিক বিরোধ নয় বরং আসল অর্থেই বিরোধ। উভয় দলের দৃষ্টিতে হাকীকতে ঈমান ভিন্ন ভিন্ন।

ঈমানের হাকীকত বিশ্লেষণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও অন্যান্য ফিরকা

জাহমিয়া ঃ জাহম ইবন সাফওয়ানের মতানুসারীদরকে জাহমিয়া সম্প্রদায় বলা হয়। তাদের মতে হাকীকতে ঈমান হল, মারিফাতে কালবী তথা আন্তরিক উপলব্ধী, আমলের কোন গুরুত্ব নেই। ব্যক্তি এ মারিফাত অর্জনের পর কোন নেক আমল করুক কিম্বা না করুক সে পরিপূর্ণ ঈমানদার বিবেচিত হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। এমন কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কারুর মনে এই মারিফাত অর্জিত হয় তাকেও একজন পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার বলে গণ্য করা হবে।

১. ফায়যুল বারী, ১ম খণ্ড।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য তাদের এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ কাফির মুশরিকদের অনেকের মনেই আল্লাহ্র মারিফাত বিদ্যমান ছিল। অথচ শরীআতে তাদেরকে মু'মিন বলে স্বীকার করা হয় নি। আহলে কিতাব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ ـ

তারা 'নবীকে' চেনে যেভাবে তারা নিজেদের সন্তান সন্ততিকে চিনে থাকে .... (২ ঃ ১৪৬)।

অথচ তাঁদের এই 'معرفت' সত্ত্বেও তাদেরকে ঈমানদার বলে স্বীকার করা হয় নি।

কার্‌রামিয়া ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন কার্‌রামের মতানুসারীদেরকে কার্‌রামিয়া বলে। তাদের মতে হাকীকতে ঈমান বলতে কেবল মুখের স্বীকারোক্তি বুঝায় অন্তরের বিশ্বাস এবং আমল-বিল-আরকানের আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। তাদের এ মতের ভ্রান্তিও সুস্পষ্ট। কেননা নবী যুগের মুনাফিকদের মধ্যে মৌখিক স্বীকারোক্তি বিদ্যমান ছিল অথচ আয়াতের সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা তাদের কুফরী প্রমাণিত। আল্লামা শাব্বীর আহ্মদ উসমানী (র.) বলেন, বস্তুতঃ কার্‌রামিয়াদের বক্তব্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, তারা আন্তরিক বিশ্বাস ও আমল-বিল-আরকানকে গুরুত্বহীন বলে থাকে এমন নয়। তবে জাগতিকভাবে হুকুম আহ্কাম প্রয়োগের জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তিকে তারা প্রধান বিষয় বলে বিবেচনা করে। এ তথ্যানুসারে কার্‌রামিয়া সম্প্রদায়ের সাথে আহলে সুন্নাতের খুব বেশী ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে না।

মুরজিয়া ঃ মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতে ঈমানের হাকীকত হল দু'টি জিনিষ:

এক. স্বেচ্ছায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা। দুই. মৌখিকভাবে স্বীকার করা।

তাদের মতে গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ঈমানের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। তারা যেমনিভাবে জাহমিয়াদের ন্যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মারিফাতকে ঈমানের মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করে না অনুরূপ আমল- বিল্-আরকানকে এতই গুরুত্বহীন কল্পনা করে যে, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দানের পর ব্যক্তি জীবনভর সর্বপ্রকার গুনাহে লিপ্ত থাকার দ্বারাও তার ঈমানের কোনই ক্রটি আসবে না। উপরন্তু এ সকল গুনাহের কারণে তাকে জাহান্নাম যেতে হবে এমনও নয়। মুরজিয়াদের এ অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা যদি আমল-বিল-আরকানের কোন সুফল বা কুফল না থাকে তাহলে আল্লাহ্ পাক আসমানী কিতাব ও নবীদের দ্বারা যুগে যুগে মানুষের আমল দুরস্ত করানোর জিহাদ করাতেন না। তাছাড়া ভাল কাজের সুফল ও মন্দ কাজের কুফল অস্বীকার করা যেমনিভাবে শরী'আত বিরোধী, অনুরূপ বিবেক ও বিবেচনা পরিপন্থী।

মুতাযিলা ও খারিজী

মুরজিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে মুতাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায়। তাদের

www.pathagar.com

মতে আমল-বিল-আরকান ঈমানের হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত। ঈমানের 'جزء حقيقى' ও রুকন। কাজেই কোন ব্যক্তি মনে দৃঢ় বিশ্বাস বজায় রাখা সত্ত্বেও যদি কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে ঈমান থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায়। সে ব্যক্তিকে তখন আর ঈমানদার বলা যায় না।

তবে তাদের নিজেদের মধ্যে মত বিরোধ আছে। যেমন এ ধরনের কবীরা গুনাহের কারণে খারিজীদের মতে সে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কাফিরে পরিণত হয় আর মুতাযিলাদের মতে সে ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করে।

মুতাযিলাদের পরিভাষায় এ মকামকে 'مَنزِلة بين المنزلتين' উভয় পর্যায়ের মধ্যবর্তী অবস্থা বলা হয়। এমন ব্যক্তি জাগতিকভাবে তো ফাসিক হিসাবে গণ্য হবে তবে আখিরাতে সে কাফিরদের ন্যায় চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। মুতাযিলা ও খারিজীদের এ অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে গুণাহ্গারদেরকেও মু'মিন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই গুনাহের কারণে যদি কোন ব্যক্তি ঈমান থেকে বহিস্কৃত হয়ে যেত তা হলে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কুরআনের ভাষায় মু'মিন বলে উল্লেখ করা হতো না।

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে হাকীকতে ঈমান বলতে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায়। গুনাহের কারণে ব্যক্তি কাফির হয় না। এ গুনাহ্ মাফ না হলে তাকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকতে হবে। তবে কাফিরদের ন্যায় চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে না। অনুরূপভাবে আমল-বিল-আরকান তাঁদের মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমলের ভাল মন্দের কারণে আখিরাতে ব্যক্তিকে পুরস্কার বা শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। বুঝা গেল যে, আহলুস্ সুন্নাহর আলিমদের অবস্থান মুরজিয়া ও মুতাযিলাদের সম্পূর্ণ মাঝামাঝিতে। তাঁরা মুরজিয়াদের ন্যায় আমলকে যেভাবে বেকার বলেন না, অনুরূপ মুতাযিলা ও খারিজীদের ন্যায় আমলকে ঈমানের প্রকৃত অংশও বলেন না। তবে আন্তরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলে কিম্বা ব্যক্তি থেকে যদি এমন কোন কাজ প্রকাশ পায় যা আন্তরিক অবিশ্বাস বুঝায় এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি মু'মিন থাকতে পারে না। আহ্লে সুন্নাহের উপরোক্ত চিন্তাধারার সাথে মুহাদ্দিসীন ও মুতাকাল্লিমীনের মধ্যেকারের কোন দ্বিমত নেই। তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ যুগের প্রেক্ষিতে ঈমান সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা ও তাবীর (تعبير) করে গেছেন তাতে কিছু ভিন্নতা আছে। যেমন মুতাকাল্লিমীন ঈমানের তাবীর করে বলেন, الايمان هو التصديق والاقرار، وهو لا يزيد ولا ينقص। ঈমান আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকে বুঝায়। বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির মধ্যে কোন রূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসীন বলেন, الايمان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالأركان وهو يزيد وينقص ঈমান অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস-মৌখিক স্বীকৃতি ও আমল-বিল-আরকান এ তিনটি সমষ্টিকে বুঝায়। এ ঈমান বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস হতে পারে।

www.pathagar.com

তাবীরের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সূচিত হওয়ার কারণ

আহ্‌লে সুন্নাহ্‌র সকলের মধ্যে ঈমান সম্পর্কে মূল চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন হওয়ার পাশাপাশি তাবীর বা ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার একাধিক কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন -

এক. যুগের চাহিদার কারণে ঃ হযরত শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মহামূদুল হাসান (র.) বলেন, মুহাদ্দিসীন ও মুতাকাল্লিমীনের বক্তব্য বিভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল প্রত্যেকের নিজ নিজ যুগের পরিস্থিতি ও দাবী। কেননা মুহাদ্দিসীনের প্রতিপক্ষে ছিল মুরজিয়া সম্প্রদায়। তারা আমল-বিল- আরকানকে গুরুত্বহীন বলে প্রচার করত। এমতাবস্থায় মুহাদ্দিসীন যদি নিজেদের মূল দর্শনের ব্যাখ্যা করে আমলকে ঈমানের প্রকৃত অংশ নয় বলে ব্যক্ত করতেন তা হলে বাতিল পন্থীরা মুহাদ্দিসীনের এ বক্তব্যকে নিজেদের ভ্রান্ত দর্শনের পক্ষে সমর্থন হিসাবে অপব্যবহার করত। সমকালীন বাতিল পন্থীদেরকে এহেন অপব্যবহারের সুযোগ না দেয়া এবং উম্মাতকে সমকালীন বাতিল পন্থীদের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য মুহাদ্দিসগণ বললেন, ঈমান 'মুরাক্কাব' আমল-বিল-আরকান ঈমানের অংশ। আমল গুরুত্বহীন জিনিস নয় বরং এর কারণে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পক্ষান্তরে মুতাকাল্লিমীন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর যুগে মুতাযিলা ও খারিজীর দৌরাত্ম চলছিল। এ বাতিল পন্থীরা আমল-বিল-আরকানকে এতখানি কঠোর বলে প্রচার করে যে, তুচ্ছ তুচ্ছ কারণেও ব্যক্তিকে ঈমান থেকে বহিষ্কৃত বলে প্রচার করে। এমতাবস্থায় হকপন্থী উলামায়ে মুতাকাল্লিমীন ও ইমাম আযম (র.) প্রচার করলেন যে, ঈমান 'বাসীত' তথা একক জিনিস (অন্তরের বিশ্বাস) আমল ঈমানের প্রকৃত অংশ নয়। কাজেই আমলের ক্ষেত্রে কখনো কোন ত্রুটি ঘটে গেলে ব্যক্তি কাফির হয় না। চিরকালের জন্য জাহান্নামী বিবেচিত হয় না। অনুরূপভাবে আমল ঈমানের অংশ নয় বিধায় ঈমান হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া থেকেও মুক্ত। বলা বাহুল্য উম্মতের যিম্মাদার হিসাবে হক পন্থী আলিমদের এহেন ব্যবস্থা গ্রহণ যথোপযুক্ত।

দুই. দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কিঞ্চিত ব্যবধানের কারণ ঃ কতিপয় আলিমের মতে- আহলে হকের মধ্যে উপরোক্ত বক্তব্যের বিভিন্নতা সূচিত হওয়ার কারণ হল ঈমানের সহিত আমলের সম্পর্ক কোন ধরনের তা নিরূপন করার ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক গাছের কাণ্ড ও মেরু দণ্ডের সাথে ডালপালার সম্পর্কের ন্যায়। গাছের যেমন ডালপালা এর মেরুদণ্ডেরই অংশ বিশেষ হয়ে থাকে। তেমনি আমলও ঈমানের অংশ বিশেষ। অনুরূপভাবে মেরুদণ্ড যেমন আসল আর ডালপালা অতিরিক্ত অংশ, তেমনি ঈমানও হল আসল, আমল তার অতিরিক্ত অংশ। ডালপালা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে গাছের দেহে যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে আমলের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে ঈমানের ক্ষেত্রেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে ইমাম আযম (র.) ও মুতাকাল্লিমীনের মতে ঈমানের সহিত আমলের

www.pathagar.com

সম্পর্ক হল মূলের সহিত গাছের ডালপালার সম্পর্কের ন্যায়। অর্থাৎ ডালপালা যেমন মূলের অংশ নয় তবে মূল থেকেই উত্থিত। অনুরূপভাবে ডালপালার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানোর কারণে মূলের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার প্রয়োজন হয় না। তাই আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারাও ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রশ্ন উঠে না। বলা বাহুল্য দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতার দরুন ঈমানের পরিচয় দান ও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন ও মুতাকাল্লিমীনের অভিমতে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ

শায়খ আবুল মানসূর আবদুল কাহির বাগদীদ (র.) তাঁর 'আস্‌মা উস্ সিফাত' গ্রন্থে এবং শায়খ আবুল কাসিম আনসারী (র.) তাঁর 'শারহে ইরশাদ' গ্রন্থে সালাফের মূল বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত সালাফের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

الإيمَان معرفة بِالقلب وإقرار بِاللسَان وعمل بالأركَان يزيد بِالطاعة وينقص بِالمعصية •

ঈমান বলতে আন্তরিক উপলব্ধি, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও হুকুম আহ্‌কামের উপর আমল করাকে বুঝায়। এটি নেক আমলের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং বদ আমলের কারণে হ্রাস হয়। বলাবাহুল্য এ বাক্যে ঈমান সম্পর্কীয় সাধারণ অনুভূতির কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আমল ঈমানের অনিবার্য অঙ্গ বুঝানো এ-ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পরবর্তী আলিমগণ উল্লেখিত বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে দু'টি বাক্যে প্রকাশ করেছেন। যেমন, ইমাম বুখারী (র.) প্রথমাংশকে সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন, 'الإيمَان قول وعمل' অনুরূপভাবে শেষাংকে সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে 'يزيد وينقص' এর ফলে সকলের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে। কারণ সংক্ষিপ্ত বাক্যদ্বয় দেখলে মনে হয় সকলের উদ্দেশ্য হল ঈমানকে 'মুরাক্কাব' প্রমাণ করা। অথচ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ঈমানের ক্ষেত্রে আমলের গুরুত্ব ব্যক্ত করা।

অনুরূপভাবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর বরাতে হানাফী আলিমগণের মধ্যে যে ,উক্তি প্রচলিত আছে অর্থাৎ الإيمَان التصديق بِالجنَان لا يزيد ولا ينقص। এখানেও বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিদ্যমান। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, এই ইবারতের সনদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) পর্যন্ত সহীহভাবে পাওয়া যায় না। ইবারতটি 'ফিকহে আকবর' গ্রন্থে আছে। তবে 'ফিকহ্ আকবর' গ্রন্থ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিজের রচিত গ্রন্থ নয়। বরং তার শাগরিদ আবূ মুতী' বালাখী (র.) রচিত। ঈমান সম্পর্কে ইমাম আযমের মূল বক্তব্যের ধারনা 'আকীদাতুত্ তাহাবী' গ্রন্থ থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়। কারণ ইমাম তাহাবী (র.) গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন যে, তাঁর এ গ্রন্থ ইমাম আযম ও সাহিবাইনের বর্ণিত আকীদার অনুসরণে রচিত।

www.pathagar.com

ইমাম তাহাবী (র.) লিখেছেন -

الإيمَان إقـرَار بِاللسـان وتصـدِيق بالجِنَان وجـمـيـع مـا صح عن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم من الشـرع والبـيـان كله حق والإيمان وَاحـد وأُصله في اصله سـواء والتـفـاضل بينهم بالخـشيـة والتقي ولخالفة الهوى وملاَزمة التقوى.

ঈমান বলতে মৌখিক স্বীকারোক্তি, বিশ্বাস এবং নবী করীম (সা.) থেকে শরী'আত ও শরী'আতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সব জিনিস সহীহ্‌ভাবে বর্ণিত আছে সেগুলো সত্য বলে মেনে নেয়াকে বুঝায়। ঈমান মৌলিকভাবে একক জিনিস। ঈমানদারগণ এ ক্ষেত্রে সম পর্যায়ের। তবে ঈমানদারদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ভীতি, তাক্‌ওয়া, খাহেশাতের বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা ও ব্যবধান হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য ইমাম আযমের উল্লিখিত উক্তিটি সম্মুখে রাখা হলে সালাফের সঙ্গে তাঁর অভিমতের কোনই ভিন্নতা দেখা যায় না। অথচ পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ উক্তিটি সংক্ষিপ্ত করে এভাবে দেওয়া হয়েছে, اَلإيمان إقـرار بِاللسَان وتَصـدِيق بِالجنَان لاَ يزِيد ولاَ ينَقص. এই সংক্ষিপ্ত করার কারণে এক দিকে ইমাম আযমের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে গেছে। আর অন্য দিকে তাঁর বক্তব্য সালাফের বক্তব্যের বিপরীত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কাজেই সালাফ ও ইমাম আযমের মূল বক্তব্যের নিরিখে এ কথা বুঝায় যে, তাঁদের মধ্যে ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা দু'টিতে কোন মৌলিক ভিন্নতা নেই। উভয়ের মূল উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

১. ফায়যুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫–২৬৭।

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ

কুফ্‌র ও শিরক

কুফ্‌র শব্দের আভিধানিক অর্থ

'কুফ্‌র' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ঢেকে দেওয়া। কেউ যদি কোন দাতার দানের কথা ভুলে গিয়ে তার অকৃতজ্ঞতা করে তবে শাব্দিক অর্থে তাকেও কুফরী বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ○

যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা কুফরী কর (অকৃতজ্ঞ হও) তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি বড় কঠিন (১৪ ঃ ৭)।

কুফ্‌র-এর পারিভাষিক অর্থ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.) তাঁর 'ফায়সালাতুত্ তারিকাহ্ বায়নাল ঈমানি ওয়ায যিনদিকা' নামক কিতাবে বলেন, ঈমান হল হযরত নবী করীম (সা.) -এর আনীত দীনের সকল বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণের অঙ্গীকার ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এবং কুফ্‌র হল নবী করীম (সা.) -কে অস্বীকার করা অথবা তাঁর আনীত দীনের কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা।

সুতরাং বুঝা গেল যে ইসলামের সমুদয় বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত্য ও বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের জন্য জরুরী। কিন্তু সমুদয় বিধি-বিধান নয়, ইসলামের শুধুমাত্র একটি বিধানকেও অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

কুফ্‌র -এর প্রকারভেদ

কুফ্‌র চার প্রকার ঃ

১. অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করা। অর্থাৎ নবী করীম (সা.) -এর নবূওয়াতী দাওয়াত ও এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে তা অস্বীকার করা। যেমন আবূ জাহ্‌ল নবী করীম (সা.) -কে অস্বীকার করেছিল।

২. হঠকারিতা ও শত্রুতাবশত:অস্বীকার করা। অর্থাৎ নবী করীম (সা.) -এর দাওয়াতকে সত্য জানা সত্ত্বেও শত্রুতাবশত: তা অস্বীকার করা। যেমন আহ্‌লে কিতাব নবী করীম (সা.)-এর

www.pathagar.com

নবূওয়াতকে অস্বীকার করেছিল।

৩. সন্দেহবশত অস্বীকার করা। অর্থাৎ নবী করীম (সা.) -এর নবুওয়াতের দাবী সত্য অসত্য তা স্থির করার ব্যাপারে দ্বিধা সংশয়ে পতিত হওয়ার কারণে তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা। যেমন, নবী করীম (সা.) -এর যুগে অধিকাংশ মুনাফিক অস্বীকার করেছিল।

৪. বিকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অস্বীকার করা। অর্থাৎ নবী করীম (সা.) -এর প্রকাশ্য বাণী সমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং অমূলক ও গর্হিত বিষয়াদি তাঁর প্রতি আরোপ করাও কুফরী। যেমন-খারিজী, মু'তাযিলা, মুরজিয়া, কাদিয়ানী ইত্যাদি সম্প্রদায়। এরা পবিত্র কুরআন হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে বাতিল মতবাদ গ্রহণ করেছে।

'ফায়যুল বারী'গ্রন্থে কুফরীকে এভাবে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১. কুফরে ইনকারী (كفر الإنكاري) অর্থাৎ অন্তর এবং জিহ্বা দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাসও না করা এবং স্বীকারও না করা। যেমন-আবূ জাহ্লের কুফরী।

২. কুফরে জুহুদ (كفر الجحود) অর্থাৎ হক বা সত্যকে অন্তরে বিশ্বাস করা কিন্তু মুখে স্বীকার না করা। যেমন- ইবলীসও একশ্রেণীর আহলে কিতাবের কুফ্রী।

৩. কুফ্রে মু'আনিদ ঃ (كفر المعاندة) অর্থাৎ সত্যকে নিজে জানা, অনুধাবন করা এবং মুখে স্বীকারও করা তবে তা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস না করা। যেমন- আবূ তালেবের কুফ্রী।

৪. কুফ্রে নিফাকী (كفر النفاقي) অর্থাৎ মুখে সত্যকে স্বীকার করা কিন্তু অন্তরে তা অস্বীকার করা। যেমন- আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর কুফ্রী।

মূলত:কুফরের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এই স্তরের বিভিন্নতার কারণে তার হুকুমও বিভিন্ন হয়ে থাকে।[১]

'শরহে মাকাসিদ'গ্রন্থে আল্লামা তাফ্তাযানী (র.) কুফরীর প্রকার ভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এ কথা সুস্পষ্ট যে,কাফির ঐ ব্যক্তি যে মুমিন নয়। যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় অথচ তার অন্তরে ঈমান নেই সে মুনাফিক। আর যদি যে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর কুফরীতে ফিরে যায় সে মুরতাদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে সে মুশরিক। আর যে ব্যক্তি কোন মানসূখ (রহিত) ধর্ম যথা ইয়াহুদী বা খৃস্টান ধর্মের অনুসারী হয় তাকে আহলে কিতাব বলা হয়। যে ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে সব কিছু প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে এরূপ মত পোষণ করে তাকে দাহরিয়া বা ন্যাচারালিষ্ট প্রকৃতিবাদী বা জড়বাদী নাস্তিক বলা হয়। যে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে তাকে নাস্তিক বলা হয়। আর যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নবূওয়াত এবং নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত ইত্যাদি ইসলামী আহ্কামকে বাহ্যিকভাবে স্বীকার করার সাথে সাথে ইসলামের পরিপন্থি

১. ফায়যুল বারী, ১ম খণ্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

বাতিল মতবাদকে ইসলামী মতবাদ রূপে প্রকাশ ও প্রচার করে তাকে যিন্দীক বলা হয়।[১]

কাফিরদের শ্রেণী বিভাগ

কাফিররা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. যারা আল্লাহ্‌কে দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে না। যেমন, দাহরিয়া। অর্থাৎ যারা বলে যে, আমরা প্রকৃতির নিয়মে চলছি এবং প্রকৃতির নিয়মে শেষ হয়ে যাব।

২. যারা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহ্‌দানিয়ত অর্থাৎ একত্ববাদকে স্বীকার করে না। যেমন, দ্বিত্ববাদী সম্প্রদায়। তারা দুই দেবতার পূজারী।

৩. যারা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা মানে এবং একত্ববাদকেও স্বীকার করে তবে রাসূল এবং ফিরিশ্‌তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। যেমন-একশ্রেণীর দার্শনিক ।

৪. যারা এ সব কিছুই স্বীকার করে কিন্তু নবী করীম (সা.) এর রিসালত ব্যাপক অর্থাৎ দুনিয়াব্যাপী এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এ কথা অস্বীকার করে। যেমন-খৃষ্টানদের এক সম্প্রদায় এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

মাসাইলে কুফর

আল্লাহ্‌র রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও এমন কিছু বিশ্বাস ধারনা অথবা কাজ রয়েছে যা কুফরীরই অন্তর্ভূক্ত অথবা কুফরীর পর্যায়ভূক্ত। যেমন-নবী করীম (সা.) কিয়ামত দিবস গুনাহগার উম্মাতের জন্য শাফা'আত করবেন। এ বিষয় অস্বীকার করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে গালি দেওয়া। কোন নবী রাসূলকে গালি দেওয়া, তাঁদের প্রতি কটূক্তি করা, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা।[২]

কোন নবীকে গালি দেওয়া কুফরী এবং তার শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড।[৩]

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে খারাপ মনে করা, এর কোন দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করা। ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষভাব পোষণ করা বা তাঁদের সম্পর্কে কটূক্তি করা।[৪]

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজ্‌দা করা। সিজ্‌দা যেহেতু একটি ইবাদত এবং বিষয় ও আনুগত্য প্রকাশের চূড়ান্ত পন্থা তাই সিজ্‌দা, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও জন্য করা যায় না।

নামায সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা

যেমন একথা বলা নামায আমার উপর ফরয নয়। জ্ঞানীদের জন্য নামায পড়া ঠিক নয়। নামায আদায় করে কি লাভ ? আমার অমুক মরে গিয়েছে বা আমার ঐ সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে-আমার নামায পড়ে কি হবে ইত্যাদি। ইত্যাদি।।[৫]

---

১. শারহ আকাইদ, ২খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৯। ২. ফাত্‌ওয়ারে আলমগিরী, ২য় খণ্ড। ৩. ফাত্‌ওয়ায়ে বায্‌যাযিয়া, শামী, আলমগিরী, ৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২২। ৪. ফাত্‌ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা। ৫. ফাত্‌ওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২য় খণ্ড ।

www.pathagar.com

ইচ্ছাকৃত কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে নামায আদায়। অথবা ইচ্ছাকৃত বিনা অযূতে নামায আদায় করা (ফাত্ওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৮)।

আযানের ধ্বনি সম্পর্কে কটূক্তি করা (ফাত্ওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯)।

পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা বা তার কোন নির্দেশ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা (ফাত্ওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬)।

হালালকে হারাম মনে করা, হারামকে হালাল মনে করা (খুলাসাতুল ফাত্ওয়া আলমগিরী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯)।

হারাম বস্তু ভক্ষণ করার সময় অথবা শরাব পান কালে 'বিস্মিল্লাহ' বলা। অথবা যিনায় লিপ্ত হওয়ার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলা (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড, ২পৃষ্ঠা)

নিজেকে সাওয়াব ও গুনাহের উর্ধ্বে মনে করা (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড)।

কারো মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'আলার উপর অভিযোগ আনা, আল্লাহ্ পাককে যালিম সাব্যস্ত করা (কাযী খান ও ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী)।

কোন বুযর্গের সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখা যে, তিনি গায়েবের খবর রাখেন বা কোন কিছুই তার অজ্ঞাত নয় (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী)।

জ্যোতিষী বা গণকের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবর বিশ্বাস করা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভাল-মন্দের মালিক মনে করা (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী)।

যে সকল বস্তু আল্লাহ্ ছাড়া কারোর দেওয়ার ক্ষমতা নেই এমন বস্তু কেউ দিতে পারে বলে বিশ্বাস রাখা বা কারো কাছে তা যাচ্না করা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা, পশু ছেড়ে দেয়া বা পশু যবেহ্ করা (ফাত্ওয়ায়ে হিন্দিয়া)।

কাউকে কুফরী শিক্ষা দেওয়া (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী)।

মুহাম্মদ (সা.) -কে সর্বশেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস না করা অথবা তাঁর পরে অন্য কোন নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস রাখা। নিজের ঈমান সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকা বা সন্দেহ পোষণ করা (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড)।

কুরআনকে মাখলূক মনে করা (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭)।

ঈমান ও কুফরীকে সমান মনে করা (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড)।

হযরত আয়েশা (রা.) -এর উপর যিনার অপবাদ দেয়া (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড)।

হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা.) -এর খিলাফতকে অবৈধ মনে করা ও অস্বীকার করা। (শামী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৬ ও ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

মুরতাদ প্রসঙ্গ

মুরতাদ শব্দটি 'ইরতিদাদ' ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু থেকে প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে যাওয়া (জামহারাতুল লুগাহ ঃ আমদী, ১ম খণ্ড)।

ইবন মঞ্জুর 'লিসানুল আরব' গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠায় (৪র্থ খণ্ড) ইরতিদাদের অর্থ লিখেন, পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন। 'তাজুল আরুস' গ্রন্থের ৫৭১ পৃষ্ঠায় (২য় খণ্ড) আল্লামা জুবায়দী অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

আর ইসলামী পরিভাষায়-কোন মুসলামান যদি ইসলাম পরিত্যাগ করে তাকে 'মুরতাদ' বলা হয় (বাদায়েউস্ সানায়ে', ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৪)।

ফাত্ওয়া দারুল উলূমের ১২ খণ্ড ৩৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ ইসলামের ছোট বড় প্রতিটি আকীদা ও হুকুম মেনে নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এর কোন একটাকে অস্বীকার করা, বা তুচ্ছ মনে করা, অথবা ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা -বিদ্রুপ করার ফলে মানুষ ধর্মের গণ্ডি হতে খারিজ হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য যে, মুরতাদের বিধান ইসলামী শরী'আতে অত্যন্ত কঠোর অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। আপনি আল্লাহ্র নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবেন না" (সূরা আহ্যাব ঃ ৬১ঃ ৬২)।

উল্লেখিত আয়াতের আলোকে মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন, মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আতেও মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছিল।

এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় কাফির অবস্থায়, তার সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে (২ ঃ ২১৭)।

আরো ইরশাদ হলো ঃ "সেদিন কারো চেহারা উজ্জ্বল হবে, এবং কারো মুখ কাল। যাদের মুখ কাল হবে তাদের বলা হবে- তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে ? যেহেতু তোমরা কুফরী করেছিলে তাই শাস্তি ভোগ কর" (৩ ঃ ১০৬)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ "ঈমান আনার পর যারা কুফরী করে এবং যাদের কুফরী বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তাওবা কখনো কবুল হবে না এরাই পথভ্রষ্ট" (৩ ঃ ৯০)।

হাদীসের আলোকে মুরতাদের শাস্তি

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেন, যে তার দীন পরিত্যাগ করবে (মুরতাদ হয়ে যাবে) তাকে হত্যা কর (নাসাই, ২য় খণ্ড)।

নবী করীম (সা.) আরও ঘোষণা করেন, তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলামানকে হত্যা

www.pathagar.com

করা জায়িয নয়। ১. বিবাহিত যিনাকারী, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী ও ৩. স্বীয় দীন পরিত্যাগ করে মুসলমানদের জামা'আত বর্জনকারী, অর্থাৎ এই তিনটি কারণে তাদের হত্যা করা হবে (বুখারী, ২য় খণ্ড)।

এ সম্পর্কে মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন, 'ইরতিদাদ' এর আভিধানিক অর্থ ফিরে যাওয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় 'ইরতিদাদ' অর্থ ঈমান ও ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া। সুতরাং যে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে সে 'মুরতাদ'।

ইরতিদাদের দু'টো পদ্ধতি রয়েছে ঃ

১. প্রকাশ্যভাবে ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা। যেমন - ইসলাম পরিত্যাগ করে ইয়াহূদী, খৃস্টান বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা।

২. প্রকাশ্যভাবে ত্যাগের ঘোষণা না দিয়ে এমন সব কাজ কর্ম করা, যদ্দ্বারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এসব কারণে মুরতাদ হয়ে যায়।

মুরতাদদের দ্বিতীয় শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে আমরা প্রায়ই ভুল করি। অথচ এটা ইসলামের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর বিষয়। কারণ তখন কাফির ও মু'মিন বা কুফর ও ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। অথচ এ শ্রেণীটি ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে থাকে।

হাফিয ইবুন তাইমিয়া (র.) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে গালমন্দ করলে যেমন মুরতাদ হবে তেমনি তাঁদের কোন একটি বিধানকে অস্বীকার করলেও কাফির হবে। যেমন, ইবলীস আল্লাহ্র রবুবিয়্যাতকে অস্বীকার না করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার একটি হুকুমকে না মানার কারণে সে কাফির হয়েছে (আস্ সারিমুল মাসলুল ঃ ইবনু তাইমিয়া (র.)।

মোটকথা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা, আল্লাহ্ ও রাসূলকে অস্বীকার করাতে যেমন মুরতাদ তেমনি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোন অঙ্গকে অস্বীকার করলেও মুরতাদ হয়ে যায়। (জাওয়াহিরুল ফিক্হ ঃ মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র.), ১ম খণ্ড)

মুরতাদ সম্পর্কীয় কয়েকটি মাসআলা

মুরতাদ বলতে তাকেই বুঝায় যে ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম পরিত্যাগ করে। মুরতাদ সাব্যস্ত ওয়ার জন্য আকিল ও বালিগ হওয়া শর্ত। কোন পাগল বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যদি কুফরী কথা বলে বা কুফরী কাজ করে তবে তাকে 'মুরতাদ' বলে গন্য করা হবে না। তেমনি স্বেচ্ছায় ইসলাম পরিত্যাগ করা শর্ত। যদি কেউ জোর-যবরদস্তীর বা প্রাণের ভয়ে কলেমায়ে কুফর উচ্চারণ করে কিম্বা কুফরী কাজ করে তবে সে 'মুরতাদ' হবে না।

মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে পুরুষ মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ৬ম খণ্ড)।

কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তার নিকট ইসলামে ফিরে আসার দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব (ফাত্হুল কাদীর)।

www.pathagar.com

এজন্য তাকে বন্দি করে রাখা হবে এবং তিন দিন অবকাশ দেওয়া হবে। এর মধ্যে সে ইসলামে ফিরে না এলে তাকে হত্যা করা হবে। ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তি সকলের ক্ষেত্রেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

মুরতাদকে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রকাশ্যে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করতে হবে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্ম ও বিশ্বাস বর্জনের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে।

কোন মুরতাদ যদি তাওবা করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে, আবার মুরতাদ হয়ে যায়, আবার ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায় এভাবে তিনবারের পর তাকে আর কোন অবকাশ না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে (আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

কোন জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন নাবালিগ মুরতাদ হওয়ার মত কর্ম করলে সেও মুরতাদ হয়ে যাবে, এ অবস্থায় ইসলামে ফিরে আসার জন্য তার প্রতি চাপ প্রয়োগ করা হবে, তবে তাকে হত্যা করা হবে না।

মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার কারণে সঙ্গে সঙ্গে তার সকল সম্পদের মালিকানা ও স্বত্বাধিকার হারাবে। তবে ইসলামে ফিরে এলে আবার তা ফিরে পাবে। আর মুরতাদ অবস্থায় মারা গেলে বা তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে মুসলমান অবস্থায় অর্জিত সম্পদের ওয়ারিস হবে তার উত্তরাধিকারীগণ। আর ঐ সময়কালীন ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর মুরতাদকালীন ঋণ মুরতাদকালীন অর্জিত সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা হবে। এ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। সাহিবাইন অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে মুরতাদ হওয়ার কারণে সঙ্গে সঙ্গেই তার মালিকানা হারাবে না। বরং মৃত বা তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরই তার ওয়ারিসগণ তার পরিত্যাক্ত সম্পদের সত্বাধিকারী হবে। ইহাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং মুসলমান মেয়ে বা মুরতাদ মেয়ে, কাউকেই সে বিয়ে করতে পারবে না। যেহেতু তার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। এ অবস্থায় সে কোন পশু যবেহ্ করতে পারবে না, করলেও তা কোন মুসলমানের জন্য খাওয়া হালাল হবে না (ফাত্ওয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ঠ, খণ্ড)।

কবীরা গুনাহ্

গুনাহ দু' ভাগে বিভক্ত ঃ কবীরা ও সগীরা। কেউ কেউ বলেছেন, মূলত সব গুনাহ্ই গুনাহ্, এর কোন বিভাগ নেই। তবে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে গুনাহ দু' প্রকার- সগীরা গুনাহ্ ও কবীরা গুনাহ্।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

www.pathagar.com

যদি তোমরা কবীরা গুনাহ্ সমূহ বর্জন কর যা করতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তবে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেব (৪ ঃ ৩১)।

হাদীস শরীফেও গুনাহ্ সগীরা ও কবীরা এই দু' প্রকার হওয়ার উল্লেখ রয়েছে (তাফসীরে বায়যাবী, সূরা নিসা)।

কবীরা গুনাহের আভিধানিক অর্থ বড় গুনাহ্। আর শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে সকল কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং যে সকল কাজের জন্য শাস্তির বিধান অথবা আল্লাহ্র ক্রোধের ঘোষণা রয়েছে তাকে কবীরা গুনাহ্ বলা হয়।

কবীরা গুনাহ্ কোন ইবাদতের দ্বারা মাফ হয় না বরং এর জন্য তাওবা করা আবশ্যক। আর সগীরা গুনাহ্ নেক আমল দ্বারাও মাফ হয়ে যায়। উলামায়ে কেরামের মতে সগীরা গুনাহ্ও যদি বেপরোয়া ও ঔদ্ধত্যের সাথে বারবার করা হয় তবে তাও কবীরার পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়।

ইবৃন হুমাম ও হাসান বাসরী (র.) বলেছেন, যে সকল গুনাহের কারণে আল্লাহ্ পাক দোযখ, লা'নত, আযাব ইত্যাদি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেগুলো কবীরা অন্যান্যগুলো সগীরা গুনাহ্।

কবীরা গুনাহ্সমূহের সংখ্যা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কবীরা গুনাহের পূর্ণ সংখ্যার বর্ণনা এক সাথে উল্লেখ নেই। তবে কুরআন ও হাদীসে যে সকল গুনাহকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, উলামায়ে কিরাম এর সংখ্যা ৭০টি বলে বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ তার সংখ্যা এর চেয়ে অধিক বলেও উল্লেখ করেছেন। এ সকল কবীরা গুনাহের মধ্যে কোনটি কোনটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুতর।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যে সকল অপারাধের কাজকে কবীরা গুনাহ্ হিসাবে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সাতটি ধবংসাত্মক কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে সাতটি কাজ কি কি, তিনি বললেন,

১. আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. শরী'আতের বিধান ছাড়া কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ্ হারাম করেছে, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৭. নিরাপরাধ ও পবিত্র মুসলিম মহিলাদের নামে যিনার অপবাদ রটানো (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবৃন উমর (রা.) বর্ণনা করেন - কবীরা গুনাহ নয়টি ঃ

১. আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৩. নির্দোষ মহিলাকে যিনার

www.pathagar.com

অপবাদ দেওয়া, ৪. যিনা করা, ৫. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৬. ইয়াতীমের মাল ভক্ষন করা, ৭. মুসলমান পিতা-মাতার নাফরমানী করা, ৮. হারম শরীফে কুফরী করা, ৯. যাদু করা।

সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) এর সাথে সুদ খাওয়া, চুরি করা ও মদ পান করাকে যোগ করেছেন।

সাহাবী আনাসের বর্ণনা, নবী করীম (সা.) আমাদের এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যেখানে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন নি ঃ

১. যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই;

২. এবং যে ওয়াদা রক্ষা করে না তার মধ্যে দীন নেই (শারহে আকাইদে নাসাফী)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) -কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্‌ কোনটি ? উত্তরে নবী (সা.) বললেন:কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করল অতঃপর কোনটি ? নবী (সা.) উত্তর করলেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। সে আবার প্রশ্ন করল, তারপর কোনটি ? নবী করীম (সা.) জবাব দিলেন, তোমরা পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এরপর পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিনি তিলাওয়াত করে শুনালেন, "যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ বলে ডাকে না, আল্লাহ্‌ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন তাকে আইনের বিধান ব্যতীত হত্যা করে না এবং যিনায় লিপ্ত হয়না" (২৫ ঃ ৬৮; বুখারী ও মুসলিম, কবীরা গুনাহ্‌ অধ্যায়)।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) -এর ঘোষণা গুরুতর কবীরা গুনাহ্‌ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা- মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা, মিথ্যা হলফ করা (বুখারী)।

হযরত আনাসের বর্ণনায় হাদীসটিতে মিথ্যা হলফের পরিবর্তে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে (বুখারী, মুসলিম ও বাবুল কাবাইর)।

মুয়ায ইবন জাবালের বর্ণনা ঃ নবী করীম (সা.) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন -

১. আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

২. পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না যদিও তারা তোমাকে স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করতে বলেন।

৩. ইচ্ছে করে কখনো ফরয নামায তরক করবে না। কেননা তা করলে আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে হিফাযতের দায়িত্ব উঠে যায়।

www.pathagar.com

৪. কখনো শরাব পান করবে না। কেননা তা হচ্ছে সকল অশ্লীলতার উৎস।

৫. সাবধান। গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকবে।

৬. সাবধান! জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকলে ধ্বংস হয়ে যায়।

৭. লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দিলে সে স্থান ত্যাগ করবে না।

৮. তোমার সামর্থানুযায়ী পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করবে।

৯. পরিবারের লোকদের আদব কায়দা শিক্ষা দিবে, শাসন করতে কখনো দ্বিধা করবে না।

১০. তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের ভয় প্রদর্শন করবে। (আহ্মাদ, মিশকাত,কবীরা গুনাহ অধ্যায়)

কবীরা গুনাহসমূহ

১. আল্লাহ্ পাকের সাথে কাউকে শরীক করা।

২. কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা।

৩. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, তাদের কষ্ট দেয়া।

৪. কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

৫. ইয়াতীমের মাল আত্মসাত করা।

৬. যিনা ব্যাভিচার করা। পুরুষে, পুরুতে নারীতে-নারীতে মৈথুন করা।

৭. ওযনে কম দেওয়া।

৮. দারিদ্রের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করা।

৯. কোন নির্দোষ মহিলার উপর যিনার অপবাদ দেয়া।

১০. সুদ খাওয়া।

১১. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।

১২. যাদু, বান, টোনা ইত্যাদি করা।

১৩. আমানতে খিয়ানত করা।

১৪. ওয়াদা ভংগ করা।

১৫. মিথ্যা বলা।

১৬. কুরআন শরীফ শিক্ষা করে তা ভুলে যাওয়া।

১৭. আল্লাহ্ পাকের কোন ফরয ইবাদত যেমন -নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিনা কারণে ছেড়ে দেয়া।

১৮. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজ্দা করা।

www.pathagar.com

১৯. কোন মুসলমানকে কাফির, বেঈমান, আল্লাহ্‌র নাফরমান, আল্লাহ্‌র দুশমন ইত্যাদি বলা।

২০. চুরি করা।

২১. গীবত শেকায়েত করা ও শোনা।

২২. খাদ্য-শস্যের দাম বাড়লে খুশী হওয়া।

২৩. কোন বস্তুর দাম সাব্যস্ত হওয়ার পরও জোরপূর্বক তার মূল্য কম দেয়া।

২৪. শরাব পান ও মাদক দ্রব্য সেবন করা।

২৫. জুয়া খেলা।

২৬. গায়ের মুহাররম -এর নিকট নির্জনে বসা।

২৭. আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শুকুরী করা।

২৮. যুলুম অত্যাচার করা।

২৯. আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

৩০. কারো প্রতি অহেতুক মন্দ ধারনা পোষণ করা।

৩১. অপরের দোষ অনুসন্ধান করা।

৩২. কারো ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা।

৩৩. বিনা ওযরে জুমু'আর নামায তরক করা।

৩৪. মিথ্যা কসম খাওয়া। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া। হযরত ইব্‌ন ওমরের বর্ণনা, নবী করীম (সা.) -কে আমি

৩৫. কাফিরদের রীতি নীতি ও প্রথাকে পসন্দ করা।

৩৬. অশ্লীল নৃত্য-গীতি বা গান-বাজনা উপভোগ করা।

৩৭. সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ন্যায় ও সত্যের পথে আহ্বান না করা ও অন্যায় অসত্য প্রতিরোধের চেষ্টা না করা।

৩৮. সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা, নবী করীম (সা.) বলেন, মুসলমানের উপর যুলুম ও করা যাবে না এবং তাকে অপমানও করা যাবে না। (মুসলিম, মিশ্‌কাত)

৩৯. কোন পশুর সাথে যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়া।

৪০. শুকরের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা।

৪১. কোন হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা।

৪২. আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্য কারোর নামে যবেহকৃত পশু পাখির গোশ্‌ত ভক্ষণ করা।

www.pathagar.com

৪৩. মিথ্যা সাক্ষী দেয়া ।

৪৪. জ্যোতিষীদের ভবিষ্যত বাণীকে বিশ্বাস করা।

৪৫. গর্ব ও অহংকার করা ।

৪৬. ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।

৪৭. সত্য ও ন্যায়ের উল্টো ফয়সালা দেয়া বা বিচার করা।

৪৮. যালিম ও অত্যাচারীর প্রসংশা করা।

৪৯. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।

৫০. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের ওয়াক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ফরয নামায আদায় করা।

৫১. মুসলমান মুসলমানে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

৫২. সাহাবায়ে কিরাম (রা.) -কে মন্দ বলা।

৫৩. ঘুষ খাওয়া।

৫৪. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়া।

৫৫. কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা।

৫৬.কারণ ছাড়াই স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অসম্মত হওয়া ।

৫৭. আল্লাহ্র শাস্তি হতে নির্ভয় থাকা।

৫৮. আলিম ও হাফিয ক্বারীদের অসম্মান ও অবজ্ঞা করা।

৫৯. স্ত্রীর সাথে যিহার করা।

৬০. বেপরোয়াভাবে বারবার গুনাহে লিপ্ত হওয়া। (আশ'আতুল লুম'আত, ফাতহুল বারী, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া)

শির্ক

ইবাদত অর্থ হল- কোন সত্তার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন ও ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সামনে নিজের চরম অসহায়ত্ব মিনতি, অসামর্থতা এবং বিনয় প্রকাশ করা। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো সামনে এমন বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা জায়িয নয়। সুতরাং কোন সৃষ্ট জীবের সামনে এধরনের কোন কাজ করা শিরক। শুধুমাত্র মূর্তি পূজার নামই শির্ক নয়। বরং যে সম্মান, বিনয় ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য তা অন্য কারো জন্য প্রকাশ করাও শির্ক। পবিত্র কুরআনে ইয়াহূদী নাসারাদের শির্কের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে পণ্ডিত এবং যাজকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে (সূরা তাওবা : ৩১)।

হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা.) মুসলমান হওয়ার পূর্বে খৃস্টান ছিলেন। তিনি নবী করীম

www.pathagar.com

(সা.) -কে উল্লিখিত আয়াতের কথা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, আমরা তো কখনো আমাদের ধার্মিক আলিম, পুরোহিতদের ইবাদত করতাম না, অথচ পবিত্র কুরআনে তাদেরকে আমাদের মা'বূদ বানানোর কথা বলা হয়েছে ? নবী করীম (সা.) বললেন, তবে কি একথা ঠিক নয় যে, তোমাদের পুরোহিতরা এমন অনেক বস্তু হারাম করেছে যা আল্লাহ্ পাক হালাল করেছেন এবং আল্লাহ্ পাক যা হালাল করেছেন তাকে তারা হারাম করেছে ? আর তোমরা তাদের কথা মেনেছ। আদী ইব্‌ন হাতিম বললেন, নিশ্চয়ই এমন তো আমরা করেছি। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, এতেই তাদের বন্দেগী করা হয়েছে। মূলত কোন বস্তুকে হারাম হালাল করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ছেড়ে দিয়ে অন্যের কথা মানল, এক্ষেত্রে সে তারই বন্দেগী করল। যা স্পষ্ট শির্‌ক।

হারাম হালালের বিধানদাতা হিসাবে যেমন আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা শির্‌ক, অনুরূপ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে করাও শির্‌ক। কেননা হযরত আদী ইব্‌ন হাতিমের বর্ণনা, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি নবী করীম (সা.) -এর দরবারে যখন উপস্থিত হলাম তখন আমার গলায় শূলীর ক্রস লটকানো ছিল। নবী করীম (সা.) তা দেখে বললেন, এই ভূতকে গলা থেকে সরিয়ে দাও। আদী ইব্‌ন হাতিম যদিও তখন খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। কিন্তু তখন বাহ্যিকভাবে তা মুশরিকদের আচরণ ছিল বিধায় নবী করীম (সা.) তা ভেংগে ফেলতে বলেছেন (মা'আরিফুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)।

শির্‌কের প্রকারভেদ

শির্‌ক দু' প্রকার ঃ

১. শিরকে আকবর হলো, কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার মত সিফাতের সমকক্ষ বা সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করা।

২. শিরকে আসগার হলো, ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়তের সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল রাখা। যেমন লোক দেখানোর নিয়তে ইবাদত করা, সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের জন্য দান-সাদাকা করা ইত্যাদি (ফাতহুল মুলহিম)।

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া (র.) বলেন, শির্‌ক দু'প্রকার। শিরকে জলী, (প্রকাশ্য শির্‌ক) শির্‌কে খফী। শিরকে জলী আবার দু' প্রকার ঃ

১. শিরক-ফিল-ইলাহিয়া (الشرك فى الإلهية) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা ঃ যেমন - ইবাদত, বন্দেগী, ভয়, ভীতি, আশা-আকাংখা ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।

www.pathagar.com

২. শিরক ফির রবুবিয়াহ- (اَلشرك فِى الرَّبوبية) অর্থাৎ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সংগে অন্য কাউকে শরীক করা।

৩. শিরকে খফী (অপ্রকাশ্য-শিরক) অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। এ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। শিরকে খফী হলো, যেমন কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের সাথে অন্য কিছুর প্রভাবের ধারনা রাখা কিম্বা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের মুহব্বতের পর্যায়ে কোন কিছুকে মুহব্বত করা।

শিরকের প্রকারভেদ এভাবেও করা হয়ে থাকে –

১. কোন সম্প্রদায়ের দুই মা'বূদে বিশ্বাস রাখা। যেমন, অগ্নিপূজক সম্প্রদায়। তারা কল্যাণের মা'বূদ হিসাবে 'ইয়াযদান' এবং অকল্যাণের মা'বূদ হিসাবে 'আহ্‌রামান' এই দুই দেবতাকে মা'বূদ বলে মানে।

২. আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা। যেমন, মানুষের কোন কল্যাণ সাধন কিম্বা বিপদ মোচনে কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা। প্রয়োজনের সময় তাকে ডাকা।

মক্কা শরীফের তৎকালীন মুশরিকরা দেব-দেবীর উপাসনার ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করত। তারা বলত যে, সকল বিষয়ের প্রকৃত ক্ষমতার মালিক তো আল্লাহ্। তবে তিনি কোন কোন ফিরিশ্‌তা বা পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদেরকে বিশেষ বিষয়ে কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। তাই আমরা ঐ সকল ফিরিশ্‌তা ও পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের আকৃতি তৈরী করে এদের উপাসনা করে থাকি (মাজমাউল ফাত্‌ওয়া, ১ম খণ্ড)।

আবার কেউ শিরকের প্রকার ভেদ এরূপ করেছেন। দীনের ব্যাপারে মানুষ দু'প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়ে থাকে। এক শিরকে আযীম (বড় শিরক)। এ ধরনের শিরক আবার চার প্রকার ঃ

১. মা'বূদ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা।

২. অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা।

৩. সৃষ্টি জগত পরিচালনায় আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা।

৪. ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা

দুই. শিরকে সগীর। (ছোট শিরক)। যেমন, ইবাদতের মধ্যে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল রাখা অথবা কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ধারনা রাখা। আর লোক দেখানো ইবাদাত করাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা আল্লামা রাগিব ইস্‌ফাহানী (র.) বর্ণনা করেছেন।[১]

---

১. কাওয়াইদুল ফিকহ্ ঃ মুফ্‌তী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান (র.)।

www.pathagar.com

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিদ্‘আত

পরিচিতি ও প্রসংগ কথা

বিদ্‘আতের পরিচিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বিদ্‘আত ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও রূপরেখায় যতখানি আঘাত হানে ও শরী‘আতের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করে অন্য কিছু এর তত ক্ষতিসাধন করতে পারে না। বিদ্‘আতের ক্ষতি ও অকল্যাণ যেমন মারাত্মক অনুরূপ এর পরিধিও ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। ইসলামের আকীদা, আমল, মো‘আমেলা - জীবনাচারণ প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্‘আত ছড়িয়ে রয়েছে।

বিদ্‘আতের বিশ্লেষণ

বিদ্‘আত(بدعة) শব্দের আভিধানিক অর্থ নব সৃষ্টি দৃষ্টান্ত বিহীন উদ্ভাবন- এক কথায় নতুন ও অভিনব। ‘ اَلبدع ’ অর্থ যা ছিল না পরে হয়েছে, ما أحدث على مثال غير سابق অর্থাৎ যা পূর্ব দৃষ্টান্ত ব্যতীত উদ্ভাবন করা হয়েছে।‘ اَلبديع’ আল্লাহ্ তা‘আলার গুণবাচক নাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলার কুদরত ও সৃজন ক্ষমতার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে,

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ ط

আসমান যমীনের দৃষ্টান্ত বিহীন স্রষ্টা (লিসানুল আরাব. তাজুল উরুস)।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ط

আমি তো কোন অভিনব রাসূল নই (৪৬ ঃ ৯)।

এ আয়াত ‘ بدع ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ‘অভিনব’।[১]

বিদ্‘আতের পারিভাষিক অর্থ

আকীদা ও আমলের সে সকল আবিস্কৃত পন্থাকে বিদ্‘আত বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পর অতিরিক্ত সাওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র যুগে ও মৌলিক কারণ বিদ্যমান

---

১. সুন্নাত ও বিদ্‘আত ঃ মুফ্তী মুহাম্মদ শাফী(র.)।

www.pathagar.com

থাকা সত্ত্বেও এ সকল কাজের কোন প্রমাণ তাদের কথায় বা কাজে সুস্পষ্টরূপে বা ইঙ্গিতে ইশারায় পাওয়া যায় না। বিদ্'আতে এই সংজ্ঞাটি আল্লামা শাতিবী (র.) প্রণীত 'আল-ইতিসাম' হতে গৃহীত।১

মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বিদ্'আতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে সে সকল সংজ্ঞার সারমর্ম মূলত তাই দাঁড়ায় যা আল্লামা কিরমানী (র.) -এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন,

مَا لم يكن له أصل فى الكتاب والسنة

কুরআন ও সুন্নাহয় যার কোন মূল উৎস নেই।

ইমাম নববী (র.) বলেন,

ان البدعة كل شئ عمل على غير مثَال سبق وفى الشرع أحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

বিদ্'আত বলা হয় এমন কার্যকলাপকে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই এবং শরী'আতের পরিভাষায় বিদ্'আত বলা হয়, এমন সব বিষয়কে যার অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যামানায় ছিল না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাতিবী (র.)-এর ভাষ্য সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক। তিনি বলেন,

ان البدعة الحقيقة التى لَم يدل عليها دليل شرعى لاَ من كتَاب ولاَ من سنة ولا إجمَاع ولا إستدلاَل معتبر عند أهل العلم لا فى الجملة ولا فى التفصيل ولذالك سميت بدعة لانها مخترع على غير مثَال سابق.

প্রকৃত ও সত্যকারের বিদ্'আত তাই, যার স্বপক্ষে ও সমর্থনে শরী'আতের কোন দলীলই নেই। না আল্লাহ্র কিতাব না রাসূলের হাদীসে, না ইজমার কোন দলীল। না এমন কোন দলীল পেশ করা যায় যা মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য, না মোটামোটিভাবে না বিস্তারিত ও খুটিনাটিভাবে। এজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে বিদ্'আত। কেননা তা মনগড়া, সকল্পিত, শরী'আতে তার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

প্রখ্যাত হাদীসবিদ্ ইমাম খাত্তাবী (র.) বিদ্'আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

كل شئ أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عبارة وقياسة واما ما كان منها مبنيا على قواعد الأصول ومردود إليها

১. মা'আলিমুস্ সুনান, ৪র্থ খণ্ড।

www.pathagar.com

فليس ببدعة ولا ضلالة.

যে মত বা নীতি দীনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা শরী'আতে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই এবং যা কিয়াস দ্বারাও সমর্থিত নয় এমন যা কিছুই নতুনভাবে উদ্ভাবন করা হয় তা-ই বিদ্'আত। কিন্তু যা দীনের মূলনীতি মোতাবেক এবং তারই ভিত্তিতে গঠিত তা বিদ্'আতও নয় এবং গোমরাহীও নয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন বর্ণনায় শব্দের কিছু তারতম্য এবং ব্যবধান থাকলেও বিচার বিশ্লেষণে অভিন্ন। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাহ, সাহাবা ও ইজমা সূত্রে প্রমাণিত আকাইদ ও মাসাইলই হচ্ছে দীন ও শরী'আত এবং যা কিছু এর পরিপন্থী তার বাহ্যরূপ ইবাদাতের হলেও তা প্রত্যাখ্যাত ও গর্হিত বিদ্'আত। এখানে আর একটি লক্ষণীয় যে মুসলিম সমাজে সাধারণত সুন্নাত ও বিদ্'আত পরস্পর বিরোধীরূপে বিবেচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস সাহাবায়ে কিরাম কিয়ামের জন্য ও পরবর্তী মনীষীদের বক্তব্য এ ব্যবহার ব্যাপক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর তরীকা হচ্ছে সুন্নাহ্ এবং যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর তরীকা বহির্ভূত তাই হচ্ছে বিদ্'আত। সুন্নাত ও বিদ্'আত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন এবং নিন্দাবাদ বর্ণনা নিম্নে কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করা হল। সুখাইক ইব্‌ন হারিস আস-সুমালী (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من أحداث بدعة

কোন জাতি যখনই কোন বিদ্'আতের উদ্ভাবন করে তখন ঐ পরিমাণ সুন্নাত অন্তর্হিত হয়। সুতরাং কোন বিদ্'আত উদ্ভাবন না করে সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত (মাসনাদে আহ্‌মাদ ও মিশকাত)।

বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করে যা এর মধ্যে নয় তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে এমন কোন মতের উদ্ভব ঘটায় কুরআন ও হাদীসে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোন প্রমাণ নেই।[১]

قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلوة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين.

১. ইব্‌ন মাজা, পৃষ্ঠা ৬।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্‌'আতী ব্যক্তির নামায, রোযা, সাদাকা খয়রাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ এবং ফরয ও নফল ইবাদত কিছুই কবূল করেন না। সে ইসলাম থেকে তেমনিভাবে বেরিয়ে যায় যেমন বেরিয়ে আসে আটার খামির হতে চুল।[১]

قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الإسلام

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ্‌'আতীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল সে ইসলামের মূলোৎপাটন করার কাজে সাহায্য করল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত,

بلغنى أنه قد أحدث فان كان قد أحدث فلا تقرءوه منى السلام

অমুক সম্পর্কে আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, সে কোন বিদ্‌'আত সৃষ্টি করেছে। যদি সত্যিই সে কোন বিদ্‌'আত সৃষ্টি করে থাকে তবে তাকে আমার সালাম পৌছাবে না।[২]

ইবনুল মাজিশুন (র.) বলেন, আমি ইমাম মালিক (র.)-কে বলতে শুনেছি,

من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ فمالم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم دينا .

যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোর বিদ্‌'আত উদ্ভাবন করে এবং সে একে সাওয়াবের কাজ মনে করে প্রকৃতপক্ষে সে অভিযোগ আনল যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমার দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম . . .

অতএব সে দিন যে সব বিষয় দীন হিসেবে গণ্য ছিল না আজও তা দীন হিসেবে বিবেচিত হবে না।[৩]

বিদ্‌'আত উদ্ভাবনের কারণসমূহ

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন হওয়া সত্ত্বেও সাধারণত নিম্নোক্ত করণে বিদ্‌'আতের উদ্ভাবন হয়ে থাকে:

এক ঃ বিদ্‌'আত উদ্ভাবনের প্রধান কারণ হল, মূর্খতা। অর্থাৎ বিদ্‌'আত কর্মসমূহ আপাত দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় বলে মনে হয়। তাই শরী'আত সম্পর্কে অনবহিত সাধারণ লোকেরা এর

১. মিশকাত শরীফ, ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা। ২. আল- ইতিসাম ঃ আল্লামা শাতিবী (র.)। ৩. ইখতিলাফুল উম্মাহ, ১ম খণ্ড ৮৭-৯০পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারা মনে করে এ তো খুব সুন্দর কাজ। শরী'আতে এ কাজ নিষিদ্ধ হবে কেমন করে ? প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অজ্ঞতা এবং বাহ্যিক পসন্দের মাপকাঠির ভিত্তিতে তারা সুন্নাতের তুলনায় বিদ্'আতের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেক বেশী। ফলে বিদ্'আতের অন্তর্নিহিত মন্দ দিকের প্রতি তাদের নযর পড়ে না মোটেই। জনসাধারণের এ মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা সম্বন্ধে ওয়াকিহাল স্বার্থান্বেষী মহল এতে বিদ্'আত উদ্ভাবনে আরো সুযোগ খুঁজে পায়।

দুই ঃ বিদ্'আত সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হল, শয়তানের অপকৌশল এবং প্রতারণা। কেননা একথা সকলের জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনিত দীন, তাঁর সুন্নাহ্ এবং তরীকার প্রতি শয়তানের শত্রুতা চিরকালীন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তরীকাই হিদায়েতের একমাত্র পথ। শয়তান জানে, ধোঁকার মাধ্যমে যে লোকদেরকে পাপের পথে তাড়িত করলেও তারা তাওবার মাধ্যমে এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক সাফ হয়ে যায়। তাই সে সরল প্রাণ মুসলমানদের সত্যভ্রষ্ট করার জন্য বিদ্'আতের এমন সব পন্থা উদ্ভাবন করে থাকে সাধারণ লোকের সাওয়াবের কাজ মনে করে এবং নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করার দিকে অগ্রসর হয়। এতে তারা সাওয়াব তো আদৌ পায় না। বরং উল্টো গুনাহের ভাগী হয়।

বস্তুত শয়তান এক কালে ফিরিশ্তাদের উস্তাদ ছিল। জায়িয কি-না জায়িয এবং হারামকে হালাল বানানোর যাবতীয় ফন্দি ফিকির তার ভালভাবে রপ্ত করা আছে। এছাড়া সে একজন সেরা মনোবিজ্ঞানীও বটে। কোন শ্রেণীর মানুষকে গোমরাহ্ করতে হয় সে সব কৌশল শয়তানের খুব ভালভাবে জানা আছে। সে ঐ সব কৌশল অবলম্বন করেই কুরআন হাদীস বহির্ভূত কাজকে ধর্মের লেবাস পরিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে। অতঃপর সরলপ্রাণ মানুষের শ্রমশক্তি সময় ও অর্থ এ সব বেহুদা কাজে লাগিয়ে তাদের যিন্দেগী বরবাদ করে দেয়। ফলে তারা কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে চোখ বন্ধ রেখে নব উদ্ভাবিত বিদ্'আতকে মহা সাওয়াবের কাজ মনে করে আনন্দ চিত্তে তা করতে থাকে। এ কারণে তারা জীবনে তাওবার প্রয়োজীয়তা কখনো অনুভব করে না এবং তাওবাও তাদের নসীব হয় না।

তিন ঃ বিদ্'আত সৃষ্টির তৃতীয় কারণ হল, সুনাম সুখ্যাতি এবং পদমর্যাদার মোহ। এসব কারণেও মানুষ বিদ্'আত উদ্ভাবন করে থাকে। কেননা মানুষ স্বভাবত নতুনকে ভালবাসে এবং সেদিকে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কারণে সম্মানী লোভী সার্থান্বেষী ব্যক্তিরা ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন বিষয় আবিষ্কার করে, যেন তার সুনাম হয় সুখ্যাতি হয়। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আখিরী যামানায় বহু মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আর্বিভাব হবে। তারা তোমাদেরকে এমন কথা শুনাবে যা তোমরা কখনো শোননি এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও কখানো শোনেনি। তাদের থেকে বেঁচে থাকবে। তাহলে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না এবং ফিত্নায়ও ফেলতে পারবে না।

চার ঃ বিদ্'আত সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল, বিজাতীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ। তাহযীব

www.pathagar.com

তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে স্বভাবজাত নিয়ম হল এই যে, কোন জাতির মধ্যে যখন ভিন্ন সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন এক সভ্যতা অন্যটিকে অবলীলাক্রমে প্রভাবিত করে। যে জাতি স্বীয় সভ্যতার হিফাযত ও সংরক্ষণ করতে পারে না সে জাতি আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য উত্তম গুণাবলী ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা বিজাতীয় সভ্যতার কাছে আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। এটাই জগতের রীতি ও সভ্যতার ধারা। মুসলিম জাতি যতদিন পর্যন্ত বিজয়ী শক্তি হিসাবে টিকে ছিল এবং নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ করেছিল ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার অপরাপর সভ্যতা ছিল এর কাছে পদানত ও পরাভূত। কিন্তু যখন ঈমানী শক্তি দূর্বল হয়ে গেল এবং নিজেদের সভ্যতা সংরক্ষণে অমনোযোগী হল, তখনই বিজাতীয় সভ্যতার জয়যাত্রা শুরু হল এবং নিজেরা ক্রমশ সে সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হতে লাগল। আজকের মুসলিম জগতে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ মূলত এরই ফলশ্রুতি। এ অন্ধ অনুকরণের অবশ্যাম্ভাবী পরিণাম হিসাবে কোথাও অমুসলিম সমাজের রুসূম-রিওয়াজ সমূহ মুসলমানদের মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে, কালে তা ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে এবং মুসলমানরা ও তা সাওয়াবের কাজ বলে মনে করে করতে শুরু করেছে। এমনকি এর বৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করার দুঃসাহসিকতাও প্রদর্শন করছে। যেহেতু বিভিন্ন দেশের বিজাতীয় সভ্যতা ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়ে থাকে তাই দেখা যায় এক এক এলাকায় বিদ্'আত এক এক ধরনের।

একথা সত্য যে, এ উপমহাদেশে সূফী সাধকগণের প্রচেষ্টায়ই ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এখানে নও মুসলিমদের যথাযথ তা'লীমের ব্যবস্থা হয়নি। ফলে যারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা সাবেক রুসূম-রিওয়াজকে পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। তাই অদ্যাবদি যে সমস্ত কুসংস্কার বিশেষত বিবাহ-শাদী ও জন্ম মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার অধিকাংশই হিন্দু ধর্ম হতে আগত। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য এলাকার বিভিন্ন বিদ্'আত ও কুসংস্কারগুলো ঠিক এভাবে বিচার করা যায়।[১]

---

১. ইখতিলাফুল উম্মাহ্, ১ম খণ্ড, ৮৭-৯০পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কুসংস্কার

যে সব কাজ দেশপ্রথা ও রেওয়াজের ভিত্তিতে করা হয় এবং যা শরী'আত অনুমোদিত ও সমর্থিত নয় বরং কোন কোন সময় শরী'আতের পরিপন্থীও হয়ে থাকে। এরূপ কাজকে কুসংস্কার বা রুস্‌ম বলা হয়।

কুসংস্কার সমাজ দেহের জন্য মারাত্মক ব্যাধি। এর থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমরা সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিবাহ-শাদী, আচার-অনুষ্ঠান তথা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এর মূলে রয়েছে অজ্ঞতা, কুশিক্ষা এবং সমাজ প্রথার অন্ধ অনুকরণ। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

মাযার এবং ওরস সংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ

দরগাহ ও মাযারে ওরশ উপলক্ষে যে গান বাজনা করা হয়ে থাকে এবং ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। ওরশ উপলক্ষে এবং অন্যান্য সময় মাযারের উপর চাদর টানানো মাকরূহ বলে শামী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে (শামী, ১ম খণ্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা)।

মাযারের নামে নযর ও মানত করা মারাত্মক ধরনের অপরাধ। মাযারে এসে বাচ্চাদের চল্লিশা করা, বাচচাদের মাথার চুল কামানো এবং মাযারে শিরনী রান্না করে তা বিতরণ করা কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। এসব কাজ যদি কবরস্থ ওলী আল্লাহ্‌কে 'কাযিউল হাজাত' (মকসুদ পুরণকারী) মনে করে করা হয় তবে তা শিরক হবে। মাযারের নামে পাঠা বা ষাঁড় ছাড়াও এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

মাযারে বাতি দেওয়া কুসংস্কার এবং মাযারে সিজ্‌দা করা হারাম। এসব- কর্ম কাণ্ড হতে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। শামী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কবর পাকা করা, কবরের উপর সৌধ-নির্মাণ করা এবং কবরের উপর চলাফেরা করা নিষিদ্ধ। এগুলোও কুসংস্কারের মধ্যে শামিল।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وان
يكتب عليها أن يبنى عليها وأن توطأ .

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কবর পাকা করতে, কবরের গায়ে কিছু লিখতে, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে এবং কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছেন।

নির্দ্ধারিত দিনে ওরশ করাকে জরুরী মনে করা এবং এতেই সাওয়াব নিহিত আছে বলে আকীদা রাখা এবং অন্য দিন তা করা হলে সাওয়াব হবে না বলে বিশ্বাস রাখা কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত।

মৃত ব্যক্তিদের কবরে ফুল দেওয়াও কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। কোন পীর-দরবেশের মাযারে গিয়ে তার নিকট সন্তান বা টাকা পয়সা ভিক্ষা চাওয়া সুস্পষ্ট শির্‌ক। কেউ এরূপ করে থাকলে এর থেকে তাওবা করা আবশ্যক। সাওয়াবের নিয়তে কবরের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ (সুন্নাত ও বিদ্'আত ঃ মুফ্‌তী মোহাম্মদ শফী (র.), পৃষ্ঠা৭১)।

শবে-বরাত এবং আশুরার রুসূমসমূহ

শবে বরাতে হালুয়া রুটি এবং আশুরার সময় খিচুড়ী-শরবতের ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। শবে-বরাতে বাড়ী-ঘর ও মসজিদে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা, পটকা বা বোম ফুটানো এবং মরিচ বাতি ও তারা বাতি জ্বালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোও কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। এতে নিজের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, ইবাদতের পরিবেশ নষ্ট নয় এবং টাকা পয়সার অপচয় ও অপব্যয় হয়। আল-কুরআনে অপচয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আশুরা উপলক্ষে তাযিয়া মিছিলের ব্যবস্থা করা এবং এতে ঢাক- ঢোল ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র বাজানো নিষেধ। আশুরার দিন শরী'আত বিরোধী প্রক্রিয়ার কোন প্রকার আহাজারী এবং মাতম করা নিষেধ।

তাযিয়া মিছিলে মর্সিয়া (শোকগাথা) পাঠ করা এবং বিশেষ রঙ্গের পোশাক পরিধান করে শোক প্রকাশ করা কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। কারবালা প্রান্তরে শহীদান যেহেতু পিপাসার্ত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেছেন তাই আশুরার দিন লোকদের মধ্যে শরবত বিতরণ করা হলে এত কারবালার শহীদানের তৃষ্ণা নিবারণ হবে বলে আকীদা রাখাও এক প্রকার কুসংস্কার (ইসলাহুর রুসূম ঃ ৯৭-১০২)।

মৃত্যু পরবর্তীকালীন কুসংস্কারসমূহ

কারো মৃত্যুর পর তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে পুরুষ মহিলা মিলে হাউমাউ করে উচ্চস্বরে বিলাপ করা, বুক চাপড়িয়ে জামা কাপড় ছিড়ে ফেলা গুনাহের কাজ। এরূপ করার ব্যপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে নিষেধ রয়েছে।

কেউ মারা যাওয়ার পর সমস্ত ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর কাপড়-চোপড়, গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করাও না জায়িয (ইসলাহুর রুসূম ঃ ১০৩-১০৭)।

www.pathagar.com

রামাযান মাসে প্রচলিত কুপ্রথাসমূহ

রামাযান মাসে তারাবীহ্‌র নামাযে কুরআন শরীফ শুনিয়ে পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা পয়সা গ্রহণ করা না জায়িয। পারিশ্রমিক দেওয়াও না জায়িয। কুরআন শরীফ খতমের দিন টাকা পয়সা চাঁদা করে তাবারুকের ব্যবস্থা করাকে জরুরী মনে করা এক প্রকারের কুপ্রথা। কুরআন খতমের দিন রাতে মসজিদে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা না জায়িয। এ কাজে অর্থের অপচয় হয়। রামাযান মাসে বাড়ীতে বেগানা হাফিয রেখে তার পেছনে মহিলাদের জামা'আত করাও এক প্রকার কুসংস্কার (ইসলাহুর রুসূম)।

লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে কুসংস্কারসমূহ

পোশাক-আশাক, চাল-চলন, আহার-বিহার ইত্যাদিতে বিধর্মীদের অনুকরণও কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে ঃ

قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهومنهم.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যদি কেউ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন জাতির অনুকরণ করে তবে সে ঐ জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে (আবূ দাউদ)।

যে সব জিনিস বিজাতীয় বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে বিজাতীয় অনুকরণ কোনক্রমেই জায়িয নেই (ইসলাহুর রুসূম, পৃষ্ঠা-২৩)।

সামাজিকতা, সাধারণ অভ্যাসাদি এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য সমূহের ক্ষেত্রে বিজাতীয় অনুকরণ মাকরূহ্ তাহরীমী। যেমন খৃস্টানদের টুপী, হিন্দুদের ধুতি এবং বৌদ্ধদের লাল-কাপড়ের তেরী পোশাক। এধরণের পোশাক ব্যবহার করা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

লেবাসের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য মহিলাদের অনুকরণ এবং মহিলাদের জন্য পুরুষের অনুকরণ সম্পূর্ণরূপে হারাম। রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। অনুরূপ স্বর্ণের আংটি বা চেইন ব্যবহার করাও পুরুষের জন্য হারাম। হাফ প্যান্ট পরিধান করা পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই হারাম। টাখ্‌নু-গিরা আবৃত করে পায়জামা এবং ফুল প্যান্ট পরিধান করাও পুরুষের জন্য হারাম। পুরুষের গলায় টাই বাধাও কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। কেননা এ হচ্ছে খৃস্টানদের বিশেষ প্রতীক।

চুল-দাঁড়ির ব্যাপারে সামাজিক কুপ্রথাসমূহ

দাঁড়ি কামানো, দাঁড়ি এক মুঠোর কম রাখা, গোঁফ লম্বা রাখা ইত্যাদি কাজ শরী'আতের বিধানে নিষেধ। দাঁড়ি কামানো বা ছোট করা এবং গোফ লম্বা রাখা গুনাহের কাজ, এ কথা জেনেও কেউ যদি এ অভ্যাস ত্যাগ না করে বরং এতে আনন্দ পায়, লম্বা দাঁড়ি রাখাকে নিন্দনীয় মনে করে, শশ্রুধারীদের নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে এবং দাঁড়ি রাখার কারণে কাউকে হীন ও অসামাজিক মনে করে তবে তার ঈমানের ব্যাপারে আশংকা রয়েছে। ফ্রান্স কাটিং দাঁড়ি রাখাও

www.pathagar.com

সামাজিক কুপ্রথার অন্তর্ভূক্ত। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা না জায়িয। চতুর্দিকে চুল লম্বা রেখে মাথার মধ্যভাগের চুল মুণ্ডন করা অথবা মধ্যখানে লম্বা রেখে চতুর্দিকের চুল ছোট করে রাখা অথবা পেছনের তুলনায় সামনের চুল বড় বা ছোট করে মধ্যখানে সামান্য চুল রেখে দেওয়া এও বদ্ রুস্ম সমূহের শামিল। ইসলামী শরী'আতে এভাবে চুল রাখার অনুমতি নেই (ইসলাহুর রুস্ম, পৃষ্ঠা ১৫-১৯)।

দাবা ও অন্যান্য খেলা ধুলা

জুয়া, দাবা, পাশা, তাস এক কথায় গুটির সাহায্যে যে সব খেলা হয়ে থাকে এগুলোও সামাজিক কুপ্রথা সমূহের অন্তর্ভূক্ত। এধরণের খেলা ধুলা ইসলামে জায়িয নেই। এসব খেলায় টাকা-পয়সার অপচয় হয়; সময় নষ্ট হয় এবং ইবাদত বন্দেগী বিঘ্নিত হয়, এবং এতে মানুষ দীন-ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে (ইসলাহুর রুস্ম, পৃষ্ঠা ৯-১০)।

আতশ্‌বাজী

আতশ্‌বাজীও সামাজিক কুপ্রথা সমুহের একটি। এতে অনেক অপকারিতা রয়েছে। এতে অর্থের অপচয় হয়; কখনো আবার জীবন বিপন্ন হয়। আতশ্‌বাজীর কারণে হাত নষ্ট হওয়া, মুখ পুড়ে যাওয়া এবং পোশাকে আগুন লাগা ইত্যাদির আশংকা থাকে।

ঘরে ছবি টানানো এবং কুকুর পালা

ঘরে ছবি টানানো এবং বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালাও বদ- রেওয়াজ সমূহের অন্যতম। বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

لاَ تدخل الملاَئكة بيتا فيه كلب ولاَ صورة .

যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে ঐ ঘরে রহমতের ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে না। তবে গবাদি পশুর রক্ষণা-বেক্ষণ, শষ্য ক্ষেতের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং শিকার করা এ তিন কাজের জন্য কুকুর পালা জায়িয। এ মর্মে হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ উল্লেখ রয়েছে (ইস্‌লাহুর রুস্‌ম, পৃষ্ঠা ২১-২৩)।

আরো কতিপয় রুস্ম

শরী'আত সম্মত ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ তাহরীমী। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

عَن عائشة رضى الله تعالىٰ قالت من حدثكم ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قَائما فلا تصدقون ما كان يبول إلا قَاعدا.

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কেউ যদি তোমাদেরকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

পেশাব করতেন তবে একথা বিশ্বাস করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তো সর্বদা বসে বসে পেশাব করতেন।

অবশ্য শরী'আত সম্মত কোন ওযর দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধানে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানা খাওয়াও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো এভাবে খানা খেয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনিভাবে খানা খাওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে প্লেটে কিছু খাদ্য রেখে দেওয়াও কুপ্রথার অন্তর্ভূক্ত। এতে খাদ্যের অপচয় হয়। বাম হাতে পানাহার করাও সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।

হিন্দুদের অনুকরণে কপালে তিলক লাগানো বদ রুসমের অন্তর্ভূক্ত (বেহেশ্তী জিওর)।

খাৎনার রুস্ম সমূহ

খাৎনার অনুষ্ঠানে লোক পাঠিয়ে বা পত্র যোগে আমন্ত্রণ করে জন্য সমাবেশ ঘটানো সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত হাসান (রা.) বলেন, কোন এক ব্যক্তি হযরত উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা.)-কে খাৎনার অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় আমরা খাৎনার অনুষ্ঠানে যোগদান করতাম না (ইসলাহুর রুসূম)।

খাৎনার অনুষ্ঠানে উপহার আদান-প্রদান করার যে রুস্ম রয়েছে তা-ও কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। খাৎনাকে কেন্দ্র করে যে নাচ-গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে তাও শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (ইসলাহুর রুস্ম)।

বিবাহ-শাদীর রুস্মসমূহ

বিবাহ শাদীর পূর্বে পাত্র কর্তৃক প্রয়োজনে পাত্রীকে দেখে নেওয়া জায়িয। কিন্তু পাত্র সহ-পাত্রের বাবা, মামা, চাচা, দাদা, নানা, ভগ্নিপতি-এবং চাচাতো ভাই, মামাতো-ভাই, খালাতো ভাই-এক কথায় মাহরাম- গায়রে মাহরাম সকলে মিলে পাত্রী দেখার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে না জায়িয।

বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠানে নাচ-গান করা হারাম। এমনিভাবে ব্যাণ্ড পার্টির দ্বারা বা যে কোনভাবে ঢোল তবলা বাজানোও সম্পূর্ণরূপে হারাম। গোসল পর্বে বর-কণে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শরীরে হলুদ মাখামাখি, রং ছিটা-ছিটি এবং বেগানা পুরুষ ও মহিলাদের পরস্পর হাতাহাতি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। গোসল অনুষ্ঠানের শুরুতে শরার অগ্রভাগে তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে গোসল আরম্ভ করা কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে কণেকে তার দুলাভাই এবং বরকে ভাবি বা এ জাতীয় গায়রে মাহ্রাম কেউ কোলে করে নিয়ে গোসলের চৌকিতে বসিয়ে গোসল দেওয়াও কুসংস্কার।

বিবাহের জন্য কোন দিন বা কোন মাসকে অশুভ মনে করাও কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত।

www.pathagar.com

বিবাহের মধ্যে দাবী করে যৌতুক আদায় করা হারাম।

বিবাহ শাদীতে এমন মোটা অংকের মোহরানা নির্ধারণ করা যা পরিশোধ করার ইচ্ছা নেই, এভাবে মোহ্রানা নির্ধারণ করা ইসলামে জায়িয নেই। হযরত উমর (রা.) বলেছেন, অংকের মোহর সাব্যস্ত করবে না। কেননা তা যদি দুনিয়ার জীবনে সম্মান লাভ এবং তাক্ওয়ার কোন বিষয় হত তাহলে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা করতেন। বিবাহের অনুষ্ঠানে কণের পিতা উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও অন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করা সামাজিক কুপ্রথার অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে মাহ্রামের সঙ্গে গায়রে-মাহ্রাম কণের নিকট গিয়ে তার থেকে ইয্ন আনাও এক ধরণের কুসংস্কার। গায়রে-মাহরাম লোকদের কণের নিকট যাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইয্ন আনার সময় পান-সুপারী এনে বরের সামনে রাখা কুসংস্কার। আমন্ত্রণ না পেয়ে কারো বাড়ীতে যাওয়া এবং খাওয়া ঠিক নয়। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে গেল সে চোর হয়ে প্রবেশ করল এবং লুটেরা হয়ে বেরিয়ে এল।

বর যাত্রার সময় আতশবাজী করা কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত। কণের বাড়ীতে ফটকে গেইট তৈরী করে বরের নিকট থেকে টাকা-পয়সা উসূল করা কুপ্রথা। বিবাহের সময় বাড়ীতে আ-লোক সজ্জার ব্যবস্থা করা অপব্যয় এর শামীল। এমনিভাবে বর যাত্রার সময় ফুল-মালা দিয়ে গাড়ী ইত্যাদি সজ্জিত করা উচিত নয়। খানাপিনার পর বরকে ঘরে নিয়ে মহিলাদের জড়ো হয়ে নির্লজ্জভাবে আলাপ চারিতায় লিপ্ত হওয়া মারাত্মক গুনাহের কাজ। বিবাহ-শাদীতে কনে পক্ষের লোকেরা বরকে এবং বর পক্ষের লোকেরা কনেকে সালামীর নামে যে টাকা-পয়সা বা উপঢৌকন দিয়ে থাকে তা দেশ প্রথার অন্তর্ভূক্ত। এসব উপঢৌকন মূলত বিনিময় পাওয়ার আশায় বা নিন্দাবাদের আশংকায়ই সাধারণত আদান- প্রদান করা হয়ে থাকে। এরূপ না করাই উচিত। কণের বিদায়ের সময় কণে এবং তার আত্মীয় স্বজনদের হাউমাউ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা শরী'আতের বর খেলাপ কাজ। নব বধুকে ঘরে তুলে তার সাথে বরকে বসিয়ে গায়ের মাহ্রাম মহিলাদের চিনি খাওয়া খাওয়ি এবং পরস্পর হাতাহাতি ইত্যাদি করা উচিত নয়। গায়রে-মাহ্রামের বর-কণেকে কোলে করে গাড়ী বা পাল্কী থেকে ঘরে তোলা হারাম।

অনৈসলামিক অনুষ্ঠানসমূহ

অনৈসলামিক অনুষ্ঠানাদি যা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এর সংখ্যাও অনেক। এর মধ্যে একটি হল গানের অনুষ্ঠান। গানের অনুষ্ঠান বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোথাও যাত্রা গান, কোথাও পাল্টা গান, আবার কোথাও সাধারণ গানের অনুষ্ঠান। এসব গানের অনুষ্ঠানে থাকে সারেঙ্গী, বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশী, দোতারা, সেতারা, ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র। গান এবং বাদ্য যন্ত্র সব কিছুই শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ

www.pathagar.com

عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অবাস্তব কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি (সূরা লুকমান ঃ ৬)।

বায়হাকী এবং হাকিম এর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ, ইব্‌ন আববাস এবং জাবির (রা.) এর মতে আলোচ্য আয়াতে -'لهوالحديث' অর্থ বাদ্যযন্ত্র। ইমাম বুখারী (র.) ও 'لهو الحديث' এর এ ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি বলেন, لهوالحديث هو الغناء وأشباهه অর্থাৎ 'لهوالحديث' বলে গান ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়কে বুঝানো হয়েছে।

আবূ মালিক আশ'আরী (র.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মাতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহ গান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করে দিবেন (আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজা)।

গান গাওয়া এবং গানের অনুষ্ঠানে যাওয়া সবই হারাম। এমনিভাবে নাট্যানুষ্ঠান এবং পেক্ষাগৃহে যে ছায়া ছবি দেখানো হয় তাতে অংশগ্রহন করাও হারাম।

বিভিন্ন রকম মেলা

মেলা যা অস্থায়ী হাট বাজার বা উৎসবাদি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে শরী'আত বিরোধী বিভিন্ন প্রকার প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। যেমন বৈশাখী মেলা, পূজার মেলা, রথের মেলা, আনন্দ মেলা, অশ্লীল প্রদর্শনী, মীনা বাজার ইত্যাদি এসব মেলায় আনন্দের নামে গান-বাজানো নৃত্য নাচ-ইত্যাদি ছাড়া নানাহ রকমের অনৈসলামিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা, জুয়া,হাউজি ইত্যাদি। এতে টাকা পয়সাও প্রচুর অপব্যয় হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো যেহেতু ইসলামে হারাম তাই মেলা অনুষ্ঠান এবং মেলায় গমন সবই শরী'আত বিরোধী কাজ।

কুফরী কালাম

যে কথার দ্বারা মানুষ কাফির হয়ে যায় বা ঈমান হারা হয়ে যায় এরূপ কথাকে 'কুফরী কালাম' বলা হয়। আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী) সম্পর্কে অস্বীকৃতি সূচক বা অবমাননা কর অথবা অশোভনীয় কোন উক্তি করা অথবা আল্লাহ্‌র কোন অকাট্য আদেশ বা নিষেধকে অস্বীকার করা বা এর প্রতি খারাপ মন্তব্য করা এসবই কুফরী কালাম। ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে কোন উক্তি করা অথবা ঈমান ও ইসলামের প্রতি অবমাননাকর

www.pathagar.com

কোনরূপ মন্তব্য করা অথবা নিজের ঈমানের প্রতি অনিহা প্রকাশ করা বা ঈমান ও কুফরকে একই পর্যায় ভূক্ত বলে মন্তব্য করা কিংবা ঈমান ও ইসলামের প্রতি লা'নত করা ইত্যাদি কুফরী কালাম। অন্য ধর্মের প্রশংসা করে ইসলাম ধর্মের প্রতি নিন্দাবাদ ব্যক্ত করা কুফরী কালাম।

নবী-রাসূগণের কাউকে অস্বীকার করা অথবা তাঁদের আনীত কোন আদর্শকে অপবাদ করে কোন মন্তব্য করা অথবা তাঁদের কারো প্রতি অশ্লীলতা আরোপ করা কিংবা তাঁদের কারো প্রতি কোন কটূক্তি করা বা তাঁদেরকে গালমন্দ করা কিংবা তাঁদের প্রতি অশালীন কোন মন্তব্য করা কুফরী কালাম। কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা কিংবা কুরআনের কোন আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করা অথবা কুরআনের ভেতর কোন ত্রুটি আছে বলে মন্তব্য করা বা কুরআনের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায় এরূপ উক্তি কুফরী কালাম। নামায, রোযা, হজ্জ,যাকাত ইত্যাদির একটি ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করা অথবা এর প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করা অথবা এ সম্পর্কে কোনরূপ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা বা এ সমস্ত হুকুম আহ্কামের প্রতি অবমাননাকর কোন উক্তি করা কুফরী কালাম।

দীনী ইল্মের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোন উক্তি করা বা ইল্মে দীনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশত কোন আলিমের প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ এবং ঠাট্টা-উপহাসমূলক কোন মন্তব্য করা কুফরী কালাম। কোন অকাট্য হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলে অভিমত ব্যক্ত করা কুফ্রী কালাম।

কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, মীযান, হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত এবং আমলনামাকে অস্বীকৃতিসূচক কোনরূপ উক্তি করা কুফরী কালাম। কুফরী কথা মুখ থেকে বের হতেই ঈমান চলে যায়। পূর্বে নামায, রোযা, ইবাদত-বন্দেগী যত কিছু করা হয়েছে সব বাতিল হয়ে যাবে। বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ হলে তাওবা করে কলেমা পড়ে পুনরায় মুসলমান হতে হবে। এরপর পুনরায় বিবাহ দুহরিয়ে নিতে হবে। পূর্বে হজ্জ করে থাকলে পুনরায় ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজ্দা করা

সিজ্দা দু'প্রকার ঃ

১. ইবাদতসূচক সিজ্দা। ২. সম্মানসূচক সিজ্দা।

ইবাদত হিসাবে সিজ্দা করার মানে হচ্ছে, কাউকে ইলাহ্ এবং মাবূদ মনে করে সিজ্দা করা। ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজ্দা করা কুফ্র এবং শির্ক। এরূপ সিজ্দা পূর্ববর্তী কোন শরী'আতেও জায়িয ছিল না। অবশ্য সম্মানসূচক সিজ্দা পূর্ববর্তী শরী'আত সমূহে বৈধ ছিল। কিন্তু এরূপ সিজ্দাও শরী'আতে মুহাম্মদীতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী শরী'আতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতসূচক সিজ্দা এবং সম্মানসূচক সিজ্দা করা হারাম এবং নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

তোমরা সূর্যকেও সিজ্‌দা করো না আর চন্দ্রকেও নয় বরং একমাত্র আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক (সূরা হা-মীম সিজ্‌দা ঃ ৩৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন,আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজ্‌দা করার জন্য যদি আমি অনুমতি দিতাম তবে মহিলাদেরকে হুকুম করতাম যেন তারা তাদের স্বামীদেরকে সিজ্‌দা কর (তিরমিযী)।

এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হোক অথবা সম্মান প্রদর্শণের উদ্দেশ্যে হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজ্‌দা করা জায়িয নেই। উভয় সিজ্‌দার মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, কাউকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করা কুফরী আর সম্মান প্রদর্শণের উদ্দেশ্যে সিজদা করা হচ্ছে হারাম। অথবা এরূপ বলা যায় যে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করা 'আকীদাগত শির্‌ক' আর সম্মান প্রদর্শণের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করা হচ্ছে কার্যত শির্‌ক (মা'আরিফুল কুরআন ঃ মাওলানা ইদ্‌রীস কান্ধলভী,১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২।

আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নামে মানত করা

এখানে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদির উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করা যেমন জায়িয নেই।অনুরূপ নবী, রাসূল, পীর, ফকীর, মাযার, দরগাহ্ ইত্যাদি কোন কিছুর সিজ্‌দা করা জায়িয নেই। কেউ যদি শরী'আতের বিধান লংঘন করে সিজ্‌দা করে তবে তা হবে শির্‌ক এবং হারাম।

এক আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নামে মানত করা জায়িয নেই। কোন দেব-দেবী, পীর, পয়গাম্বর অথবা কোন মাজার বা আস্তানার নামে মানত করা হারাম। এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কেউ যদি কাউকে হাজত পুরাকারী আকীদা রেখে তাকে বলে, হে অমুক! তুমি আমার এ উদ্দেশ্য পূরা করে দাও, আমি তোমার নামে শির্‌নী দিব। এরূপ বলা হরাম এবং শিরক (শামী, ৪র্থ খণ্ড)।

দরগাহের নামে মানত করা তা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কেননা মানত হচ্ছে ইবাদত। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা জায়িয নেই।

কেউ যদি এরূপ মানত করে যে, আমার অমুক কাজটা হয়ে গেলে আমি অমুক মাজারে একটি চাদোঁয়া দিব বা অমুক দরগাহে নিয়ায পাঠাব তবে এ মানত সহীহ্ হবে না। এবং তার

www.pathagar.com

দায়িত্বে কোন কিছু ওয়াজিবও হবেনা। এ সম্বন্ধে বুনিয়াদি কথা হচ্ছে এই যে, মৃত অলীগণের নৈকট্য হাসিলের জন্য তাদের নামে যে মানত করা হয় এবং নযর ও নিয়ায প্রেরণ করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এর বহুবিদ কারণ রয়েছে- প্রথমত, মানত হচ্ছে ইবাদত। আর ইবাদত কোন মানুষের জন্য করা জায়িয নেই। দ্বিতীয়ত, যার নামে মানত করা হচ্ছে সে হল মৃত ব্যক্তি আর মৃত ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তৃতীয়ত, যারা মৃত অলীদের নামে মানত করে তারা যদি এ কথা মনে করে যে, ওলীগণই সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তবে এ ধারনাও সুস্পষ্ট কুফ্রী। সুতরাং পীর-ফকীর, মাজার, দরগাহ্ ইত্যাদি কোন কিছুর উদ্দেশ্যে মানত করা জায়িয নেই (শামী)।

ইফাবা/৯৬-৯৭/গবেষণা/৫৩৩০-উন্নয়ন-৩২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ